1334.

আকাশ-প্রদীপ

[শিল্পী—শ্রীঅসীতকুমার হালদার।

CALCUTTA UNIVERSITY
Acc. No.
Book No.

বসন্ত রায়

আহা, ভিতের মধ্যে হোলো না দেখা! দিন বৃথা গেল।

ধনঞ্জয়

গান

কখন পথের বাহির থেকে
হঠাৎ বাঁশি যায় যে ডেকে
পথ-হারাকে করে সচেতন॥

বসন্ত

এসো ঠাকুর, একবার কোলাকুলি ক'রে নিই।

প্রজা

কোথায় চলেচ মহারাজ?

বসন্ত

প্রতাপ আমাকে ডেকেছে তাই যশোরে চলেচি।

প্রজা

রাজগড়ে ফিরে যাও আজ রাত্তিরেই।

বসন্ত

কেন বলো দেখি?

প্রজা

নানারকম গুজব কানে আসে। ভালো লাগে না।

ধনঞ্জয়

কোথাকার অবাজা এরা সব! নিজেরাও চলবিনে ভবে, অন্যকেও চল্‌তে দিবিনে?

প্রজা

দেখচ না, ঠাকুর, পাঠানটা হঠাৎ কখন্ স'রে গেল?

ধনঞ্জয়

তোদের সঙ্গ ওর ভালো লাগল না, তাতে আর আশ্চর্য্য কি রে! সবাই কি তোদের সহ্য করতে পারে?

প্রজা

তোমার সাদা মন, তুমি বুঝবে না—ওর যে কি মৎলব ছিলো তা বোঝাই যাচ্ছে।

ধনঞ্জয়

সাদা মনে বোঝা যায় না, ময়লা মনে বোঝা সহজ হয় এ কথা নতুন শোনা গেল। বিশ্বাস নেই, উপর থেকে বস্ দীঘির পানা, বিশ্বাস ক'রে নীচে ডুব মারিস, দেখবি জল। তোরা ভাঙা থেকেই মুখ ফিরিয়ে যাস, আমি না নিয়ে দেখে ছাড়িনে।

প্রজা

প্রভু, বাঁশ যে হয়।

ধনঞ্জয়

সেই জন্যেই সংসারে কেবল রাগীকেই দেখিস্—না রাগতিস, তা হ'লে যে রাগে না, তাকেও দেখতে পেতিস্।

(পাঠানের পুনঃ প্রবেশ)

বসন্ত রায়

এই যে খাঁ সাহেব ফিরেচে। তুমি যে কারসি বয়েৎগুলি শুনিয়েছিলে, ওগুলি আমাকে লিখে দিতে হবে।

পাঠান

দেবো হুজুর, কিন্তু একটা কথা নিবেদন করি। (প্রজাদিগকে দেখাইয়া) এই ওদের স'রে যেতে বলো।

প্রজা

না, সে হবে না। আমরা ওঁকে ফেলে যাবো না।

ধনঞ্জয়

কেন যাবিনে রে? তাই অহঙ্কার তোদের দেখি। তোরা যদি রক্ষাকর্ত্তা, না?

প্রজা

তুমি যদি হুকুম করো তো যাই।

ধনঞ্জয়

রক্ষা করবার যদি দরকার হয়, খাঁ সাহেব একলা রক্ষা করতে পারবেন। [প্রজাদের প্রস্থান।

পাঠান

মহারাজ, আমাকেই রক্ষা করো।

বসন্ত রায়

সে কি কথা? কিছু বিপদ হয়েচে?

পাঠান

হয়েচে। আমি যদি আজ যশোরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ থাকবে না।

বসন্ত রায়

সর্ব্বনাশ! কেন, কি অপরাধ করেচ?

পাঠান

প্রতাপাদিত্য রাজা কাল যখন আমাদের দুই ভাইকে রওনা ক'রে দিলেন, তখন পথের মধ্যে আপনাকে খুন করবার হুকুম ছিল।

বসন্ত রায়

কি বলো খাঁ সাহেব?

পাঠান

হাঁ, কিন্তু গোপনে। গোপনও রইল না, তা ছাড়া আপনাকে মারা আমার দ্বারা হবে না, মনিবের হুকুমেও না। এখন আপনার মেহেরবানী চাই।

বসন্ত রায়

এখনি চলে যাও রায়গড়ে। তোমার কোনো ভয় নেই। (সেলাম করিয়া প্রস্থান) বুকে বড় বাজলো ঠাকুর!

ধনঞ্জয়

বাজবে বই কি ভাই। ভালোবাসো যে—না বাজলে কি ভালো হতো?

গান

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।

বসন্ত রায়

আহা, সার্থক হোক্ কান্না আমার।

ধনঞ্জয়

গান

তোমার অভিসারে
যাবো অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে॥

বসন্ত রায়

এই ব্যথার পথেই আমাকে চালাও প্রভু! আমি আর কিছুই চাইনে।

ধনঞ্জয়

গান

পরাণে বাজে বাঁশি নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিলো দিশাহারা।
সকলি নিবে কেড়ে
দিবে না তবু ছেড়ে,—
মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কি দায়ে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্র-গৃহে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী

মহারাজ কাজটা কি ভাল হবে?

প্রতাপাদিত্য

কোন্ কাজটা?

মন্ত্রী

যেটা আদেশ করেছেন—

প্রতাপ

কি আদেশ করেছি?

মন্ত্রী

আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে—

প্রতাপ

আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কি?

মন্ত্রী

মহারাজ আদেশ করেছিলেন, যখন রাজা বসন্ত রায় যশোরে আসবার পথে শিমুলতলীর চটিতে আশ্রয় নেবেন, তখন—

প্রতাপ

তখন কি? কথাটা শেষ ক'রেই ফেল।

মন্ত্রী

তখন লুকন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপ

হাঁ।

মন্ত্রী

তাকে নিহত করবে।

প্রতাপ

নিহত করবে! অমরকোষ খুঁজে বুঝি আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না? নিহত করবে! মেরে ফেলবে কথাটা মুখে আনতে বুঝি বাধছে?

মন্ত্রী

মহারাজ আমার ভাবটি ভাল বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপ

বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

মন্ত্রী

আজ্ঞে মহারাজ আমি—

প্রতাপ

তুমি শিশু। খুন করাটা যেখানে ধর্ম, সেখানে না করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি আছে। পিতৃব্য বসন্ত রায় নিজেকে মোগলের দাস বলে স্বীকার করেছেন। কত হ'লে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়, সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্রী

যে আজ্ঞে।

প্রতাপ

অমন তাড়াতাড়ি "যে আজ্ঞে" বলে চলবে না। তুমি মনে করছ নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে লাগচে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অনুরোধে ভৃগু তাঁর মাকে বধ করেছিলেন, আর ধর্ম্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ করবো না?

মন্ত্রী

কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন, তবে—

প্রতাপ

আর যাই কর, দিল্লীশ্বরের ভয় আমাকে দেখিয়ো না!

মন্ত্রী

প্রজারা জানতে পারলে কি বলবে?

প্রতাপ

জানতে পারলে ত।

মন্ত্রী

এ কথা কখনই ছাপা থাকবে না।

প্রতাপ

দেখ মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দুর্ব্বল ক'রে তোলবার জন্যই কি তোমাকে রেখেছি?

মন্ত্রী

মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—

প্রতাপ

দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, শেষকালে উদয়াদিত্য! সেই ত্রৈণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না। দেখদেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটো এখনো এল না!

মন্ত্রী

সেটা ত আমার দোষ নয় মহারাজ।

প্রতাপ

দোষের কথা হচ্চে না। দেরি কেন হচ্চে তুমি কি অনুমান কর তাই জিজ্ঞাসা করচি।

মন্ত্রী

শিথিলতলী ত কাছে নয়। কাজ সেরে আসতে দেরি ত হবেই।

(এক জন পাঠানের প্রবেশ)

প্রতাপ

কি হোলো?

পাঠান

মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।

প্রতাপ

সে কি রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান

জানি বৈ কি। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভুল নেই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলুম না। আমার ভাই হোসেন খাঁর উপর ভার আছে সে খুব হুসিয়ার। মহারাজের পরামর্শমতে আমি খুড়া রাজা সাহেবের লোকজনদের তফাৎ করেই চলে আসচি।

প্রতাপ

হোসেন যদি ফাঁকি দেয়।

পাঠান

তোবা! সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ! আমি আমার শির জামীন রাখ্‌লুম।

প্রতাপ

আচ্ছা, এইখানে হাজির থাক, তোমার ভাই ফিরে এলে বক্‌শিষ মিলবে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায়, সে চেষ্টা করতে হবে।

মন্ত্রী

মহারাজ, এ কথা গোপন থাকবে না।

প্রতাপ

কিসে তুমি জানলে?

মন্ত্রী

আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষ আপনি ত কোনো দিন লুকোতে পারেন নি। এমন কি, আপনার কন্যার বিবাহেও আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি—তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, আর পথে এই কাণ্ডটি ঘটল, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এর মূল ব'লে জানবে।

প্রতাপ

তা'হলেই তুমি খুব খুসি হও! না?

মন্ত্রী

মহারাজ, এমন কথা কেন বল্‌ছেন? আপনার ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্যের বিচার আমি করিনে, কিন্তু রাজ্যের ভাল-মন্দর কথাও যদি আমাকে ভাবতে না দেবেন, তবে আমি আছি কি কর্‌তে? কেবল প্রতিবাদ ক'রে মহারাজের ভেদ বাড়িয়ে তোল্‌বার জন্যে?

প্রতাপ

আচ্ছা, ভালমন্দর কথাটা কি বোঝালে, শুনি!

মন্ত্রী

আমি এই কথা বলছি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুল্‌বেন না! দেখুন মাধবপুরের প্রজারা খুব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তারা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয়, এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেই জন্য মাধবপুর-শাসনের ভার যুবরাজের উপর দেবার কথা আমিই মহারাজকে বলেছিলেম।

প্রতাপ

সে ত বলেছিলে। তার ফল কি হ'ল দেখ না। আজ ছয়বৎসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এল, আর ওখান থেকে কি আদায় হ'ল?

মন্ত্রী

আজ্ঞে আশীর্ব্বাদ। তেমন সব বজ্জাত প্রজাও যুবরাজের পায়ের গোলাম হয়ে গেছে। টাকার চেয়ে কি তার কম দাম? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধবপুরের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উল্টে গেল। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভাল ছিল! সেখানকার প্রজারা ত হ'য়ে ভূভূরের মত ক্ষেপে রয়েছে—তার পরে আবার যদি এই কথাটা প্রকাশ হয়, তা'হলে কি হয় বলা যায় না। রাজকার্য্যে ছোটোদের অবজ্ঞা কর্‌তে নেই মহারাজ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড় হয়ে ওঠে।

প্রতাপ

সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী ত মাধবপুরে থাকে!

মন্ত্রী

আজ্ঞে হাঁ।

প্রতাপ

সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্ম্মের ভেক ধ'রে সেই ত যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই ত প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলেছিলুম যেমন ক'রে হোক তাকে আচ্ছা ক'রে শাসন ক'রে দিতে। কিন্তু উদয়কে জান ত? এ দিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌরুষ, কিন্তু একগুঁয়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন ঘুরে থাক্ তাকে আস্পর্দ্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এ বারে তার কণ্ঠরুদ্ধ কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্ছে, তার পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপুরের প্রজাদের কতবড় বুকের পাটা! আর দেখ, লোকজন আজই সব ঠিক করে রাখ—খবরটা পাবামাত্রই রায়গড়ে গিয়ে বল্‌তে হবে। সেইখানেই শ্রাদ্ধশান্তি করব—আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর ত কাউকে দেখিনে।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ। প্রতাপাদিত্য চমকিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান)

বসন্ত রায়

আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় আমি বৃদ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তিই নেই। (প্রতাপ নীরব) প্রতাপ একবার রায়গড়ে চল—ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছ—তারপরে বহুকাল সেখানে যাও নি!

প্রতাপ

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জ্জনে) খবরদার ঐ পাঠানকে ছাড়িস্‌নে।

[দ্রুত প্রস্থান।

(বসন্ত রায়ের প্রস্থান, প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রতাপ

দেখ, মন্ত্রী, রাজকার্য্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্ছে।

মন্ত্রী

মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপ

এ বিষয়ের কথা তোমাকে কে বল্‌ছে? আমি বল্‌ছি রাজকার্য্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখছি। সে দিন

তোমাকে চিঠি রাখতে দিলাম হারিয়ে ফেল্লে! আর এক দিন মনে আছে উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে যেতে বলেছিলুম, তুমি লোক দিয়ে কাজ সেরেছিলে।

মন্ত্রী

আজ্ঞে মহারাজ—

প্রতাপ

চুপ কর! দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যাহোক্ তোমাকে জানিয়ে রাখচি রাজকার্য্যে তুমি লেশমাত্র মনোযোগ দিচ্ছ না। আর একটা কথা তোমাকে ব'লে দিচ্চি মন্ত্রী, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে উদয় আছে। এমনি ক'রে সে নিজের চারদিকে জাল জড়াচ্ছে—এর পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

উদয়াদিত্য ও সুরমা

উদয়াদিত্য

যাক্, চুকল।

সুরমা

কি চুকল?

উদয়াদিত্য

আমার উপর মাধবপুর শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। টাকায় আট আনা বৃদ্ধি ধরে খাজনা আদায়ের হঠাৎ হুকুম এলো। বৃষ্টি নেই, এবারে সেখানে অজন্মা—তাই আমি—

সুরমা

আমিত তোমাকে আমার গহনাগুলো দিতে চেয়েছিলুম। তার থেকে—

উদয়াদিত্য

তোমার গহনা কেনে এত বড় বুকের পাটা এরাজ্যে আছে? আমি মহারাজকে বল্লুম, মাধবপুর থেকে বৃদ্ধি খাজনা আমি কোনমতেই আদায় করতে পারব না! শুনে তিনি মাধবপুর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তিনি এখন কেবলি সৈন্য বাড়াচ্ছেন, অস্ত্র কিনচেন, টাকা তাঁর

সুরমা

পরগণা ত কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মরবে!

উদয়াদিত্য

আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক্ তাদের পেটের জ্বালাটা জোগাব। শুনতে পেলে মহারাজ খুসি হবেন না—নিশ্চয় ভাববেন, আমি তাদের প্রশ্রয় দিচ্চি। উনি মনে করেন, আমি দয়া দিয়ে নাম কিনি। কিন্তু তোমার ঘরে আজ ফুলের মালার ঘটা কেন?

সুরমা

রাজপুত্রকে রাজ-সভায় যখন চিন্‌ল না, তখন যে তাকে চিনেছে, সে তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।

উদয়াদিত্য

সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপুত্র আসা যাওয়া করেন? তিনি কে শুনি? এ খবরটা জানতুম না।

সুরমা

রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পারবে না!

উদয়াদিত্য

রাজপুত্র! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পুত্র জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ!

সুরমা

সে কি কথা?

উদয়াদিত্য

রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না।

সুরমা

এ তুমি মনের ক্ষোভে বল্‌চ।

উদয়াদিত্য

কথাটা কি নূতন যে ক্ষোভ হবে? যখন এতটুকু ছিলুম, তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখচেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না? কেবলই পরীক্ষা, স্নেহ নেই।

সুরমা

প্রিয়তম, দরকার কি স্নেহের! খুব কঠোর পরীক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মত রাজার ছেলে কোন

উষরাদিত্য

বল কি ? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার কর্‌বেন না, সেটা বেশ বুঝতে পারচি।

সুরমা

কারো পরামর্শ নিয়ে বিচার করতে হবে না—আগুনের পরীক্ষাতেও সীতার চুল পোড়ে নি ; তুমি রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নও, এ কথা কি বলেই বল ? এত বড় অবিচার কি জগতে কখনো টিকতে পারে !

উষরাদিত্য

রাজ্যভারটা নাই বা ঘাড়ের উপর পড়ল, তাতেই বা দুঃখ কিসের ?

সুরমা

না, না, ওকথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান তোমাকে রাজার ছেলে করে পাঠিয়েছেন, সে কথা বুঝি অমন করে উড়িয়ে দিতে আছে ! না হয় দুঃখই পেতে হবে—তা বলে—

উষরাদিত্য

আমি দুঃখের পরোয়া রাখিনে ! তুমি আমার ঘরে এসেছ, তোমাকে সুখী করতে পারিনে, আমার পৌরুষে সেই ধিক্কার !

সুরমা

যে সুখ দিয়েছ তাই যেন জন্ম-জন্মান্তরে পাই !

উষরাদিত্য

সুখদুঃখ পেয়ে থাক ত নিজের গুণে, আমার শক্তিতে নয়। এ ঘরে আমার আদর নেই বলে তোমারও যে অপমান ঘটে ! এমন কি বাও যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন।

সুরমা

আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে ত কেউ কাড়তে পারে নি।

উষরাদিত্য

তোমার পিতা শ্রীপুরনাথ কিনা বশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না—সেই হয়েছে তোমার অপরাধ—মহারাজ তোমার উপর রাগ দেখিয়ে তার শোধ তুলতে চান।

(নেপথ্যে) দাদা, দাদা।

উষরাদিত্য

কেও ! বিভা বুঝি ? (দ্বার খুলিয়া) কি বিভা ? কি হয়েচে।

বিভা

একটা কাণ্ড হয়ে গেচে। আমি আর বাঁচিনে ! (মুখ ঢাকিয়া কান্না)।

সুরমা

(বিভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কি হয়েচে ভাই, বল্‌।

বিভা

আসবারে যখন উনি এখানে এসেছিলেন, ঠাট্টার সম্পর্ক ধরে ওঁকে কে ঠাট্টা করেছিল।

সুরমা

সে তো জানি, ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া বামনটা ওঁর কাপড়ের সঙ্গে একটা ন্যাজ ঝুড়ে দিয়েছিল—বলেছিল উনি রামচন্দ্র নন্‌, রামদাস।

বিভা

সে কথা উনি ভুলতে পারেন নি। এবার এসে ঠাট্টার জিতস্তে পণ করে ওঁর রমাই ভাঁড়কে মেরে সাজিয়ে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—মাকে কি একটা বা-তা বলেচে !

উষরাদিত্য

সর্ব্বনাশ।

বিভা

আমি তাকে দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলুম—মোহন মালকে বলে তখনি তাকে বিদায় করে দিয়েছি। কিন্তু কি জানি যদি কেউ বুঝতে পেরে থাকে !

উষরাদিত্য

তোমার কি মনে হয় মা টের পেয়েছিলেন ?

বিভা

হতেও পারে মা হয়তো টের পেয়েছেন, কিন্তু অপমানটা পাছে ছড়িয়ে পড়ে, তাই চুপ করে গেলেন।

উষরাদিত্য

মা কখনো এত বড় সর্ব্বনেশে কথাটা বাবাকে বল্‌বেন না।

বিভা

তা বল্‌বেন না, কিন্তু কেমন করে বুঝব আর কেউ জেনেচে কি না।

সুরমা

বিভা ভয় পাসনে, নিশ্চয় কেউ টের পায়নি। পেলে এতক্ষণ আগুন বাই বাই করে জ্বলে উঠত।

উদয়াদিত্য

ব্যাপারটা তো কাল হয়ে গেছে ?

বিভা

হাঁ।

উদয়াদিত্য

তা হলে আমি বলে দিচ্ছি ঝাঁড়া কেটে গেছে। বিচার করতে মহারাজের এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। খবর পেলে কালকের রাতটা কাটত না। তবু এক কাজ কর, বিভা, তুই এখনি যা। রামচন্দ্রকে বল, এ বাড়ী থেকে চলে যেতে, যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করেন।

বিভা

তুমি বলোনা, দাদা, আমার কথা যদি না শোনেন।

উদয়াদিত্য

না,আমি তাকে যেতে বললে সে অপমান বোধ করবে।

[বিভার প্রস্থান।

সুরমা

রাজা হলেই কি মানুষ নিজের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না ?

উদয়াদিত্য

সামান্য একটা মেয়েলি ঠাট্টার হার জিতের কথা এই যশোরের রাজবাড়ীতে স্বপ্নেও ভাবতে পারে, এত বড় নির্ব্বোধ ! এখানেও খেয়ালের রাজত্ব বটে, কিন্তু কত বড়ো সব খেয়াল—বিধির লিখনকে মুছে ফেলে রক্তের অক্ষরে নতুন লিখন বসিয়ে দেওয়ার খেয়াল।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

একি, দাদামশায় যে ! স্বপ্ন ? না মতিভ্রম ?

বসন্ত রায়

গান

আজ তোমারে দেখতে এলেম
অনেকদিনের পরে।
ভয় কিছু নেই, সুখে থাকো,
অধিকক্ষণ থাকবো নাকো—
এসেছি এক নিমেষের তরে ॥
দেখব শুধু মুখখানি,
শুনব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাবো দেশান্তরে ॥

সুরমা

দাদামশায়, কারো মুখে হাসি দেখবার জন্যে তোমাকে কোনোদিন আড়ালে থাকতে হয় নি।

উদয়াদিত্য

তুমি যাই বলো, হাসি দেখে দেশান্তরে যেতে ইচ্ছে হয়, এমন হাসি আমরা কেউ হাসিনে।

সুরমা

তুমি যে এলে আমরা কোনো খবর জানতুম না।

বসন্ত রায়

দিদি, এ সংসারে প্রত্যক্ষ এসে না পৌঁছলে কে আসবে কে না আসবে, তার ঠিক খবরটি তো পাওয়া যায় না !

সুরমা

ওটা শঙ্করাচার্য্যের মতো কথা হলো। তোমার ঐ হাসি-মুখে এমন কথা মানায় না।

বসন্ত রায়

সে কথা মিথ্যে বলিস্‌নি, ভাই। সংসার অনিত্য, জীবন অনিশ্চিত, এ সব কথা ঘোর মিথ্যে। তোদের মুখ যখনি দেখি, তখনি সংসার নিত্য, তখনি জীবন চিরদিনের, তা যেদিন মরি আর যেদিন বাঁচি।

সুরমা

যে অমৃত-মুখের কথা বললে, সেটিকে তোমার তৃষিত চক্ষু খুঁজে বেড়াচ্ছে আমি কি বুঝতে পারচিনে ?

বসন্ত রায়

ওটা ভাই মিথ্যে অভিমানের কথা বললি, মহাদেব বুকের মধ্যে রেখেছেন অন্নপূর্ণাকে, আর মাথার উপরে রেখেছেন গঙ্গাকে—কাউকেই তাঁর ছাড়লে একদণ্ড চলে না—তাঁর প্রাণের অন্নজল দুইই সমান চাই।

সুরমা

আর আমার ঠাকুরপদিদি ! এখানে এসেই বুঝি জলাঞ্জলি ?

বসন্ত রায়

তিনি তো আমার চাঁদ। বিধাতা আমার কপালে লিখে দিয়েছেন। তাঁকে ভুলেও ভোলবার যো নেই।

সুরমা

তিনি ঠাদের মতই চুপ করে থাকেন বটে, আমি বোধ হয় গঙ্গার মতোই মুখরা।

বসন্ত রায়

সে কথা অস্বীকার করতে পারিনে। চক্ষু বুজে ঐ মিষ্ট কলহই নিয়তই মনে মনে শুনতে পাই।

সুরমা

এত স্তুতিবাক্যও চতুর্মুখ তোমার একমুখে জোগান কি করে?

বসন্ত রায়

সে আমার এই বাগ্‌বাদিনীর গুণে,—বিদ্যিরও নয়, আমারও নয়।

সুরমা

আর নয় দাদামশায়, মিষ্টির পরিমাণটা একলার পক্ষে কিছু বেশী হয়ে উঠেছে।

(বিভার প্রবেশ)

বসন্ত রায়

বিভা! কি হয়েছে দিদি, তোমার মুখ অমন কেন?

বিভা

মহারাজের কানে গিয়েছে।

উদয়াদিত্য

কি সর্বনাশ! কেমন করে গেলো? মা কিছু বলেছেন না কি?

বিভা

না, মা বলেন নি। ওঁরা নিজেই থাকতে পারেন নি। এই নিয়ে আমাদের রাজবাড়ির লোকদের কাছে বড়াই করতে গিয়েছেন—তার থেকেই রাষ্ট্র হয়েছে।

বসন্ত রায়

কি হয়েছে ব্যাপারটা?

উদয়াদিত্য

রামচন্দ্র ছেলেমানুষী করে অন্তঃপুরে তার ভাঁড়কে পাঠিয়েছিল মেয়ে সাজিয়ে। সে কথা মহারাজের কানে উঠেছে, এখন কি হয় কিছুই বলা যায় না।

বসন্ত রায়

আমি একবার প্রতাপের কাছে যাই।

উদয়াদিত্য

এখন কিছু বোলো না—উল্টো হবে। আগে দেখি মহারাজ কি হুকুম দেন।

সুরমা

হুকুম যাই দিন্, এখনি ঘরের ছেলে ওঁদের পাঠানো চাই।

(রামমোহন মালের প্রবেশ)

রামমোহন

(বিভার প্রতি) তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি মা, ঘরে দেখতে পেলুম না, তাই এখানে এলুম।

বিভা

(সভয়ে) কেন, কেন, কী হয়েছে!

রামমোহন

কিছুই হয় নি। আজ কতকাল পরে মায়ের দেখা পেয়েচি—চারজোড়া শাঁখা এনেচি—তুমি পরো, আমি দেখে যাই।

উদয়াদিত্য

রামমোহন, তোমাদের নৌকো সব তৈরী আছে?

রামমোহন

এখনি কিসের তৈরী যুবরাজ, কতদিন পরে আমাদের আশা, এখন তো শীগগির মাকে ছেড়ে যাচ্ছিনে।

বিভা

মোহন, এখনি নৌকো তৈরী কর গে—একটুও দেরী করিস্ নেন।

রামমোহন

কেন মা?

বিভা

বিপদ ঘটিয়েছে—তুই তো সব জানিস। ঐ যে ভাঁড় এসেছিল অন্তঃপুরে। সে কথা মহারাজের কানে গিয়েছে।

রামমোহন

বেশ তো, এখনি তার মুণ্ডু নেন্ না—তার দোরা মুখটা বন্ধ হলে আমরাও বাঁচি। আমি ধরে এনে দেব তাকে—ভাবনা নেই।

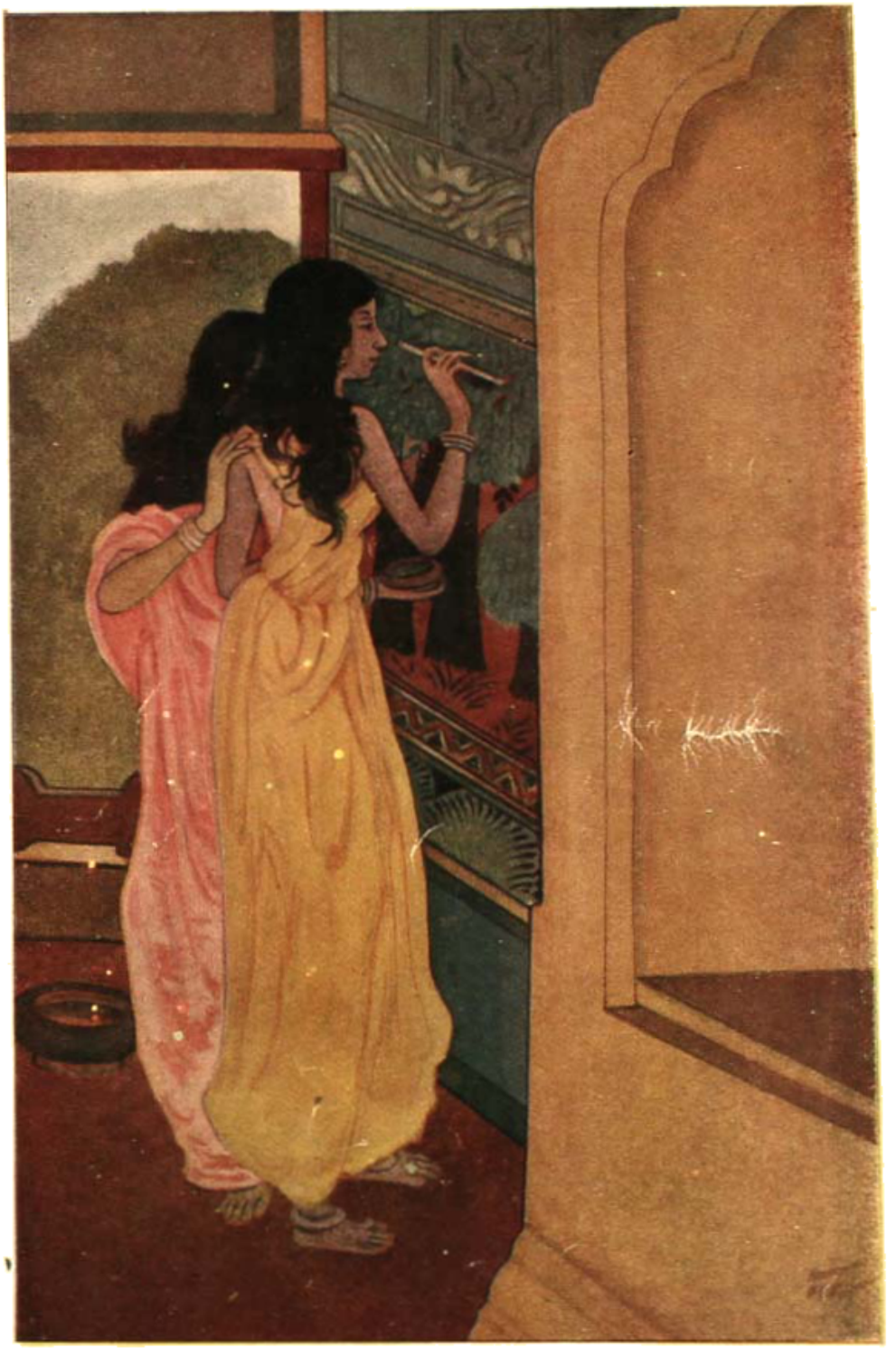

"দুলিতে দুলিতে ভাল তুলে ধরেছে—"

শ্রীযুত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের সৌজন্যে] [শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু ।

উদয়াদিত্য

রামমোহন, সে কাটটাকে কেউ ছোঁবেও না, তার চেয়ে বড়ো বিপদের ভয় আছে। তোমাদের সব চেয়ে বড়ো যে ছিপ নৌকো তার পাঁড়ী কত?

রামমোহন

চৌষট্টি জন।

উদয়াদিত্য

সেই নৌকাটা আমার এই জানালার সাম্‌নের ঘাটে এখনি তৈরি ক'রে আনো। আজ রাত্তিরেই কোনো মতে রওনা ক'রে দিতে হবে।

রামমোহন

সেরি হবে না যুবরাজ, দণ্ড দুয়েকের মধ্যে সব তৈরি ক'রে রেখে দেব। কি করতে হবে ব'লে যাও।

উদয়াদিত্য

এই জান্‌লা দিয়ে তাঁকে নাবিয়ে দিতে হবে, তার পরে রাতারাতি তোরা দাঁড় টেনে চলে যাবি।

[রামমোহনের প্রস্থান।

(বিভা বসিয়া পড়িয়া মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন)

বসন্ত রায়

দিদি, ভয় করিস্‌নে, ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বেঁচে থাক্‌তে তোর ভয় নেই রে।

বিভা

ভয় না, দাদা মশায়, লজ্জা। ছি ছি কি লজ্জা। রাজার ছেলে হয়ে এমন ব্যবহার তো আমি ভাবতে পারিনে। ঘৃণায় যেতো আমার যে মাথা হেঁট হয়ে যেলো।

বসন্তরায়

এখন ও সব কথা ভাবিস্‌নে, আপাততঃ—

বিভা

অপরাধ করলে আমি নিজে মহারাজের কাছে মাপ চাইতে যেতুম। কিন্তু এ যে তারো বেশি। এ যে নীচতা। আমার মাপ চাইবার মুখ রইল না।

সুরমা

বিভা, এখন মনটা বিচলিত করিস্‌ নে।

বিভা

যৌ দিদি, যদি মহারাজ শাস্তি দেন, আমার তো কিছুই বলবার থাকবে না। তাঁর সম্মান তাঁর মেয়ে জামাইয়ের সুখ-দুঃখের চেয়ে অনেক বড়ো, তাঁর মেয়ে হয়ে এ কথা কি আমি বুঝতে পারি নে?

বসন্ত রায়

এখন রামচন্দ্র আছেন কোথায়?

বিভা

বাইরের বৈঠকখানায় নাচ-গান জমিয়েছেন, সহর থেকে তিনি সব নাচওয়ালী আনিয়েছেন, আজ দু'দিন ধরে এই সব চল্‌চে।

বসন্ত রায়

কলি যখন সর্ব্বনাশ করে, তখন আমোদ করতে করতেই করে। যেমন ক'রে পারো, বিভা, তুমি এখনি তাকে ডাকিয়ে আনাও।

[বিভার প্রস্থান।

(নেপথ্যে) উদয়, উদয়!

উদয়াদিত্য

ঐ যে মহারাজ আস্‌চেন।

[সুরমার পলায়ন।

(প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

শুনেছ সব কথা?

উদয়াদিত্য

শুনেছি।

প্রতাপ

লছমন সর্দ্দারকে হুকুম করেচি, কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বে, তখন তার মুণ্ডু কাটা যাবে। আজ রাত্রে অন্তঃপুরের পাহারার ভার তোমার উপরে।

উদয়াদিত্য

আমার উপরে মহারাজ? এ যে আমাকে শাস্তি।

প্রতাপ

শাস্তি আমাকেও নয়? তা ব'লে রাজার কর্ত্তব্য করতে হবে না?

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ।

(প্রতাপাদিত্য নিরুত্তর)

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ, এ-ও কি সম্ভব ?

প্রতাপ

কেন সম্ভব নয় ?

বসন্ত রায়

ছেলেমানুষ, সে তো অবজ্ঞার পাত্র, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য ?

প্রতাপ

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এ কথা যে বোকা নাও বোঝে, তারো হাত পোড়ে। দুর্বুদ্ধি যার মাথায় জোগাতে পারে, সে বুদ্ধির ফলটা কি হবে, সে কি তার মাথায় জোগায় না ? দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাবে, মাথাটা তখন দেহে থাকবে না।

বসন্ত রায়

অপরাধ যে করে সে দুর্বল, ক্ষমা যে করে শক্তি তারই, এ কথা ভুলো না।

প্রতাপ

দেখো পিতৃব্য ঠাকুর, রায় বংশের কিসে মান অপমান সে বোধ যদি তোমার থাকবে, তা'হলে পাকা মাথায় আজ মোগল-বাদশার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পারতে কি ? তোমারো লাঞ্ছিত মাথার স্থান এই ধূলায়, আমারি দুর্ভাগ্য তোমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এই তোমাকে স্পষ্ট বললুম। বুড়ো মশায়, এখন আমার নিদ্রার সময়।

বসন্ত রায়

বুঝেছি প্রতাপ, একবার যে ছুরি তোমার খাপ থেকে বেরোয়, রক্ত না নিয়ে সে ফিরবে না। তা নিক, যে তার প্রথম লক্ষ্য ছিলো, এখনো তো সে সামনেই আছে। প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো।

প্রতাপ

আচ্ছা তবে ডাকো বিভাকে। (বিভার প্রবেশ) ঐ এসেছে। বিভা !

বিভা

মহারাজ !

প্রতাপ

সকল কথা শুনেছ বিভা ?

বিভা

প্রতাপ

তোমার মাকে, আমাদের অন্তঃপুরকে কি রকম অপমান করেছে, তা তো জানো ?

বিভা

জানি।

প্রতাপ

আমি যদি তার প্রাণবধ দিই, তবে সেটা অন্যায় হবে কি ?

বিভা

না।

বসন্ত রায়

দিদি, কি বল্‌লি দিদি ! মহারাজের পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নে !

(বিভা নিরুত্তর)

প্রতাপ

বুড়ো মহারাজ, মনে রেখো, বিভা আমারি মেয়ে।

উদয়াদিত্য

মহারাজ, আপনি দণ্ডদাতা, আপনিই শাস্তি দিন। কিন্তু এ শাস্তির দণ্ডভার আমাদের উপরে দেবেন না।

প্রতাপ

কি বল্‌তে চাও তুমি ?

উদয়াদিত্য

পাহারা দেবার লোক মহারাজের অনেক আছে, তাদের স্নেহ নেই, এই জন্যে তাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েই কর্তব্য-পালন করবে। আমার উপরে পাহারা দেবার ভার দেবেন না।

প্রতাপ

লোক থাকবে আমার, কিন্তু দায় থাকবে তোমার।

উদয়াদিত্য

আমি আমার স্নেহকে অতিক্রম করতে পারবো না।

প্রতাপ

না পারো তো তারো জবাবদিহী আছে।

[প্রস্থান।

উদয়াদিত্য

কোথায় ফাঁক আছে, একবার দেখে আসি।

বসন্ত রায়

উদয়াদিত্য

তা হলে যা হবে সেটা তো এখনকার কথা নয়—এখনকার কথা হচ্ছে হাত ধোওয়াই চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

নৃত্যশালা

রামচন্দ্র

নট-নটীর দল

(রামমোহনের প্রবেশ)

রামমোহন

একবার উঠে আসুন।

রামচন্দ্র

এখন না, যাঃ বিরক্ত করিস্ নে। গান থেমো না।

রামমোহন

শুনতেই হবে।

রামচন্দ্র

কাল সকালে শুনব। দেখ বিরক্ত করিস্ নে।

রামমোহন

যুবরাজ ডাকচেন, জরুরি কাজ আছে।

রামচন্দ্র

বুঝেচি, শালা বুঝি ঠাট্টার জবাব দিতে চায়! পারবে না আমার সঙ্গে।

রামমোহন

ঠাট্টা শেষ হয়ে গেছে, এখন বিপদের পালা। শীঘ্র এসো।

রামচন্দ্র

আর তর সেধাতে হবে না, এখন আমার সময় নেই।

রামমোহন

এ দিকেও সময় একটুও নেই। আচ্ছা এই দিকে আসুন, বলচি! (রামচন্দ্র জনান্তিকে) প্রতাপাদিত্য মহারাজ সব কথা শুনেচেন।

রামচন্দ্র

না শুনলে মজাটা কি।

রামমোহন

কি বলেন মহারাজ, মজা! তিনি আপনার শ্বশুর, আপনার ঠাট্টার সম্পর্ক ত নয়।

রামচন্দ্র

আমার ঠাট্টা চল্‌চে শালাদের নিয়ে। তিনি সেটা যদি গায়ে মাখেন সেটা কি আমার দোষ?

রামমোহন

সে বিচার এখন নয়। আপাতত প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েচে, কাল সকালেই—

রামচন্দ্র

তুমি শুনলে কোথা থেকে?

রামমোহন

যুবরাজের নিজের মুখ থেকে।

রামচন্দ্র

তোর মতো বোকা ত দুনিয়ায় নেই রে! যুবরাজ ঠাট্টা করেচে বুঝতে পারিস্ নে। প্রাণদণ্ড!

রামমোহন

দোহাই তোমার, একটুও ঠাট্টা নয়।

রামচন্দ্র

আমাকে ঠাট্টায় ওরা হারাতে পারবে না। তুই এখন যা।

রামমোহন

আচ্ছা আমি যুবরাজকে ডেকে আনচি!

[প্রস্থান।

রামচন্দ্র

(নটীদের প্রতি) ধরো গান।

নাচ ও গান

(আমার) নয়ন তোমার নয়নতলে
মনের কথা খোঁজে!
(সেথায়) কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
পথ হারালো ও যে।
নীরব দিঠে শুধায় যত
পায় না সাড়া মনের মতো,
অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে
অশ্রুধারায় ম'জে॥
তুমি আমার কথার আভাখানি
পেয়েছ কি মনে?
এই যে আমি মালা আনি
তার বাণী কেউ শোনে?

পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে
হাওয়ায় ব্যথা দিই যে পেতে,
বাঁশি বিছায় বিষাদ ছায়া
তার ভাষা কেউ বোঝে ?

রামচন্দ্র

বেটা রামমোহন আমার মনটা মিছিমিছি খারাপ করে দিয়ে গেলো। এ কেমন গোঁয়ারগোছের ঠাট্টা এ বাড়ির ? ভালোদের রসের জ্ঞান একটুও নেই। যেমোনা, আর একটা গান ধরো। একটু দ্রুততালে।

(গান)

না বলে যেয়োনা চলে মিনতি করি।
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।
সারা নিশি জেগে থাকি
ঘুমে ঢ.লে পড়ে আঁখি,
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি ॥
চকিতে চমকি বঁধু তোমারে খুঁজি,
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি !
নিশিদিন চাহে হিয়া,
পরাণ পসারি দিয়া,
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি ॥

(রামচন্দ্র মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত ভাবে দ্বারের দিকে চাহিতেছেন।)

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

উঠে এসো শীঘ্র।

রামচন্দ্র

একেবারে জোর তলব যে !

উদয়াদিত্য

দেরি কোরো না, এসো শীগগির।

রামচন্দ্র

যৌবনের পোষাণ হয়ে এসেচে বুঝি, তলব দিতে ?

উদয়াদিত্য

আমার কর্ত্তব্য আমি করলুম। যদি না শোনো তো থাকো। বিধাতা যাকে মারেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

[প্রস্থান।

রামচন্দ্র

আওয়াজটা ঠাট্টার মতো শোনাচ্চে না। একবার দেখেই আসি গে। (নটীদের প্রতি) তোমরা গান থামিয়ো না—এখনো রাত আছে বাকি। আমি এখনি আসচি।

[প্রস্থান।

গান।

ফুল তুলিতে ভুল করেছি
প্রেমের সাধনে।
বঁধু তোমায় বাঁধব কিসে
মধুর বাঁধনে।
ভোলাব না মায়ার ছলে,
রইব তোমার চরণতলে,
মোহের ছায়া ফেল্‌ব না মোর
হাসি কাঁদনে ॥
রইল শুধু বেদনভরা আশা,
রইল শুধু প্রাণের নীরব ভাষা।
নিরাভরণ যদি থাকি,
চোখের কোণে চাইবে না কি,
যদি আঁখি নাই বা ভোলাই
রঙের বাঁদনে ॥

নটীগণ

প্রথমা

কই, এখনো ত ফিরলেন না !

দ্বিতীয়া

আর ত ভাই পারি নে ! ঘুম পেয়ে আসচে !

তৃতীয়া

কের কি সভা জমবে না কি ?

প্রথমা

কেউ যে জেগে আছে তা ত বোধ হচ্ছে না। এত বড় রাজ-বাড়ি সমস্ত যেন হাঁ হাঁ করচে !

দ্বিতীয়া

চাকররাও সব হঠাৎ কে কোথায় যেন চলে গেল!

তৃতীয়া

বাতিগুলো সব নিবে আসচে, কেউ জ্বালিয়ে দেবে না?

প্রথমা

আমার কেমন ভয় করচে ভাই!

দ্বিতীয়া

(বাদকদিগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও যে সব ঘুমুতে লাগল—কি মুস্কিলেই পড়া গেল! ওদের তুলে দে না। কেমন গা ছম্ ছম্ করচে!

তৃতীয়া

দিচ্ছে না ভাই। একটা গান ধর! ওগো তোমরা ওঠ!. ওঠ!

বাদকগণ

(ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া) অ্যা অ্যা। এসেছেন না কি?

প্রথমা

তোমরা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখ না গো! কেউ কোথাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে না—না কি!

একজন বাদক

(বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ওদিকে যে সব বন্ধ!

প্রথমা

অ্যা! বন্ধ! আমাদের কি করেদ করলে না কি?

দ্বিতীয়া

দূর! করেদ করতে যাবে কেন?

প্রথমা

ভাল লাগচে না! কি হল বুঝতে পারচি নে। চল ভাই, আর এখানে নয়। একটা কি কাণ্ড হচ্চে।

[প্রস্থান।

(রাজমহিষীর প্রবেশ)

রাজমহিষী

কই এদের মহলেও তো মোহনকে দেখতে পাচ্চিনে। কি হল বুঝতে পাচ্চিনে। স্বামী!

(স্বামীর প্রবেশ)

এদিককার খাওয়া দাওয়া ত সব শেষ হল, মোহনকে খুঁজে পাচ্চিনে কেন?

স্বামী

মা, তুমি অত ভাবচ কেন? তুমি শুতে যাও, রাত যে পুইয়ে এল, তোমার শরীরে সইবে কেন?

রাজমহিষী

সে কি হয়! আমি যে তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াব বলে রেখেছি।

স্বামী

নিশ্চয় রাজকুমারী তাকে খাইয়েছেন। তুমি চল, শুতে চল।

রাজমহিষী

আমি ঐ মহলে খোঁজ করতে গিয়েছিলুম, দেখি সব দরজা বন্ধ—এর মানে কি, কিছুই বুঝতে পারচি নে।

স্বামী

বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তার মহলের দরজা বন্ধ করেছেন। অনেকদিন পরে জামাই এসেছেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন? চল তুমি শুতে চল।

রাজমহিষী

কি জানি স্বামী, আজ ভাল লাগচে না। প্রহরীদের ডাকতে বল্লুম তাদের কারো কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

স্বামী

যাত্রা হচ্চে, তারা তাই আমোদ করতে গেছে।

রাজমহিষী

মহারাজ জানতে পারলে যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে। উদয়ের মহলও যে বন্ধ, তারা ঘুমিয়েছে বুঝি!

স্বামী

ঘুমবেন না! বল কি! রাত কি কম হয়েছে!

রাজমহিষী

গান বাজনা ছিল, জামাইকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করবে না? ওরা মনে কি ভাববে বল ত! এ সমস্তই ঐ বৌ-মার কাণ্ড! একটু বিবেচনা নেই! রোজই ত ঘুমচ্চে—একটা দিন কি আর—

স্বামী

যাক, সে সব কথা কাল হবে—আজ চল।

রাজমহিষী

মঙ্গলার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে ত ?

বামী

হয়েছে বৈ কি ?

রাজমহিষী

ওষুধের কথা বলেছিল ?

বামী

সে সব ঠিক হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

(প্রতাপ, প্রহরী, পীতাম্বর ও অনুচরের প্রবেশ)

প্রতাপ

কত রাত আছে ?

পীতাম্বর

এখনো চার দণ্ড রাত আছে।

প্রতাপ

কি যেন একটা গোলমাল শুনলুম।

পীতাম্বর

আজ্ঞে তাই শুনেই আমি আসছি।

প্রতাপ

কি হয়েছে ?

পীতাম্বর

আসবার সময় দেখলুম বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।

প্রতাপ

অন্তঃপুরের প্রহরীরা।

পীতাম্বর

হাত পা বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ

তারা কি বলে ?

পীতাম্বর

আমার কথার কোনো জবাব দিলে না—হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

প্রতাপ

রামচন্দ্র রায় কোথায় ? ঈশরাদিত্য, বসন্ত রায় কোথায় ?

পীতাম্বর

বোধ করি তাঁরা অন্তঃপুরেই আছেন।

প্রতাপ

বোধ করি ! তোমার বোধ করার কথা কে জিজ্ঞাসা করছে ! মন্ত্রীকে ডাক।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী

মহারাজ রাজমাতা,—

প্রতাপ

রামচন্দ্র রায়—

মন্ত্রী

হাঁ, তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপ

পরিত্যাগ করে গেছেন, প্রহরীরা গেল কোথা ?

মন্ত্রী

বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।

প্রতাপ

(মুষ্টি বদ্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে ? পালাবে কোথায় ? যেখানে থাকে তাদের খুঁজে আনতে হবে ! অন্তঃপুরের প্রহরীদের এখনি ডেকে নিয়ে এস। অন্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিল ?

মন্ত্রী

সীতারাম আর ভাগবত !

প্রতাপ

ভাগবত ছিল ? সে ত হুঁসিয়ার, সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিলে ?

মন্ত্রী

সে হাত পা বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ

হাত পা বাঁধা আমি বিশ্বাস করিনে। হাত পা ইচ্ছে করে বাঁধিয়েছে। আচ্ছা সীতারামকে নিয়ে এস, সেই গর্দভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

(মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

প্রতাপ

অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হল কি করে ?

সীতারাম

(করযোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোন দোষ নেই।

প্রতাপ

সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করচে!

সীতারাম

আজ্ঞা না, মহারাজ,—যুবরাজ—যুবরাজ আমাকে বলপূর্ব্বক বেঁধে—

(ব্যস্তভাবে বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

সীতারাম

যুবরাজকে নিষেধ করলুম, তিনি—

বসন্ত রায়

হাঁ হাঁ সীতারাম কি বলি? অমর্থ করিস্ নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোন দোষ নেই।

সীতারাম

আজ্ঞা না, যুবরাজের কোন দোষ নেই।

প্রতাপ

তবে তোর দোষ।

সীতারাম

আজ্ঞে না।

প্রতাপ

তবে কার দোষ?

সীতারাম

আজ্ঞা যুবরাজ—

প্রতাপ

তাঁর সঙ্গে আর কে ছিল?

সীতারাম

আজ্ঞে বউরাণী মা—

প্রতাপ

বউরাণী? ঐ সেই শ্রীপুরের—(বসন্ত রায়ের দিকে চাহিয়া) উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ, এতে উদয়ের কোনো দোষ ছিল না।

প্রতাপ

দোষ ছিলো না। দেখ, তুমি তার পক্ষ নিয়ে যদি কথা কও তাতে তার ভালো হবে না—এই আমি বলে দিলুম।

(বসন্ত রায় কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাধবপুরের পথ

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনঞ্জয়

একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস্ কেন? মেরেছে বেশ করেছে! এতদিন আমার কাছে আছিস বেটারা, এখনো ভাল করে মার খেতে শিখলিনে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে?

প্রথম

রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড় অপমান!

ধনঞ্জয়

আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে! এখনো সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িসনি? তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে!

দ্বিতীয়

বাকি আর রইল কি ঠাকুর? এদিকে পেটের জ্বালায় মরচি, ওদিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে!

ধনঞ্জয়

বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে—একবার খুব করে নেচে নে।

গান

আরো প্রভু আরো আরো!
এমনি করে আমায় মারো!
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই?
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো!
এবার যা কর্‌বার তা সারো সারো!
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার!

দ্বিতীয়

আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ বল দেখি ?

ধনঞ্জয়

যশোর যাচ্ছি রে !

তৃতীয়

কি সর্ব্বনাশ ! সেখানে কি করতে যাচ্ছ ?

ধনঞ্জয়

একবার রাজাকে দেখে আসি। চিরকাল কি তোদের সঙ্গেই কাটাব ? এবার রাজদরবারে নাম রেখে আসব।

চতুর্থ

তোমার উপরে রাজার যে ভারি রাগ। তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে ?

পঞ্চম

জান ত যুবরাজ তোমাকে শাসন করতে চায় নি বলে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ধনঞ্জয়

তোরা যে মার সইতে পারিসনে ! সেই জন্যে তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেঁয়াজ নয় রে পেয়ারা নয়—যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে, সেইখানে ছুটেছি।

প্রথম

না, না, সে হবে না, ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়

খুব হবে—পেট ভরে হবে, আনন্দে হবে।

প্রথম

তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়

পেয়ারার হাতে আশ মেটেনি বুঝি ?

দ্বিতীয়

না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পারচ না, আমরাও সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়

আচ্ছা যেতে চাস ত চল্ ! একবার সহরটা দেখে আসবি।

তৃতীয়

কিছু হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে ?

ধনঞ্জয়

কেন রে ? হাতিয়ার নিয়ে কি করবি ?

তৃতীয়

যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—

ধনঞ্জয়

তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কি করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয় ! কি আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ। তোদের যদি এই রকম বুদ্ধি হয়, তবে এইখানেই থাক্।

চতুর্থ

না, না, তুমি যা বলবে তাই করব, কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে থাকব।

তৃতীয়

আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়

কি চাইবি রে ?

তৃতীয়

আমরা যুবরাজকে চাইব।

ধনঞ্জয়

বেশ, বেশ, অর্দ্ধেক রাজত্ব চাইবি নে ?

তৃতীয়

ঠাট্টা করচ ঠাকুর !

ধনঞ্জয়

ঠাট্টা কেন করব ? সব রাজত্বটাই কি রাজার ? অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় ত কি ? চাইতে দোষ নেই রে ! চেয়ে দেখিস।

চতুর্থ

যখন তাড়া দেবে ?

ধনঞ্জয়

তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে ? আরো এক জন শোনবার লোক দরবারে বসে থাকেন—শুনতে শুনতে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই আসে যায় না।

P 23777

নটীর পূজা।

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

আমরা বসব তোমার সনে।
তোমার সরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে।
তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে॥

প্রথম

বাবা ঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ কিন্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়বেন না।

ধনঞ্জয়

ছাড়বেন কেন বাপ সকল! আদর করে ধরে রাখবেন।

প্রথম

সে আদরের ধরা নয়।

ধনঞ্জয়

ধরে রাখতে কষ্ট আছে বাপ্—পাহারা দিতে হয়—যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজ-বাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে—আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই ভবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে!
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন!
সে কি অমনি হবে!
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আন্‌বে আপন বশে—
সে কি অমনি হবে!
তার আগে তার পাষাণ হিয়া গল্‌বে করুণরসে
সে কি অমনি হবে!
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি অমনি হবে! ১৫,১৯০

দ্বিতীয়

বাবা ঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন, তা হলে কিন্তু আমরা সইতে পারবো না।

ধনঞ্জয়

আমার এই গা যাঁর, তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি, আমার এই গায়ে তিনি কত দুঃখই সইলেন—কত মার খেলেন, কত ধুলোই মাখলেন—হায় হায়—

কে বলেছে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে?
আপনি কেন এলে বঁধু আমার বোঝা বইতে?
প্রাণের বন্ধু বুকের বন্ধু
সুখের বন্ধু দুখের বন্ধু
(তোমায়) দেব না দুখ পাব না দুখ
হের্‌ব তোমার প্রসন্ন মুখ
(আমি) সুখে দুঃখে পারব বন্ধু
চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

তৃতীয়

বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কি বল্‌ব?

ধনঞ্জয়

বল্‌ব আমরা খাজনা দেব না!

তৃতীয়

যদি শুধোয় কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়

বল্‌ব, ঘরের ছেলে-মেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই, তা'হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে, সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

চতুর্থ

বাবা, একথা রাজা শুন্‌বে না।

ধনঞ্জয়

শুন শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে

এমন হতভাগা যে ভগবান্ তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না? ওরে জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম

ও ঠাকুর, ওঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—ওঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়

দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস্!

ষষ্ঠ

কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার ঘরজাড় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেকলে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়

দেখ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভাল হয় না। যত দূর পর্য্যন্ত চলবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চুকাস্ত হয়, তখনি শান্তি হয়।

সপ্তম

তোরা অত ভয় করছিস্ কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়

তোদের ওই বাবা যার ভরসায় চলেছে, তার নাম কর্। বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস্—পণ করে বসেছিস্ যে মরবি নে। কেন, মরতে দোষ কি হয়েছে! যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুঝি! তোরা একটু দাঁড়া, চারিদিকের ভাবগতিকটা একটু বুঝে নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

ওরে মরতে এসেচিস এখানে? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা!

প্রথম

আমাদের মরণ সর্ব্বত্রই। পালাব কোথায়?

দ্বিতীয়

তা মরতে যদি হয় তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব।

উদয়াদিত্য

তোদের কি চাই বল দেখি!

অনেকে

আমরা তোমাকে চাই।

উদয়াদিত্য

আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে নারে—দুঃখই পাবি।

তৃতীয়

আমাদের দুঃখই ভাল কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

চতুর্থ

আমাদের মাধবপুরে ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত কাঁদচে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে? তা নয়। তুমি চলে এসেছ বলে! তোমাকে আমরা ঘরে নিয়ে যাব!

উদয়াদিত্য

আরে চুপ কর্, চুপ কর্। ও কথা বলিস নে!

পঞ্চম

রাজা তোমাকে ছাড়বে না! আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে মানিনে—আমরা তোমাকে রাজা করব।

(প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

কাকে মানিস্ নে রে! তোরা কাকে রাজা করবি?

প্রজাগণ

মহারাজ পেন্নাম হই।

প্রথম

আমরা তোমার কাছে ধরবার করতে এসেছি।

প্রতাপ

কিসের ধরবার?

প্রথম

আমরা যুবরাজকে চাই।

প্রতাপ

বলিস্ কি রে?

সকলে

হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাব।

প্রতাপ

আর তাকি দিবি? খাজনা দেবার নামটি করবি নে।

সকলে

অর বিনে মরি যে।

প্রতাপ

মরতে ত সকলকেই হবে। বেটারা রাজার দেনা বাকি রেখে মরবি?

প্রথম

আচ্ছা আমরা না খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু যুবরাজকে আমাদের দাও। মরি ত ওঁরি হাতে মরব।

প্রতাপ

সে বড় দেরি নেই। তোদের সর্দার কোথায় রে।

দ্বিতীয়

(ধনঞ্জয়কে দেখাইয়া) এই যে আমাদের গণেশ সর্দার।

প্রতাপ

ও নয়—সেই বৈরাগীটা।

প্রথম

আমাদের ঠাকুর! তিনি ত পুজোয় বসেছেন। এখনি আসবেন। ঐ যে এসেছেন।

(ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রবেশ)

ধনঞ্জয়

দয়া যখন হয় তখন সাধনা না করেই পাওয়া যায়। তার ছিল কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয় না! প্রভুর কৃপা হল, রাজাকে অমনি দেখতে পেলুম। (উদয়াদিত্যের প্রতি) আর এই আমাদের হৃদয়ের রাজা। ওকে রাজা বলতে যাই বন্ধু বলে ফেলি!

উদয়াদিত্য

ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয়

কি রাজা! কি ভাই!

উদয়াদিত্য

এখানে কেন এলে?

ধনঞ্জয়।

তোমাকে না দেখে থাকতে পারি নে যে।

উদয়াদিত্য

মহারাজ রাগ করছেন।

ধনঞ্জয়

রাগই নই। আগুন জলতে তবু পতঙ্গ মরতে যায়।

প্রতাপ

তুমি এই সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়

ক্ষ্যাপাই বই কি! নিজে ক্ষেপি ওদেরও ক্ষ্যাপাই এই ত আমাদের কাজ।

আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ ক্ষেপা সে!
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কি যে বাজে কোন্ বাতাসে!

ওরে ক্ষ্যাপার দল, গান ধর রে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েছিস আনন্দ করে নে! রাজা আমাদের মাধবপুরের নৃত্যটা দেখে নিক্।

সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত—

গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা,
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা!
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে!

(প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে এত লীলা হচ্ছে! ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে, আমরা ধরব বলে কোমর বেঁধে বেরিয়েছি!

প্রতাপ

দেখ বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না! এখন কাজের কথা হোক্। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বল?

ধনঞ্জয়

না মহারাজ দেব না।

প্রতাপ

দেবে না! এত বড় আস্পর্দা!

ধনঞ্জয়

যা তোমার নয়, তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ

আমার নয়!

ধনঞ্জয়

আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কি বলে!

প্রতাপ

তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়

হাঁ মহারাজ, আমিই ত বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা ত বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে, প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণ-হত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপ

দেখ ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়

যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ—সেই দুঃখই ত আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক্।

প্রতাপ

দেখ বৈরাগী তোমার চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ? (প্রজা-দের প্রতি) দেখ্ বেটারা, আমি বলচি তোরা সব মাধব-পুরে ফিরে যা। বৈরাগী তুমি এইখানেই রইলে!

প্রজাগণ

আমাদের প্রাণ থাকতে সে ত হবে না।

ধনঞ্জয়

কেন হবে নারে! তোদের বুদ্ধি এখনো হল না। রাজা বলে বৈরাগী তুমি রইলে, তোরা বল্লি না তা হবে না—আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তার থাকা না থাকা নেবে রাজা আর তোরা ঠিক করে দিবি?

(গান)

রইল বলে রাখলে কারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
(তোমার) টানাটানি টিকবে না ভাই
র'বার যেটা সেটাই রবে।
যা খুসি তাই করতে পার—
গায়ের জোরে রাখ মার—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা স'ন সেটাই সবে!
অনেক তোমার টাকা কড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবচো হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে,
হয় না যেটা সেটাও হবে!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

প্রতাপ

তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে যাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী

মহারাজ—

প্রতাপ

কি! হুকুমটা তোমার মনের মত হচ্ছে না বুঝি!

উদয়াদিত্য

মহারাজ বৈরাগী ঠাকুর সাধুপুরুষ।

প্রজারা

মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ অকল্যাণ হবে!

ধনঞ্জয়

আমি বলচি তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে আমি [illegible]

প্রজারা

আমরা এই জন্যেই কি দরবার কর্‌তে এসেছিলুম? আমরা যুবরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব?

ধনঞ্জয়

দেখ্ তোদের কথা শুন্‌লে আমার গা জ্বালা করে! হারাবি কি রে ব্যাটা। আমাকে তোদের গাঁঠে বেঁধে রেখেছিলি? তোদের কাজ হ'য়ে গেছে, এখন পালা সব পালা।

প্রজারা

মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাব না?

প্রতাপাদিত্য

না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা

বিভা, ভাই বিভা, তোর চোখে যদি জল দেখ্‌তুম, তা হ'লে আমার মনটা যে খোলসা হ'ত। তোর হ'য়ে যে আমার কাঁদ্‌তে ইচ্ছা করে ভাই, সব কথাই কি এমনই ক'রে চেপে রাখতে হয়!

বিভা

কোনো কথাই ত চাপা রইল না বৌরাণী। ভগবান্ ত লজ্জা রাখলেন না।

সুরমা

আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে, জগতে সব লাজই ঘুড়িয়ে যায়। আজকের মত এমন কপাল-পোড়া লজ্জা ত রোজ আস্‌বে না; সংসার লজ্জা দিতেও যেমন, লজ্জা মিটিয়ে দিতেও তেম্‌নি। সব ভাঙাচোরা ঘুচে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হ'য়ে যায়।

বিভা

ঠিক নাও যদি হ'য়ে যায় তাতেই বা কি। যেটা হয় সেটা ত সইতেই হয়।

সুরমা

শুনেছি ত বিভা, মাধবপুর থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এসেছেন। তাঁর ত খুব নাম শুনেছি, বড় ইচ্ছা করে তাঁর গান শুনি। গান শুন্‌বি বিভা? ঐ দেখ,—কেবল অতটুকু মাথা নাড়লে হবে না। লোক দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছি আজ যেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন, তা হ'লে আমরা উপরের ঘর থেকে শুনতে পাব। ও কি—পালাচ্ছিস্ কোথায়?

বিভা

দাদা আস্‌ছেন!

সুরমা

তা এলই বা দাদা।

বিভা

না আমি যাই বৌ-রাণী।

[প্রস্থান।

সুরমা

আজ ওর দাদার কাছেও মুখ দেখাতে পার্‌ছে না।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

সুরমা

আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়াদিত্য

সে ত হবে না।

সুরমা

কেন?

উদয়াদিত্য

তাঁকে মহারাজ কয়েদ করেছেন।

সুরমা

কি সর্ব্বনাশ, অমন সাধুকে কয়েদ করেছেন?

উদয়াদিত্য

ওটা আমার উপর রাগ করে। তিনি জানেন আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি—মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি—সেই জন্যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য্য কেমন ক'রে কর্‌তে হয়।

সুরমা

কিন্তু এগুলো যে অমঙ্গলের কথা—শুন্‌লে ভয় হয়। কি করা যাবে!

উদয়াদিত্য

মন্ত্রী আমার অনুরোধে বৈরাগীকে গারদে না দিয়ে

তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বল্লেন আমি গায়েই যাব, সেখানে বহু কয়েদী আছে, তাদের প্রভুর নাম গান শুনিয়ে আসব। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না—তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।

সুরমা

মাধবপুরের প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেছি—কোথায় সব পাঠাবো?

উদয়াদিত্য

গোপনে পাঠাতে হবে। নির্বোধগুলো আমাকে রাজা রাজা করে চেঁচাচ্ছিল, মহারাজ সেটা শুনতে পেয়েছেন—নিশ্চয় তাঁর ভাল লাগেনি।" এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হলে মনে কি সন্দেহ করবেন বলা যায় না।

সুরমা

আচ্ছা সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব! কিন্তু আমি ভাবচি, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল সেই সীতারাম ভাগবতের কি দশা হবে!

উদয়াদিত্য

মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না—সে ভয় নেই।

সুরমা

কেন?

উদয়াদিত্য

মহারাজ কখনো ছোট শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না, রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেড়ে দিলেন।

সুরমা

কিন্তু শাস্তি ত তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাকবেন না।

উদয়াদিত্য

সে ত আমি আছি।

সুরমা

ও কথা বোলো না।

উদয়াদিত্য

বলতে বারণ কর ত বলব না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হতে হবে না?

সুরমা

আমি থাকতে তোমার বিপদ্ ঘটবে কেন? সব বিপদ আমি নেব।

উদয়াদিত্য

তুমি নেবে? তার চেয়ে বিপদ আমার আর আছে না কি? যাই হোক সীতারাম ভাগবতের জন্যেও একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সুরমা

তুমি কিন্তু কিছু কোরো না! তাদের জন্যে যা করবার ভার সে আমি নিয়েছি।

উদয়াদিত্য

না, না, এতে তুমি হাত দিয়ো না।

সুরমা

আমি দেব না ত কে দেবে? ও ত আমারি কাজ! আমি সীতারাম ভাগবতের স্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়েছি।"

উদয়াদিত্য

সুরমা, তুমি বড় অসাবধান।

সুরমা

আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কি জান?

উদয়াদিত্য

কি বল দেখি!

সুরমা

ঠাকুর জামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে কাণ্ডটি করলেন, বিভা সে জন্যে লজ্জায় মরে গেছে।

উদয়াদিত্য

লজ্জার কথা বই কি।

সুরমা

এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের 'পরেই তার অভিমান ছিল—আজ যে তার সেই অভিমান করবারও মুখ রইল না। বাপের নিষ্ঠুরতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেছে। একে ত ভারি চাপা মেয়ে—তার পরে এই কাণ্ড। আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না। স্বামীর গর্ব্ব যে স্ত্রীলোকের ভেঙেছে, জীবন তার পক্ষে বোঝা, বিশেষতঃ বিভার মত মেয়ে।

উদয়াদিত্য

ভগবান্ বিভাকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন।

সুরমা

সে শক্তির অভাব নেই—বিভা তোমারি ত বোন বটে!

উদয়াদিত্য

আমার শক্তি যে তুমি।

সুরমা

তাই যদি হয় ত সেও তোমারি শক্তিতে।

উদয়াদিত্য

আমার কেবলি ভয় হয় তোমাকে যদি হারাই তা হলে—

সুরমা

তা হলে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো একদিন ভগবান্ প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ত্ব একলা তোমাতেই।

উদয়াদিত্য

আমার সে প্রমাণে কাজ নেই।

সুরমা

ভাগবতের স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়াদিত্য

আচ্ছা চল্লুম কিন্তু দেখো।—

[প্রস্থান।

(ভাগবতের স্ত্রীর প্রবেশ)

সুরমা

তোর রাজে আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি, তা তোদের হাতে গিয়ে পৌঁছেচে ত?

ভাগবতের স্ত্রী

পৌঁচেছে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কতদিন চল্‌বে? তোমরা আমাদের সর্ব্বনাশ কল্লে!

সুরমা।

ভয় নেই কাদিনী! আমার হাত দিন খাওয়া পরা ফুটবে তোদেরও ফুটবে। আজও কিছু নিয়ে যা। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকিস্ নে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজমহিষী ও বামীর প্রবেশ)

রাজমহিষী

এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আমি জান্‌তেও পারলুম না।

বামী

মহারাণী মা, জেনেই বা লাভ হত কি। তুমি ত ঠেকাতে পার্‌তে না!

রাজমহিষী

সকালে উঠে আমি ভাবছি হল কি—জামাই বুঝি রাগ করেই গেল! এদিকে যে এমন সর্ব্বনাশের উদ্যোগ হচ্ছিল, তা মনে আন্‌তেও পারিনি। তুই সে রাত্রেই জান্‌তিস্ আমাকে ভাঁড়িয়েছিলি!

বামী

জান্‌লে তুমি যে ভয়েই মরে যেতে! তা মা, আর একথায় কাজ নেই—যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে।

রাজমহিষী

হয়ে চুক্‌লে ত বাঁচতুম—এখন যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হচ্চে।

বামী

ভয় খুব ছিল, কিন্তু সে কেটে গেছে।

রাজমহিষী

কি করে কাটল।

বামী

মহারাজার রাগ বৌরাণীর উপর পড়েছে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক্—আমাদের মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে কিন্তু ওঁর ভয় ভয় নেই। যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি ইচ্ছে করেই যেন তার জোগাড় কর্‌চেন।

রাজমহিষী

তার জন্যে ত বেশী জোগাড় কর্‌বার দরকার দেখি নে। মহারাজ যে ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। এবারে আর ত ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা বলেছিলুম, সেটা ঠিক আছে ত!

বামী

সে সমস্তই তৈরী হয়ে রয়েছে, সে জন্যে ভেবো না।

রাজমহিষী

আর দেরী করিস্ নে, আজকেই যাতে—

বামী

সে আমাকে বল্‌তে হবে না, কিন্তু—

রাজমহিষী

যা হয় হবে—অত ভাব্‌তে পারি নে—ওকে বিদায় করতে পার্‌লেই আপাততঃ মহারাজের রাগ পড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা শীঘ্র কাজ সেরে আয়।

বামী

আমি সে ঠিক করেই এসেছি—এতক্ষণে হয় ত—

[প্রস্থান।

রাজমহিষী।

কি জানি বামী, তাও হয়!

(প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

মহিষী!

মহিষী

কি মহারাজ!

প্রতাপ

এ সব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে করতে হবে?

মহিষী

কি কাজ!

প্রতাপ

ঐ যে আমি তোমাকে বলেছিলুম শ্রীপুরের মেয়েকে তার পিত্রালয়ে দূর করে দিতে হবে—এ কাজটা কি আমার সৈন্য সেনাপতি নিয়ে করতে হবে?

মহিষী

আমি তার জন্যে বন্দোবস্ত করছি।

প্রতাপ

বন্দোবস্ত! এর আবার বন্দোবস্ত কিসের! আমার রাজ্যে ক'জন পাল্কীর বেহারা জুটবে না—না কি?

মহিষী

সে জন্যে নয় মহারাজ!

প্রতাপ

তবে কি জন্যে?

মহিষী

দেখ তবে খুলে বলি! ঐ বউ আমার উদয়কে যেন যাদু করে রেখেছে সে ত তুমি জান। ওকে যদি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তা' হলে—

প্রতাপ

এমন যাদু ত ভেঙে দিতে হবে—এ বাড়ি থেকে ঐ মেয়েটাকে নির্ব্বাসিত করে দিলেই যাদু ভাঙবে।

মহিষী

মহারাজ, এ সব কথা তোমরা বুঝবে না—সে আমি ঠিক করেছি।

প্রতাপ

কি ঠিক করেছ জান্‌তে চাই।

মহিষী

আমি বামীকে দিয়ে মদনার কাছ থেকে ওষুধ আনিয়েছি।

প্রতাপ

ওষুধ কিসের জন্যে?

মহিষী

ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর যাদু কেটে যাবে। মদনার ওষুধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপ

আমি তোমার ওষুধ টষুধ বুঝিনে—আমি এক ওষুধ জানি—শেষকালে সেই ওষুধ প্রয়োগ করব। আমি তোমাকে বলে রাখচি কাল যদি ঐ শ্রীপুরের মেয়ে শ্রীপুরে ফিরে না যায়, তা'হলে আমি উদয়কে শুদ্ধ নির্ব্বাসনে পাঠাব—এখন যা করতে হয় করগে!

মহিষী

আর ত বাঁচিনে! কি যে করব মাথামুণ্ড ভেবে পাই নে!

[প্রস্থান।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

সীতারাম ভাগবতের বেতন বন্ধ হয়েছে, সে কি রাজ-কোষে অর্থ নেই বলে?

উদয়

না মহারাজ, আমি বল পূর্ব্বক তাদের কর্ত্তব্যে বাধা দিয়েছি, আমাকে তারি দণ্ড দেবার জন্যে।

প্রতাপ

বৌমা তাদের গোপনে অর্থ সাহায্য করছেন।

"—ফিরে এস, ফিরে এস।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত নাথ হে ফিরে এস!—" রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সৌজন্যে।

উদয়

আমিই তাঁকে সাহায্য করতে বলেছি।

প্রতাপ

আমার ইচ্ছার অপমান করবার জন্তে ?

উদয়

না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপ্য, তা নিজে গ্রহণ করবার জন্তে।

প্রতাপ

আমি আদেশ করচি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থ-সাহায্য না করা হয়।

উদয়

আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হল।

প্রতাপ

আর বৌমাকে বোলো, তিনি আমাকে একেবারেই ভয় করেন না—দীর্ঘকাল তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলেই এ রকম ঘটতে পেরেছে, কিন্তু তিনি জানতে পারবেন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়!

[উদয়ের প্রস্থান।

(মহিষী ও বামীর প্রবেশ)

মহিষী

ওষুধের কি করলি ?

বামী

সে ত এনেছি—পানের সঙ্গে সেজে দিয়েছি।

মহিষী

খাঁটি ওষুধ ত ?

বামী

খুব খাঁটি !

মহিষী

খুব কড়া ওষুধ হওয়া চাই, এক দিনেই যাতে কাজ হয়। মহারাজ বলেছেন কালকের মধ্যে যদি সুরমা বিদায় না হয়, তা'হলে উদয়কে শুদ্ধ নির্ব্বাসনে পাঠাবেন। আমি যে কি কপাল করেছিলুম !

বামী

কড়া ওষুধ ত বটে। বড় ভয় হয় মা, কি হতে কি ঘটে !

মহিষী

তার ভাবনা করবার সময় নেই বামী। একটা কিছু করতেই হবে। মহারাজকে ত জানিস্—কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্তে আমি দিনরাত্রি ভেবে মরচি। ঐ বউটাকে বিদায় করতে পারলে তবু মহারাজের রাগ একটু কম পড়বে। ও যেন তাঁর চক্ষুশূল হয়েছে।

বামী

তা ত জানি ! কিন্তু ওষুধের কথা বলা ত যায় না। দেখো, শেষকালে মা আমি যেন বিপদে না পড়ি ! আর আমার বাজুবন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী

সে আমাকে বলতে হবে না। তোকে ত গোটা ছড়াটা আগাম দিয়েছি।

বামী

শুধু গোটা নয় মা—বাজুবন্দ চাই !

[প্রস্থান।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

মহিষী

বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠান যা'ক !

উদয়

কেন মা, সুরমা কি অপরাধ ক'রেছে ?

মহিষী

কি জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ কিছু বুঝি না, বৌমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজার রাজকার্য্যের যে কি সুযোগ হ'বে, মহারাজই জানেন !

উদয়

মা ! রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হয়ে থাকে তবে সুরমার কি হবে না ? কেবল স্থানটুকু মাত্রই তার ছিল, তার বেশি ত আর কিছু সে পায়নি !

মহিষী

(সরোদনে) কি জানি বাবা, মহারাজ কখন কি যে করেন কিছু বুঝতে পারি নে। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বৌমাও বড় ভাল মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করে অবধিই এখানে আর শান্তি নেই। হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল ! তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই

থাক না কেন, দেখা যাক, কি বল যাছ? ও দিনকতক এখান থেকে গেলেই দেখতে পা'বে, বাড়ীর শ্রী ফেরে কি না!

(উদয় নীরব থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে প্রস্থান।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা

কই এখানে ত তিনি নেই!

মহিষী

পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কি করি? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তা'র কি সর্ব্বনাশ না করি? অবশেষে সে রাজার ছেলে- তা'র হাতে বেড়ী না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হ'বি নি?

সুরমা

কোনো ভয় নেই মা। বেড়ী এবার ভাঙ্‌ল। আমি বুঝতে পারছি আমার বিদায় হবার সময় হয়ে এসেছে— আর বড় দেরি নেই। আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে! বুকের ভিতর যেন আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। তোমার পায়ের ধূলো দিতে এলুম। অপরাধ যা কিছু করেছি মাপ কোরো। ভগবান্ করুন যেন আমি গেলেই শান্তি হয়!

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

মহিষী

ওষুধ খেয়েছে বুঝি! বিপদ কিছু ঘটবে না ত? যে যা বলুক, বৌমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্ম্মে সইবে? বামী, বামী!

(বামীর প্রবেশ)

বামী

কি মা!

মহিষী

ওষুধটা কি বড্ড কড়া হয়েছে?

বামী

তুমি ত কড়া ওষুধের কথাই বলেছিলে।

মহিষী

কিন্তু বিপদ ঘটবে না ত?

বামী

আপদ্ বিপদের কথা বলা যায় কি!

মহিষী

সত্যি বল্‌চি বামী, আমার মনটা কেমন কর্‌চে। ওষুধটা কি খেয়েছে ঠিক জানিস্?

বামী

বেশিক্ষণ নয়- এই খানিকক্ষণ হল খেয়েচে।

মহিষী

দেখ্‌লুম, মুখ একেবারে শাদা ফেকাসে হয়ে গেছে? কি করলুম কে জানে! হরি রক্ষা কর।

বামী

তোমরা ত ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিলে!

মহিষী

না, না, ছি ছি—অমন কথা বলিস্ নে। যা আমি তোকে আমার এই গলার হার গাছটা দিচ্চি তুই শীগ্‌গির দৌড়ে গিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে এর উল্টো ওষুধ নিয়ে আয়গে। যা বামি, যা! শীগ্‌গির যা!

[বামীর প্রস্থান।

(বিভার সরোদনে প্রবেশ)

বিভা

মা, মা, কি হল মা?

মহিষী

কি হয়েছে বিনু।

বিভা

বৌদিদির এমন হল কেন মা! তোমরা তাকে কি করলে মা! কি খাওয়ালে!

মহিষী

(উচ্চস্বরে) ওরে, বামী, বামী, শীগগির্ দৌড়ে যা— ওরে ওষুধ নিয়ে আয়!

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

মহিষী

বাবা, উদয়, কি হয়েছে বাপ!

উদয়াদিত্য

সুরমা বিদায় হয়েছে মা, এবার আমি বিদায় হতে এসেছি—আর এখানে নয়।

মহিষী

(কপালে করাঘাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ হল রে, কি সর্ব্বনাশ হল।

উদয়

(প্রণাম করিয়া) চল্লুম তবে !

মহিষী

(হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ ! আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা !

বিভা

(পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা ! আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে !

উদয়াদিত্য

তোকে কার হাতে দিয়ে যাব ! আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে আছে ! ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখলি —নইলে এ পাপ বাড়িতে আমি আর এক মুহূর্ত্ত থাকতুম না।

বিভা

বুক ফেটে গেল দাদা, বুক ফেটে গেল।

উদয়াদিত্য

দুঃখ করিস্ নে বিভা, যে গেছে সে সুখে গেছে ! এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেল। ওখানে কিসের গোলমাল। (বাতায়ন হইতে নীচে চাহিয়া) প্রজারা এসেচে দেখচি। ওদের বিদায় করে দিয়ে আসি গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নীচের আঙিনায় মাধবপুরের প্রজাবৃন্দ

প্রথম

(উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।

দ্বিতীয়

আমরা এখানে না খেয়ে মরব।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী

এরা সব বৈরাগী ঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু যে রকম গোলমাল লাগিয়েছে—এখনি মহারাজের কানে যাবে—মুস্কিলে পড়ব। কি বাবা তোমরা মিছে চেঁচামেচি করচ কেন বল ত।

সকলে

আমরা রাজার কাছে দরবার করব।

প্রহরী

আমার পরামর্শ শোন্ বাবা—দরবার করতে গিয়ে মরবি। তোরা নেহাৎ ছোট বলেই মহারাজ তোদের গায়ে হাত দেন নি—কিন্তু হাঙ্গামা যদি করিস্ ত একটি প্রাণীও রক্ষা পাবিনে।

প্রথম

আমরা আর ত কিছু চাইনে, যে গারদে বাবা আছেন, আমরাও সেখানে থাকতে চাই।

প্রহরী

ওরে চাই বল্লেই হবে এমন দেশ এ নয় !

দ্বিতীয়

আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাব।

প্রহরী

তিনি তোদের ভয়েই লুকিয়ে বেড়াচ্চেন।

তৃতীয়

তাঁকে না দেখে আমরা যাব না।

সকলে

(উর্দ্ধস্বরে) দোহাই যুবরাজ বাহাদুর !

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

আমি তোদের হুকুম করচি, তোরা দেশে ফিরে যা !

প্রথম

তোমার হুকুম মানব—আমাদের ঠাকুরও হুকুম করেছে, তাঁর হুকুমও মানব—কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য

আমায় নিয়ে কি হবে ?

প্রথম

তোমাকে আমাদের রাজা করব।

উদয়াদিত্য

তোদের ত বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে। এমন কথা মুখে আনিস্। তোদের কি মরবার জায়গা ছিল না ?

দ্বিতীয়

মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ্য হয় না।

তৃতীয়

আমাদের যে বুক কেমন করে কাটচে, তা বিধাতা পুরুষ জানেন।

চতুর্থ

রাজা, তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জলে গেল।

পঞ্চম

আমরা জোর ক'রে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য

আচ্ছা শোন্ আমি বলি - তোরা যদি দেরি না করে এখনি দেশে চলে যাস্, তা হলে আমি মহারাজের কাছে নিজে যাদবপুরে যাবার দরখাস্ত করব।

প্রথম

সঙ্গে আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে?

উদয়াদিত্য

চেষ্টা করব। কিন্তু আর দেরি না—এই মুহূর্ত্তে তোরা এখান থেকে বিদায় হ।

প্রজারা

আচ্ছা, আমরা বিদায় হলুম। জয় হোক্! তোমার জয় হোক।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্ত্রী ও প্রতাপাদিত্য

মন্ত্রী

যুবরাজ কারাদণ্ড তো এত দিন ভোগ করলেন, এখন ছেড়ে দিন।

প্রতাপ

কারাদণ্ড দেবার কারণ ঘটেছিল, ছেড়ে দেবার তো কারণ ঘটে নি।

মন্ত্রী

কেবল সন্দেহ মাত্রে ওঁকে শাস্তি দিয়েছেন। প্রমাণ তো পান নি।

প্রতাপাদিত্য

যাদবপুরের প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লীতে চলেছিল—হাতে হাতে ধরা পড়েছিল, সেও কি তুমি অবিশ্বাস কর?

মন্ত্রী

[illegible]

প্রতাপাদিত্য

ওরা তাতে লিখেছে আমি দিল্লীশ্বরের শত্রু—ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়—এ কথাগুলো ত ঠিক?

মন্ত্রী

আজ্ঞে হাঁ, সে দরখাস্ত ত আমি দেখিছি।

প্রতাপাদিত্য

এর চেয়ে তুমি আর কি প্রমাণ চাও?

মন্ত্রী

কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যুবরাজ আছেন, এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারিনে।

প্রতাপ

তোমার বিশ্বাস কিম্বা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভর করে ত আমি রাজকার্য্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ্ ঘটে, তবে, "ঐ যা' মন্ত্রী আমার ভুল বিশ্বাস করেছিল" বলে ত নিষ্কৃতি পাব না।

মন্ত্রী

কিন্তু ন্যায়বিচার করা রাজত্বের অঙ্গ মহারাজ। যুবরাজকে যে সন্দেহে কারাদণ্ড দিয়েছেন তার যদি কোনো মূল না থাকে তা'হলেও রাজকার্য্যের মঙ্গল হবে না।

প্রতাপ

রাজ্য রক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী। অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তার পরে দণ্ড দেওয়াই যে রাজার কর্ত্তব্য তা আমি মনে করিনে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিম্বা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।

মন্ত্রী

আপনি রাগ করবেন, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে সন্দেহ কিম্বা ভবিষ্যৎ অপরাধের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কল্পনা করতে পারি নে।

প্রতাপ

যাদবপুরের প্রজারা এখানে এসেছিল কি না?

মন্ত্রী

হাঁ।

প্রতাপ

তারা ওকেই রাজা করতে চেয়েছিল কি না?

মন্ত্রী

হাঁ চেয়েছিল।

প্রতাপ

তুমি বলতে চাও এ দকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিল না ?

মন্ত্রী

যদি হাত থাকত তা'হলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

প্রতাপ

আচ্ছা আচ্ছা তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাক—বিপদ্‌টা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব না। রাজার দায়িত্ব মন্ত্রীর দায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি। অন্যায়ের দ্বারা অবিচারের দ্বারাও রাজাকে রাজধর্ম পালন করতে হয়।

মন্ত্রী

অন্ততঃ বৈরাগীঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ! প্রজাদের মনে এক সঙ্গে এতগুলো বেদনা চাপাবেন না।

প্রতাপ

আচ্ছা সে আমি বিবেচনা করে দেখবো।

মন্ত্রী

চলুন না মহারাজ, একবার স্বয়ং ভিতরে গিয়ে যুবরাজকে দেখে আসুন না। ওঁর মুখ দেখলে, ওঁর দুটো কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন, গোপনে অপরাধ ওঁর দ্বারা কখনো ঘটতেই পারে না।

প্রতাপ

যারা মুখের ভাব দেখে, আর হায় হায় আহা উহু করতে করতে রাজ্যশাসন করে, তারা রাজা হবার যোগ্য নয়।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও!—পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে—তবে তা'কে এই বুড়োর কাছে দাও না। (প্রতাপ নিরুত্তর) তুমি যা মনে ক'রে উদয়কে শাস্তি দিচ্ছ, সেই অপরাধ যে যথার্থ আমার। আমিই যে রামচন্দ্র রায়কে রক্ষা করবার জন্যে চক্রান্ত করেছিলুম।

প্রতাপ

খুড়োমশায়, বৃথা কথা বলে আমার কাছে কোন দিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্ত রায়

ভাল, আমার আর একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল উদয়কে দেখে যেতে চাই—আমাকে তার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করতে কেউ যেন বাধা না দেয় এই অনুমতি দাও।

প্রতাপ

সে হতে পারবে না।

বসন্ত রায়

তাহ'লে আমাকে তার সঙ্গে বন্দী করে রাখ। আমাদের দুজনেরই অপরাধ এক—দণ্ডও এক হোক্—যতদিন সে কারাগারে থাকবে আমিও থাকব।

[নীরবে প্রতাপের প্রস্থান।

(রামমোহনের প্রবেশ)

বসন্ত রায়

কি মোহন? কি খবর?

রামমোহন

মাকে আমাদের চন্দ্রদ্বীপে আসবার কথা বলতে এসেছিলুম।

বসন্ত-রায়

প্রতাপকে জানিয়েছিস্ না কি?

রামমোহন

তাঁকে জানাবার আগে একবার স্বয়ং মাকে নিবেদন করতে গিয়েছিলুম।

বসন্ত রায়

তা বিভা কি বললে?

রামমোহন

তিনি বললেন, তিনি যেতে পারবেন না।

বসন্ত রায়

কেন, কেন! অভিমান করেছে বুঝি? সেটা মিছে অভিমান, রামমোহন, সে বেশিক্ষণ থাকবে না, একটু তুমি সবুর করো।

রামমোহন

তিনি বললেন, দাদাকে ছেড়ে আজ আমি যেতে পারব না।

বসন্ত রায়

আহা, সে কথা বলতে পারে বটে।

রামমোহন

বড়ো বুক দমিয়ে এসেছিলেম। মহারাজ নিষেধ করেছিলেন—বলেছিলেন, মা লক্ষ্মী আমাকে বড়ো দয়া করেন আমার কথা ঠেলতে পারবেন না। আমাদের রাজা বল্‌লেন, প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়েকে নিতে পারবো না। আমি বল্‌লেম, তিনি কি কেবল প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়ে? আপনার ঘরের রাণী নন? শ্বশুরের উপর রাগ করে নিজের সিংহাসনকে অপমান করবেন? এই বলে চলে এসেছি, আজ আমি ফিরব কোন্ মুখে?

বসন্ত রায়

বিভাকে দোষ দিয়ো না রামমোহন।

রামমোহন

না, খুড়ো মহারাজ, আমাদের মহারাজার ভাগ্যকেই দোষ দিই,—এমন লক্ষ্মীকে পেয়েও হেলায় হারাতে বসেছেন?

বসন্ত রায়

হারাবে কেন রামমোহন? ওঁরদিন আস্‌বে, আবার মিলন হবে।

রামমোহন

কুপরামর্শ দেবার লোক যে ঢের আছে। ওরা বল্‌চে যাদবপুরের ঘরের মেয়ে এনে তাকে ওঁর পাটরাণী করবে।

বসন্ত রায়

এও কি কখনো সম্ভব? আমাদের বিভাকে ত্যাগ করবে?

রামমোহন

সেই চক্রান্তই হয়েচে, তাই আমি ছুটে এলুম। অপরাধ করলেন নিজে, আর যিনি সতীলক্ষ্মী, তাঁকে দণ্ড দিলেন! এও কি কখনো সইবে? হোক্ না কলি, ধর্ম্ম কি একেবারে নেই? চল্‌লুম মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করবেন, আমাদের রাজার যেন সুমতি হয়।

বসন্ত রায়

এখানকার বিপদ কেটে গেলে আমি নিজে যাব তোমাদের ওখানে। এমন অন্যায় হতে দেবো কেন?

(রামমোহনের প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

(সীতারামের প্রবেশ)

কি সীতারাম, খবর কি?

সীতারাম

কারাগারে আমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েচি, এখনি যুবরাজ বেরিয়ে আসবেন।

বসন্ত রায়

আবার আর একটা উৎপাত ঘটবে না তো? একটা ঝাঁড়া কাটাতে গিয়ে আর-একটা ঝাঁড়া ঘাড়ে চাপে যে। আমার ভালো ঠেকচে না।

সীতারাম

কাছেই নৌকো তৈরি আছে খুড়ো মহারাজ, ওঁকে নিয়ে এখনি আপনাকে পালাতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

বসন্ত রায়

তার আগে বিভার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি গে।

সীতারাম

না, তার সময় নেই।

বসন্ত রায়

দেরি করব না সীতারাম, তার সঙ্গে জীবনে আর তো দেখা হবে না!

সীতারাম

তা হলে সমস্ত আমাদের বৃথা হয়ে যাবে। ঐ দেখুন না আগুনের শিখা জ্বলে উঠেচে।

বসন্ত রায়

আগুন থেকে বেরিয়ে আস্‌তে পারবে ত রে?

সীতারাম

কারাগারের মধ্যেই আমাদের চর আছে; এই এলেন বলে দেখুন না।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

দাদামশায় যে!

বসন্ত রায়

আয় ভাই আয়।

উদয়াদিত্য

সমস্তই স্বপ্ন না কি? আমি তো বুঝতে পারচিনে!

সীতারাম

যুবরাজ এই দিকে নৌকো আছে, শীঘ্র আসুন।

উদয়াদিত্য

কেন নৌকো কেন ?

সীতারাম

নইলে আবার প্রহরীরা ধরে ফেল্‌বে !

উদয়

কেন, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি ?

বসন্ত রায়

হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করে নিয়ে চলেচি।

সীতারাম

কয়েদখানায় আমিই আগুন লাগিয়েচি।

উদয়

কি সর্ব্বনাশ ! মরবি যে রে !

সীতারাম

যতদিন তুমি কয়েদে ছিলে, প্রতিদিন আমি মরেচি !

উদয়

না, আমি পালাব না।

বসন্ত রায়

কেন দাদা ?

উদয়

নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যদের বিপদের ভারে জড়াতে পারব না।

বসন্ত

অন্যদের যে তাতেই আনন্দ। তোমার তাতে কোনো অপরাধ নেই।

উদয়

সে আমি পারব না। কারাগারের বন্ধন আমার পক্ষে তার চেয়ে অনেক ভালো। যদি পালাই তবে মুক্তি আমার ফাঁস হবে। আমি কারাগারে ফিরব।

বসন্ত

কারাগার তো গেছে ছাই হয়ে, তুমি ফিরবে কোথায়।

উদয়

ঐ দিকে একখানা ঘর বাকি আছে।

বসন্ত

তা হলে আমিও যাই।

উদয়

না, তুমি যেতে পারবে না। কিছুতেই না।

বসন্ত

আচ্ছা তা হলে আমি বিভার কাছে যাই। তার প্রাণটা যে কি রকম করচে, সে আমিই জানি।

উদয়

সীতারাম, আমার জন্যে যে নৌকো তৈরি আছে, সে নৌকোয় চড়ে এখনি তুই রায়গড়ে চলে যা !

সীতারাম

(উদয়কে প্রণাম করিয়া) তা ছাড়া আমার আর গতি নেই। প্রভু, যদি কোনো পুণ্য করে থাকি, আর জন্মে যেন তোমার দাস হয়ে জন্মাই !

[উভয়ের প্রস্থান।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ—নৃত্য ও গীত)

ওরে আগুন আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার, শিকলভাঙা এমন রাঙা মূর্ত্তি দেখি নাই !
তুমি দুহাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই !
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই
আগল যাবে সরে—
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবিরে ছাই করে !
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে
ঘুচবে সব বালাই !

[প্রস্থান।

(প্রতাপ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

প্রতাপ

দৈবাৎ আগুন লাগার কথা আমি এক বর্ণ বিশ্বাস করি নে। এ'র মধ্যে চক্রান্ত আছে ! খুড়ো কোথায় ?

মন্ত্রী

তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রতাপ

হুঁ। তিনিই এই অম্বিকাও ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছেন।

মন্ত্রী

তিনি সরল লোক—এ সকল বুদ্ধি তো তাঁর আসে না।

প্রতাপ

বাইরে থেকে থাকে সরল বলে বোধ হবে না তার কুটিল বুদ্ধি বৃথা।

মন্ত্রী

কারাগার ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে যদি—

প্রতাপ

কোনও আশঙ্কা নেই, আমি বলছি উদয়কে নিয়ে খুড়ো মহারাজ পালিয়েছেন। সেই বৈরাগীটার খবর পেয়েছ?

মন্ত্রী

না মহারাজ।

প্রতাপ

সে বোধ হয় পালিয়েছে। সে যদি থাকে ত আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

মন্ত্রী

কেন মহারাজ, তাকে আবার কিসের প্রয়োজন।

প্রতাপ

আর কিছু নয়—সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু আমোদ করতে পারতুম—তার কথা শুনতে মজা আছে।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

ধনঞ্জয়

জয় হোক্ মহারাজ! আপনি ত আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আজন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির; কিন্তু না বলে যাই কি করে! তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ

ক'দিন কাটল কেমন?

ধনঞ্জয়

সুখে কেটেছে—কোনো ভাবনা ছিল না। এ সব তারই লুকো-চুরি খেলা—ভেবেছিল গায়ের লুকবে, ধরতে পারব না—কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তারপরে খুব হাসি, খুব গান। বড় আনন্দে গেছে—আমার গায়ের তাকে মনে থাকবে!

(গান)

ওরে শিকল তোমায় অঙ্গে ধরে
দিয়েছি ঝঙ্কার!
(তুমি) আনন্দে তাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার।

তোমায় নিয়ে করে' খেলা
সুখে দুঃখে কাট্‌ল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার।

তোমার পরে করিনে রোষ,
দোষ থাকে ত আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।

অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার!

প্রতাপ

বল কি বৈরাগী, গায়ের তোমার এত আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়

মহারাজ, রাজো তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ। অভাব কিসের? তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না?

প্রতাপ

এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয়

রাস্তায়।

সরকারী সহানুভূতি

[বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীঅসিতকুমার হালদার]

প্রতাপ

বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভাল—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়

মহারাজ, রাজ্যটাও ত রাস্তা! চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই ত পথিক; আমরা কোথায় লাগি? তা'হলে অনুমতি যদি হয় ত এবারকার মত বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপ

আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেয়ো না।

ধনঞ্জয়

সে কেমন করে বলি, যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না?

[প্রস্থান।

মন্ত্রী

মহারাজ। ঐতো দেখি যুবরাজ আসছেন।

প্রতাপ

তাইতো, পালায়নি তবে!

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

কি! তুমি যে মুক্ত দেখি?

উদয়াদিত্য

কেমন করে বলব মহারাজ? কারাগার পুড়লেই কি কারাগার যায়?

প্রতাপ

তুমি যে পালিয়ে গেলে না?

উদয়াদিত্য

যেরাদ না ছুরোলে পালাব কি করে? মহারাজের সঙ্গে আমার যে চিরবন্ধনের সম্বন্ধ, সেটা যখন নিজে ছিন্ন করে দেবেন, সেই দিনই তো ছাড়া পাবো।

প্রতাপ

তোমাকে ত্যাগ করে?

উদয়াদিত্য

তা ছাড়া আর কি বলব? আমাকে গ্রহণ করে আমাদের তো কারো কোনো সুখ নেই।

প্রতাপ

তুমি অথচ সিংহাসনের যোগ্য নও, সেই সিংহাসনে তোমার অধিকার আছে এর থেকেই যত দুঃখ। যেখানে যার স্থান নয়, সেইখানেই তার বন্ধন।

উদয়

না মহারাজ, আমি যোগ্য নই। আপনার এই সিংহাসন হ'তে আমাকে অব্যাহতি দিন এই ভিক্ষা।

প্রতাপ

তুমি যা বলছ তা' যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কি করে জানবো?

উদয়

আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ ক'রে শপথ করব আপনার রাজ্যের সূচাগ্র ভূমিও আমি কখনও শাসন করবো না; সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপ

তুমি তবে কি চাও?

উদয়াদিত্য

মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই নে—কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশুর মত গারদে পুরে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুন, আমি একাকী কাশী চ'লে যাই।

প্রতাপ

আচ্ছা, বেশ! আমি এর ব্যবস্থা করছি!

উদয়াদিত্য

আমার আর একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ। আমি বিভাকে নিজে তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবার অনুমতি চাই।

প্রতাপ

তার আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

উদয়াদিত্য

তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিন। এখানে ত তা সুখও নেই স্বস্তিও নেই।

প্রতাপ

তার মাতার কাছে অনুমতি নিতে পার।

[মন্ত্রীর প্রস্থান

(মহিষী ও বিভার প্রবেশ)

মহিষী

ঈশ্বর কি বেঁচে আছে ?

প্রতাপ

ভয় নেই। বেঁচে আছে! তুমি এখানে যে ?

মহিষী

পারব কেন থাকতে ? শুনলুম কারাগারে আগুন লেগেছে। ঈশ্বর, বাবা আমার, এখন ঘরে চল্।

ঈশ্বর

আমার ঘর নেই। আমি যাচ্ছি কাশী।

মহিষী

সে কি কথা ? তাহলে আমাকে নেবে ফেলে যা !

ঈশ্বর

মা, এত দিনে তুমি কি ঠাউরেচ তোমার আশ্রয়েই ছেলে নিরাপদে থাকবে ? আমার তো শিক্ষার আর কিছু বাকি নেই ? আজ তোমাদেরই কল্যাণে বিশ্বনাথের আশ্রয় পেয়েছি। কারাগারের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্য সব আশ্রয়ই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কেঁদে কি হবে, মা, আজই চোখের জল মোছবার সময়।

বিভা

দাদা, আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

ঈশ্বর

কিছুতে না। (মাতার প্রতি) বিভারও তো আর ভাবনা নেই—এখন তুমি অনুমতি করো আমার সঙ্গে ওকেও অন্য আশ্রয়ে নিয়ে যাই।

মহিষী

তুই যদি যাবি ঈশ্বর, তো ও যাক্, তোর সঙ্গে—তোর মায়ের হয়ে ওই তোকে দেখতে শুনতে পারবে। ইতিমধ্যে ওর শ্বশুর বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিই—যদি তারা—

প্রতাপ

চুপ করো, ওর আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?

মহিষী

গর্ভে ধরে সংসারে কি দুঃখই এনেছি ! রাজার বাড়িতে এরা জন্মেছিল এই জন্যেই ? এখন একবার বাড়িতে চল্—তার পরে—

ঈশ্বরাদিত্য

না, মা, ও বাড়িতে আর নয়—রাস্তা বেয়ে সোজা চলে যাব, আমাদের পিছনে তাকাবার কিছুই নেই।

মহিষী

তোরা রাস্তায় বেরিয়ে যাবি, আর এই রাজবাড়ির অন্ন যে আমার বিষের মত ঠেকবে।

ঈশ্বরাদিত্য

এখন আমাদের আশীর্বাদ করে বিদায় করো।

মহিষী

বুঝতে পারচি তোদের দুঃখের দিন ঘুচল। এবার ঈশ্বর তোদের সুখেই রাখবেন। তবু দুর্বল মন মানে না যে। আজ থেকে মায়ের যোগ্য সেবা তোদের আর তো কিছু করতে পারব না, তোদের জন্যে বশোরেশ্বরীর কাছে রোজ পুজো দেব।

বিভা

বাবামহাশয় কোথায় দাদা।

ঈশ্বরাদিত্য

তিনি কাছেই কোথাও আছেন—এখনি দেখা হবে।

প্রতাপ

না, দেখা হবে না। কোনো দিন না।

ঈশ্বরাদিত্য

কেন, তাঁর কি হল ?

প্রতাপ

তাঁর বিচার বাকি আছে। সে সব কথা তোমাদের ভাববার কথা নয়।

ঈশ্বরাদিত্য

না হতে পারে কিন্তু এই বলে গেলুম মহারাজ, রাজা তো মাটির নয়, রাজ্য হোলো পুণ্যের, সে পুণ্য রাজাকে নিয়ে, প্রজাকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে। বিভা, আর কাঁদিস নে। বাবামশায় তো মহাপুরুষ, তবে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যু নেই। আমাদের মতো সামান্য মানুষই যা খেয়ে মরে।

প্রতাপ

এখন এসো ঈশ্বর, কালীর মন্দিরে এসো, মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করতে হবে।

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বরবেশে রামচন্দ্র

রমাই

আপনি তো চলে এলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাটি বিষম গোলে পড়লেন।

মন্ত্রী

কি রকম, হে রমাই।

রমাই

রাজার অভিপ্রায় ছিলো, কন্যাটি বিধবা হ'লে হাতের নোয়া আর বালা দু'গাছি বিক্রি করে রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করাতে ভারী কন্তো!

মন্ত্রী

মহারাজ, শুনতে পাই প্রতাপাদিত্য আপনাকে খারা হচ্ছেন। এদিকে একটু ইসারা করলেই নিজের খরচে এখনো মেয়েটিকে পৌঁছিয়ে দিতে রাজি!

রমাই

সেটা বিনি-খরচায় হতে পারে কিন্তু ফিরে পাঠাবার খরচাটা মহারাজের নিজের গাঁট থেকে দিতে হবে।

মন্ত্রী

সে তো বটেই। বিবাহ করেছেন তাঁদের বাড়িতে, কিন্তু নিজের বাড়িতে আনবার বেলা তো বিচার করতে হয়! কি বলো রমাই?

রমাই

সে তো বটেই। পাঁকে যদি মহারাজা পা দিয়ে থাকেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, তা বলে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসবেন না?

মন্ত্রী

বেশ বলেচ রমাই।

রমাই

মন্ত্রিবর, শুভকর্মে মহারাজের শ্বশুরে শ্বশুর মশায়কে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েচে তো? কি জানি মনে দুঃখ করতেও পারেন। (সকলের হাস্য)

রমাই

বরণ করবার জন্যে এয়ো-স্ত্রীদের মধ্যে শাশুড়ি ঠাকুরুণকেও ভুললে চলবে না। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, সেটাও চাই—অতএব যখন মিষ্টান্ন পাঠানো হবে তখন সেই সঙ্গে দুচার ছড়া কাঁচা রম্ভাও পাঠানো ভালো। কী বলো মন্ত্রী!

মন্ত্রী

তার উপরে কথা! (উচ্চহাস্য)

রমাই

আর দেখেন মহারাজ, যুবরাজকে একখানা পত্র লিখে জানাবেন যে, তোমাদের রাজত্ব রাজকন্যা তোমাদেরি থাক, প্রজাপতির কৃপায় জগতে শ্যালা শ্বশুরের অভাব নেই! কি বলেন আপনারা?

(সকলের উচ্চ হাস্য)

রামচন্দ্র

রমাই, তুমি যাও লোকজনদের দেখ গে।

[রমাইয়ের প্রস্থান।

সেনাপতি, তুমি এইখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগচে না।

সেনাপতি

মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গন্ধকের ধোঁয়ার মতো, তার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

রামচন্দ্র

ঠিক বলেচ সেনাপতি, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে চলে যাই। আজ গান বাজনা ভালো জমচে না, কর্ণাভিজ।

কর্ণাভিজ

না মহারাজ, জমচে না, আমার বুকে বাজছে—আর একদিনের কথা মনে পড়চে।

রামচন্দ্র

গুরুবটা কি সত্য?

কর্ণাভিজ

কিসের গুজব?

রামচন্দ্র

ঐ তাঁরা কি বশোর থেকে আসচেন?

কর্ণাভিজ

হাঁ মহারাজ, শুনেচি বটে। আদেশ করেন তো তাঁদের এগিয়ে আনি গে।

রামচন্দ্র

এগিয়ে আসবে ? তাহলে কিন্তু মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।

কর্ণাভিজ

আদেশ করেন তো ওদের হাসিমুখ মুখ একেবারে চেঁচে পরিষ্কার করে দিই।

রামচন্দ্র

না, না, গোলমাল করে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি আমি তোমাকে গোপনে বলচি, কাউকে বোলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারিচিনে। কালই রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখেচি।

কর্ণাভিজ

মহারাজ, আমি আর কি বলব—তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তবুও দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রামচন্দ্র

দেখ সেনাপতি, এক কাজ করলে হয় না ?

কর্ণাভিজ

কি বলুন।

রামচন্দ্র

মোহন যদি একবার খবর পায় যে, তাঁরা আসচেন, তা'হলে সে আপনি ছুটে যাবে। একবার কোন মতে তাকে সংবাদটা জানাও না ! কিন্তু দেখো আমার নাম কোরো না।

কর্ণাভিজ

যে আজ্ঞা মহারাজ !

(রমাইয়ের প্রবেশ)

রমাই

মহারাজ, যশোর থেকে ত কেউ নিমন্ত্রণ রাখতে এল না। রাগ করলে না।

রামচন্দ্র

হা, হা, হা, হা !

রমাই

আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশুর ত সেবার তাঁর কন্যার বিধির সিঁদুরের উপর হাত বুলাবার চেষ্টায় ছিলেন—যারে তাঁকে—

(রামমোহন দ্রুত আসিয়া)

রামমোহন

চুপ ! আর একটি কথা যদি কও তা'হলে—

রমাই

বুঝেছি বাবা, আর বলতে হবে না।

রামমোহন

মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ। আজকের দিনে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু মহারাজের ঐ হাসি সহ্য করতে পারচি নে।

রামচন্দ্র

কের বেয়াদবি করচিস।

রামমোহন

আমার বেয়াদবি ! বেয়াদবি কে করলে বুঝলে না !

কর্ণাভিজ

মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একটু এ দিকে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

রামচন্দ্র

ওরা সব গান বন্ধ করে হাঁ করে বসে রইল কেন ? ওদের একটু গাইতে বল না ! আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়চে। গান ধরো !

গান

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেচে
উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার
গন্ধ সুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে
ডাক পড়েচে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পানে যায়
তারেই লাগে ভালো।
নীলগগনের ললাটখানি
চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন
মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশি, ছড়াও কি এ ?
ইন্দ্রপুরীর কোন রমণী
বাসর প্রদীপ জ্বালো ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথে

উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়

আজ রাস্তায় মিলন—আজ বড় আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই—আজ আর যুবরাজ নয়। আজ ত তুমি ভাই! আয় ভাই কোলাকুলি করে নিই। (কোলাকুলি) দাদা, যেখানে দীন দরিদ্র সবাই এসে মেলে, সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই!

(গান)

সকল ভয়ের ভয় যে তারে
কোন্ বিপদে কাড়বে?
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়বে?
না হয় গেল সবই ভেসে—
রইবে ত সেই সর্ব্বনেশে!
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে লাভ কেবল বাড়বে!
সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থাকি
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি
কেই বা সে সুখ নাড়বে?
যে পড়েছে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে,
ভয় মিটেছে বেঁচেছে সে
তারে কে আর পাড়বে?

উদয়াদিত্য

বৈরাগী ঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গ ধরলুম, আর ছাড়-ছিনে কিন্তু!

ধনঞ্জয়

তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই ভাই। মনে বেশ আনন্দ আছে ত? খুঁৎখুৎ কিছু নেই ত?

উদয়াদিত্য

কিছু না—বেশ আছি!

ধনঞ্জয়

তবে দাও একটু পায়ের ধুলো।

উদয়াদিত্য

ও কি কর! ও কি কর! অপরাধ হবে যে!

ধনঞ্জয়

দাদা, এত বড় বোঝা নিজের হাতে ভগবান্ যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন, সে যে মহাপুরুষ! তোমাকে দেখে আমার সর্ব্ব গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একবার দিদিকে আন—তাকে একবার দেখি!

উদয়াদিত্য

সে তোমাকে দেখবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে আছে—তাকে ডেকে আন্‌চি!

(বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম)

ধনঞ্জয়

ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই! এই দেখ্‌না আমাকে দেখ্‌না—আমি তাঁর রাস্তার ছেলে—রাস্তার কোলে কোলেই দিন কেটে গেল—দিন রাত্রি একেবারে ধূলোয় ধূলোময় হয়ে বেড়াই—মায়ের আদরে লাল হয়ে উঠি। আমার মায়ের ওই ধূলোঘরে আজ তোমার নতুন নিমন্ত্রণ—কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা

বৈরাগী ঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি আমা-দের সঙ্গে যাবে?

ধনঞ্জয়

কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ঐ রাস্তাই ত আমাকে মজিয়েছে! এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।

গান

(সারিগানের সুর)

গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে!
(ওরে) কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধূলায় রে!

(ও যে) আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
(ও যে) কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে !
(ও) কোন্ বাঁকে কি ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কি দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে !

উদয়াদিত্য

ঠাকুর, তুমি কি ভাবচ, বিভা আমার পথের সঙ্গিনী ? ওকে আমি ওর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

ধনঞ্জয়

বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই ভাল। দেখি তিনি কোন্‌খানে পৌঁছিয়ে দেন্—আমিও সঙ্গে আছি।—কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই।

[প্রস্থান।

বিভা

দাদা ঐ যে মোহন আসচে। ওর সঙ্গে আমি একটু আলাদা কথা কইতে চাই।

উদয়াদিত্য

আচ্ছা, আমি একটু সরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

(রামমোহনের প্রবেশ)

বিভা

মোহন !

রামমোহন

মা, আজ তুমি এলে ?

বিভা

হাঁ মোহন, তুই কি আমায় নিতে এলি ?

রামমোহন

না, মা, অত ব্যস্ত হয়ো না, আজ যাও।

বিভা

কেন মোহন, আজ কেম নয় ?

রামমোহন

আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়।

বিভা

ভাল দিন নয় ? তবে আজ এত উৎসবের আয়োজন কেন ? বরাবর দেখলুম রাস্তায় আলোর মালা—বাঁশি বাজ্‌চে। আজ বুঝি শুভ লগ্ন পড়েছে !

মোহন

শুভ লগ্ন ! মিথ্যা কথা। সমস্ত ভুল।

বিভা

মোহন, তোর কথা আমি বুঝতে পারচিনে, কি হয়েছে আমাকে সত্যি করে বল। মহারাজ কি রাগ করেচেন ?

মোহন

রাগ করেচেন বৈ কি।

বিভা

তিনি ত আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন !

মোহন

দেরি হয়ে গেছে, মা, দেরি হয়ে গেছে ! অনেক দেরি হয়ে গেছে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা

কে বলে ফেরে না ? আমি তপস্যা করে ফেরাব—আমি জীবন মন দিয়ে ফেরাব। মোহন, এখনি তুই আমাকে নিয়ে যা ! দেরি যদি হয়ে থাকে, আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করব না !

মোহন

যুবরাজ কোথায় গেছেন ?

বিভা

তিনি এখনি আসবেন।

মোহন

তিনি ফিরে আসুন না !

বিভা

না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েছেন আমি এসেছি ? দাদা বল্লেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেছেন। ময়ূরপংখী সাজানো হচ্ছে !

মোহন

হাঁ সাজানো হচ্ছে বটে—

বিভা

এখনো কি সাজানো শেষ হয় নি ?

মোহন

ঐ ময়ূরপংখীর সাজসজ্জার আগুন লাগুক্, আগুন লাগুক্ !

বিভা

মোহন, তোর মুখে এ কি কথা! তুই যখন আন্‌তে গেলি আস্‌তে পারিনি বলে এত রাগ করেছিস্? তুইও আমার দুঃখ বুঝতে পারিস্‌নি মোহন?

(মোহন নিরুত্তর)

বিভা

এই দেখ্ তোর দেওয়া সেই শাঁখা জোড়া পরে এসেছি —আজকের দিনে তুই আমার উপর রাগ করিস্ নে।

মোহন

আমাকে আর দগ্ধ কোরো না! মিথ্যে দিয়ে তোমার কাছে আর কথা চাপা দিতে পারলুম না! মা জননি, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি, কিন্তু এ রাজ্যে তোমার আজ আর স্থান নেই! চল মা, তুমি ফিরে চল—তোমার এই পাষণ্ডের দাস, এই অধম সন্তান তোমার সঙ্গে যাবে!

বিভা

মোহন, যা তোর বলবার আছে সব তুই বল্! আমি যে কত দুঃখ সইতে পারি, তা কি তুই জানিস্‌নে?

মোহন

সন্তান যখন ডাক্‌তে গেল তখন কেন এলিনে—তখন কেন এলিনে—আমার পোড়া কপাল, তোকে কেন আন্‌তে পারলুম না!

বিভা

ওরে মোহন, জগতে এমন কোনো সুখ নেই যার লোভে আমি সে দিন দাদাকে ফেলে আস্‌তে পারতুম—এতে আমার কপালে যা থাকে তাই হবে!

মোহন

তবে শোন্ মা, সেই ময়ূরপংখী তোর জন্যে নয়!

বিভা

নাই হল মোহন, দুঃখ কিসের! আমি হেঁটে চলে যাব!

মোহন

যাবি কোথায়? সেখানে যে আজ আর এক রাণী আস্‌চে!

বিভা

আর এক রাণী!

মোহন

হাঁ আর এক রাণী! আজ মহারাজের বিবাহ!

বিভা

ওঃ—আজ বিবাহের লগ্ন!

মোহন

এক বিবাহের লগ্নে মহারাজ তোমাদের ঘরে গিয়েছিলেন—আজ কোন্ বিবাহের লগ্নে তুমি তাঁর ঘরের সাম্‌নে এসে পৌঁছলে! আর, আমার এমন কপাল, আজ আমি বেঁচে আছি! চল্ মা, ফিরে চল, আর এক দণ্ড নয়—ঐ বাঁশি আমার কানে বিষ ঢাল্‌চে! ওরে, আর একদিন কি বাঁশি শুনেছিলুম, সেই কথা মনে পড়্‌চে! চল্ চল্ ফিরে চল্! অমন চুপ করে বসে রইলে কেন মা? কেমন করে যে কাঁদতে হয় তাও কি একেবারে ভুলে গেছ?

বিভা

মোহন, আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবে।

মোহন

কি কথা?

বিভা

আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। যদি না যাস্ আমি একলা যাব।

মোহন

সে আজ ময়ূরপংখীতে চড়বে, আর তুমি আজ হেঁটে যাবে?

বিভা

হেঁটে যাওয়াই আমাকে সাজে—আমি হেঁটেই যাব। তুই সঙ্গে যাবিনে?

মোহন

আমি সঙ্গে যাব না, ত কে যাবে? কিন্তু মা, সে সভায় আজ তুমি কিসের জন্যে যাবে?

বিভা

তা বটে, কেন যাব? মোহন, আমাকে দুঃখ সইতে হবে সে কথাটা হঠাৎ আমি ভুলে গিয়েছিলুম—ভেবেছিলুম, যা ভোগ হবার তা বুঝি হয়ে চুকে গেছে!

মোহন

কেন মা, তুমি সতী লক্ষ্মী, তুমি দুঃখ কেন পাও।

বিভা

মোহন, সেদিন অপরাধ যে সত্যি হয়েছিল। সে অপরাধের শাস্তি না হয়ে ত মিটবে না, সে শাস্তি আমিই নিলুম—প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়েই হবে।

মোহন

মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ—আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে। কিন্তু আমি বল্‌চি মা, সকলের চেয়ে বড় দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ যারের কাছ থেকেও তোমাকে হারাল!

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়

ওরে বিভা!

বিভা

দাদা সব জানি। কিছু ভেবো না!

উদয়

এখন কি করবি বোন?

বিভা

ভেবেছিলুম রাজবাড়িতে একবার যাব, কিন্তু যাব না।

মোহন

না, যেয়ো না, যেয়ো না! গেলে তোমার অপমান হত—সেই অপমানে তোমার স্বামীর পাপ আরো বাড়ত।

বিভা

আমার মান অপমান সব চুকে গেছে। কিন্তু দাদার অপমান হত যে। দাদা, এবার নৌকা ফেরাও।

উদয়াদিত্য

তুই কোথায় যাবি বিভা!

বিভা

তোমার সঙ্গে কাশী যাব। আমি আজ মুক্তি পেয়েছি! এখন তোমার চরণসেবা করে আমার জীবন আনন্দে কাটবে। মোহন, তুই তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা!

মোহন

ঐ দেখ মা, কেরবার পথে আগুন লেগেছে, ঐ যে মধুরপঞ্জী চলেছে। ও পথ আমার পথ নয়।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

বিভা

বৈরাগী ঠাকুর!

ধনঞ্জয়

কেন দিদি?

বিভা

আমাকে তোমাদের সঙ্গ দিয়ো ঠাকুর!

উদয়াদিত্য

ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হল!

ধনঞ্জয়

সেত বেশ কথা! দয়াময় হরি! কি আনন্দ—তোমার এ কি আনন্দ! ছাড় না, কিছুতেই ছাড় না! শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মত বসে আছে! দিদি, এই মাঝ রাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে। একেবারে জোর তলব! চল্ চল্! চল্ চল্। পা ফেলে চল্! খুসি হয়ে চল! হাস্‌তে হাস্‌তে চল। রাস্তা এমন ক'রে পরিষ্কার করে দিয়েছে—আর ভয় কিসের।

(গীত)

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে—
এখন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে।
ছড়িয়ে গেছে সূতো ছিঁড়ে
তাই খুটে আজ নরব কি রে!
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর ঘিরব না রে!
ঘাটের রসি গেছে কেটে
কাঁদুব কি তাই বক্ষ ফেটে?
এখন পালের রসি ধরব কসি
এ রসি ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব নারে।

"—অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে"

—এক—

দুপুরবেলা আহারান্তে বাহিরের দালানে একখানি ডেক্-চেয়ারে বসিয়া প্রভাত অন্যমনস্ক ভাবে কত কি ভাবিতেছিল।

প্রায় একমাস সে ওয়াল্‌টেয়ারে তার বন্ধু সুধীরদের বাড়ী আসিয়াছে। সুধীরের স্ত্রী কমলা ও বৌদি সুহাসিনী দেবীর সহিত এই ক'দিনেই তার নিজের বৌদিদিদের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালবাসা পুঞ্জীভূত হইয়াছে,—সুধীরের জ্যেঠামশাই শরৎ বাবু তো তাকে নিজের সন্তানের ন্যায়ই স্নেহ করেন! বিচিত্র লাগে তার শুধু—সুধীরের ছোট বোন সুধাকে। সুধাকে সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

এই সুন্দরী তন্বী তরুণী মেয়েটির পরিশ্রমের ক্ষমতা অসাধারণ। সেবা-নৈপুণ্যও অদ্ভুত। বৃদ্ধ জ্যেঠামশাইকে সে যেন কোলের শিশুর মত সদা সর্ব্বদা শুশ্রূষা ও যত্ন দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে! দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তার জ্যেঠাম'শায়ের নিকটেই কাটে,—কিন্তু তবুও বাড়ীর এমন একটিও লোক নাই, যে সুধার হস্তের গভীর যত্ন ও সুমিষ্ট সেবা না পাইতেছে!

প্রভাতকেও সুধা খুবই যত্ন করে,—হাস্যে-পরিহাসে গল্পে-গানে মূর্ত্তিমতী সেবা ও আনন্দস্বরূপিণী হইয়া বাড়ীর প্রত্যেক জনের মনের গভীর অন্তস্তলটুকু পর্য্যন্ত সে অধিকার করিয়াছে।

প্রভাত আজ একান্তে বসিয়া সুধারই কথা ভাবিতেছিল। খানিকটা নীলরঙের পশম হাতে ঘুরাইয়া গোলা পাকাইতে পাকাইতে সুধা দালানে বাহির হইয়া আসিয়া, প্রভাতের পানে তাকাইয়া হাসিমুখে বলিল—"প্রভাত বাবু! আকাশের পানে চেয়ে কি ভাবছেন? বাড়ীর লোকদের জন্য মন কেমন ক'রছে বুঝি? কিন্তু আমরা তো আপনাকে এখন ছাড়বো না!—আপনার কাছে আমাদের একটা আর্জ্জি আছে যে—"

প্রভাত চেয়ারে ভাল করিয়া উঠিয়া বসিয়া সহাস্যে বলিল—"আর্জ্জি কেন, আদেশ বলুন!"

সুধা হাসিয়া বলিল—"না' আপনার অভিরুচি! কিন্তু আমাদের কথা রাখবেন কি না আগে বলুন?"

"অবশ্যই রাখবো।"

"বৌদিরা সীমাচলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। আপনি নিয়ে যেতে পারবেন কি?"

"হাঁ। এ ত অতি উত্তম প্রস্তাব।"

"প্রস্তাব ত উত্তম, কিন্তু ছোড়দা বলছে, দু'সপ্তাহ পরে যেতে। কিন্তু বৌদি, ছোট বৌদি দু'জনেই আজ কালের মধ্যে যেতে চায়।"

"জ্যেঠামশাই কি বলেন?"

"তাঁকে রাজী করার ভার আমার।"

"সুধীর কোথায়?"

"ঐ ত মজা! বৌদিরা ছোড়দার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আপনাকে মুরুব্বি ধরেছেন! আমাকে দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে পাঠালেন। আচ্ছা বসুন, বৌদিদের ডেকে আনি।"

সুধা স্মিতমুখে হাতের অবশিষ্ট পশমটুকু দ্রুত হাত ঘুরাইয়া জড়াইতে জড়াইতে চলিয়া গেল।

প্রভাত মুগ্ধনেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল—সুধা এখানকার সকল আমোদ-প্রমোদ আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে আছে তাই যেন এই পরিবারের আনন্দ এত মধুর! কিন্তু এই হাসিখুসী গান-গল্পের মধ্য দিয়া সুধাকে এত নিকটে পাওয়া গেলেও প্রভাতের কাছে সে যেন অনেকখানি সুদূর।

অল্পক্ষণ পরেই কমলা ও সুহাসিনীকে লইয়া সুধা ফিরিয়া আসিল। প্রভাত বলিল—"বৌদি! সত্যই সীমাচলে যাওয়া হবে না কি?"

বৌদি বলিলেন—"সে আপনাদের অনুগ্রহ!"

কমলা বলিয়া উঠিল—"বহুবচনে নয় দিদি, এক বচনে বলো। ওঁকে ত আমরা ঝগড়া ক'রে বারই দিয়েছি,—প্রভাত বাবুই এখন আমাদের সীমাচলে নিয়ে যাওয়ার মুরুব্বি।"

প্রভাত হাসিয়া বলিল—"কিন্তু আমার বন্ধু-ব্যতীত আমি যে অচল!"

বৌদি বলিলেন—"শেষ রাত্রে বন্ধির বন্দোবস্ত করতে হবে, তা হ'লে ভোর বেলাই সীমাচলের নীচে পৌঁছানো যাবে। উপরে উঠে পুজো-টুজো দিয়ে—দেখে-শুনে সেই দিনই সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরবো।"

—"তা বন্দোবস্ত ত বেশ করেছেন, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?"

সুধা বলিল—"ইকমিক্ আর টোস্ত নেবো না কি, বৌদি?"

বৌদি বলিলেন—"না, সেখানে বেশ ভাল খিচুড়ি ভোগ কিনতে পাওয়া যায়। চায়ের সরঞ্জাম টোস্ত আর খান দুই পাউরুটি নিলেই চের হবে।"

রাত্রি প্রায় তিনটা হইতে সকলে জাগিয়া বাহিরের দালানে প্রস্তুত হইয়া বন্ধির অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সুধীর ও প্রভাত দুইখানা ক্যাম্বিসের চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বসিয়া ছিল। কমলা ও বৌদি একখানি বড় চৌকীর উপরে বসিয়া আছে। সুধা সিঁড়ির চাতালের পাশে উঁচু বেদীর নিকট পা ঝুলাইয়া বসিয়া চন্দ্রালোকসিক্ত শুভ্র চতুর্দ্দশীর জোয়ার-উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের পানে তাকাইয়া ছিল।

প্রভাত, সুধীর, বৌদি ও কমলা চার জনের মৃদু গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ঘরের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে জোঠা মহাশয়ের কাসির শব্দ আসিতেছে। উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে সমাগরা নৈশ প্রকৃতির কালো নারিকেল কুঞ্জগুলি স্বপ্নময় হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রের গর্জ্জন স্বরপার প্রপাতধ্বনির মত, দূরাগত সঙ্গীত-সুরের মত, গভীর মধুর মন্দ্রে নিশীথাকাশ ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

কমলা অধীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"এখনও চারটে বাজল না? নিশ্চয়ই ঘড়ি খারাপ। জোৎস্নাতে ভোরের আলো বোঝা যাচ্ছে না, বোধ হয়।"

সুধীর গম্ভীর ভাবে বলিল—"ঘড়িটাতে কাঁটা ঘুরিয়ে এখুনি সকাল ক'রে দিতে পারি,—কিন্তু চাঁদটাকে ধাক্কা দিয়ে আকাশ থেকে সরিয়ে দিই কি ক'রে?"

সুহাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু এই হতভাগা চাঁদই আবার এক এক দিন চ'খের নিমিষে কোথা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে এক নিমেষে ভোর এনে দেয়,—সেও কমলই সব চেয়ে ভাল জানে।"

সুধীর বলিল—"ঠিক বলেছো, বৌদি! চাঁদের 'ডিউটি' ফাঁকি দেওয়া সম্বন্ধে কমলকে অভিযোগ করতে আমিও শুনেছি ব'লে মনে পড়ছে!"

কমলা রাগিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সুধীর, কমলা ও সুহাসিনীর মধ্যে একটা কপট কলহ বেশ জমিয়া উঠিল। প্রভাত অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় ইহাদের মধুর কলহ উপভোগ করিতে করিতে তন্দ্রাবেশে চক্ষু মুদিত করিতেছিল।

কমলা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে সুধীরও কুপিতা কমলার অনুসরণ করিল। বৌদি ঢুলিতে ঢুলিতে চৌকির একপাশে বাহুতে মাথা রাখিয়া গাঢ় নিদ্রামগ্না হইলেন।

মশকধ্বংশনে নিবিড় তন্দ্রাটুকু হঠাৎ ছুটিয়া যাওয়ায় প্রভাত সচকিতে চক্ষু মেলিতেই চ'খে পড়িল,—অদূরে সিঁড়ির বেদীতে উপবিষ্টা সুধার দুইটি নির্নিমেষ তৃষিত আঁখি। শুকতারার মত উজ্জ্বল, সাগরেরই মত অতল গভীর দৃষ্টিটুকু প্রভাতের নিদ্রিত মুখের উপর ঘন-নিবদ্ধ হইয়া ছিল। প্রভাত সচকিতে উঠিয়া বসিতেই সুধা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল। প্রভাত কিন্তু নিস্তব্ধ চঞ্চল-নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

এ ব্যাপার আজ নূতন নয়। সে আরও অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে, সুধা তাহাকে দেখিতে ভালবাসে। সুধা গল্প করিতে করিতে প্রভাতের মুখের পানে তাকাইয়া হঠাৎ কথার খেই হারাইয়া ফেলিয়া অতিরিক্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে! কিন্তু আজ রাত্রির এই চুরি করিয়া দেখা প্রভাতকে যেন হঠাৎ বিহ্বল করিয়া ফেলিল।

সুধা কিন্তু ব্যাপারটিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে সহজ করিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—"প্রভাতবাবু! আপনারা সকলেই বেশ

একটু ক'রে ঘুমিয়ে নিলেন দেখলুম ; আমিই কেবল একা জেগে রয়েছি—"

শান্তপ্রকৃতি প্রভাত কোনও দিন সুধাকে বড় একটা পরিহাস করিত না,—কমলা ও সুহাসিনীকে লইয়া ভ্রাতৃ-জায়া সম্পর্কে তাহার যৎসামান্য রঙ্গ-পরিহাস চলিত। আজ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"ঘুমহারা সুধাংশুর সাথী হ'য়ে জেগে থাকা সুধা দেবীরই কায ; আমাদের নয়।"—কথাটা বলিয়া ফেলিয়া পরমুহূর্ত্তে প্রভাত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল।

সুধা আরক্তিম হইয়া উঠিয়া—তখনই কিন্তু সহজ ভাবে হাসিয়া বলিল—"তা হ'লে সকাল হ'লেই আমাদের লুকিয়ে পড়া উচিত। যেহেতু প্রভাতের সঙ্গী প্রভাত বাবুরই হওয়া সমীচীন।"

সুধা এত সহজ পরিহাসের সুরে কথাগুলি বলিল যে—প্রভাত সঙ্কোচ হইতে অনেকটা যেন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল। হাসিয়া উত্তর দিল—"হার মানলুম!"

দুইখানি বড়ি গাড়ী আসিয়া গেটের বাহিরে দাঁড়াইল। সুধীর ও কমলা বাহির হইয়া আসিল। শরৎ বাবু বাহিরের দিকের জানালা খুলিয়া বিছানার উপর হইতে চাদর মুড়ি দিয়া উঁকি মারিয়া বলিতে লাগিলেন—"সন্ধ্যার মধ্যে ফিরো—বেশী রাত কোরো না যেন—সুধা, তুই পায়ে একখানা র‍্যাপার নিলি নে কেন মা? শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা—প্রভাত, ছাতা নিয়েছো তো?—" ইত্যাদি। জ্যেঠামহাশয়ের প্রত্যেক কথার উত্তরে সংক্ষিপ্ত "আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিয়া সকলে গাড়ীতে উঠিল।

সুধা জ্যাঠামহাশয়ের ঘরে বিছানার পাশে গিয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"আপনাকে রেখে গিয়ে একটুও স্বস্তি পাবো না, জ্যেঠামশাই!—এত ক'রে বল্‌লুম 'আমি থাকি'—আপনারা কেউই তা' শুন্‌লেন না!"

"—না রে না পাগলি! তা কি হয়? তুই থাকলে বৌমারা যাবে কেন? আমি বেশ থাকবো, তুই তো আমায় সবই গুছিয়ে রেখে গেলি রে!—ঠাকুর রইল, ঝাই রইল, বিওরা রইল, আমার কিছু কষ্ট হবে না।"

—দুই—

নিশা-শেষের বিবর্ণ জ্যোৎস্নাধারায় পর্ব্বতশ্রেণী এবং বনানী-প্রদেশ যেন কোন রূপকথার রূপার কাঠি ছোঁয়ানো ঘুমন্ত পরীরাজ্যের ন্যায় দেখাইতেছিল। নিষ্প্রভ আকাশে এক একটা মরণোন্মুখী তারা দপ্ দপ্ করিয়া তখনও শেষ দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়া লইতেছিল।

সহরের রাস্তা ছাড়াইয়া সুধাদের বড়ি দুইখানি গ্রামের পথে আসিয়া পড়িয়াছে। পথের ডান পাশে কালো রংয়ের পাহাড়! ঘন বন্যবৃক্ষ ও পার্ব্বত্য লতা-গুল্মে পর্ব্বত-গাত্র সমাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। শুক্লা নিশি-শেষে নিদ্রিতা পার্ব্বত্য প্রকৃতির মৌন, শান্ত শোভায় সকলেরই চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সুধা ও কমলা পথিপার্শ্বের অচেনা পার্ব্বত্য ফুলের গাছ হইতে ফুল সংগ্রহের ছলে বড়ি হইতে নামিয়া আনন্দ কলহাস্যে হাঁটিতে হাঁটিতে চলিল।

সুধীর অল্প গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া ধমক দিয়া বলিল—"এই সুধা! ফুল তুলতে বাস্ নি! সাপ-টাপ আছে হয় তো! গাড়ীতে ওঠ তোরা—"

কমলা দুষ্ট শিশুর মত চপল হাসিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল—"আমরা গাড়ীতে উঠবো না—হাঁটবো।"

সুধা হাসিতে হাসিতে বলিল—"বোহাই ছোড়দা! ভগবানের দেওয়া পা নামক অঙ্গটির চলৎশক্তিরূপ গুণ আছে, সেটা একদিনের জন্যও আমাদের ভাল ক'রে জানতে দাও, ভাই! সাপকে ভয় ক'রে কি ওই গাড়ীর গহ্বরে বন্দী হয়ে যেতে হবে?"

সুহাসিনী এ গাড়ী হইতে বলিলেন—"হাঁটার মজা বেরুবে! হাজার বার্ নিঁড়ি উঠতে-নামতে হবে—মনে থাকে যেন! গাড়ীর ভিতরে উঠে আয় বল্‌ছি—"

সুধা অকারণ হাস্যে কুটি-কুটি হইয়া বালিকার ন্যায় কৌতুকতরলকণ্ঠে কহিল—"ছোট বৌদি! তুমি গাড়ীতে ওঠো—জল্‌দি—" তাহার পর গুজরাটী গরবা'র সুরে সুমিষ্ট কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইল—

—"পারব না একলাটি আজ ঘরে পারব না রইতে!"
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দু'টো কথা কইতে!
নিরালার কোল ভরা ফুল জাগে আলো-করা
যেচে কার খুনসুড়ি সইতে!
অথই পাথার পারা জোছনায় মাতোয়ার
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে!" *

* কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত গুজরাটী গরবা সুরের গান।

প্রভাত গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিল—"ছোট বৌদি! রাস্তা এখনও অনেক বাকী। এখন থেকেই যদি আপনারা হাঁটতে সুরু করেন, তা হ'লে সীমাচলের নীচে থেকেই ফিরে আসতে হবে। উঠতে আর পারবেন না।"

সুধা প্রভাতের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল—"আপনারা নিজেরা পুরুষমানুষ হ'য়ে গাড়ী চ'ড়ে যাচ্ছেন, আর আমরা মেয়েমানুষ হাঁটছি, তাই লজ্জা করছে বুঝি?"

প্রভাত এবার গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সুধীরও নামিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া সুধা কমলার হাত ধরিয়া নিজেদের বস্তিতে উঠিয়া পড়িল এবং খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"আপনারা যা করবেন, আমরা ঠিক তার উল্টো করবো। প্রভাত বাবু! আপনারা দু'জনে হাঁটুন এইবার!"

সুধীর অবতরণোদ্যত পা গাড়ীর মধ্যে টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"প্রভাত! উঠে আয়, শয়তান দু'টোর সঙ্গে পেরে উঠবি নে।"

সুধা বস্তি'র মধ্যে বসিয়া বলদের গলার ঘণ্টার টুং-টাং আওয়াজের মধ্যে আবার মিষ্ট কণ্ঠে গহনা গাহিতে সুরু করিল—

"চল্ রে লখিয়ার হিল্লোলে সাগরেরি ছন্দ!
কোন্ বনে চন্দন - কোন্ বনে গন্ধ!—"

প্রাচীপট আরক্তিম হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গমের মধুর কলকূজনে পার্ব্বত্য-প্রকৃতি মুখরিত হইয়া উঠিল। বস্তি দুইখানি যে পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে পথটি পাহাড় ঘুরিয়া অপর পার্শ্বে চলিয়া গিয়াছে। পাহাড় ঘুরিয়া গাড়ী দুইখানি সীমাচল গ্রামে উপস্থিত হইল। গ্রামখানি অতি সুন্দর—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছবির মত। দুইটি একটি করিয়া লোক জাগিতে সুরু হইয়াছে। গাড়ী গিয়া একবারে সীমাচল পাহাড়ের পাদদেশে থামিল।

একটি তেলেগু তরুণের শিরে জিনিষপত্রগুলি তুলিয়া দিয়া প্রভাতরা সিঁড়িতে উঠিতে সুরু করিয়া দিল। এই সোপান বাহিয়া সীমাচলের উপরে উঠিবার সময়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। প্রভাত "ক্যামেরা" লইয়াছিল,—মধ্যে মধ্যে সোপানের উপরে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক দৃশ্যের "ফটো" তুলিয়া লইতে লাগিল।

সুধা ও কমলা সিঁড়ির দুই পাশে জঙ্গলে হাত বাড়াইয়া ফুল তুলিতেছিল,—গান গাহিয়া, ভিখারীদের পয়সা দিয়া পর্ব্বতগাত্রে প্রবাহিতা ক্ষীণস্রোতা নির্ঝরিণীর মধ্যে চিল নিক্ষেপ করিয়া, হাত পরিহাসে কৌতুকে মুখরা ছোট বালিকার মত মহা উৎসাহে অবলীলাক্রমে দ্রুত উঠিতে লাগিল।

সুধীর তরুণী পত্নী ও ভগিনীর সহিত সিঁড়ি ওঠার পাল্লা দিল। তিন জনের কলহাস্যে ও কৌতুকালাপে নির্জ্জন অরণ্য-প্রকৃতি মুখর হইয়া উঠিল। বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রিগণ পাহাড়ে উঠিতেছিল। সকলেই কৌতূহলোজ্জ্বল নেত্রে এই তরুণ-সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অপেক্ষাকৃতা স্থূলকায়া বৌদিদি ধীরে ধীরে সিঁড়ি উঠিতে-ছিলেন। প্রভাত বৌদিদির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে উঠিতেছিল।

সুধা উপর হইতে পিছন ফিরিয়া নীচের দিকে তাকাইয়া বলিল—"ওমা, বৌদি আর প্রভাত বাবু যে একেবারে নীচে পেছিয়ে পড়েছেন! ছোট বৌদি! এসো এইখানে আমরা একটু ওঁদের জন্য দাঁড়াই!"

সিঁড়ির উপরে মাঝে মাঝে পাথরের দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে। একটা অর্দ্ধভগ্ন সিন্দূরপ্রলিপ্ত দেবমূর্ত্তির পাশে পাথরের উপর বসিয়া পড়িয়া সুধীর বলিল—"সুধা, এইবার এইখানে একটু চা তৈরী কর, দিদি।"

কমলা বলিল—"এখানে দেবমূর্ত্তির কাছে চা' খাওয়া হবে না, আরও একটু উঁচুতে চলো—"

আরও ধাপ কতক সিঁড়ি উঠিয়া সিঁড়ির একপাশে গাছের ছায়ায় বসিয়া সুধা তেলেগু বাহকের মাথা হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। বৌদি তখনও অনেক দূরে। তিনি বিশ-ত্রিশ ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া খানিকটা করিয়া বসিয়া জিরাইয়া লইতে ছিলেন। প্রভাত বাবুও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ধীরপদে উঠিতে-ছিলেন। কমলা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"সুধা! দিদির সঙ্গে প্রভাত বাবুর শুভ দুরবস্থা দেখ—"

সুধীর উপর হইতে হাঁকিল—"কি বৌদি, কপিকল নামিয়ে টেনে তুলব না কি?"

প্রভাত ও বৌদি আসিয়া পৌঁছিলে সুধা বলিল—"বৌদি তুমি একটু চা খাও, ভাই! নইলে তুমি মারা যাবে, এর মধ্যেই তোমার মুখ চোখ যেন কেমন হ'য়ে গেছে—"

"না রে, না। তোরা সব ছেলেমানুষ, তোরা খা'। আমি নৃসিংহদেবকে দর্শন ক'রে পূজো দিয়ে তারপরে জল খাব।"

সুধীর বলিল, "বৌদি, তোমার হ'য়ে আমি না হয় উপোস ক'রছি! চা' না খাও, কিছু জল-টলও খাও, নইলে উঠতে পারবে না।"

"আচ্ছা গো মশাই, উঠতে পারবো কি না, তোমায় তত ভাবতে হবে না!"

সুধা নিপুণ হস্তে কেটলীতে সুগন্ধি চা' প্রস্তুত করিয়া পেয়ালা পিরিচগুলি ধুইয়া ফরসা 'তোয়ালে' দিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া মুছিয়া—পেয়ালায় চা ঢালিয়া দুধ-চিনি মিশ্রিত করিয়া সুধীর, প্রভাত ও কমলার হাতে তুলিয়া দিল। তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে পাউরুটী কাটিয়া 'স্লাইস্'গুলি মাখন মাখাইয়া ষ্টোভে টোষ্ট করিয়া গরম গরম প্রত্যেকের প্লেটে দিল।

প্রভাত একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আপনিও এক কাপ চা' নিলেন না কেন? জুড়িয়ে যাবে।"

সুধীর বলিল—"ও চা' খায় না।"

সুন্দর বাসন্তী রংয়ের জেলি চামচে করিয়া ডিসের উপর দিয়া সুধা সন্দেশপূর্ণ অ্যালুমিনিয়মের কৌটা খুলিতে খুলিতে বলিল—"প্রভাত বাবু! জেলিটা কিসের তৈরী বলতে পারেন?"

প্রভাত রুটীতে কামড় দিয়া বলিল—"ফলের।"

"জেলি ফল ভিন্ন অন্য কিছুর হয় না, কিন্তু কি ফল বলুন?"

"তা' ঠিক বলতে পারছি নে! ঘরে তৈরী না কি? চমৎকার টেষ্ট কিন্তু!"

"উহুঁ, কেনা।"

"বেশ সুন্দর তো! আগে এমন খাইনি। রংটিও বেশ।"

কমলা হাসিয়া বলিল—"সুধা তৈরী করেছে। আনারসের জেলি, তাই রং অমন সুন্দর হয়েছে।"

প্রভাত এ কথা শুনিয়া যেন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল,—"বলেন কি? উনি হাতে তৈরী করেছেন? তারি চমৎকার হয়েছে তো!"

সুধা অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল। প্রভাতের বিস্মিত প্রশংসা ঢাকা দিবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"ছোড়দা, আর দু' স্লাইস্ রুটী নেবে? সন্দেশ আর চাই?"

সুধীর বলিল—"আমরা যথেষ্ট খেয়েছি, এইবার তুই নিজে কিছু খা দেখি!"

—"খাব এখন। এখন কিদে পায় নি!"

কমলা মাছোড়বান্দা হইয়া ধরিল। সুধা কমলার পীড়াপীড়িতে একটা সন্দেশ খাইয়া জল খাইল।

আবার সিঁড়ি ওঠা সুরু হইল। উপরে উঠিতে 'হনুমান-তোরণে'র পার্শ্ব দিয়া, 'আকাশগঙ্গা'র প্রপাত বিপুল বেগে পাথরের উপরে আছড়াইয়া পড়িতেছিল ও সেই জল সোপানশ্রেণী প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। এখানকার পিচ্ছিল সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিতে করিতে সাবধানতা সত্ত্বেও কমলা সজোরে আছাড় খাইল।

হাসির অট্টরোলের মধ্যে সকলে উপরে পৌঁছিল। ছত্রের মধ্যে একখানি ঘরে জিনিষপত্র রাখিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলে, সুধা স্নানের তেলের শিশি হইতে অল্প তেল লইয়া কমলার আঘাতপ্রাপ্ত পায়ে জোরে মালিশ করিয়া দিতে লাগিল। তাহার পর সকলে মিলিয়া মহানন্দে 'গঙ্গাধারা' নামক সুন্দর প্রপাতটিতে স্নানসমাপনান্তে সিংহাচলের নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ও পূজা দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচিত্র শিল্প-কারুপূর্ণ মন্দিরগুলি এবং অসংখ্য দেবদেবীর সঙ্গে রম্ভা, মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিগুলি পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া ফিরিলেন। ফিরিবার পথে পূজারী ব্রাহ্মণদিগকে উপযুক্ত অর্থ দক্ষিণা দিয়া নৃসিংহদেবের উৎকৃষ্ট খিচুড়ি ভোগ সংগ্রহ পূর্ব্বক ছত্রে আহারে বসিলেন।

সুধা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল,—"ইকনিকটা আনলেই বেশ হ'ত, ঐ খিচুড়ী খেয়ে তোমাদের অসুখ-বিসুখ না করলে বাঁচি!"

বৌদি স্নানান্তে দেবতাদের পূজা দিয়া এখন একবারেই ক্লান্তিতে অবসন্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি শ্রান্তকণ্ঠে বলিলেন—"সুধা, তুই এখন আর অত হাঙ্গামা তুলিস্ নে বোন্,—ওদের খেতে দে।"

বড় বড় পদ্মপাতায় করিয়া গরম গরম খিচুড়ী সুধা প্রত্যেককে বণ্টন করিয়া দিল। পাতিলেবু, লবণ, কাঁচা লঙ্কা, চাটনি ও আচার বাহির করিয়া প্রত্যেকের পাতে দিয়া ষ্টোভে পাপর এবং বড়ী ভাজিতে বসিল।

সুধীর সবিস্ময়ে বলিল—"এ কি ? তুই আচার, কাঁচা-লঙ্কা, বড়ী, পাঁপর পর্য্যন্ত সঙ্গে এনেছিলি না কি রে ?"

সুধা বলিল—"যখন শুনলুম, খিচুড়ী ভোগ কিনে খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন বুঝলাম, খিচুড়ীর আনুষঙ্গিক প্রধানি না নিলে কেউই তোমরা ভাল ক'রে খেতে পারবে না ! তাই সব জোগাড় করে বেতের বাক্সটার মধ্যে পুরে নিয়েছিলুম। বৌদি জানতে পারলে অযাত্রা বলে বড়ী আচার এ সব নিতে চাইতেন না !

প্রভাত পরম তৃপ্তির সহিত কুড় কুড় করিয়া পাঁপর ভাজা চিবাইতে চিবাইতে বলিল—"বড়ী পাঁপর ও আচারের মধ্যে যে কি অপূর্ব্ব সুস্বাদ আছে—তা' এই হিমাচলস্থ পাহাড়ের উপরে পত্রপাত্রায় খিচুড়িভোগের সঙ্গে না রকম ভাবে না খেলে বোধ হয় জীবনেও এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যেত না !"

সুধীর গম্ভীর মুখে বলিল—"যেস্থলে যে জিনিষ যত দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য, সেস্থলে সেই জিনিষটি অতি তুচ্ছ হ'লেও মহা মূল্যবান্ এবং লোভনীয় !"

সকলের আহারাদি শেষ হইলে সুধা খানিকটা শুখনো কাপড় গরম করিয়া বৌদির পায়ে ও কোমরে সেক দিয়া আবার সরিষার তেল ডলিতে বসিল। কমলা প্রথমটা অসম্মতা হইলেও শেষে সুধার জিদে পরাভূতা হইয়া চুপ করিলেন।

সুধা বলিল—"এখুনি আবার নীচে নামতে হবে তো ? আছাড় খাওয়া পা'দু'টোকে একটু তাজা করে না নিলে ওরা আজ আর তোমাকে নীচে পৌঁছে দিতে রাজী হবে না, মনে থাকে যেন।"

সুধীর একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপরে বসিয়া দেয়ালে পিঠ দিয়া আরাম করিয়া সিগারেট টানিতেছিল. বলিল—"সুধা, আমারও পায়ে একটু তেল দিয়ে দিবি তো ?"

"ইস্ ! ব'য়ে গেছে ! ছোট বৌদি দিক্ না—"

"আহা ! তোর ছোট বৌদিরই তো পায়ে তুই তেল দিচ্ছিস্ ! সে কি আর আমার পায়ে তেল মালিস্ করবে ? বরং আমাকেই হয় তো হুকুম করে বস্‌বে"—

কমলা তর্জ্জন করিয়া উঠিল—"মিছি মিছি আমার সঙ্গে লেগো না বলে দিচ্ছি।"

সুধা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ব্যাটা ছেলে—পায়ে দিবি তোর আছে—তোমাদের পায়ে অনর্থক তেল মালিস করতে ব'য়ে গেছে !.....নাও ওঠো, ভাল করে এবার মন্দির-টন্দির যা কিছু দেখবার আছে, দেখে শুনে—বেলাবেলি নামবার উদ্‌যোগ করো,—জোঠামশাই ব্যস্ত হবেন ! জোঠামশাইয়ের জন্ত এখানকার কোনও জিনিষ একটা কিনে নিয়ে যাব ভাবছি। কিছুই তো নেবার মত নেই ! অনেক সুগন্ধ চন্দন কাঠ বিক্রী হচ্ছে,—একখণ্ড চন্দনকাঠ নেব, জোঠামশাই গন্ধে খুসী হবেন।"

প্রভাত বিমুগ্ধভাবে লক্ষ্য করিতেছিল—সুধা শুধু সঙ্গীত-নিপুণা বা হাস্তরহস্তনিপুণা নহে, তার সেবানৈপুণ্য ও যত্ন করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। অন্তরটি গভীর মমতাশীল। একটিও ভিখারী কিম্বা প্রার্থী সুধার হাতের ক্ষুদ্র বেতনী থলির পরশ হইতে বঞ্চিত হইতেছিল না। সদাসর্ব্বদা হাস্ত-পরিহাসে ব্যাপৃতা থাকিলেও তাহার হাত দুইখানি সর্ব্বদাই প্রত্যেকের সেবাযত্ন ও প্রয়োজন পূর্ণ করিতে নিরত। মনটি সর্ব্বক্ষণ প্রত্যেকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছে।

নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তার লক্ষ্য খুবই কম। অথচ তাহাকে দেখিলে মোটে বুঝিবার উপায় নাই যে, মানুষটি নিজের প্রতি অত্যধিক উদাসীন ! কারণ, তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুবিন্যস্ত বেশবাস, সদাপ্রসন্ন মুখ ও প্রফুল্ল আচরণের মধ্যে—নিজের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য যেন একটুও ধরিতে পারা যায় না।

—তিন—

সীমাচলে বেড়াইতে যাওয়ার দুই সপ্তাহ পরের কথা।

প্রভাত আগামী কল্য ওয়ালটেয়ারে সুধীরদের আতিথ্য সমাপন করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিবে, সেই জন্ত আজ সকলে মিলিয়া ভাইজাগে 'ভালিগার্ডেন' বা উপত্যকা-উদ্যানে 'পিক্‌নিক্' বা বনভোজন করিতে আসিয়াছিল।

সকলে মিলিয়া মহানন্দে মাটী খুঁড়িয়া পাথর সাজাইয়া উনান প্রস্তুত করা হইল, শুষ্ক কাঠ ডালপালা আহরণ করিয়া রান্না করা হইল। আহারান্তে একটা ঝোপের আড়ালে সুধীর কমলা প্রভাত ও সুহাসিনী চার জনে তাস খেলিতে বসিল। সুধা তাস খেলা'র তত অনুরাগিণী নহে, সে

দূরবীণটা হাতে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে লাগিল।

'ভ্যালিগার্ডেনের' ভিতরে যত কিছু দেখিবার না থাকুক, বাহিরের চারিদিকের শোভা অতি রমণীয়। বাগানের ভিতরে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল-তরু ও অন্যান্য নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ। বাহিরে তিন দিকে সবুজ ও কালো পাহাড়, একদিকে 'ব্যাক্‌ওয়াটার্‌ বে'র কৃষ্ণাভ জলরাশি। একটি সুন্দর ঝরণা পাহাড় হইতে চপলনৃত্যে নামিয়া আসিয়া 'ব্যাক্‌ওয়াটার বে'তে মিশিয়াছে।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম পাহাড়ের উপরে উঠিয়া নোনা গাছের মত আকৃতি একটা অজানা-গাছের ছায়ায় বসিয়া সুধা দূরবীণ দিয়া 'রসহিল্‌' পাহাড়ের উপরের গির্জ্জাটি লক্ষ্য করিতেছিল; প্রভাত ঘাসের উঁচু ঢিপিটার নীচে আসিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া কহিল—"আপনি এখানে? ওঁরা সকলে আপনাকে খুঁজছেন যে!"

সুধা চোখ হইতে দূরবীণটা নামাইয়া হাসিমুখে বলিল—"উপরে উঠে আসুন না! এখান থেকে দূরের পাহাড়ের সিনারিগুলো আর 'ব্যাক্‌ওয়াটার্‌ বে'র জল চমৎকার দেখাচ্ছে!"

প্রভাত উপরে উঠিয়া আসিল। সুধা বলিল—"বসুন। দূরের পাহাড়গুলো সন্ধ্যার সিঁদুর-মাখা হ'য়ে রাঙ্গায় কালোয় কি চমৎকার দেখতে হয়েছে দেখুন!"

সুধা প্রভাতের হাতে দূরবীণটা তুলিয়া দিল।

প্রভাত গাছের ছায়ায় বসিয়া চোখে দূরবীণ দিয়া দূরের দৃশ্য লক্ষ্য করিতে লাগিল।

—"আচ্ছা প্রভাতবাবু! ঐ পাহাড়টার নাম 'ডল্‌ফিন্‌ নোজ' কেন হ'ল বলতে পারেন? ওটা কি 'ডল্‌ফিন্‌' মাছের নাকের মত দেখতে?"

প্রভাত চোখ হইতে দূরবীণ নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"দেখে তো তা' মনে হয় না। আমি 'ডল্‌ফিন্‌' মাছ দেখিনি!"

"আমিও দেখিনি কখনো।"

'ডল্‌ফিন্‌ নোজ' পাহাড়টি লইয়া সুধা ও প্রভাতের মধ্যে আলোচনা যখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ প্রভাত অস্ফুট আর্ত্তনাদে চমকাইয়া উঠিল।

সুধা সচকিতে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল?"

"পায়ে কি যেন কামড়াল!"

মুহূর্ত্তমধ্যে দেখা গেল, একটি উজ্জ্বল পীতাভ বর্ণের অর্দ্ধ-হস্ত পরিমিত সরু সাপ দ্রুতবেগে সবুজ ঘাসের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে! প্রভাতের হাত হইতে বিদ্যুদ্বেগে ছাতাটা টানিয়া লইয়া তাহারই বাঁটের দ্বারা সাপটার মাথায় উপর্য্যুপরি বারকতক আঘাত করিয়া সুধা তাহার জুতা শুদ্ধ ডান পা'টি সাপের মাথায় সজোরে চাপিয়া ধরিল। সাপটি একটুখানি ছটফট করিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িল।

পর মুহূর্ত্তেই সুধা রুমালের কোণে বাঁধা চাবি-রিংয়ে ঝোলানো ক্ষুদ্র ছুরীখানি খুলিয়া প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় কামড়েছে?"

প্রভাত তখন যাতনায় না উঁউক, ভয়ে অর্দ্ধচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। হাঁটু দিয়া বাম পায়ের গোড়ালীর খানিকটা উঁচুতে দেখাইয়া দিল। সুধা মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ছুরীখানি দিয়া দৃঢ়হস্তে সেখানটি গভীররূপে চিরিয়া দিল।

প্রভাত যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের উপরে এলাইয়া লুটাইয়া পড়িল। সুধা প্রভাতের দিকে না চাহিয়া, সেইখানেই হেঁটমুখে নতজানু হইয়া, ক্ষত-স্থান হইতে রক্ত চুষিয়া ফেলিতে সুরু করিয়া দিল।

প্রভাত অস্ফুটস্বরে বলিল—"সুধা, কি সর্ব্বনাশ করছো, —আমি তো যাবই—তুমিও কেন আমার সঙ্গে মারা যাবে?"

সুধা উত্তর দিল না, ক্রমাগত রক্ত চুষিয়া চুষিয়া কুলকুচা করিয়া ফেলিতে লাগিল। যখন চুষিয়া আর রক্ত পাওয়া গেল না, তখন সে ক্ষিপ্রহস্তে নিজের আসমানী রংয়ের আলপাকা শাড়ীর নিম্নাংশের পাড় সহ খানিক লম্বা করিয়া ছিঁড়িয়া প্রভাতের হাঁটুর নীচে হইতে বেশ সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

ইতোমধ্যে বৌদি কমলা প্রভৃতি সকলেই তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধার মুখে ঘটনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সকলে মিলিয়া ভাইজাগের বড় হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হওয়ার বন্দোবস্ত করিল। চাকর লোকজন জিনিষপত্র সব পড়িয়া রহিল, তাহারা পরে যাইবে।

'ব্যাক্‌ওয়াটার বে'তে নৌকা প্রস্তুত ছিল, সকলে সন্তর্পণে গিয়া উঠিয়া বসিল। নৌকায় শায়িত প্রভাতের মাথার কাছে বসিয়া পাখা দিয়া হাওয়া করিতে করিতে সুধা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল—"ভয় কি প্রভাতবাবু? আপনি অত ভয় পাবেন না, আমি বলছি, আপনার কোনও ভয় নেই।"

প্রভাত অবশহস্তে সুধার হাতখানি মুঠায় ধরিয়া অশ্রু-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"সুধা, এবার যদি বেঁচে উঠি, সে কেবল তোমারই গুণে।"

সুধা সে কথায় কান না দিয়া শান্ত সংযতকণ্ঠে স্নেহপূর্ণ স্বরে প্রভাতের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"ভয় কি? কালই আপনি উঠে হেঁটে বেড়াবেন! কাল তো আপনার কলকাতা যাওয়ার কথা!"

প্রভাত বালকের মত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া বলিল—"সুধা, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না,—তুমি না থাকলে আমি বাঁচব না"—

কমলা ও সুহাসিনী প্রভাতের পাশেই বসিয়াছিল, সুধীরও ছিল। সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া সুধার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিল।

সুধা একটুও লজ্জিতা বা সঙ্কুচিতা না হইয়া বরং অত্যন্ত সহজে শান্তমুখে শিশুকে যেমন জননী প্রশান্ত-স্নেহে ভুলাইয়া থাকেন, তেমনইভাবে প্রভাতের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া শান্তনার স্বরে বলিল—"না না, আমি আপনাকে ছেড়ে যাব কেন? এই তো আমরা সকলেই আপনার কাছেই র'য়েছি! আপনি চুপ করুন, কথা কইবেন না। আপনার কিছু ভয় নেই।"

প্রভাত সুধার হাতখানি টানিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া শিশুর মত পরম আশ্বস্তচিত্তে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

'বাকওয়াটার যে'র কালো জলে নৌকা বাহু তাড়নে ছুটিতেছে। সন্ধ্যার সিঁদুরের মত আকাশের রক্তিমছায়া কালো জলে ঝলমল্ করিতেছে। হাওয়ায় সুধার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িল। সুধার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; পাথরের মত নিশ্চল হইয়া প্রভাতের শিয়রের কাছে বসিয়া রহিল।

কমলা অনেকক্ষণ সুধার পানে অপলকনয়নে চাহিয়া থাকিয়া, সুহাসিনীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"সুধার দিকে তাকিয়ে আজ আমার কেবল 'বেহুলা'র কথা মনে পড়ছে দিদি!"

সুহাসিনী একবার চকিতে প্রভাত ও সুধার পানে তাকাইয়া বলিল—"তা কি আর আমাদের ভাগ্যে ঘ'টবে ভাই?"

"প্রভাতবাবু যদি এ যাত্রায় বেঁচে ওঠেন তো সে সুধারই জন্যে!"

"চুপ, আস্তে! সুধা শুনতে পাবে!"

নৌকা তীরে ভিড়িল। ডাইঙ্গাগে মেডিক্যাল কলেজ ও সিভিল হস্পিট্যাল্ আছে। সুধীররা প্রভাতকে লইয়া মেডিক্যাল কলেজে উপস্থিত হইল। মৃত সর্পটিকেও সঙ্গে আনা হইয়াছিল। ডাক্তার সর্পটি দেখিয়া বলিলেন—এ যে 'রিখিয়া' দেখছি! এ দেশী সাপ, ভারী বিষাক্ত! প্রভাতকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"তখনই গভীর করে' চিরে রক্তটা চুষে বের্ করে ফেলায় ও পা বেঁধে দেওয়ায় শরীরের রক্তে বিষ মোটে মিশতে পায় নি! ওষুধ দিচ্ছি, এইটে ব্যবহার করবেন। আরও খানিকটা রক্ত আমি বে'র্ করে দিচ্ছি, তা'হলে আর কোনও ভয় থাকবে না। তবে হয় তো গায়ে একরকম 'বিষাক্ত গরল' বেরুতে পারে। তার দরুণ গায়ের রং কালো হয়ে যেতে পারে!"

সুধাকে দেখাইয়া সুধীর বলিল—"এঁকে একবার দেখুন তো! ইনিই সে সময়ে এঁর কাছে ছিলেন এবং পা ছুরী দিয়ে কেটে রক্ত চুষে বের্ করে দিয়েছিলেন! এঁর তো কোনও আশঙ্কা নেই?

প্রৌঢ় মাদ্রাজী ডাক্তার সুধাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"ইনি সঙ্গে সঙ্গে বিষটা মুখে করে টেনে নিয়েছেন, যদি জিভের লালার সঙ্গে সামান্যমাত্রও বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে, খুব সম্ভব অসুখ-বিসুখ করতে পারে। গায়ে যদি গরল হয়, রং একেবারে কালো হয়ে যাবে। এখন থেকে সাবধান হওয়া দরকার! ইনি বোধ হয় এঁর স্ত্রী?"

"না, ইনি আমার বোন, এখনও অবিবাহিতা, আর ইনি আমার বন্ধু।"

ডাক্তারের মুখে একটু সকৌতুক মৃদুহাস্য দেখা গেল। সুধীর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"প্রাণের আশঙ্কা আছে কি না বলুন? আর যাতে ঐ গরলটা না হয়, তার কি কোনও উপায় করা যায় না?"

"প্রাণের আশঙ্কা আর নেই। গরলের আর কি উপায় হবে? একটা করে ইন্‌জেক্‌শান্ দিয়ে দিচ্ছি—যদি আটকাবার হয়, এতেই আটকাবে।"

প্রভাত অশ্রুবিহ্বলনেত্রে তাকিতেছিল—"সুধা আজ [illegible]

হয় তো প্রভাতের জীবনের মূলাধাররূপ তাহাকে তাহার তরুণ স্বাস্থ্য ও নবোদিত উষার ন্যায় স্নিগ্ধ কান্তি বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু এই বেদনা, ক্ষোভ ও দুঃখের মধ্যেও আজ তাহার গোপন মর্ম্মতারে কি যেন এক আনন্দ-ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিতেছিল—সুধা তাহাকে ভালবাসে! তাহার কাছে সুধার সম্বন্ধে সংশয়ের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

—চার—

সেদিন ভাইজাগ হস্পিট্যাল্ হইতে বাড়ী ফিরিয়া রাত্রিতেই সুধার খুব জ্বর আসিয়াছিল। প্রায় দুই সপ্তাহ ভুগিয়া কাল সে জ্বরপথ্য করিয়াছে! কিন্তু আশঙ্কার কথা—সুধার সর্ব্বাঙ্গে গরলের মত ক্ষতচিহ্ন রেখা দিয়াছে এবং তাহার কনকচাঁপার মত গৌরবর্ণও দ্রুত মলিন হইয়া আসিতেছে!

এই দুই সপ্তাহ সুধাকে লইয়া জ্যেঠামহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া, সুধীর, প্রভাত, কমলা, সুহাসিনী সকলেই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। প্রভাত এখনও কলিকাতা ফিরে নাই। সুধা গায়ে একটু বল পাইলে সকলে মিলিয়া একত্র ফিরিবে, ঠিক হইয়াছে।

সুধা আজ ঘর হইতে বাহির হইয়া বাহিরের দিকের দালানে ঈজি-চেয়ারের উপরে বিছানা পাতিয়া বালিস মাথায় দিয়া শুইয়াছিল। এখনও সে নিজে হাঁটিতে গেলে টলিয়া পড়িয়া যায়, এত দুর্ব্বল! সুধীর ও প্রভাত তাহাকে ঈজি-চেয়ারে শোয়াইয়া চেয়ার শুদ্ধ বাহিরে লইয়া আসিয়াছে!

কমলা ও সুহাসিনী বাড়ীর ভিতরে ছিল, সুধীর ও প্রভাত সুধার কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল। সুধীর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কি কাযে উঠিয়া গিয়াছে, প্রভাত সুধার শিছন দিকে একখানি ছোট চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

এই কয়দিনেই সুধার চেহারা এত খারাপ হইয়াছে যে, চিনিবার উপায় নাই। শান্ত সমুদ্রের পানে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সুধা চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়াছিল। কি ভাবিতেছিল কে জানে? তাহার রোগশীর্ণ কৃষ্ণাভ গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। প্রভাত সুধার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি এবং অশ্রুবিন্দু দেখিয়া বিচলিতচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু ঐ সময়ে সামনে যাইবে কি না ইতস্ততঃ করিয়া শিছনদিকেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুধা ব্লাউসের হাতায় চোখ দুইটি ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ডাকিল,—"দাই।"

প্রভাত সুধার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—"দাইকে কি ডেকে দেব, সুধা?"

সুধা বলিল—"এই যে, আপনি আছেন? দাইকে ডাকছিলুম আমার এস্‌রাজটা একবার এনে দেবে বলে!"

"আমি এনে দিচ্ছি"—বলিয়া প্রভাত চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে কালো রংয়ের ক্ষুদ্র এস্‌রাজটির রাঙ্গা শালুর আবরণ খুলিতে খুলিতে বাহিরে লইয়া আসিয়া বলিল—"কিন্তু তোমার শরীর যে এখনও বড় দুর্ব্বল, সুধা! বাজাতে পারবে কি?" প্রভাত এখন সুধাকে নাম ধরিয়া ডাকে ও 'তুমি' বলে। সুধা ইহাতে আপত্তি করে না।

সুধা হাত বাড়াইয়া এস্‌রাজটা প্রভাতের হাত হইতে টানিয়া লইয়া নিজের বাম কাঁধের উপর শোয়াইয়া ম্লানহাস্যে বলিল—"গানই আমার প্রাণ, প্রভাতদাদা! আমার দৃষ্টি যদি অন্ধ হয়ে যায়, আমার তত দুঃখ হবে না, যদি আমার এই গান গাওয়ার সামান্য শক্তিটুকু নষ্ট হ'য়ে যায়!"

প্রভাত বিস্ফারিতনেত্রে সুধার পানে তাকাইয়া রহিল। কাঁধের উপরে ফেলা যন্ত্রটির উপরে শীর্ণ অঙ্গুলিগুলি লীলায়িত করিতে করিতে ডান হাতে ছড়ির টানের সঙ্গে সে বলিল—"কি গান গাইবো বলুন?"

"গান গাইলে বড় বেশী ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে না কি সুধা? আজ সবে দু'টি ভাত পেয়েছ!"

"না, কষ্ট হবে না। বরং দিনরাত্রি বিছানায় চুপটি করে থেকে থেকে বুকটার ভেতর যেন গুম্‌রে উঠছে! গান কিছু মনে আসছে না। একটা গান মনে ক'রে দিন্ না—"

প্রভাত উত্তর দিল না। স্নিগ্ধ গভীর দৃষ্টিতে সুধার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। সুধা প্রভাতের এই ভাষাপূর্ণ চাহনিতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া একটু উস্‌খুস্ করিয়া নড়িয়া চড়িয়া বলিল—"আপনারও কোনও গান মনে আসছে না বুঝি! আচ্ছা, আমার ঘরে শেল্‌ফের উপর থেকে গীতাঞ্জলিখানা এনে দিন্ তো!"

প্রভাত সুধাকে তাহার সেই যৌন করুণ-ভাষা-ভরা চাহনিতে অভিষিক্ত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"তোমার মনে এখন যে গানের প্রেরণা আসছে, সেই গানখানিই গাও না সুধা।"

সুধা মৃদু হাসিয়া বলিল—"এখন যে কোনও কিছুরই প্রেরণা আসছে না! আচ্ছা বসুন, একটা গান মনে পড়েছে—"

সুনিপুণ অথচ শিথিল হস্তে এসরাজে ছড়ি টানিতে টানিতে সুর-ঝঙ্কারের সহিত সুমিষ্ট দুর্বল কণ্ঠ মিশাইয়া সুধা আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিল—

"কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
হায়— অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায়— যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে!—"

প্রভাত অপলকদৃষ্টিতে সুধার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। গান গাহিবার সময়ে অধিকাংশ সময়ে সুধা যেন মূর্তিমতী বিষাদ হইয়া উঠে! তখন আর মনে হয় না, এই সেই সদা প্রফুল্লচিত্তা তরুণী সুধা! এ যেন কোন্ মূর্তিমতী বেদনা। গানের সুর ও কথার বাতায়ন দিয়া তাহার প্রাণের নিরুদ্ধ গোপন বেদনারাশি প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে! মুগ্ধ প্রভাত শুনিতে লাগিল, সুধার রোগ-দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল মিনতি লুটাইয়া পড়িতেছে—

"আজো সময় হয়নি কি তার কাছে কি আছে বাকী?
ওগো,— ঐ যে সন্ধ্যা নামে সাগর-তীরে—
মলিন আলোর পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখী
আপন,— কুলায় মাঝে সবাই এল ফিরে!
কখন তুমি আসবে ঘাটের 'পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে
অস্ত-রবির শেষ আলোটির মত
তরী— নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে!"

বাগানের বৃক্ষপত্রের মর্মর শব্দ ও সুদূরশ্রুত সমুদ্রতরঙ্গের অস্ফুট কলধ্বনির মধ্যে এই বেদনা-করুণ গানখানি পরিপূর্ণ ব্যথারসে সান্ধ্য আকাশ কম্পিত—উদাস করিয়া তুলিল।

প্রভাত সুধীর গানে আবেগপূর্ণ ব্যথিত দৃষ্টি মেলিয়া দেখিল, তাহার সুন্দর ঘন কালো আঁখির দৃষ্টি নীল-সাগরের দিক্-চক্রবালে উড়িয়া গিয়াছে, শান্ত মুখখানির উপরে গভীর বিষাদের কৃষ্ণছায়া স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে!

গান সমাপ্ত করিয়া প্রভাতের দিকে স্মিতহাস্যে চাহিয়া সুধা জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন শুনলেন?"

প্রভাত আর থাকিতে পারিল না, ব্যাকুলভাবে উঠিয়া গিয়া নিজের কম্পিত হস্তের মধ্যে সুধার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া আবেগরুদ্ধস্বরে বলিল—"সুধা—সুধা—রাণী আমার,—তোমার কণ্ঠে যে আমি বিশ্বের অমৃত—"

সুধা সচকিতে প্রভাতের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া চেয়ারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার রোগপাণ্ডুর মুখে চোখে ঘন বিস্ময় ও বিরক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"প্রভাতবাবু! আপনার কি হয়েছে? আমাকে এ সব কি বলছেন আপনি?"

বিমূঢ় প্রভাত চকিত সন্ত্রস্ত নিজেকে সম্বরণ করিতে করিতে বাষ্পাকুলস্বরে বলিল—"সুধা—তবে কি—তবে কি আমি ভুল বুঝিছি? তুমি কি আমাকে—"

"আপনাকে ভালবাসি কি না জানতে চান? হাসি প্রভাতবাবু! এই এক মাস দেড় মাসে আপনাকে আমি আমার ছোড়দারই মত আন্তরিক ভালবেসেছি! কিন্তু আর যদি কিছু মনে ক'রে থাকেন, মাফ করবেন—আপনি ভুল করেছেন।"

প্রভাতের মুখে চোখে একটা বিপুল রিক্ততার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সুধীর সেই সময়ে আসিয়া পড়ায় প্রভাত ও সুধা দুই জনেই যেন বাঁচিয়া গেল।

সুধা বলিল—"ছোড়দা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এইবার তোমরা আমাকে ঘরের,ভিতরে তুলে নিয়ে চল।"

—পাঁচ—

প্রভাত সমুদ্রবেলায় বসিয়া ছিল, সুধীর আসিয়া পাশে বসিল।

"প্রভাত, তোকে এত শুখনো দেখাচ্ছে কেন রে?"

"কৈ, না!"

তাহার পর এ কথা সে কথার পর সুধীর বলিল—"আসছে সোমবারে কলকাতা রওনা হওয়া ঠিক করলুম, প্রভাত! সুধা একটু গায়ে বল পেয়েছে!—ওঃ এমন সর্পনেশে সাপও দেখিনি! কি রকম শীসগির সুধা কালো হয়ে যাচ্ছে দেখেছ তো?"

প্রভাত বিশুষ্কমুখে বলিল—"হ্যাঁ"—

অনেকক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া থাকিবার পর সুধীর

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"যাক্, তবু সুধার বিয়ের ভাবনা আর নেই—তা হ'লে আরও মুস্কিল হ'ত!"

প্রভাত চমকিতভাবে সুধীরের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল—"তার মানে?"

সুধীর প্রভাতের প্রতি চাহিয়া বলিল—"ও যে আর বিবাহ করবে না বলেছে! কেন? তুমি কি অজিতের বিষয় জান না?"

"কে অজিত?"

"প্রোফেসর অজিত সেন! অক্সফোর্ডের এম্, এ!"

"হাঁ হাঁ খুব জানি! আমরা একসঙ্গে ফাইইয়ার থেকে কলেজে পড়েছি! খুব বন্ধুত্ব ছিল। আহা, সে তো বিলেত থেকে ফিরতে জাহাজে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেল!"

সুধীর বিষণ্ণমুখে বলিল—"তার সঙ্গেই সুধার বিয়ের এনগেজমেণ্ট হয়ে গিয়েছিল।"

প্রভাত উৎসুক মুখে বলিল—"তার পর?"

"সে বলেছিল, বিলেত থেকে ফিরে এসে বিয়ে করবে। সুধা বোর্ডিংএ থেকে কলেজে আই-এ পড়তে লাগল। দু'জনে চিঠিপত্র লিখত। তার পর আর কি? সে বিলেত থেকে টার্ন করতে সুধা বোর্ডিং ছেড়ে বাড়ী এলো, এডেন থেকেও তার টেলিগ্রাম পাওয়া গেছল—ভাল আছে, নির্ব্বিঘ্নে আসছে—বম্বে'র নামবার আগেই জাহাজে ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়ে সব শেষ হয়ে গেল।"

প্রভাত স্তম্ভিত মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুধীর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরে বলিল—"সুধাকে জোঠামশাই ছোট থেকে মানুষ করেছেন। খুব ছোট অবস্থায় ও মাতৃহীনা হওয়ায় জোঠামশাই ওকে নিজের সন্তানের চেয়ে গভীর স্নেহে মানুষ করেছেন। তার পর বাবাও মারা যাওয়ায় জোঠামশাই সুধাকে আরও নিজের বুক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। ওঁর নিজের তো স্ত্রী পুত্রকন্যা কিছু নেই! জোঠামশাইয়ের ইচ্ছা—সুধা ভাল পাত্রে বিবাহিতা হয়ে সুখী হয়। ওর আশা,—মনের ধাক্কাটা সামলে গেলে সুধা এর পরে বিয়ে করবে!—কিন্তু সুধা যে আর বিয়ে করবে না, আমি জানি। ও শুধু জোঠামশাইকে সুখী রাখবার জন্য ও আর সবাইকে সুখী করবার জন্য নিজে সর্ব্বদা অত প্রফুল্লভাবে থাকে!"

প্রভাত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। একটিও কথা কহিতে পারিল না।

সুধীর আবার বলিল—"সুধা প্রথমটা খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল,—তার পরে হঠাৎ একবারেই সামলে সহজ হয়ে গেল! তিন বছর অজিত মারা গেছে—জোঠামশাই কত জায়গায় ওর বিয়ের চেষ্টা করলেন, কিন্তু ও কিছুতেই রাজী হয় না!

"অজিত সুধার হাতের রান্না খেতে বড় ভালবাসতো—বিলেত থেকে লিখতো, দেশে ফিরে সুধার হাতের রান্না খাবে। সেইজন্যে সুধা নিজের হাতের তৈরী কোনও রান্না মুখে তোলে না। অর্দ্ধেক ভালজিনিষ সুধা খেতে পারে না অজিত ভালবাসত ব'লে!—ওর বাইরের চাদিখুসী সব মিথ্যে।"

প্রভাত যেন স্বপ্নাভিভূতের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুধীরও আর কোনও কথা বলিতে পারিল না।

সেইদিনই বিকাল বেলা সুধা বাংলো-সংলগ্ন বাগানে আস্তে আস্তে পায়চারী করিতেছিল। এখনও সে দুর্ব্বল, বেশীক্ষণ হাঁটিতে পারে না। অল্পক্ষণ পায়চারী করিয়া ক্লান্তভাবে সে একটি লোহার বেঞ্চের উপরে গিয়া বসিল।

প্রভাত আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। সুধা প্রভাতের দিকে চাহিয়া বেঞ্চের একপাশে কোণ ঘেঁসিয়া সরিয়া বসিয়া ম্লানহাস্যের সহিত বলিল—"বসুন।"

প্রভাত বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসিতে বসিতে বলিল—"তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে সুধা! সে দিন তুমি আমাকে সুধীরের সঙ্গে সমান আসন দিয়েছো,—সেই ভরসাতেই আজ তোমার সঙ্গে কথা কইবার স্পর্দ্ধা করছি!"

সুধার ম্লান বিষণ্ণ মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রভাত বলিতে লাগিল—"সুধীরের কাছে আমি তোমার বিষয় সব শুনেছি। তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে! তোমার এই মূর্খ নির্ব্বোধ ভাইয়ের সেদিনকার মূঢ় আচরণ পারো তো ক্ষমা কোরো, সুধা! আমি আজ তোমার কাছে আর একটা নতুন দাবী নিয়ে এসেছি—আমি অজিতের বন্ধু—অজিতের সঙ্গে আমি অনেকদিন একত্র পড়াশুনা করেছি,—তার চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার এত বেশী সাদৃশ্য ছিল যে, কলেজের ছেলেরা

আমাদের মনের ভাই বলতো ! আমি জানতুম না, অজিতের সঙ্গে তোমার—"

সুধা বাধিত-দৃষ্টি অবনত করিয়া বলিল—"হাঁ, সেই অদ্ভুত দায়িত্বটি আমি প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি।

প্রভাত বুঝিতে পারিল, সুধাকে ভুল বুঝা তাহার কোন্-খানটায় হইয়াছে ! বুঝিতে পারিল তাহার মুখের পানে নির্নিমেষ তৃষিত-নয়নে তাকাইয়া সে কাহার মুখের সাদৃশ্য অন্বেষণ করিত ! গল্প করিতে করিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কেন মাঝে মাঝে সে অমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত !

প্রভাত প্রকৃতই অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত হইয়া বলিল—"আমার অভদ্র আচরণ ভুলে যেও, সুধা ! আজ থেকে আমিও তোমার 'দাদা' !"

সুধা স্নিগ্ধ হাসিয়া ধীর মৃদুকণ্ঠে বলিল—"শুধু আমার দাদা নয়,—তার চেয়েও বেশী—আপনি তাঁর বন্ধু—"

শ্রী রাধারাণী দত্ত

তাঁতের ফাঁক

জীবন-বসন চল্‌ছে বোনা নূতন পুরাণাতে—
অতীত যুগের জোড় মিলিয়ে উপস্থিতের সাথে ;
সুখের দুখের পাঁচমিশালি মন্দ এবং ভালো,
আর বছরের লালের সাথে এই বছরের কালো,
সরু এবং মোটায় মিলে টানা-পোড়েন সুতোয়
রাত্রিদিবা চল্‌ছে বুনোন শক্ত মাকুর গুঁতোয়।

চল্‌ছে মাকু খোস্-খেয়ালী বিশ্ব-তাঁতীর ঘরে,
বাড়ির পরে পড়ছে বাড়ি লক্ষ তাঁতের 'পরে ;
খস্‌খসানি কাউরি বেশী কাউরি কিছু কম,
কোন'টা বা কেবল হাঁপায়, কোন'টা লয় দম ;
কাউরি আওয়াজ হাসির মতো, কেহ বা কান্নাতে
বসন-জন্ম শেষ করে তার ভাগ্য-তাঁতীর হাতে !

গামছা কেহ, কেউ বা কাপড়, কারো বা নাম শাল,
কেউ বা কিছু ঠাস্ বুনোনী কেউ বা ফিকে জাল ;
সব্‌জে নীলে জরদা লালে রং-বেরঙে ছুটে'
খোস্-খেয়ালীর মরজি মাফিক্ বসন বনে' উঠে ;
যেথায় খুসি পাড় বসানো হয়ে গেলেই তার তার,
তাঁতীর হাতের মাকুর চলায় পার বুঝি নিস্তার !

বিশ্ববাজে গ্রাহক কোথায়, কিন্‌বে কেবা তার ?
জগৎজোড়া বসন সে তাই জড়ায় আপন গায় !
তবু যে তার লাজ ঢাকে না বিরাট মোটা সেহে,
নিজের লজ্জা নিজের চোখে শিউরে দেখে চেয়ে ;
যতই জোরে চালায় সে তাঁত খেইএর খেয়াল ধরে',
ততই যে তার ফাঁক বেড়ে' যায় অনন্তকাল ভরে'।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ফুলী

৯

তিন দিন গৃহ হইতে অনুপস্থিতির পর যখন মাখম বাউরি তাহার গ্রাম মাধববাটীর প্রান্তে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে। তিন দিন পূর্ব্বের প্রাতঃকালে সে ফলমূলের ভার কাঁধে করিয়া, তাহার মনিব নরহরি চট্টরাজের জামাই বাড়ী তত্ত্ব লইতে গিয়াছিল। জামাই বাবুর বাড়ী তাঁহার শ্বশুরের গ্রাম হইতে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে। তবে সমস্ত পথটা মাখমকে হাঁটিয়া যাইতে হয় নাই। অর্দ্ধেক পথ বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত বেঙ্গল নাগপুর কোম্পানীর রেল আছে।

গ্রামপ্রান্ত হইতে তাহার ঘর এখনও প্রায় পোয়াখানেক পথ দূর। চট্টরাজ মহাশয়ের বাটী সে স্থান হইতে অনেক নিকটে। জামাই ও কন্যার সংবাদ লইয়া সর্ব্বাগ্রে মনিবের ঘরেই মাখমের উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া মাখম একটা ভিন্ন পথ অবলম্বনে প্রথমে আপনার ঘরের দিকেই চলিল। পথিপার্শ্বে প্রকাণ্ড জলাশয় গোকুল বাঁধ। তখনও পর্য্যন্ত গ্রামের দুই চারি জন মেয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা, পা ধোয়াটা বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া মাখম একবার বাঁধের ঘাটের দিকে চলিল, —আবার কি মনে করিয়া ফিরিল।

ফিরিতে ফিরিতে একটা কথা তাহার কানে গেল, "মাখম বাউরি না ?" একটি মেয়ে আর একটি মেয়েকে যেন প্রশ্ন করিল। উত্তরের কথাটা তাহার কানে প্রবেশ করিল না। তবে সেই মেয়েটিরই কথা আবার সে শুনিতে পাইল। "তোমার মামাকে দিয়ে এর একটা বিহিত না করালে কিন্তু চলবে না ভাই।"

এই বারে দ্বিতীয়ার কথাও সে শুনিল, "মামা ত করবে ব'লে তইরী হ'য়ে ব'সে আছে।"

"আহা বেচারি নিরীহ।"

এতক্ষণে মাখম যে স্থানে আসিয়া পড়িল, তাহাতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে পাওয়া যায় না।

একটু ঘোরা পথ অবলম্বনে যখন সে লোকের অলক্ষ্যে তাহার মনিবের বাড়ী অতিক্রম করিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

তাহার গৃহে ফিরিবার ব্যস্ততার একটা কারণ ঘটিয়াছিল। চট্টরাজ মহাশয়ের জামাতার বাড়ী হইতে যাত্রির হইয়া যে সময় সে বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, তখন কলিকাতাভিমুখী গাড়ীখানা সবে মাত্র ছাড়িয়াছে।

গাড়ীখানার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই সে যাহা দেখিল, তাহাতে প্রথম তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। দেখিল, সেই চলন্ত গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া একটা মেয়ে ষ্টেশনটা দেখিতেছে। তাহার মুখখানা ঠিক যেন তাহার স্ত্রী ফুলীর মুখের মত। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যই তাহার চোখ দু'টা অন্ধের মতই হইয়া গেল। বিস্ময়ে সে যেন জড়ীভূত হইল।

আরও বিস্ময়ের কথা, এ-দিক্ ও-দিক্ দেখিতে দেখিতে যেমন মেয়েটার চক্ষু একবার মাখমের উপর পড়িল, অমনই এমন ব্যস্ততার সহিত সে মাথাটা জানালার ভিতরে লইয়া গেল যে, মাখমের বোধ হইল, মেয়েটার মাথা জানালার মাথায় ঠুকিয়া গেল।

গাড়ী তখন অল্পে অল্পে ষ্টেশনের সঙ্গ অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। মাখম মনে করিল, গাড়ীর কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মেয়েটাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া আসে; কিন্তু ষ্টেশনের ভিতরে প্রবেশমুখে ষ্টেশন মাষ্টারের বাধায় তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া সশব্দে বহুদূর চলিয়া গেল। মাখম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃষ্টিকে তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া সেই দূর হইতে সুদূরগামী গাড়ীখানাকে দেখিতে লাগিল।

আর যখন দেখা গেল না, তখন সে হাতের বাক ভূমিতে রাখিয়া, ষ্টেশনের বাহিরের গাছের তলে উপবিষ্ট হইল। [illegible]

কিন্তু অবসর হয় নাই ; অবসর হইয়াছে—গাড়ীতে ফুলীর মত মেয়েটাকে দেখিয়া। ওকি সাদৃশ্য, না সত্য সত্যই ফুলী ?

মাথার হাত দিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তার পর মাধব ঠিক করিল, সাদৃশ্যটাই বটে। এইক্ষণ সময়ে বিষ্ণুপুরে গাড়ীর ভিতরে—যেটা মনে করা—পাগলের চিন্তা ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না—ফুলী কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে ?

কিন্তু মেয়েটা তাহাকে দেখিয়া ভয়-বিহ্বলার মত অত ব্যস্ততার সহিত মাথাটাই বা গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করাইল কেন ?

তথাপি সে ফুলী নহে। মনে মনে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর মাধব সিদ্ধান্ত করিল, "সে কখন ফুলী হইতে পারে না। মেয়েটা ফুলীর একটা সাদৃশ্য। কিন্তু অদ্ভুত সাদৃশ্য !"

সিদ্ধান্ত করিয়াও কিন্তু মাধব মনে শান্তি অনুভব করিতে পারিল না। সে বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইল। ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল, কলিকাতা হইতে যে গাড়ী বাঁকুড়ার দিকে আইসে, তাহার বিষ্ণুপুরে পৌঁছিতে তখনও চারি ঘণ্টার উপর বিলম্ব।

মাধব ভাবিল, এই সময়ের মধ্যে বাড়ীর বারো আনা পথ সে অতিক্রম করিতে পারিবে। আর কালবিলম্ব না করিয়া সে মাধববাটী হাঁটিয়া চলিল।

কিন্তু যত শীঘ্র সে আসিবে মনে করিয়াছিল, তত শীঘ্র সে আসিতে পারিল না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই সে চলা আরম্ভ করিয়াছিল, "খাউকি" বেলায় পথে মুড়ি জলযোগ করিয়াছিল মাত্র। বিষ্ণুপুর হইতে প্রথমটা যত বেগে সে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শেষটা তাহা আর পারিল না। চলিতে চলিতে সে দেখিতে পাইল, রেল গাড়ী তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

নিজের মূর্খতা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পথ চলিবার আগ্রহ কমিয়া গেল। গাড়ীতে চড়িয়া গেলে অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে বাড়ী পৌঁছিতে পারিত। বাড়ীতে সে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে।

২

বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই মাধব ডাকিল, "ফুলি !" উত্তর পাইল না।

সম্বোধনটা বিশেষ উচ্চস্বরের নয়। সুতরাং উত্তর না পাওয়ায় বিস্ময়ের বিষয় কিছুই ছিল না। কিন্তু যখন সে তাহার ঘরের একান্ত নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে কিঞ্চিৎ বিস্মিতই হইতে হইল, ঘরে এখনও আলো জ্বালা হয় নাই !

তখন সে আর কোনও কথা না কহিয়া একবারে ঘরখানির চালির তলদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে তখনও বিশেষ অন্ধকার না হইলেও চালির ভিতরটা বেশ ঘন অন্ধকারেই ভরিয়া গিয়াছে। তথাপি সে অনুমানে বুঝিল, ঘরের দ্বার বন্ধ।

ফুলী কি তবে ইহারই মধ্যে দ্বার বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়াছে ?

ইহার অধিক আর সে অনুমান করিতে সাহস করিল না। বিষ্ণুপুরের সেই দৃশ্যটা এই একান্ত পথশ্রমক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত্তের কাছে অস্পষ্ট হইতে হইতে একবারে মুছিয়া যাইবার মত হইয়াছে।

সে এইবারে একটু বিরক্তির ভাবে ডাকিল, "ফুলি !"

এবারও উত্তর না পাইয়া সে বাঁকটা সিঁড়ির গায়ে ঠেসাইয়া দাওয়ার উপরে উঠিল ; দোরে হাত দিল, ঠেলিল, তাহার পর কপাটের মাথার চৌকাটে হাত ঠেকাইল। তখন সে বুঝিতে পারিল, দ্বার বাহিরের দিক্ হইতে বন্ধ।

তখনও তাহার মনে সন্দেহের লেশ মাত্র উদিত হইল না। সে দেখিল, ফুলী নাই বটে, কিন্তু তাহার কুকুট ও ছাগগুলা যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। ফুলী না থাকিলে আর কে সে গুলাকে অমন করিয়া চালির মধ্যে পুরিয়া রাখিবে ?

তবে সে অভাগী সন্ধ্যাবেলা দুয়ার তালা বন্ধ করিয়া কোথায় গেল ? মাধব আবার উঠানে নামিয়া তাহার খুড়া অটলের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "ফুলি !"

তাহার ডাক শুনিয়া যে আসিল, সে ফুলী নহে—অটলের কন্যা ভাবিনী। ভাবিনী নীরবেই তাহার সমীপস্থ হইল। তাহার পা যেন মাধবের দিকে চলিতে চাহিতেছিল না।

"বউ কোথায় রে, ভাবি ?"

ভাবি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "তুমি কি মনিবের ঘর হ'য়ে আসছ, দাদা ?"

"না, বরাবর এইখানেই আস্‌ছি।"

"পাও ধোও নাই দেখছি যে।"

"মনিবের বাড়ী যাবার সময় ধোবো। আগে বল্ সন্ধ্যে-কালে দোরে চাবি দিয়ে সে আবাগী গেল কোথায়?"

"চাবি কি সে আবাগী দিয়েছে?"

"দোর খুলে? এমন সময় কোথায় সে মরতে গেল," ভাবি?"

"হায়, আবাগীর যদি মরণ হত?"

"ব্যাপার কি রে? খুলে বল। আ মর, চুপ ক'রে রইলি কেন?"

ভাবিনী তথাপি উত্তর দিতে পারিল না। অন্ধকার না হইলে মাধব দেখিতে পাইত, তাহার দুই চক্ষু হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে।

তাহার নীরবতায় কিন্তু মাধবের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। সে এইবারে বুঝিল, বিষ্ণুপুরের ষ্টেশনে সে যাহাকে দেখিয়াছে, সে তাহারই কুলী।

তথাপি বুঝিয়াও বুঝিতে সাহস না করিয়া সে ভাবিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি বাপের বাড়ী চ'লে গেছে, ভাবি?"

"বাবা তার বাপের বাড়ীতে খোঁজ করতে গেছে।"

"হুঁ! কেন সে চ'লে গেল, ভাবি? কারও সঙ্গে কি আর গণ্ডগোল হয়েছিল?"

"গণ্ডগোল হবার কোনও ত কারণ ছিল না, দাদা, কি লেগে হবে?"

গম্ভীর ভাবে এইবার মাধব বলিল, "খুড়ো মিছে গেছে। কুলী তার বাপের বাড়ী যায় নি।"

"তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে দাদা?"

"সে কি একাই চ'লে গেছে?" উত্তর না দিয়া মাধব প্রশ্ন করিল।

"অজবাকেও আজ কেউ দেখতে পায় নি।"

"কখন থেকে?"

"সেই সকাল থেকে।"

"নে, ঘরে আলো জাল্।"

তুই কি—কিছু জান্‌তে পেরেছিস্?"

"দেখেছি।"

"দেখেছিস্?"

"আগে মনে করেছিলুম স্বপন, এখন বুঝছি সত্যি।"

"কোথায় দেখলি?"

"বিষ্ণুপুরে।"

"দেখলি ত, চুলের মুঠি ধ'রে আবাগীকে ফিরিয়ে আনলি নে কেন?"

"আনবার উপায় ছিল না রে বোন্। প্রথমটা ত দেখা দিয়েই করতে পারিনি। সে গাড়ীতে—আমি মাটীতে। তার পর দেখতে দেখতে গাড়ী ছেড়ে দিলে। কিছুতেই বোন্, মন আমাকে বল্‌তে পারলে না সে কুলী।"

"সেই বেদেটা?"

"তাকে দেখিনি। সে বোধ হয় গাড়ীর ভিতরে ছিল।"

ভাবিনী অনেক মাথা হেঁট করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। ইতাবসরে মাধবও সেই বিষ্ণুপুরের দৃশ্যটী আর একবার কল্পনার দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল, মুখ বাহির করিয়া কুলীর বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকা, তাহাকে দেখা, আর দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অতি ব্যস্ততায় মুখখানাকে লুকাইয়া ফেলা। সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"এখন বুঝতে পারলি, দাদা! তোকে সে পৈ পৈ মানা করতুম্, অজবার সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠতা করা ভালো নয়!"

"ঘরে আলো জাল্।"

"হ'লেই বা সে ইয়ার! অতটা বাড়াবাড়ি কেন? দাওয়ায় ব'সে এক পহর রাত পর্য্যন্ত তার সঙ্গে গল্প-গুজোব —বউয়ের হাত দিয়ে তাকে পান-তামাক দেওয়া।"

"আলো জাল্।"—বিরক্তির সহিত মাধব ভাবিনীকে আদেশ করিল।

ভাবিনী তথাপি বলিতে লাগিল, "সে বেটা নেশাখোর, তার কি ধর্ম্মজ্ঞান আছে।"

"আ মর, কথা শুন্‌ছিস্ না কেন?"

ভাবিনী এইবারে কথা বন্ধ করিয়া ঘরে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করিতে চলিল। মাধবও গেল ঘাটে হাত, পা, মুখ ধুইতে। তাহার পায়ে ত ছিল তার আজানু ধূলা। এখন তাহার হাত পা মুখ চোখ—সর্ব্বগাত্রই জ্বালা করিতেছিল।

৩

ঘর হইতে অনতিদূরে "গাঙ্গুলি"গোড়ে হইতে হাত পা মুখ ধুইয়া ঘরে ফিরিয়া মাধব দেখিল, ভাবিনী ঘরে আলো জ্বালিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই

তাহার টাকা পয়সা রাখিবার ছোট বাক্সটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল—বাক্সটি যথাস্থানেই রহিয়াছে। বাক্সের চাবিকাঠী কোথায় থাকিত, তাহার জানা ছিল। সে সেই স্থান হইতে সেটিকে বাহির করিয়া প্রথমেই বাক্সটি খুলিল। যাইবার দিন সে মনিবের নিকট হইতে পাওয়া পঁচিশটি টাকা কুলীর হাতে দিয়া গিয়াছিল।

বাক্স খুলিয়া মাখন দেখিল, কুলী টাকার একটিও লইয়া যায় নাই। তদ্ভিন্ন স্বামীনের কাজ করিয়া কুলী নিজে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাও বাক্সের মধ্যে এক স্থানে সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে। এইবার সে কাপড়-চোপড় প্রভৃতি চলিয়া যাইবার কালে যাহা যাহা কুলীর সঙ্গে লইয়া যাওয়া সম্ভব, সমস্তই পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহাদের ভিতর হইতে একটিও সামগ্রী সে লইয়া যায় নাই। এমন কি, সপ্তাহ পূর্ব্বে সে যে একখানি রঙ্গিন কাপড় কুলীর জন্য বাকুড়ার বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল, সেখানিকেও সে ফেলিয়া গিয়াছে।

তখন বাক্স আবার বন্ধ করিয়া মাখন ঘরের বাহিরে দাওয়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল।

চোখের জল সে আর রোধ করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে কুলীকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি দুঃখে তুই চ'লে গেলি, কুলি ?"

"মনিবের ঘর থেকে ফিরে এসে ভাত খাবি, দাদা, না খেয়ে মনিবের ঘরে যাবি ?"

"কেন সে চ'লে গেল ভাবি, আমি ত এক দিনের জন্যও তাকে একটা বাথানও পর্য্যন্ত করিনি !"

"কপালে তাঁর দুখ আছে, দাদা, নইলে এ রকম মতিচ্ছন্ন তাঁর কি লেগে হবে ?"

"কবে সে গেছে ?"

"কবে কি, আজই গেছে। দাদা, আজ সকালেও যদি আস্‌তিস্, তা হ'লে বোধ হয়, আবাগী যেতে পারতিনা।"

"কখন গেলো ?"

"তাও ত বল্‌তে নারবো দাদা ! সকাল বেলায় যেমন রোজ যাই, ধান কলে কায করতে গেছলুম। যাবার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'বউ যাবি ?' সে বল্‌লে, 'আজকে আমি যেতে নারবো, গায়ে আমার সুখ নেই।' আমি একাই চলে গেলুম।"

মাখন মাথা হেঁট করিয়া শুনিতেছিল, উঠানে দাঁড়াইয়া ভাবিনী বলিতেছিল। এমন সময় চট্টরাজ মহাশয়ের আর এক ভৃত্য পান্থ কাপড়ী, তাহার "বাকুলের" বহির্ভাগের পথ হইতে ডাকিল, "মাখন ঘরে রইছিস্ ?"

ভাবিনী শুনিয়া বলিল, "মনিব তোকে ডাকতে পাঠি-য়েছে।"

"তা হ'তে পারে।"

মাখন পান্থর কথার কোনও উত্তর দিল না।

পান্থ আবার ডাকিল, "মাখন !"

ভাবিনী বলিল, "উত্তর দে।"

মাখন বলিল, "তুই ওকে ব'লে আয়, জামাইবাবুর বাড়ীর খবর সব ভাল। জামাইবাবু শুক্কুরবার বাকুড়ায় আস্‌বে। কাছারীতে তার মকদ্দমা আছে। এসে মনিবের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে।"

"মনিবের ঘরকে তুই যাবিনি ?"

"আজ আর যাব না।"

পান্থ আবার ডাকিল, "মাখন বাউরী !"

"যা ভাবি, বলে আয়।"

"তুই নিজেই ব'লে আয় না।"

"আমি যেতে নারবো।"

আরও দুই একবার অনুরোধের পরও যখন মাখন স্থান হইতে উঠিল না, তখন অগত্যা ভাবিনীকেই পান্থর কাছে যাইতে হইল।

যাইয়াই ভাবিনী বুঝিল, সত্যই মনিব মাখনকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে। মাখন তাহাকে যাহা বলিতে বলিয়াছিল, সে তাহাই পান্থকে বলিল।

শুনিয়া পান্থ তাহাকে বলিল, "তা হবে না রে ভাবি, বাবু একবার তাকে দেখতে চায়। যা বল্‌বার সে নিজেই বাবুকে ব'লে চ'লে আসুক্।"

ভাবিনী ফিরিয়া দেখিল, মাখন ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া কবাট বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "কবাট দিলি কেন, দাদা ?"

"গায়ে সুখ নাই রে বৌন্।"

"ভাত খাবি না ?"

"আজ আর কিছু খেতে নারবো।"

"তা কি হয় !"

দেওদী মা ফুল ফল গঙ্গাজল কুঙ্কুম কেশর চন্দন-শীতল,
দেওদী ধূপ্ দীপ লাল শুভ্ শুভ্ লোবান।

"বকাস্ নি, ভাবি!"

তথাপি ভাবিনী নানা কথায় তাহাকে কবাট খুলিতে অনুরোধ করিল। সে কিছু না আহার করিলে কেমন করিয়া ভাবিনী অন্ন মুখে তুলিবে? নানা কথায় মমতায় সুরে, মাথার দিব্য পর্য্যন্ত দিয়া, সবলে দ্বারে আঘাত পর্য্যন্ত করিয়া ভাবিনী ভাইকে বাহিরে আসিবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিল। প্রথম প্রথম ভিতর হইতে দুই একটা কথা কহিয়া শেষে মাধব তাহার কথার উত্তরই দিল না।

এই সময় পানু আসিয়া উঠান হইতে ডাকিল, "মাধম!"

"আজ আর যেতে নারবো, পানু খুড়ো!"

"বাবু তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আমাকে হুকুম করেছে।"

"আজ যেতে নারবো।"

ভাবিনী বলিল, "একটিবার দেখা ক'রেই চ'লে আয় না, ভাই।"

মাধব উত্তর দিল না।

পানু কাপড়ীও ভাবিনীর কথার পুনরুক্তি করিল। মাধব তাহার কথারও উত্তর দিল না। তখন পানু কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাবেই বলিল, "মনিবের কথা কাটতিস্ না। তোরই ভালোর জন্তে—হেই—মাধমা!"

"কাল যাব, পানু খুড়ো।"

"একবার বাইরে আয়।"

"নারবো।"

বিরক্ত হইয়া পানু চলিয়া গেল।

ভাবিনী বিশেষ ব্যাকুলভাবে এইবার জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মহত্যা করবি না ত রে, দাদা?"

"রাধেগোবিন্দ, আত্মহত্যা করব কিসের লেগে রে, বোন্!"

৪

তথাপি ভাবিনী তাহার কথায় আশ্বস্ত হইল না। অনন্যোপায় হইয়া, ব্যস্ততার সহিত একটা লণ্ঠন হাতে সে চট্টরাজ মহাশয়ের গৃহাভিমুখে ছুটিল।

কিছুদূর না যাইতেই সে দেখিল, বাবু, পানু কাপড়ী, দিনু বাঙ্গাল ও তাহার বাপের মনিব গ্রামের প্রধান ছত্রী ভূম্যধিকারী রোলগোবিন্দ সিং ওরফে দলুবাবুকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছেন।

নরহরি তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন, একটা অনর্থের আশঙ্কায় ভাবি তাঁহারই কাছে ছুটিয়াছে—মাধমা এখনও ঘরের কবাট খুলে নাই!

তিনি সেইভাবেই প্রশ্ন করিলেন, "কবাট সে খোলেনি?"

"না, বাবু।"

"ছুটে যা, তাকে বল্, বাবু আস্‌ছে।"

ভাবিনী ফিরিতেছিল, এমন সময় দলুবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর বাপ কি এখনও ফেরেনি, ভাবি?"

"না বাবু!"

নরহরি শুনিয়া বলিলেন, "তা হ'লে বোধ হচ্ছে ফুলী সেখানে যায়নি?"

ভাবিনী বলিল, "না ত।"

"না কি রে, ভাবি? তোরা কি কিছু জেনেছিস্?"

"ভাই তাকে দেখেছে।"

তখন সকলেই আগ্রহ সহকারে তাহাকে প্রশ্ন করিল। মাধবের মুখে সে যাহা শুনিয়াছিল, ভাবিনী আনুপূর্ব্বিক সেই কথা তাহাদের শুনাইল। শুনিয়া নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর অজবা?"

"ভাই তাকে দেখেনি।"

নরহরি দিনু বাঙ্গালকে আদেশ করিলেন, অজবার ঘরে তাহার তত্ত্ব লইয়া সে যেন যত শীঘ্র পারে তাঁহার কাছে ফিরিয়া আইসে।

দিনু দুই চারি পদ অগ্রসর হইতে না হইতে অপর দিক্ হইতে এক জন তাহাদের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, "তোমরা—আপনারা কে বট গো?"

রোলগোবিন্দ সিং অটলের স্বর অনুমান করিয়া বলিলেন, "কে রে অটলা?"

ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূর নিষ্ফল অনুসন্ধানে ক্লান্ত হইয়া অটল ঘরে ফিরিতেছিল। প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেইদিকে ছুটিয়া আসিতে সে উভয়কেই দেখিল।

"হুজুররা রইছেন?" বলিয়া অটল একবারে উভয়েরই সম্মুখে ভূমিতে মাথা রাখিয়া চুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভাবিনীও অমনই বাপের ক্রন্দনের সঙ্গে নিজের অদ্ভুত ক্রন্দন যোগ করিয়া দিয়া লণ্ঠন ভূমিতে রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

ফুলীর পলায়ন-কাহিনী তখন বিশেষভাবে গ্রামমধ্যে

প্রচারিত হয় নাই। পিতা ও পুত্রীর ক্রন্দনে এইবার তাহা হইবার উপক্রম হইল।

লোকসমাগমের আশঙ্কা করিয়া নরহরি তাহাদের উভয়কেই ধমক দিলেন। মাথা না তুলিয়াই অস্পষ্ট ক্রন্দনের সুরে অটল বলিল, "আপনারা দু'জনেই আমার মনিব রইছেন, বিহিত কর হুজুর।"

দলুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহিত কি? কার সঙ্গে সে চ'লে গেছে শুনেছিস্?"

"জেনেছি হুজুর, অভয়া তাকে নিয়ে গেছে। মূর্শীনগরের রামুরেটে ভেদোশোলের ইষ্টেশনে তাঁদের গাড়ীতে উঠতে দেখেছে।"

বলিয়া আবার অটল ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, আর করযোড়ে কাতরকণ্ঠে উভয়েরই কাছে এই বিষম অপমানের প্রতীকার প্রার্থনা করিল। নহিলে সে গ্রামে আর তাহারা থাকিবে না, বাস উঠাইয়া "ভিন্ গাঁয়ে" চলিয়া যাইবে, চিত্তের আবেগে সে কথাও সে মনিবদের শুনাইয়া দিল।

দলুবাবু, বিশেষতঃ নরহরি তাহাকে যথাসম্ভব আশ্বাস দিয়া উঠিতে আদেশ করিলেন। কেন না, পথের মধ্যে তাহার ওরূপভাবে বসিয়া থাকায় লোকজানাজানি হইবে মাত্র। যদি হয়, সেটা আরও লজ্জার কথা হইবে।

নরহরির আদেশে অটল মাখনকে ডাকিতে গেল। অস্পৃশ্য জাতির গৃহ, তাহাদের উঠানে চট্টরাজ মহাশয় কিম্বা দলুবাবুর উপস্থিত হওয়া একবারেই অসম্ভব। তাঁহারা সদর পথে দাঁড়াইয়া মাখনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

খুড়ার-মুখে যখন সে শুনিল, মনিব পথে দাঁড়াইয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছে, তখন মাখন আর ঘরের ভিতরে রহিতে পারিল না। বাহিরে আসিয়া কিন্তু সে খুড়াকে একটি কথাও বলিতে পারিল না।

অটল তাহাকে অনেক আশ্বাস দিল; বলিল, অভয়াকে জব্দ করিতে যত টাকা লাগে, মনিব তত টাকাই খরচ করিবে।

মাখন এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া কেবল খুড়াকে মনিবের কাছে চলিতে অনুরোধ করিল।

অটল কিন্তু আশ্বাস দিতে ক্ষান্ত হইল না; বলিল, "ভাবনা কি তোর? দুই মনিবেই যখন ভরসা দিয়েছে, তখন একা মধুপরখে বেটীকে রুখে করবে, সাধ্য কি!"

মাখন এরূপ আশ্বাস বাক্যেও কোন কথা কহিল না। তাহারা তখন উভয়েই চট্টরাজ মহাশয়ের সম্বোধন শুনিল, "মাখনা!"

নরহরির কাছে উপস্থিত হইয়া মাখন দেখিল, গ্রামের অনেকেই তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর, অন্ধকারে যতটা দেখা যায়, সে বুঝিতে পারিল, গ্রামের দুই চারি জন যুবকও কিছু দূরে পথের উপরে দাঁড়াইয়া আছে।

"যদি দেখতেই পেয়েছিলি ত ঘরে না এসে প্রথমেই আমাকে খবর দিলি নে কেন হতভাগা! এতক্ষণে আমি সে দু'টোকেই গ্রেপ্তার করিয়ে বাঁকুড়ার ইষ্টেশনে উপস্থিত করাতুম!"

মাখনের পরিবর্ত্তে ভাবিনী নরহরিকে উত্তর দিল, "ও বুঝতে পারেনি, বাবু। মনে করেছিল কে, তবে দেখতে আমাদের বউএর মতন।"

অটল শুনিয়া অতি বিস্মিতের মত মাখনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই তাদের দেখেছিস্?"

ভাবিনী বলিল, "অভয়াকে দাদা দেখেনি। দেখে ছিল শুধু বউকে, বিষ্ণুপুরে ইষ্টেশনে গাড়ীতে। বউ কি না, বুঝতে না পেরে ঘরে আইছে।"

অটল আবার নরহরির পায়ের সমীপে মাথা রাখিয়া পড়িল। মাখন দাঁড়াইয়া ছিল মাথা হেঁট করিয়া। সে মাথা না তুলিয়াই বলিল, "জামাই বাবুর বাড়ীর খবর সব ভাল রইছেন বাবু।"

"সে খবর কাল শুনবো, এখন আমার সঙ্গে একবার আয় দেখি।" বলিয়াই নরহরি দলু সিংকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আবার হাত কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে, দলু ভাই! হতভাগাটা যদি আর আধ ঘণ্টা আগেও আমাকে বলতো, তা হ'লেও হাওড়া পৌঁছিবার আগে যে কোনও ষ্টেশনে তাদের আমি আটক করাতুম।"

"এখন কি আর হয় না?"

দূর হইতে একটি যুবক নরহরিকে উক্ত প্রশ্ন করিল। সে দোলগোবিন্দেরই ব্রাহ্মণপুত্র। নাম তার রমানাথ।

দোলগোবিন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কত বেজেছে বলতে পারিস্, রমা?"

তখন পার্শ্বের লোকদিগের মধ্যে কেহ বলিল, আটটা, কেহ বলিল, সাড়ে আট কেহ বা বলিল, সাড়ে আট অনেকক্ষণ

উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, গুরুতারা পশ্চিমে চলিয়া পড়িয়াছে; নটার কাছাকাছি।

রমা কিন্তু ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া একেবারে দীপ্ত বাজালের লণ্ঠনের সমীপে উপস্থিত হইল এবং বাম হস্তের মণিবন্ধ আলোর সমীপে তুলিয়া বলিল, "আটটা এগারো মিনিট।"

একটি অতি ক্ষুদ্র কব্জী-ঘড়ী অলঙ্কার স্বরূপ তাহার মণিবন্ধে শোভা পাইতেছিল।

নরহরি শুনিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "ষ্টাণ্ডার্ড না লোকাল?"

রমানাথ বলিল, "লোকাল।"

দলু সিং বলিল, "গাড়ী ত তা হ'লে এখনো হাওড়ায় পৌঁছে নাই হে।"

এইবারে এক এক করিয়া যুবকের দলও সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

চট্টরাজ-বংশের আর একটি ছেলে, নাম গতি, বলিয়া উঠিল, "আর গোমা পাসেঞ্জার ত? পৌঁছুতে অন্ততঃ আধঘণ্টা লেট না ক'রে ছাড়বে না!"

দলু বলিল, "তা হলে ত এখনো সময় আছে, চট্টরাজ।"

"তুমি কি পাগল হয়েছ, দলু ভাই, গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবে, ষ্টাণ্ডার্ড টাইম আটটা কুড়ীতে।"

রমানাথ বলিল, "ঠিক পৌঁছুলেও এখনো তেত্রিশ মিনিট।"

"কিন্তু ষ্টেশন এখান থেকে পাকা তিনটি মাইল।"

গতি বলিয়া উঠিল, "গাড়ী ভারি লেট হয়, কাকা!"

এইবারে নরহরি কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিতই বলিয়া উঠিলেন, "থাম্ ছোঁড়া! যদি লেট না হয়?"

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

দলু বাবু সেই ক্ষণিক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নরহরিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তব্য কি তা হ'লে এখন, চট্টরাজ?"

"কর্ত্তব্য ত দেখছি আজকের রাত্রির মত চুপ। সময় মাত্র আধ ঘণ্টা। যেতে হবে তিন মাইল। ষ্টেশনে উপস্থিত হ'তে না হ'তে গাড়ী হাওড়ায় পৌঁছে যাবে। যদি অন্ততঃ আর পোনেরো মিনিটও সময় থাকতো—"

নরহরির কথা শেষ না হইতেই রমানাথ আবার বলিল, "আমাদের সঙ্গে সাইকেল আছে কাকা।"

"পোনেরো মিনিটের মধ্যে যেতে পারবি, রমা?"

"খুব পারবো।"

গতি বলিল, "রমার অত সময়ও লাগবে না।"

ওই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই নরহরি ট্যাঁক হইতে দশ টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া রমানাথের হাতে দিতে দিতে বলিলেন, "এই নে, তবে আর বিলম্ব করিস্ নি। সময় যদি থাকে দেখিস্, টেলিগ্রাম করিস্। দেখিস্, টাকাগুলো যেন জলে না যায়।"

"না কাকা, তা কেন যাবে?" বলিয়া রমানাথ মালকোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে সাহায্য করিতে সঙ্গী যুবকগণ ক্ষিপ্রতার সহিত সাইকেল আনিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত করিল।

নোটখানা বুকের পকেটে রাখিয়া রমানাথ সাইকেলের প্যাডেলে পা-টি যেমন দিয়াছে, অমনই মাখন বলিয়া উঠিল, "কি করতে যাবে, হুজুর?"

"কি করতে, কি রে?" বিস্ময়ের সহিত নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মাখনের কথায় সকলেই অল্পবিস্তর বিস্মিত হইয়াছিল। রমানাথও দাঁড়াইয়া ছিল।

মাখন আর কোনও কথা কহে না দেখিয়া নরহরি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্, মুন্সীকে ফিরিয়ে আনতে পারব না!"

"তা পারবেক না কেন হুজুর, কিন্তু মুন্সীর ভালবাসা ত ঘুরাতে নারবেন।"

এ কথায় সকলেই প্রথমটা স্তম্ভিতের মত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে নরহরি বলিয়া উঠিলেন, "বেটা পাগল হয়েছে! যা রে রমা, যদি টেলিগ্রামই করতে হয়, আর দাঁড়াস্‌নি।"

রমানাথ চলিল। আর মুহূর্ত্তের ভিতরে সকলেই দেখিল, রমানাথের সঙ্গে আরও পাঁচ ছয়টা সাইকেল ছুটিয়াছে।

নরহরি মাখনকে আর কিছু না বলিয়া তাহার ভগিনীকে বলিলেন, "যা ভাবি, তোর বোকা ভাইটেকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে যা।"

চলিতে চলিতে পথে দলু সিং নরহরিকে বলিল, "ছোট লোকের ব্যাপার, তুমি ভাই নরহরি, ওতে মাথা ঘামাতে যাচ্ছ কেন? সে অমনি বেটা ফিরে এলে দু'দিন পরেই ওদের আপোষে মিল হয়ে যাবে।"

নরহরি বলিলেন, "আমি কি ওই মাথমা বেটার জন্যেই শুধু এতটা করছি! আমি চাই জব্দ করতে অজবাকে। বাগালি থেকে আরম্ভ ক'রে খাইয়ে পরিয়ে বেটাকে 'মানুষ' করেছিলুম, নেমকহারাম বেটা এক কথায় আমার চাকরী ছেড়ে মধু মানার মনিষি করতে চ'লে গেল!"

"তা যা বলেছ, ভাই, মহুর কামীনের এখন বড়ই বাড় হয়েছে। বেশে আর কলে ব্যাটাদের মাথা এমন বিগড়ে দিয়েছে যে, হাজার দিয়েও তাদের মন পাওয়া যায় না। তবে—"

কথা কহিতে কহিতে দলুকে নিরস্ত হইতে দেখিয়া নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "'তবে' বলে চুপ করলে কেন হে ভায়া?"

দলু বলিল, "কর বেটাকে জব্দ।"

গ্রামের যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মুন্সীর এই পলায়নকাহিনীর কেহ অনুকূল, কেহ প্রতিকূল সমালোচনা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। থাকিবার মধ্যে ছিল মাত্র তিন চারি জন। তাহারা পানু কাপড়ীর হাত-লণ্ঠনের সাহায্যে নরহরির অনুগমন করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন সুচাঁদ বাগ, দলু বাবুর অসমাপ্ত কথাটা সমাপ্ত করিতেই যেন নরহরিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মিছে পয়সা খরচ ক'রে তাদের আনাতে যাচ্ছেন, ছোট বাবু? গাঁয়ের লোক দিন কতক ঘুমিয়ে বাঁচত।"

দলু বাবু সুচাঁদের কথা শুনিবামাত্র উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "আমিও ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম, চট্টরাজ।"

সুচাঁদ উৎসাহের উপর উৎসাহ যোগ করিয়া বলিল, "সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই,—ছোট বাবু, আপনি ত গাঁয়ের খবর রাখবার বড় একটা সময় পান না।" বলিয়া সুচাঁদ চুপ করিল।

"ব্যাপারটা কি, দলু ভাই? আমি ত সত্যিই কিছুই জানিনে।"

"আর জিজ্ঞাসা ক'র না দাদা, তুমি ত বাড়ীতে সর্ব্বদা থাক না। ছোঁড়াগুলোর গানের জ্বালায় কান কালা-পালা হয়ে গেছে।"

বাকুড়া সহরে নরহরির ধান-চালের আড়ত ছিল। এই জন্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় তাঁহাকে সেই স্থানেই থাকিতে হইত। সত্য সত্যই গ্রামের সমস্ত সংবাদ জানিবার অবকাশ তাঁহার থাকিত না। সুতরাং বিস্মিতের মতই তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে হইয়াছে।

সুচাঁদ বলিল, "শুধু গান হ'লেও বাঁচতুম, ছোটবাবু, আ আ ই ঈ তারে নারে—সুর তাঁজার জ্বালায় গাঁয়ের লোক অস্থিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।"

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ওই বেটীরই জন্যে? কি বল দলু বাবু?"

সুচাঁদ বাগ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল। দলু বাবু নরহরির কথার উত্তর না দিয়া তাহাকে বলিল, "ও কথা ছেড়ে দে রে, বাগ।"

নরহরি ঈষৎ হাসির সুরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওই ছেলেগুলোও সেই তানসেনের দল না কি?"

"আর ওর কথায় কান দিও না দাদা। তুমি যা ভাল বুঝবে—কর।" বলিয়াই দলু বাবু উচ্চহাস্যে বলিল, "তানসেন হলেও নিস্তার ছিল দাদা। প্রত্যেকেই এক একটি সোরি মিঞা।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া নরহরি বলিলেন, "সমস্তই বুঝতে পারলুম, সুচাঁদ। কিন্তু আজ আবার কাযে যাওয়াতেই ও বাক্তির এই বিপদ হয়েছে—"

সুচাঁদ বলিল, "তা বটে, ছোট বাবু, কিছু না করলে চিরকালের জন্য একটা কথা থেকে যাবে।"

"কথা থাকবার জন্যও নয় রে, ও ছোট জাত, দলু বাবু যা বললে, ওদের ও সব ব্যাপার ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে আমি যদি কিছু না করি, এর পর মনিব, বান্দার পাওয়া দুষ্কর হবে।"

"না ছোট বাবু, বুঝতে পেরেছি।"

দলু বাবু বলিল, "এখন আমি আর চট্টরাজ দু'জনেই ত মুন্সিফে পড়ব। কর দাদা তুমি বেটাকে জব্দ।"

কিন্তু সে দিনও আর অজবাকে জব্দ করিবার কোন উপায় হইল না। রাত্রি অনুমান দশটার সময় রমানাথ ও তাহার সঙ্গীরা ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া নরহরিকে সংবাদ দিল, পলাতকরা হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হয় নাই। তাহারা বোধ হয়, পথিমধ্যে কোন ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছে।

ফুলী—ফুলকুমারী ! দুই এক দিন নহে, চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে মাখমের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। মাখমের পিতা নীলু বাউরী ছিল তাহাদের স্বজাতির মধ্যে মাতব্বর। পুত্রের বিবাহে সে তাহার জাতির হিসাবে যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিল। সভাই হইয়াছিল বাউরীদের মধ্যে তাহা এক সমারোহের বিবাহ। তিন চারি দিন "নাচনী'র নাচ, পচাই ও ভোজ—নীলু একমাত্র পুত্রের জন্ত অনুষ্ঠানের সামান্তমাত্র ত্রুটি করে নাই। ভাল "নাচনী'র নাচ দেখিতে আসিয়া গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকই এই বিবাহের সাক্ষী হইয়াছিলেন।

যখন তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল, তখন ফুলকুমারীর বয়স ছিল নয় বৎসর, মাখমের পোনেরো।

অবিচ্ছিন্ন ভাবে না হইলেও অনেকদিন ফুলকুমারী শ্বশুরের ঘর করিয়াছে। মাঝে মাঝে ক্রিয়াকলাপে দুই দশ-দিনের জন্ত সে তাহার পিত্রালয় জুনবেদের যাইত মাত্র। অতি নিম্নশ্রেণীর বলিয়া হাট-বাজারে গতায়াতে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেও তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে বড় একটা গৃহের বাহির হইতে দিত না। তাহার প্রতিবেশিনী অন্যান্য বাউরী-কন্যারা যেরূপ কখন বাঁকুড়ায়, কখন গ্রামের এর ওর তার বাড়ীতে "কামীনের" কাযে স্বতন্ত্রভাবে অর্থোপার্জ্জন করিত, যত দিন শ্বশুর-শাশুড়ী বাঁচিয়া ছিল, তত দিন ফুলকুমারী সেরূপ কায করিবার অধিকার পায় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে কলেরা রোগে দুই একদিনের ব্যবধান মধ্যে হঠাৎ তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু হইল। কন্যারও ওই রোগে জীবন যাইবার আশঙ্কায় ফুলীর পিতা তাহাকে লইয়া স্বগৃহে পলায়ন করিল।

এক বৎসর ফুলকুমারী আর শ্বশুরগৃহে আইসে নাই। পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া, দুই চারিদিন পরে ঘরে চাবি দিয়া মাখমও জুনবেদের চলিয়া গেল। এক বৎসর কাল মাখম শ্বশুরগৃহেই বাস করিল।

পিত্রালয়ে আসিবার অল্পদিন পরেই ফুলকুমারী "কামীনের" কায আরম্ভ করিয়াছিল। বাউরীকন্যা, যখন সে কায করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, কেন সে উদরান্নের জন্ত বাপ-মার গলগ্রহ হইয়া থাকিবে ? তাহার পিতামাতারই বিশেষ আগ্রহে সে মজুরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল।

এইবার সে শ্বশুর-গৃহের পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া পিতৃগৃহের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। প্রতিবেশিনী সঙ্গীদের সঙ্গে বাঁকুড়ার ধানকলে, তামাকের আড়তে, ইটপোলায় কায করিবার জন্ত জুনবেদে হইতে সহরে অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিল।

এই যাতায়াতের ফলে তাহার চোখ অনেকটা ফুটিয়াছিল, বাহিরের লোকের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথাবার্ত্তায় কুলবধূর যে লজ্জা-সঙ্কোচ, সেটা গিয়াছিল। তখন সে পথচারী যে কোন পুরুষের সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা কহিতে পারিল, এমন কি তাহাদের হাস্ত-পরিহাসে উত্তর-প্রত্যুত্তররূপে হাস্ত-পরিহাসে যোগ দিতেও সে আর পূর্ব্বের মত লজ্জাবোধ করিত না।

সে শ্যামী-বর্ণা ছিল। কিন্তু তাহার দেহের গঠন, তাহার মুখ, নাক, তাহার গ্রীবার ভঙ্গিমা, বিশেষতঃ, দীঘির কালো-জলের উপর ভাসিয়া উঠা প্রস্ফুটিত পদ্মের মত তাহার দুইটী চক্ষু এই অসিতাঙ্গীর রূপকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল যে, যখন সে প্রাতঃকালে স্নানাহার নিষ্পন্ন করিয়া মুক্তকেশ পৃষ্ঠে ছড়াইয়া তাহারই সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে কাযে যাইত, তখন পথে অনেকেরই দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না।

এই সময়ে অজবার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। অজবা রেলের মাটীকাটা উপলক্ষে তখন মাধববাটী হইতে বাঁকুড়ায় আসিত। প্রায় একই সময়ে অজবার ও মাখমের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী বিবাহের পর অধিক দিন জীবিত ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে সে একটা সাঙ্গা করে। সেই সাঙ্গার স্ত্রীরও ছয় মাস পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল। গ্রামের বধূ—কাযেই স্বামীর এই বন্ধুর কাছে পূর্ব্বেই ফুলী পরিচিতা ছিল। কিন্তু তথায় সে কখনও অজবার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ লাভ করে নাই। এখন পিত্রালয়ে তাহার সে ভাব ছিল না। তাহার উপর বাড়ীর বাহিরে কাযে প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষদের সঙ্গে আলাপের সঙ্কোচও দূর হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় অজবার সঙ্গে তাহার যখন প্রায়ই দেখা হইত, তখন প্রথমে অজবার স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষ করিয়াই উভয়ে আলাপ আরম্ভ হয়। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। পথিপার্শ্বে উভয়ের হাস্ত-পরিহাস যে কোন দিন ফুলকুমারীর সঙ্গিনীদিগের দৃষ্টিপথে পতিত

হয় নাই, এখনও নহে। তথাপি তাহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কথা বলিবার মত কাষ তাহার আত্মীয়গণের মধ্যে কেহ তাহাকে করিতে দেখে নাই। মাধব ত দেখেই নাই, শুনেও নাই। শ্বশুরগৃহে আশ্রয় লইয়া সে তাহার স্ত্রীর তৎপ্রতি আসক্তির কিছুমাত্র লাঘব অনুভব করে নাই, বরং স্ত্রীকে মুক্ত করিয়া অর্থসম্বন্ধে সে বিশেষ লাভবানই হইয়াছিল। দুই জনে সমানভাবে খাটিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহারা দু'পয়সার সঞ্চয় করিয়াছিল। জাতিগত স্বাধীনতায় ফুলকুমারীর উক্তরূপ আনন্দের আচরণ তাহাদের সমাজে দোষ বলিয়া গণ্য হইত না।

এইরূপভাবে প্রায় এক বৎসর সে তাহার পিতৃগৃহে বাস করিয়াছিল। এই এক বৎসরের মধ্যে খুড়া অটল ও তাহার একমাত্র কন্যা ভাবিনীর তত্ত্ব লইতে মাধব অনেকবার মাধববাটীতে আসিয়াছিল, ফুলকুমারী আইসে নাই। আসিবার জন্য স্বামীর মুখে ভাবিনীর অনুরোধের কথা অনেকবার সে শুনিয়াছিল, কিন্তু সে অনুরোধ রাখে নাই, অথবা তাহার মা-বাপ রাখিতে দেয় নাই। একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকায় তাহাদের অবস্থিতিতে ফুলকুমারীর বাপের সংসারখরচ সম্বন্ধে অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল।

শ্বশুর-গৃহে বাস করায় মাধবের বিশেষ কোনও অসুবিধা না থাকিলেও একটা অভাব সে নিত্য অনুভব করিত। তাহার স্বতন্ত্র বাসগৃহ ছিল না। বৎসরের শেষে যখন ফুলবেদের বাদ তাহার সাবাস্ত হইয়া গেল, তখন তাহার স্বতন্ত্র গৃহেরও প্রয়োজন হইল।

মাধববাটীর ঘর লোকাভাবে অনেকটা জীর্ণ হইলেও তখনও ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হয় নাই। গৃহনির্ম্মাণ করিতে যে সকল সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, তাহার অনেকাংশ তাহার পুরাতন ঘর হইতে পাইবার সম্ভাবনা জানিয়া মাধব এক দিন মাধববাটীতে চলিয়া গেল।

ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে মধুসূদন পরীক্ষা ওরফে মধুপন্থে নরহরি চট্টরাজের বহুকাল হইতে নিযুক্ত মনিষ অজবাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিল। সম্মুখে বর্ষা, চাষের জন্য এক জন কর্ম্মক্ষম মনিষের একান্ত প্রয়োজন। চট্টরাজ মহাশয় কয় দিন ধরিয়া উক্তরূপ মনিষের অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

মাধবের আর ফুলবেদের ঘর করা হইল না। অটলের—বিশেষতঃ ভাবিনীর অনুরোধে মাধব চট্টরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে উপযুক্ত দাদন গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহে চাকরী স্বীকার করিল। তাহার স্ত্রী ফুলীর জন্যও সে চাষের সময়ে যথোপযুক্ত "বেরুণ" পাইবার আশ্বাসে দাদন গ্রহণ করিল। গ্রহণ করা ভিন্ন মাধবের অন্য উপায় ছিল না। চট্টরাজ মহাশয়দের চাকরাণ জমীতে বাস, চাকরী স্বীকার না করিলে ঘর ভাঙ্গিয়া অন্যত্র লইয়া যাইতে তাহার অধিকার ছিল না।

অগত্যা ফুলী স্বামীর সঙ্গে বহুদিনের পর আবার শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিল।

৬

মধুবাবু নরহরিকে যতটা বলিয়াছিল, ততটা না হইলেও ফুলীর মাধববাটীতে পুনরাগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের যুবকদের মধ্যে গানের চর্চ্চাটা হঠাৎ কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু গান বলা ঠিক হয় না, অধিকাংশ সময় চর্চ্চা হইত সুরের, অর্থাৎ "তানা নানা তেরে নারে। সুর কখন উঠিত ছত্রী বাবুদের "বড়মেলার" রোয়াকে, কখন উঠিত "মনসা-মেলার" প্রাঙ্গণে, কখন পথে, কখন মাঠে, কখন বা গাঙ্গলিগোড়ের পার্শ্বস্থিত পরশদের আম্রকাননে। তাহার সময়ের কোনরূপ স্থিরতা ছিল না—কখনও প্রভাতে, কখনও সন্ধ্যায়, কখন বা গভীর রাত্রিতে।

শ্বশুরগৃহে আসিয়া ফুলী এবার আর ঘরে আবদ্ধ থাকে নাই। সে কায করিতে যাইত। সে কখন স্বামীর সঙ্গে, অধিকাংশ সময় ভাবিনী প্রভৃতি প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে এখানে সেখানে যাইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়াই হউক, কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক, 'ভদ্র'গৃহের দুই একটি নিষ্কর্ম্মা যুবক এ সময় সত্য সত্যই একটু অস্বাভাবিক ভাবে উল্লসিত হইয়াছিল। সেই উল্লাসের ফলে গ্রামবাসীরা কিছুদিন হইতে কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তথাপি ফুলীর বিরুদ্ধে কথা কহিবার মত কায কেহ তাহাকে করিতে দেখে নাই।

জাতির অস্পৃশ্যতাই হউক, অথবা উচ্চবর্ণের উপর আন্তরিক বিদ্বেষই হউক, বর্ম্মস্বরূপ হইয়া এই বাউরী-কন্যার বিপদ হইতে আত্মরক্ষার সহায় হইয়াছিল।

সুতরাং অজবার সঙ্গে ঐরূপ অতর্কিতভাবে ফুলীর পলায়ন গ্রামবাসীদের পক্ষে অনেকটা বিস্ময়ের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

কখন, কি ভাবে, কেমন করিয়া উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের স্বজাতীয়ের মধ্যেও কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। এমন কি, ভাবিনী পর্য্যন্ত তাহা বুঝে নাই। অজবা ছিল মাখমের বাল্যবন্ধু। সেই বন্ধুত্বের সূত্র ধরিয়া কার্য্যাবসরে সন্ধ্যার পর অনেক সময় সে মাখমের ঘরে অতিবাহিত করিত।

অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা, গল্পগুজব, হাস্য-পরিহাস চলিত বটে, কিন্তু তাহাতে মাখম অথবা অজবার উপর অসন্তুষ্ট হইবার অনেক কারণ থাকিলেও, ভাবিনী ফুলীকে দোষ দিবার কিছু দেখিতে পাইত না। সুতরাং ফুলীর সেই দুর্ব্বোধ্য আচরণে সে প্রথমটা স্তম্ভিতেরই মত হইয়া গিয়াছিল।

মাখম ঘরে ফিরিতেই ভাবিনী একটু রাগের সুরে বলিল, "ও তুই গাড়োলের মত মনিবকে কি বল্‌লি দাদা? বউকে ফিরিয়ে আন্‌লে তুই কি তাকে ঘরে নিবি নে?"

মাখম এই কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, "ঘরে ভাত রইছে?"

"বউকে আমি তত দোষ দিই না, যত দোষ দিই তোকে।"—বলিয়াই সে অজবার উদ্দেশে কতকগুলা তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়া সেই দুষ্টটাকে নানাভাবে প্রহার দিবার জন্য ভাইকে একটু নির্ম্মম ভাবেই তিরস্কার করিল।

মাখম বলিল, "কিছু খাবার থাকে ত দে, ভাবি, নইলে আমি কপাট দিয়ে শুয়ে পড়ি।"

"ভাত ত রইছে। তোকে যে তখন খাবার লেগে কত সাধলুম।"

"আর সাধতে হবে না, বড় খিদে লেগেছে রে বোন্।"

আর কোনও কথা না বলিয়া ভাবিনী কেবল বলিল, "তা হ'লে টুক্‌চে অপিক্ষে কর, আমি চ'লে গেলে আবার ঘরে কপাট দিস্‌নে।"

ভাবিনী প্রস্থান করিল। মাখম দুই হাঁটুর ভিতরে মাথা রাখিয়া দাওয়ার উপর উপবেশন করিল।

অল্পক্ষণ মাত্র সে বসিয়াছে, এমন সময় অটল আসিয়া তাহাকে ডাকিল, "মাখমা!" দাওয়ার অন্ধকারে বসা মাখমকে প্রথমটা সে দেখিতে পায় নাই। দ্বিতীয়বার তাহাকে সম্বোধন করিতে গিয়া তাহাকে সে উক্তভাবে উপবিষ্ট দেখিল। দেখিয়াই মাখমকে আশ্বাস দিতে সে একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "ভয় কি রে! আমি দুই মনিষকেই শুনিয়ে বলেছি, অজবা বেটাকে যদি শাসন না কর, হুজুর, তা হ'লে নিশ্চয় বল্‌ছি, পুড়োভাইপোর আমরা গাঁ ছেড়ে চ'লে যাব। আমরা আর দেবতায় পর্য্যন্ত খাতির রাখবনি—হুঃ! মাগন ক'রে খেতে হয়, তাও সি আচ্ছা—হুঃ।"

এই সময় ভাতের থালা হাতে পশ্চাৎ দিক্ হইতে ভাবিনী আসিয়া অটলকে বলিল, "যা রে বাবা, তোরও ভাত বেড়ে রেখে এলুম, খেয়ে নিগে যা। রাত ঢের হইচে।"

ক্রোধের সমস্ত লক্ষণ "হুঃ হুঃ" শব্দের উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে অটল নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তাহারও পেটে জ্বালা ধরিয়াছিল। মাখমের উত্তর শুনিবার কিম্বা তাহার কথায় সে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হইল, বুঝিবার ধৈর্য্য তাহার রহিল না। মাখম কিছুই বলিল না।

সেই দাওয়ারই উপরে ভাতের থালা রাখিয়া ঘরের ঘড়া হইতে জল আনিয়া, দাদাকে আহার করিতে অনুরোধ করিয়া ভাবিনী তাহার সম্মুখেই উপবিষ্ট হইল—আর সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। মাখম কিন্তু আহার করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর তাকে ফিরিয়ে আনা কি উচিত হয় রে, ভাবি?"

"উচিত হবে না কেন যে? ঘরের বউ, একটা ভুলই না হয় ক'রে ফেলেছে! সেটা কার দোষে এখনও যখন বুঝতে পার্‌ছি না, তখন ও রকম কথা কস্‌নি, দাদা। আমি একবার দেখতে পেলেই চুলের মুঠি ধ'রে হতচ্ছাড়ীকে ঘরকে নিয়ে আস্‌বো।"

"আমি যে তার মুখের দিকে আর চাইতে নারব রে!"

"দেখ, ভাই, অলটা কথা কস্‌নি, আমার ভালো লাগছে না।"

"ভাল, বোন্, পারিস্ ত নিয়ে আয়।"

চটরাজ মহাশয়ের মত লোক যখন তাহাদের বউকে ফিরাইয়া আনিবার আশ্বাস দিয়াছেন, তখন সে যে কেন আসিবে না, ভাবিনী বুঝিতে পারিল না। ফুলকুমারীর ফিরিয়া আসার ধ্রুব বিশ্বাসে সে কেবল বলিল, "এলে যেন বউকে মারধর করিস্‌নি, দাদা!"

"কবে আমি তাকে মারধর্ করেছি?"

"করিস নি ত জানি। কিন্তু হতভাগীর ওপর এমন

রাগ হচ্ছে দাদা, যে দেখতে পলে তাকে আমারই বাঁটা মারতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"পারিস্ ত নিয়ে আয়। কিন্তু—" বলিয়া মাধব কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল।

"কিন্তু কি দাদা ?"

"আমি তার মুখের দিকে আর যে চাইতে পারব না, ভাবি !"

এ কথার উপরে ভাবিনীও কিছুক্ষণের জন্য কথা কহিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল, "মেয়েলোকের বুদ্ধি, দাদা, তোকে কথা যোগাতে করতে হবে।"

"ভালা, তাকে নিয়ে আয়।"

৭

কিন্তু কে তাহাকে লইয়া আসিবে ?

রঘানাথ, গতি ও অন্যান্য যুবক স্থির করিয়াছিল, অজবাকে ধরিতে পারিলে, তাহাকে একবারে যমের বাড়ীতে না হউক, অন্ততঃ তাহার একরশী দূরে নিক্ষেপ করিয়া আসিবে।

কিন্তু হায়, অজবার কোনও সন্ধান না পাইয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া তাহারা ষ্টেশন হইতে রাত্রি অনুমান দশটার সময় ঘরে ফিরিয়া আসিল। নরহরি বুঝিলেন, তাঁহার কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইল মাত্র। মাধব রঘাই বাবুর অকৃতকার্য্যতার কথা পরদিন শুনিল, ভাবিনীও শুনিল।

শুনিয়া মাধব অন্তরের ভাব কিছু মাত্র প্রকাশ না করিলেও ভাবিনী কোনও মতে রোদন সংবরণ করিতে পারিল না। মুন্নী যাহাই হউক, সে তাহাকে ভালবাসিত। প্রায় বৎসরেক কাল সে ফুলকুমারী হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাহাকে লইয়া ঘরে ফিরিতে সে দাদাকে কত অনুরোধ করে নাই। তাহার বিশ্বাস, অন্যের কথায় না হউক, শুধু তাহারই অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া, তাহার দাদা তাহার ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া জুনবেদে হইতে মাধববাটীতে আসিয়াছে।

সত্যসত্যই পরদিন প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়াই সে কাঁদিল এবং অজবার উদ্দেশে ও তাহার মা ও আত্মীয় স্বজনকে শুনাইয়া যত পারিল গালি দিল।

মাধব ও অজবা উভয়েই ছিল পরীক্ষাদের প্রজা। নরহরি মাতামহের সূত্রে পরীক্ষাদের সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছিলেন। সুতরাং অজবার উপর প্রভুত্বে মধু পরীক্ষার মত তাঁহারও অধিকার ছিল।

তাঁহার চাকরী ছাড়িয়া যে দিন অজবা মধু পরীক্ষার চাকরী গ্রহণ করিল, সেই দিন হইতেই নরহরি তাহাকে মর্য্যাদার অনুরোধে শাসন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। মাধবের জন্য তাঁহার ভাবনা যতটা না ছিল, তাহার অনেকগুণ ভাবনা হইয়াছিল, তাহার ভগিনী ভাবিনীর।

গাঙ্গলিগোড়ের দুই দিকে ছিল উচ্চভূমি। একদিকে বাস করিত মাধব ও তাহার পুত্রা অটল, অপর দিকে অজবা। গাঙ্গলিগোড়ে একটি অনতিবৃহৎ জলাশয়। গ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র পুষ্করিণীগুলা যেমন জলশূন্য হইত, এটা সেরূপ না হইলেও ইহার জল এত নীচে নামিয়া যাইত যে, দুই পাড় পরস্পর হইতে দশ বারো হাত ব্যবধান থাকিত মাত্র। এক দিন—দুই দিন—তিন দিন, যখন অজবা ও ফুলকুমারীর কোনও সংবাদ কেহই তাহাদের আনিয়া দিতে পারিল না, তখন বাসন রাজার উপলক্ষে একদিকে বসিয়া ভাবিনী ও অপর দিকে বসিয়া অজবার মা ও ভগিনী—এক জন অজবার নাম লইয়া, অন্য দুই জন মুন্নীকে উপলক্ষ করিয়া, সর্ব্বশেষে পরস্পরে গালাগালি আরম্ভ করিল।

মাসখানেক সময় এই ভাবেই কাটিয়া গেল। মাঘের শেষ ফাল্গুনের আরম্ভ। গ্রামের ক্ষেত্রের কার্য্য ধানকাটা এই সময় একরূপ শেষ হইয়া যায়। যাহারা মনিবদের বাঁধা মুনিষ, তাহারা ভিন্ন গ্রামের প্রায় অধিকাংশ বাউরীই এই সময় রোজগার করিতে "নামাল" চলিয়া যায়। "নামাল" অর্থে নিম্নভূমি—হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানকে ইহারা নামাল বলিয়া থাকে। সে সব স্থানে মাঘ ফাল্গুন হইতে আষাঢ়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা নানা কাজে অর্থোপার্জ্জন করে; বর্ষা আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বেই মাঠের কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য আবার গ্রামে ফিরিয়া আইসে। যাইবার সময় তাহারা স্ত্রীপুত্রাদিগকে সঙ্গে লইয়া যায়। কঠোর পরিশ্রম করিতে যাহারা অশক্ত, পুরুষ অথবা স্ত্রী, অধিকাংশ সময়েই বুড়া ও বুড়ী, তাহারাই কেবল ঘর আগুলিবার জন্য গ্রামে থাকে। সে বৎসর গ্রামে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য হয় নাই। এই জন্য মাঘ শেষ হইতে না হইতেই বাউরীদের মধ্যে অনেকেরই নামাল যাইবার প্রয়োজন হইল।

"আপনাতে আপনি বিকাশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী ?"

—রবীন্দ্রনাথ।

মাধব ছিল নরহরির সংবৎসরের বাঁধা মনিষ। তাহার গ্রাস ছাড়িবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অটলের মা ছাড়িলে চলিবে না। সে দনু বাবুর মনিষ বটে, কিন্তু সারা বছরের জন্য বাঁধা ছিল না।

ভাবিনী ছিল অটলের একমাত্র কন্যা—বিধবা। তাহাদের জাতির প্রথা অনুসারে "সাঙ্গা" করিবার যথেষ্ট বয়স থাকিলেও, সে দ্বিতীয় পতি পরিগ্রহ করে নাই। তাহার মা জীবিত ছিল না; পুত্র-কন্যাও ছিল না। ছিল মাত্র এক পিসী—অটলের অপেক্ষা সে বড়।

সেই পিসীকে ঘরে রাখিয়া ভাবিনী তাহার পিতা ও অন্যান্য বাউরি ও বাউরীদের সঙ্গে নামাল চলিয়া গেল। আশ্চর্য্যের কথা, সমস্ত কলহ ধামা-চাপা দিয়া অজবার ভগিনী পস্‌নি (প্রসন্ন) ও তাহার স্বামী কৃত্তিবাস ওরফে কিতে বাউরীও ভাবিনীর সঙ্গে চলিল। অপ্রসন্ন কেহই নহে, যেন কোনও কালে তাহাদের ভিতরে কোনও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় নাই।

যাইবার সময় মাধবকে সে বুঝাইয়া গেল, ফুলী যদি একান্তই না ফিরে, তাহা হইলে ছাতার কানালী গ্রামে শ্বশুরঘরে তাহার যে এক অল্পবয়সী বিধবা ননদ আছে, নামাল হইতে ফিরিয়া সে তাহার সহিত মাধবের সাঙ্গা করাইয়া দিবে।

৮

তিন মাস দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইয়া গেল। বর্ষা আসিতে আর বড় বিলম্ব নাই। আর দশ বারো দিনের ভিতরেই বাউরীর দল, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গ্রামে ফিরিয়া আসিবে। ফুলকুমারীকে উপলক্ষ করিয়া গ্রামের মধ্যে দুই দশ দিন যে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নিবিয়া গেল। সমাজের অতি নিম্ন স্তরের এই হীন কথা লইয়া উচ্চশ্রেণীর জনগণের মধ্যে যতটা আন্দোলন হওয়া সম্ভব, সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় সময়ে অসময়ে যে সুরের উচ্ছ্বাস উঠিত, তাহাও যেন ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া, ভবিষ্যতের গল্পের বিষয়ে পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে। ফুলীকে ফিরাইবার জন্য মাধবের বিশেষ আগ্রহ দেখিতে না পাইয়া, আর ফুলীর অভাবে তাহার কার্য্যে বিশেষ অনাস্থা না দেখিয়া, নরহরিও অজবাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিবার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইয়াছেন। সমস্ত গ্রামটার ভিতরে মর্ম্মবেদনা লইয়া পড়িয়া আছে, এক দিকে মাধব, অন্যদিকে অজবার মা। অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর জন্য মাধব যতটা মনোব্যথাই ভোগ করুক না কেন, সেই অভাগীর অপরাধের জন্য অজবার মা এই দীর্ঘ তিন মাস এক মাত্র পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বড় অল্প মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে না।

এই তিন মাসের মধ্যে অজবার মা বহুবার তাহার পুত্রের প্রভু মধু পরীক্ষার কাছে কাঁদিয়া আসিয়াছে। মধু আশ্বাস দিয়াছে, তাহার পুত্র যেখানেই থাকুক না, সন্ধান পাইলেই সেই স্থান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিবে। শুধু তাহাই নহে, মধু ঠাকুর বলিয়াছে, অজবা ফিরিলে চট্টরাজরা যদি তাহার উপর অত্যাচার করিতে যায়, সে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবে।

কিন্তু এই তিন মাসের মধ্যে কেহ জানিতে পারিল না, অজবা ও ফুলী কোথায়? যাহারা নামাল গিয়াছিল, তাহারা উভয়কে খুঁজিয়াছে। সন্ধান পাইলে নিশ্চয়ই গ্রামে খবর আসিত।

অজবার মা, বিশেষতঃ মধু পরীক্ষা নিজে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। ইহার মধ্যে একটা বেশ বড় রকমের বৃষ্টি হইয়া চাষের "বতর" হইয়া গেল। চট্টরাজের জমীর প্রায় বার আনা জমীতে লাঙ্গল দেওয়া হইল। তাহার একবিঘা জমীতেও এখন লাঙ্গল পড়িল না! অথচ এখন নূতন মনিষ পাওয়া বড়ই দুর্ঘট। গ্রামের লোক পূর্ব্ব হইতেই কোথাও না কোথাও "কাঁকড়া" লইয়া আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অজবার সন্ধান গ্রামের সকলের অপেক্ষা মধু পরীক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

মধ্যে বেশ আর একটা বৃষ্টি হইয়া হলবর্ষণের আর একটা সুযোগ হইল। এবারও "বতর" যদি উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে মধু পরীক্ষার জমীর পক্ষে বিলক্ষণই ক্ষতি হইবে। ব্রাহ্মণ, মনিষের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

বৃষ্টির পর দুই চারিদিনের রৌদ্রে ক্ষেত্র যখন ঈষৎ শুষ্ক হয়, তখনই তাহা হলচালনের উপযোগী থাকে। ইহাকেই পশ্চিমবঙ্গে বলে "বতর" এবং পূর্ব্ববঙ্গে বলে "বো"।

চট্টরাজের অবশিষ্ট ক্ষেত্র কর্ষণের জন্য মাধবও সেই

শুভতার প্রতীক্ষা করিতেছিল। দুই দিন সে একরূপ নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামসুখ ভোগ করিল। তৃতীয় দিবসে আবার তাহাকে লাঙ্গল ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যার পর কাজ করিবার কিছু না থাকায় ঘরের দাওয়াটিতে বসিয়া মাধব গান গাহিতেছিল। তাহার প্রতিবেশীদের মধ্যে সকলে তখনও ফিরে নাই। তাহার নিজের 'বাকুলে'র মধ্যে এক দিকে ছিল অটলের ঘর আগুলিয়া তাহার পিসী; অপর দিকে ছিল একমাত্র সে। আর কেহ থাকিলে বলিতে বাধা হইত, গত তিন মাসের মধ্যে একটি দিনের জন্যও মাধব এরূপ প্রফুল্লতা লইয়া উপবিষ্ট হয় নাই।

তাহার প্রফুল্লতার বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল। ফুলীর চলিয়া যাওয়ার পর একটি দিনের জন্যও সে নেশা করে নাই! আজ সে করিয়াছে। মনিবের ঘর চষিতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের ওঁড়িখানা হইতে এক পেট "পচাই" পান করিয়া সে ঘরে ফিরিয়াছে।

বাউরী জাতের মধ্যে ওই একটা প্রচণ্ড অব্যক্তি—জ্ঞানদোষ, যাহার জন্য মজুরীতে যথেষ্ট পয়সা পাইয়াও তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচে না, সেটা পূর্ব্বে মাধবের ছিল না; তাহার বাপ না জীবিত থাকিতে একবারেই ছিল না। শ্বশুরগৃহে অবস্থান কালে বিবাহাদি দুই একটা উৎসবে সেই স্থানের সমবয়স্কদের অনুরোধে দুই একবার সে পচাই পান করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে "কালে-ভদ্রে"।

তাহার স্বগৃহে ফিরিয়া আসার পর তাহার সাঙ্গাৎ ওই অজবা তাহাকে মদ্যপানে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। মাঝে মাঝে সে মাধবকে কুমোরহাটির পচাইখানায় ধরিয়া লইয়া যাইত। এইরূপে অল্পকালে সে তাহার বন্ধুকে মদ্যপানে অনেকটা অভ্যস্ত করিয়াছিল।

তথাপি মাধব তাহার সাঙ্গাতের মত বদ্ধ-মাতাল ছিল না, মদ্যপান অজবার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল, মাধব কোনও দিন সেরূপভাবে মদ্যপান করে নাই। বিশেষতঃ ফুলকুমারীর চলিয়া যাওয়ার পর হইতে আজিকার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সে মদ্য স্পর্শও করে নাই। আজ করিয়াছে। শুধু স্পর্শ করা নহে—আজ সে পচাই পূর্ণমাত্রায় পান করিয়াছে, অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার পেটে ধরিয়াছে। কেন সে এরূপ করিল, তাহার কারণ নির্ণয়ের লোকও সে সময় পাড়ায় বড় একটা কেহ ছিল না। নেশায় বিভোর হইয়া টলিতে টলিতে মনে মুখে যাহা আসিয়াছে, গাহিতে গাহিতে সে আজ ঘরে ফিরিয়াছে।

পথে আসিবার সময় মোকানী সুচাঁদ বাগ তাহার এই বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাহার দোকান হইতেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, স্ফূর্ত্তির একটা কারণ অনুমান করিয়া—"বউএর সন্ধান পেয়েছিস্ নাকি রে মাধব?"

"হুঃ, বাগ খুড়া—নমস্কার।"

"কোথায় রে?"

"সেইটি বল্‌তে নারব, খুড়া!"

"কেন নারবি, বল্, মধু পদ্মখে তার মনিবের সেগে পাগলের মত ঘুরে বুলছে।"

"বুল্‌চেক বইকি খুড়া, দু'টা দু'টা বতর গেল—জমীতে হাল পড়লো না। মন থির রইবেক লাতো!"

"জেনে থাকিস্ ত বল্। পদ্মখে ঠাকুরুকে আমি খবর দি।"

ইহার উত্তরে মাধব গান ধরিল,—

"রূপসুলখা পিসী রে মরতে যদি রামের কাছেই গেলি।
লাকটা কেনে খুয়ে ঘরে চাবি না দিলি॥
তোর লাকের লেগে লঙ্কা ছারে খার,
বাবার বংশে বাতি দিতে রইল না কেউ আর।
মরি হায় রে, পিসী রে—তোর লাকের লেগে এএএ—"

গাহিতে গাহিতে টলিতে টলিতে বামগণ্ডে হাত দিয়া তানের উপর তান যোগ করিতে করিতে মাধব ঘরে চলিয়া আসিল।

ঘরের দাওয়াটিতে একাকী বসিয়া ঐরূপ 'পিসী পিসী' বলিয়া সুর ভাঁজিতে লাগিল।

শুনিয়া সত্যই তাহার পিসী অটলের ভগিনী, তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং আহারের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। মাধব উঠে নাই; যেহেতু সে আহারের প্রয়োজনীয়তা একবারেই অনুভব করে নাই।

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া পিসী যখন চলিয়া গেল, তখন সে কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরবে বসিয়া রহিল; এমন নীরব যে, যদি কেহ সেখানে উপস্থিত হইত, তীক্ষ্ণদৃষ্টির সাহায্যে অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইত, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিত না।

অনেকক্ষণ বসিয়া মাধব দীর্ঘশ্বাস সহযোগে একটি হুঙ্কার দিল। দিয়াই কি যেন একটা অপরাধ করিয়াছে, এই-রূপ ভাবে আপনাকেই গোটা দুই গালি দিয়া সে আবার গান ধরিল :—

"হরি হে তোমায় ভালবাসি কই ?
তোমায় যদি বাস্‌তুম ভালো, জানতুম নাকো তোমা বই।"

গান শেষ হইতে না হইতে তাহার কানে শব্দ গেল, "মাধমা !"

মাধব শুনিয়াও শুনিল না। সে তখন আবার গণ্ডে করতল দিয়া বেশ উচ্চকণ্ঠেই তান ধরিল,—

"হরি হে, ওহে হরি, হরি-ই-ই।"

আবার শব্দ আসিল, "মাধব বাউরি !" কে সে ডাক শুনে ! সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুর উচ্চ হইতে আরও উচ্চে উঠিল, "হরি-হে-এ-এ-এ !"

মাধবের নামে ডাক অটলের ভগিনীও শুনিয়াছিল ! সে ছুটিয়া আসিয়াই তাহাকে বলিল, "শুনতে পাইছুস্ না মাধমা ?"

"কি পিসী ?"

"মনিব ডাকছে, শুনতে পাইছুস না ?"

"ও মনিব নয় রে, পিসী !"

"কে তবে ?"

উত্তরে মাধব কিঞ্চিৎ নিম্ন কণ্ঠে গাহিল,—

"হরি-হে-এ-এ।"

পিসী তথাপি সম্বোধনকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে অনুরোধ করিল। যখন দেখিল, মাধব তাহার অনুরোধ রক্ষা করিল না, তখন তাহার মাথা ঠিক নাই বুঝিয়া পিসী চলিয়া গেল।

আবার সে হরি শব্দের উপর সুর সংযোগের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় তীব্র কণ্ঠে তাহার অতি নিকটেই তাহার নাম উচ্চারিত হইল, "মাধমা !"

মাধব মাথা তুলিল ; দেখিল, তাহার অপবিত্র গৃহ-প্রাঙ্গণে চালির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মধু পরীক্ষা।

তাহাকে দেখিয়াই অতি সঙ্কুচিতভাবে করযোড়ে মাধব প্রণাম করিল।

প্রণামের উত্তরে পরীক্ষা মহাশয় একান্ত লীলভাবর্জিত ভাষায় তাহাকে গালি দিয়া বলিলেন, "মা কাড়ছিস্ না, হয়েছে কি রে ?"

"কিছুই হয় নি হুজুর।"

"তবে ?"

"বলুন হুজুর !"

"এত যে ডাক্‌লুম, শুনতে পাস্ নি ?"

"পেয়েছি হুজুর—বাবা ঠাউর !"

শুনিয়াই মধু পরীক্ষার ক্রোধটা বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। একটা নীচ বাউরীর স্পর্দ্ধা এতদূর বাড়িয়াছে যে, সে তাঁহার ডাক কানে না তুলিতে সাহস করিল ! কিন্তু নিজের একটা বিশেষ স্বার্থের জন্য তাঁহাকে ক্রোধ সংযত করিতে হইল। কথা কহিতে কহিতেই পরীক্ষা বুঝিলেন, মাধমা মাতাল হইয়াছে। তাহার পর তাঁহার কথার উত্তর দিয়াই মাধব যখন নাসিকার সাহায্যে আবার সুর ধরিল, তখন তাঁহার সমস্ত ক্রোধ দূর হইয়া গেল। তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি, আজ তোর হ'ল কি রে, মাধমা ?"

"নোতুন কিছু হয় নাই হুজুর, যা হবা'র তা হয়ে গেছে।"

"আমি তোর কাছে বড় দরকারে এসেছি। একটা বতর চ'লে গেছে, আর একটা যায় যায় হয়েছে, অথচ আমার এক বিঘে জমীতেও লাঙ্গল পড়ল না।"

"তা তো দেখতেই পাইছি, হুজুর।"

"অথচ তোর মনিবের প্রায় সমস্ত জমীতেই লাঙ্গল দেওয়া হয়ে গেল।"

"তা হলেন বই কি, হুজুর। ঘোষালের দোলের সেই পাঁচ বিঘে বাকড়া শুধু বাকী রইছেন।"

"তা হ'লে আমার কি হবে, মাধম ?"

"মনিব পেলে না, হুজুর ?"

"কোথা থেকে পাবো ? অভাব বেটার লেগে আর কাউকেও ত কাঁকড়া দিতে পারলুম না !"

বলিয়াই পরীক্ষা মশাই মাধমকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই যেন অভাবকে উদ্দেশ করিয়া যৎপরোনাস্তি গালি দিলেন।

মাধব সে সমস্ত গালি নীরবে শুনিল মাত্র।

"এখনও ত আর ভালো মনিব পাবার কোনও উপা দেখছি না, মাধম।"

মাধব একটি মৃদু হুঙ্কার দিয়া বলিল, "তা বটে।"

"বটে না ?"

"বটেই ত হুজুর, ভালো মনিষ আর কুথাকে মিল্‌বেক! বিশেষ ক'রে অভয়ার মতন মনিষ। তার মতন কায করতে আমিও রাজি হুজুর।"

পরীক্ষা আসিয়াছিলেন মাধবের নিকট হইতে অভয়ার সন্ধান লইতে। মুচীদের দোকানে "হাট" করিতে আসিয়া তিনি তাহারই নিকটে শুনিয়াছেন, মাধব ফুলীর সন্ধান কোথা হইতে কেমন করিয়া জানিয়াছে। যেখানে ফুলী সেইখানেই অভয়া। তাহাদের গোপন স্থানটী কোনও রকমে মাধবের নিকট হইতে জানিতে হইবে। একবারে সেই প্রশ্ন করিলে পাছে মাধব কথা প্রকাশ না করে,—তাই ভয়, মৈত্র, কথার কৌশল প্রভৃতি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য পরীক্ষা মহাশয় প্রস্তুতই হইয়া আসিয়াছেন। তিনি জানিতেন, একটু চতুরতার সহিত প্রশ্ন করিতে পারিলেই বর্ব্বর বাউরী পেটে কথা রাখিতে পারিবে না। এতক্ষণের কথা-বার্ত্তায় অভয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সুবিধা হয় নাই, এইবারে হইল। অভয়ার উদ্দেশে আবার তিনি কতকগুলা গালি দিলেন। মাধবের ন্যায় নিরীহ ধার্ম্মিক বন্ধুর উপর অভয়ার সেই নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা যে কত বড় পাপ, নিষ্ঠাবান্ 'বাবাঠাকুর' হইয়াও তিনি তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না। মৃত্যুর পরে অভয়াকে কোন্ নরকে যে যাইতে হইবে, তাহাও তিনি কল্পনার অনুসন্ধানে খুঁজিয়া পাইলেন না।

অভয়া সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া মধুঠাকুর মাধবের মুখ হইতে দুই একটা কথা শুনিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছু বলা দূরে থাকুক, সমস্ত সময়টা সে নিশ্চল পাষাণের মত বসিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত তাহার নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন না। সে এখন মাতাল, তাঁহার কথা শুনিতে পাইল না মনে করিয়া, অসত্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "ঘুমুচ্ছিস্ নাকি রে?"

মাধব এখনও নিরুত্তর। অনিচ্ছাতেই হউক, অথবা ফুলীসম্বন্ধীয় আলোচনার নূতন ভাবে জাগিয়া উঠা মর্ম্মবেদনার জন্যই হউক, তাহার মুখ হইতে কোন উত্তর বাহির হইল না।

ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে পরীক্ষা ঠাকুর ডাকিলেন, "মাধব!"

"ঘুমুই নাই, হুজুর।"

"তবে? একটা কথাও কইছিস্ না কেন? হাঁ কি না ব'লে একটা কথা সারও ত দিতে পারতিস্! এক পেট মদ খেয়েছিস্ বুঝি?"

"টুক্‌খা খেইয়েছি বটে।"

"সে বেটার মত তোকে ত বড় একটা মদ খোত দেখি নি! যাক্, একটা কথা তোর কাছে আমি জানতে এসেছি। তোর মেইয়ার কি তুই কোন খবর পেয়েছিস্?" এ দেশে সাধারণতঃ স্ত্রীকে "মেয়ে" বলিয়া থাকে।

মাধব বলিল, "এখন সে আর আমার 'মেয়্যা' কই বাবাঠাকুর!"

"তোর নয় ত কার?"

"না হুজুর, সে আর আমার কেমন ক'রে হবে?"

"কেন হবে না? তোদের জাতের বিয়ে ত! কত জনের পরিজন, ঘর করতে করতে মানুষই নিয়ে পালিয়ে গেল, ফিরে এসে আবার ঘর করলে। জেনেছিস্ ত বল্, আমি তাকে আনা করাই।"

"তিন মাস—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া মধু ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "তাকে কি হয়েছে? তুই বল্, আমি তাকে নগদী পাঠিয়ে ধরে আনা করাই। এর পর তোকে ফেলে আর যাতে সে না পালিয়ে যেতে পারে, আমি তারও ব্যবস্থা করব। চুপ ক'রে রইলি কেন বল্।"

একটা গভীর শ্বাস ত্যাগ করিয়া মাধব বলিল, "না:।"

"'না' কি? কোথায় তারা বল্‌বি না?"

"সে আর আসবেক নি, বাবাঠাকুর।"

"আসে না আসে সে আমি বুঝব। তুই কেবল বল্ কোথায় রইছে তারা।"

আবার ক্ষণেকের জন্য নীরব রহিয়া মাধব বলিল, "দরকার নাই। সে যখন আমার এত ভালবাসা ছেড়ে যেতে পেরেছে, তখন দরকার নাই।"

ক্রোধকর্কশস্বরে এইবারে মধু ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "তোর নেই, আমার আছে।"

বলিয়াই তিনি স্ত্রীজাতীয়াকে উদ্দেশ করিয়া কতকগুলা গালি দিলেন। মাধব অবনত মস্তকে মাথা নাড়িতে নাড়িতে নীরবে সেই গালিগুলা শুনিল—"সেই বেউশ্যেটার জন্য আমার এমন কাযের মনিষ চ'লে যাবে?"

পরীক্ষা ঠাকুরের এ কথাও মাধব নীরবে কর্ণগত করিল; কথার প্রতিবাদও করিল না, মুরলীর সম্বন্ধে অত বড় ই ন বিশেষণটা স্বীকারও করিল না।

মধুসূদন মাধবের নীরবতায় আর নিরস্ত রহিলেন না। ক্রোধের উপর ক্রোধ যোগ করিয়া তিনি বলিলেন, "বল মাধবা! কোথায় অজবা?"

"আমি জানিনে হুজুর।"

"জানিস্ না?"

"কোথা অজবা রইছে—আমি জানি না।"

"মুরলী? বল্, কতক্ষণ আমি তোর এই নরককুণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকবো?"

মাধব তাঁহাকে কেবল ঘরে ফিরিতে অনুরোধ করিল।

"বল্‌বি নে? তবে রে—" উদ্দীপ্ত ক্রোধে ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রহার করিতে হাত উঠাইলেন। নিতান্ত অস্পৃশ্য জাতি না হইলে মধুসূদনের হস্তে নিশ্চয়ই সে দিন মাধবের লাঞ্ছনা হইত। একান্ত "নীচ বাউরী" বলিয়া মধুসূদন তাহাকে রাত্রিকালে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। প্রহারোদ্যত হস্ত তাঁহাকে নামাইয়া লইতে হইল।

কয় দিন ধরিয়া মনিবের নিষ্ফল অনুসন্ধানে মধুসূদনের মনটা বিশেষরূপই উত্যক্ত হইয়া ছিল। তাহার উপর তাঁহার স্থির ধারণা ছিল, তাঁহার এই নিষ্ফলতায় নরহরি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছে। সুতরাং মাধবের ওইরূপ নীরবতায় তাঁহার ক্রোধ অনেকটা ভাষ্যের মতই হইয়াছিল।

ক্রোধের বশে মাধবকে আরও কতকগুলা গালি দিয়া, এমন কি চাল কাটিয়া তাহার উচ্ছেদের ভয় পর্য্যন্ত দেখাইয়াও যখন তাহার পেট হইতে কথা বাহির করিতে পারিলেন না, তখন মধুসূদন আবার শান্তভাব ধরিয়া অজবার সন্ধান জানিবার অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। বাউরী জাতির চরিত্র তাঁহার বিশেষরূপই জানা ছিল। জাতিটা অত্যন্ত নিরীহ ও বিশ্বাসী। কড়া কথা কহিলে যেমন ভয় পায়, মিষ্ট কথা কহিলে তেমনই গলিয়া যায়। এই হতভাগা মাধবটা কেবল আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখাইতেছে। এ ব্যতিক্রমের কারণটাও তিনি একরূপ অনুমান করিয়া লইলেন। সেটা আর কিছু নহে, নরহরির আস্কারা।

গ্রামের মধ্যে নরহরিই ছিল তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রাহ্মণদের ভিতরে পূর্ব্বে 'পরখে'রাই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তিবান্। চট্টরাজরা তাঁহাদের বংশের দৌহিত্র। মায়ের দিক্ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে তাহারা পরখেদের প্রায় অর্দ্ধেক সম্পত্তির মালিক হইয়াছে। কোথাকার কে কোথা হইতে আসিয়া তাহাদেরই 'বাপুতি' সম্পত্তি দখল করিল। এই জন্য চট্টরাজদের উপরে পরীক্ষাদের স্বাভাবিক একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। দুই বংশে বহুকাল ধরিয়া মামলা মোকর্দ্দমা হইয়াছে। পরস্পরের ভিতরে বহুদিন পর্য্যন্ত মুখ দেখাদেখি ছিল না। নরহরি নিজে যদিও অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, তথাপি মাতুলবংশের সহিত মিলিত হইবার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও 'দায়াদ'দের বাধায় তিনি ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। নরহরির পরীক্ষাদের প্রতি ততটা বিদ্বেষ না থাকিলেও পরীক্ষাদের তৎপ্রতি বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। বিদ্বেষের আর একটা কারণ হইয়াছিল। ইদানীং নরহরি বাঁকুড়া সহরে চালধানের আড়ত করিয়া বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করিয়া অনেক ভূসম্পত্তি তাঁহার পূর্ব্ব সম্পত্তিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু 'দায়াদ'দের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পরীক্ষাদের অনেকের সম্পত্তি অল্প হইয়া গিয়াছে।

অল্প হইলেও চট্টরাজদিগের অপেক্ষা পরীক্ষাদের প্রতিপত্তি এখন অনেক বেশী। পায়ের উপর পা দিয়া আরও একপুরুষ খাইবার সম্পত্তি এখন অনেকেরই আছে, বিশেষতঃ মধু পরীক্ষার। নরহরির অপেক্ষা আয় অল্প হইলেও তাঁহারও সম্পত্তি নিতান্ত নগণ্য নহে, বিশেষতঃ আজকাল আদালতে উকীলের মুহুরিগিরি করিয়া, তাঁহারও বেশ দু'পয়সা উপরি রোজকার হইতেছে।

সুতরাং মাধবের নীরবতায় নরহরির প্ররোচনা অনুমান করিয়া অজবাকে ফিরাইতে তাঁহার আগ্রহ অধিক হইয়া পড়িল।

শান্তভাবে এইবার তিনি মাধবকে বলিলেন, "মনে কিছু করিস্ না, জমীতে চাষ হচ্ছে না দেখে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তাই তোর চুপ থাকায় হঠাৎ আমার রাগ হয়ে গেল, কিছু মনে করিস্ না।"

মাধব বলিল, "না হুজুর, তা করব কেন।"

"সত্যিই কি তুই সে বেটার খবর জানিস্ না?

মাধব আবার নীরব হইয়া গেল দেখিয়া মধুসূদন তাহার জানাটা ঠিক বুঝিয়া লইলেন। তখন আরও বিনম্রস্বরে

তিনি বলিলেন, "তাই ত রে, বলকে তোর কোন কষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, তবু বলতে নারলি।"

মাখন এইবারে উত্তরে মধুসূদনকে পরিহাস করিল, "সত্যিই আমি জানিনি, হুজুর। তাঁরি জেনেছে। জেনে আমাকে খবর দিয়েছে।"

"তাঁরি কোথায় মজুরী করছে?"

"ফরাসডাঙ্গায় সেঠ বাবুদের দীঘিতে মাটী তুলছে।"

"অভয়াও তা হ'লে সেখানে আছে?"

"না। সে কোথায় আছে, আমি গেলে জানতে পারব। আমাকে যেতে লিখেছে।"

"তবে তুই যা।"

মাখন আবার মাথা হেঁট করিয়া বলিল।

"কি বলিস, শীগগির বল্। আমি এখানে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পারি না। আবার গা ঝিড়-ঝিড় করছে।"

মাথা না তুলিয়াই মাখন উত্তর দিল, "ঘরকে যাও, হুজুর।"

"সে ত যাবই রে বেটা! তোর হুকুমে যাব? তুই যাবি না?"

মাখনের মাথা তাহার দুই হাঁটুর ভিতর প্রবিষ্ট হইল।

"কুলীকে আবার আমরা তোর কাছে পাঠিয়ে দেব। অভয়াকে শাসন করবার দরকার হয়, তাও আমি করব, মাখনা!"

এরূপ কথাতেও যখন মাখন উত্তর দিল না, তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত ক্ষণেক সেখানে নীরবে দাঁড়াইয়া মধুঠাকুর প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

কিছুদূর গিয়া ব্রাহ্মণ আবার ফিরিলেন। এইবার সত্যসত্যই করুণকণ্ঠে মাখনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোর যা হবার তা ত হয়েই গেছে। বিনা অপরাধে আমার ছেলেগুলো না খেয়ে মরবে!"

মাখন এ কথা শুনিয়া আর চুপ রহিতে পারিল না। বলিল, "ঘরকে যাও হুজুর, আমি আজ তোরেই নামাল চ'লে যাব।"

বিশেষ আশ্বস্তভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মধু পরীক্ষা বলিয়া উঠিলেন, "তাই বল, শুনে আশ্বস্ত হই। শুধু নামাল যাব বললে চলবে না; তাদের আনতে হবে। অত বেলী দেরী করলে চলবে না—আনতে হবে। দু পাঁচ দিনের মধ্যেই—যতর থাকতে থাকতে।

"তুমি ঘরকে যাও, রাত হইছে।"

"আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি?"

মাখন যাইতে প্রতিশ্রুত হইল—সে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গ্রাম ত্যাগ করিবে। মধু ঠাকুর কিছু খরচা দিতে চাহিলেন। উত্তরে সে গান ধরিল—

"হরি হে, তোমায় ভালবাসি কই?"

৯০

রমানাথ টেলিগ্রাফ করিবার বহুপূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের পরের ষ্টেশন পিয়ারডেবাতে অভয়া ও ফুলকুমারী নামিয়া গিয়াছিল—এই জন্য রমানাথ তাহাদের কোনও সন্ধান পায় নাই।

ষ্টেশন হইতে বনপথ ধরিয়া, এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে আশ্রয় লইয়া, কিছুদিন তাহারা জাহানাবাদে অবস্থিতি করিয়াছিল। সে স্থান হইতে তারকেশ্বরের পথ অবলম্বনে তাহারা ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়াছিল।

এখন, প্রায় দুই মাসের উপর, তাহারা চাঁপদানীর কলে মজুরী করিতেছে। করিতেছে তাহারা ওই মাটীরই কাষ। কিন্তু বেতন, বাঁকুড়ায় তাহারা যেরূপ পাইত, এখানে প্রত্যেকেই তার দ্বিগুণ পাইতেছে।

কলে তাহারা কায করে, কিন্তু বাস করে তাহারা সে স্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, ঠিকাদারের বাগানে। ধরা পড়িবার আশঙ্কায় অন্যান্য কুলীদের সঙ্গে তাহারা কুলীলাইনে থাকিতে সাহস করে নাই।

সেই বাগানের একটা কুঁড়ে ঘরে দুই মাসের উপর তাহারা দম্পতির মতই বাস করিতেছিল। অন্যান্য কুলী তাহাদের উপর সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখে নাই। অবস্থাও তাহাদের গ্রামের অপেক্ষা অনেকটা স্বচ্ছল হইত, যদি না অভয়া অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান করিত। কুলীও আজকাল সময়ে সময়ে একটু আধটু নেশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সে দিন শনিবার অপরাহ্ণ। সন্ধ্যা হইতে মাত্র ঘণ্টা খানেক বিলম্ব ছিল। তিনটি যোগ সে দিন একত্র হইয়াছিল। সপ্তাহের শেষ—কুলীরা সে দিন একবারে ছয় দিনের বেতন পাইবে। মাসের শেষ—কুলীদের মাটীকাটা কাযও মাসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়াছে। পরদিন হইতে আর তাহারও সেখানে থাকিবার প্রয়োজন রহিবে না। সকলেই এইবারে মাঠের কায করিতে যে যাহার গ্রামে ফিরিবে।

ফিরিতে পারিবে না কেবল অম্বরা ও ফুলকুমারী। সঙ্গীরা চলিয়া গেলে কোথায় যাইবে তাহারা? এ প্রশ্ন দুই জনেরই মনে উঠিয়াছে। কাম খুঁজিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণ ভিন্ন তাহাদের অন্য উপায় রহিল না। অস্পৃশ্য জাতি, তাহাদের হাতের জলে অন্য গৃহস্থদের কোনও কাম হইবে না, ওই এক মাটীকাটার মত কাম ভিন্ন অন্য কোনও কাম তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সেই দিন কার্য্যশেষে উভয়েরই চিত্ত অন্তর্বিপ্লবে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তাহার উপর মজুরীনামি ব্যাপারে যথেচ্ছ অপব্যয় করিয়া দুই দিন যে বসিয়া খাইবে, তাহারও উপায় তাহারা রাখে নাই।

বিশেষ চিন্তিত হইল কুলী। আজিকার পাওনা বেতনের অধিকাংশ, খাই খরচ প্রভৃতি বাদে, অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে বুঝিয়া সে একটু শঙ্কিতা হইয়াছে। অম্বরার সঙ্গে এই তিন মাস ধরিয়া তাহার অবস্থিতির নেশা আজ যেন ছাড়িবার মত হইয়াছে।

কুলীদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ঠিকাদার মনিব আনন্দ করিবার জন্য প্রত্যেককে আজ এক দিনের বেতন পুরস্কার দিয়াছে। পুরস্কার পাইয়াই অম্বরা তাহার সমস্ত চিন্তা এক পেট হাড়ির অতলে ডুবাইতে গিয়াছে। কুলীও হঠাৎ জাগিয়া উঠা দুশ্চিন্তার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, অন্যান্য কুলী কামিনীর সঙ্গে মনিবের দেওয়া পুরস্কারের মর্য্যাদা রাখিয়াছে।

সমস্ত চিন্তার বিলোপে যেন একটু উৎফুল্ল ভাবেই সে তাহার সেই বাগানের ঘরটিতেই ফিরিতেছিল। বেলা যায় দেখিয়া সে আর অম্বরার ফিরিবার অপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহাকে ইহার পর রাঁধিয়া খাইতে হইবে।

মাথায় তাহার ছিল গামছায় বাঁধা হাট—চাল, ডাল, লবণ প্রভৃতি; এক হাতে ছিল বোতলে পোরা তৈল, অন্যটিতে বাঁধা ছিল খরচ-পত্র যাহে তাহার সপ্তাহের বেতনের যৎসামান্য অবশেষ।

তথাপি ফুলকুমারী আজ বিশেষভাবে উৎফুল্ল। মনিবের আনন্দ তাহার ভবিষ্যতের চিন্তা একবার মুছিয়া লইয়াছে। পাছে টলা রাখা হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়, এইজন্য সে মুক্ত হস্ত দিয়া মাথার পুঁটুলিটি ধরিয়া রাখিয়াছিল। সহর ছাড়িয়া সামান্য দূর আসিয়াই সে গান ধরিল। অন্যান্য সঙ্গিনীরা যে যাহার নিজের স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এখন সে একাকিনী। পথ নির্জ্জন।

যেখানে আসিয়াছে, তাহার নিকটে কতকগুলা গাছ জড়াজড়ি করিয়া এক প্রকার জঙ্গলের ভাব ধরিয়াছে।

স্থানটা গানের অনুকূল মনে করিয়াই যেন সে গান ধরিল :—

"গাঙের নাগাল পেলেম না লো সই!
আমি কেমন ক'রে ঘরে রই?"

"আজও গাঙের নাগাল পেলিনি!"

বৃক্ষকুঞ্জের ভিতর হইতে কথা উঠিল। কথাটা ফুলকুমারীর কানে স্বপ্নের মত লাগিল। তাহার ঘোরা মাথা আরও ঘুরিয়া গেল। কোনও প্রকারে মাথার পুঁটুলি মাথায় রাখিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল অথবা দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল—মুখ ফিরাইতে পারিল না।

তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ভাবিনীকে সঙ্গে লইয়া মাখন সেই বৃক্ষগুলার অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছিল। কথা কহিয়াই সে বাহিরে আসিল। ভাবিনী আসিল না।

নিকটে আসিয়াই সে প্রশ্নের পুনরুক্তি করিল, "আজও পেলিনি? কূল ছেড়ে এত দূরে এলি, তিন মাস সঙ্গে সঙ্গে রইলুম, তবু গাঙচাঁদের নাগাল ধরতে নারলি ফুলি!"

বলিতে বলিতে যে দিকে ফুলকুমারী মুখ করিয়া ছিল, মাখন সে দিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফুলকুমারীর আর কথা না কহিলে চলিল না। মাখনের চোখের উপর তাহার মদির-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, "হেথাকে মরতে কেন আইলুস্?"

তাহার সে বিলোল দৃষ্টির প্রহারে মাখন ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল না। তাহার মনে হইল, এই স্বামি-ত্যাগিনীর অন্তরে তাহার জন্য এখনও অনেক মমতা লুকানো আছে। মনে হইল, তাহার হঠাৎ চলিয়া আসার জন্য মর্ম্মবেদনা তাহার দৃষ্টির বিলোলতার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। দেখিয়া সে মুগ্ধ, স্তব্ধ—কোনও কথা কহিতে পারিল না।

তাহাদের আলাপের ভাষা সকলের বোধগম্য না হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আমরা তাহার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিব।

স্বামীকে উত্তর দিতে অশক্ত বুঝিয়া ফুলকুমারী আবার বলিল, "কেন আর এখানে এসেছিস্?"

"ভয় নেই রে তোকে নিতে আসিনি, দেখতে এসেছি। অনেক দিনের মায়া, ছাড়তে পারলুম না। তুই যে আমার যথাসর্ব্বস্ব ছিলি রে! তাই দেখতে এলুম আমাকে ছেড়ে তুই কেমন আছিস্। তা দেখলুম, ভালই আছিস্ তুই।"

"পথ ছেড়ে দে, আমি চ'লে যাই।"

"এখনি ছেড়ে দেবো রে। আমি তোর সুখে বাধা দিতে আসি নি। তবে একটিবার বল্, তুই যে চ'লে এলি, সে কি আমার কোন অপরাধে?"

"না।"

"তবে?"

"তোকে আমার ভালো লাগতো না।"

"ভালো লাগতো না!"

"না।"

"কত দিন থেকে লাগতো না, ফুলি!"

"যে দিন থেকে তোর সঙ্গে আমার বিয়ে।"

শুনিয়া মাধব প্রথমটা অপ্রতিভের মত হইল। ভালো লাগতো না, এ কথার উপর কথা কহিবার তাহার কি আছে!

উত্তরেই ক্ষণেকের জন্য নীরব। ফুলকুমারীই প্রথমে এই নীরবতা ভঙ্গ করিল। দৃষ্টি ভূমির দিকে করিয়া বলিল, "এই ত শুন্‌লি, এইবারে চ'লে যা।"

মাধবও এতক্ষণে উত্তর দিবার কথা পাইল। সে বলিল, "ভালোই যদি লাগে নি ফুলি, তা হ'লে আসেই আমাকে ত্যাগ করিস্ নি কেন? এতকাল আমার ঘর ক'রে মায়া বাড়িয়ে কেন ত্যাগ করলি?"

ফুলী এ অতি ন্যায্য কথার উত্তর দিতে পারিল না। কেবল বলিল, "সন্ধ্যা হয়ে এলো, বিদেশ বিভূঁই, কোথায় রয়েছিস্, চ'লে যা।"

"না, আর দাঁড়াবো না ফুলি! তবে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তোর ভাত-কাপড়ের ভার নিয়েছিলুম, তাই একবার তোকে শুনিয়ে যাই, আমার সঙ্গে এখনো কি তোর যাবার ইচ্ছা আছে?"

"যাবার উপায় নেই!"

"উপায় নেই!"

"তুই একা এসেছিস্, না সঙ্গে কেউ আছে?"

"আছে, ভাবি।"

"তুই যা, ঠাকুরঝিকে একবার পাঠিয়ে দে।"

কথার অর্থ বুঝিতে পারুক, আর নাই পারুক, মাধব সেখানে থাকার আর প্রয়োজনীয়তা বুঝিল না। সে তাহার জামার ভিতর লুকান একখানি সুন্দর পাড়ওয়ালা রঙ্গীন কাপড় বাহির করিল।

দেখিয়াই সবিস্ময়ে ফুলী বলিয়া উঠিল, "ও কি?"

কোনও উত্তর না দিয়া, কাপড়খানি ফুলীর সম্মুখে পথের উপর রাখিয়া, পাকড়ীর প্রান্ত খুলিতে খুলিতে বলিল, "ওই নে, তোর সেই সখের কাপড়, আর এই নে তোর রোজগারের পয়সা। গুণে নে, তেরো টাকা চারি আনা।" বলিয়া কাপড়ের উপর সে টাকা কয়টি রাখিয়া দিল।

তাহার পর কোঁচার খুঁট হইতে একটি ক্ষুদ্র নাকছাবি বাহির করিয়া বলিল, "আর এই নে, যা তুই পালিয়ে আস্‌বার পাঁচ দিন আগে চেয়েছিলি।"

ফুলকুমারী অতি কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, "না, না।"

"না কেন রে, হাঁ। আমি তোকে সুদ্ধ মনে দিচ্ছি; তুই আমাকে ত্যাগ করেছিলি; আমি যে তোকে এখনো মন থেকে ত্যাগ করতে পারি নি রে!"

এই বলিয়া ফুলকুমারীর অঞ্চল ধরিয়া তাহার প্রান্তে মাধব সেই ক্ষুদ্র অলঙ্কারটি বাঁধিয়া দিল। কেন না, ফুলকুমারীর দুই হাতই বদ্ধ ছিল। তাহার সে বস্ত্রটি লইবার উপায় ছিল না।

দিয়াই মাধব চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্যও আর সে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল না।

১১

চক্ষু দুটি নিম্ন করিয়া ফুলকুমারী কিছুক্ষণ সেই কাপড়খানি ও তাহার উপরে রক্ষিত টাকা কয়টির উপর চাহিয়া রহিল। তাহার পর একবার মুখ ফিরাইল। দেখিল, তাহার স্বামী চলিয়াছে। মাথার পুঁটুলি ও হাতের বোতল ভূমিতে রাখিতে রাখিতে আর একবার সে মাধবের দিকে চাহিল। মাধব সেইরূপই চলিয়াছে। ক্ষণেক সে সেইদিকেই চাহিয়া রহিল। মাধব একটিবারের জন্যও মুখ ফিরাইল না।

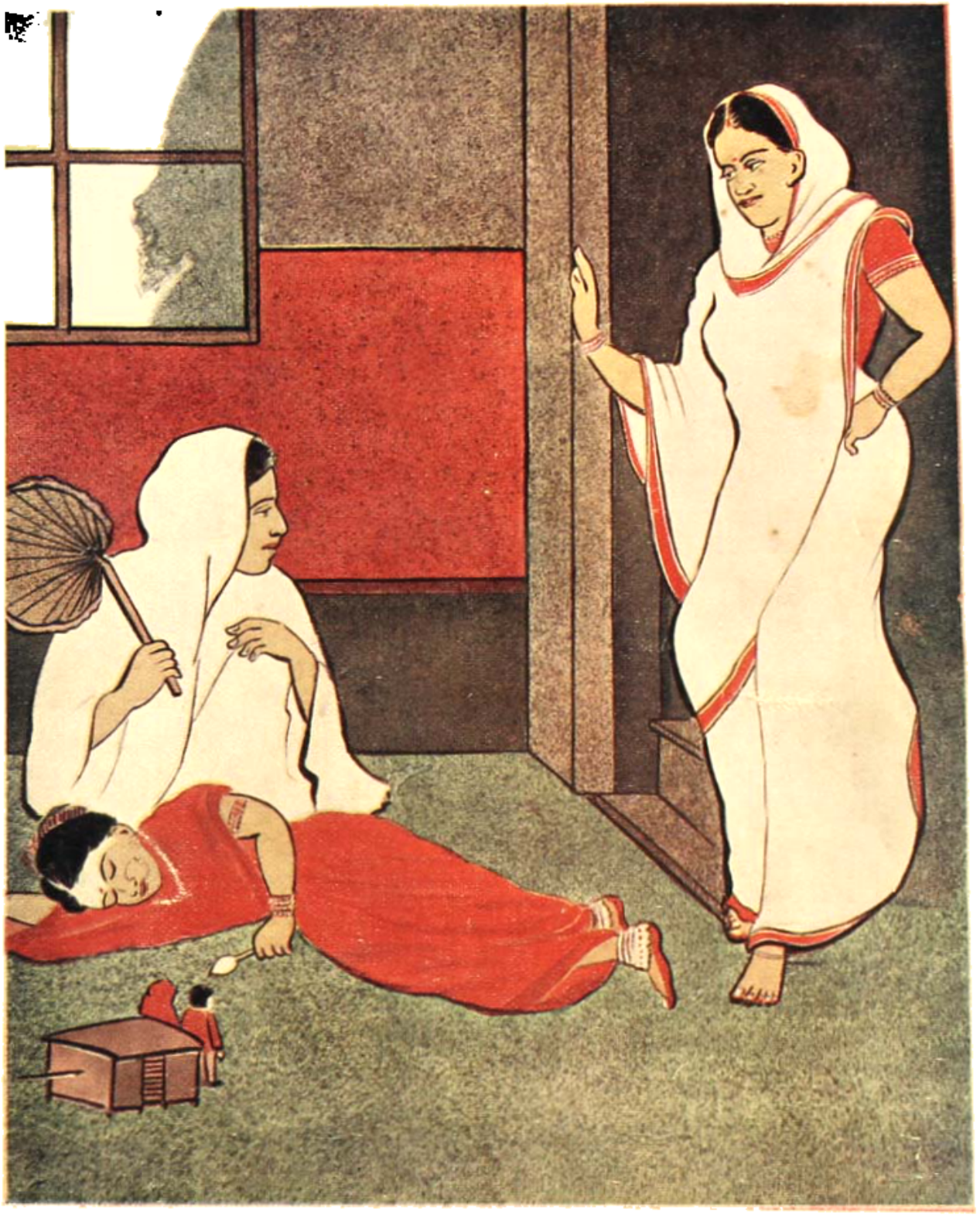

শ্বশ্রূর তর্জ্জন

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যেন একটা শঙ্কার ভাবে সে কাপড় ও টাকা শীঘ্র শীঘ্র উঠাইয়া লইল। টাকা নাকছাবির পার্শ্বে অঞ্চলে বাঁধিল। কাপড় বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইল।

সমস্ত গুছাইয়া আবার যেমন সে উঠিতে যাইতেছে, অমনি সে শুনিল, "ভালো কথা ফুলি, অজবাকে বলিস্, সে যেন দু' এক দিনের ভিতরে দেশে ফিরে যায়। পথে ঠাকুরের চাষ একেবারেই বন্ধ। ঠাকুর ছটফট করছে। পথে ঠাকুরের সঙ্গেই আমি এসেছি। তার কোনো ভয় নেই। কেউ কিছু বলবে না তাকে।"

ফুলকুমারীর মুখ ফিরাইতে বিলম্ব দেখিয়া সে একটু জোর গলায় বলিল, "শুনতে পেলি ?"

ফুলকুমারী ফিরিয়া ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল, পাইয়াছে।

"বলতে পারবি ?"

ফুলকুমারী সেইরূপ ভাবেই বুঝাইল, "পারবো।"

তাহার কথা না শুনিয়া বুঝি মাধবের তৃপ্তি হইতেছিল না ! সে আবার বলিল, "না, আমাকেই বলতে হবে ?"

তিন বারের প্রশ্নেও ফুলকুমারী একটি বাক্যনিষ্পত্তি করিল না। সে সেইরূপই মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "তোমাকে বলতে হবে না।" বলিয়াই ফুলকুমারী চলিল। পথের বাঁকের মুখে উপস্থিত হইয়া একবার সে মুখ ফিরাইল। ফিরাইতেই দেখিল, তাহার স্বামী ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছে। ঈষৎ দ্রুতপদে সে তাহার দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

"কি হ'ল, দাদা ?"

চমক লাগার মত মাধব মুখ ফিরাইল।

ভাইয়ের মুখের অবস্থাটা ভাবিনী যেন কেমন এক রকম দেখিল। সে ব্যাকুলভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আবাগী বললে কি ?"

"বললে ? সে ? আমাকে ?—অনেক কথা বলেছে।"

"আসতে চাইলে না ?"

"বললে আসবার উপায় নেই।"

"উপায় নেই মানে কি ?"

"সে তোকে একবার দেখা করতে বললে।"

"কোথায় সে ?"

"পথেই এখনো আছে। বোধ হয় তোর অপেক্ষা করছে।"

কালবিলম্ব না করিয়া ভাবিনী দ্রুতপদে ফুলকুমারীর উদ্দেশে চলিয়া গেল।

বাঁকের মুখ হইতে কিছু দূরে ছিল পথের একটা দাঁকো। চলিতে চলিতে টলিতে টলিতে আর অধিক চলা অসম্ভব বুঝিয়া ফুলী সেই দাঁকোর আলিশার উপর বসিল। পানের হস্ততাতেও সে মাথা অনেকটা ঠিক রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পারিল না যখন তাহার স্বামী তাহার সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতাটাকে উপেক্ষা করিয়া, তিরস্কারের পরিবর্তে, তাহাকে কতকগুলা উপহার দিয়া চলিয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, এক নাকছাবিটি বাদে, অবশিষ্ট সমস্ত বস্তুরই প্রবল অভাব সে অনুভব করিতেছিল। একটু সাজিবার মত বস্ত্র ত তাহার ছিলই না, সেদিনকার কাজ শেষ হইবার পর দুইটা দিন যদি তাহাদের নূতন কাজ না জুটিত, তা হইলে তৃতীয় দিনে তাহাদের উভয়কেই উপবাসী থাকিতে হইত। তাহাদের গৃহত্যাগের প্রথম মাসটা অতিকষ্টেই অতিবাহিত হইয়াছিল। পথে এক দিন কাজ জুটিত ত দুই দিন জুটিত না। কোনো কোনো দিন পেটভাতায় তাহাদিগকে সারাদিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। দুইটি মাস মাত্র তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল হইয়াছিল। আবার দারিদ্র্য ফুলকুমারীকে বিভীষিকা দেখাইতেছিল। এমন সময় এক অভাবনীয় দিক্ হইতে আসিল ওই দান। দেবতাও বুঝি কাহারও কাতর প্রার্থনায় অমন করিয়া দান করিতে পারে না।

নেশা ছাড়িবার মুখে বাস্তবিকই ফুলী যেন দ্বিগুণ মাতাল হইয়া পড়িল। চলিতে গিয়া দুই তিনবার সে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। অসত্যা তাহাকে বসিতেই হইল।

সাঁকোর আলিশাটা বিশেষ চওড়া ছিল না। তার তিন চার হাত নিম্নে নালা। বর্ষাকালে সেই স্থান দিয়া পথের এক দিক্ হইতে অন্য দিকে জল নিকাশ হইয়া যায়।

ভাবিনী দূর হইতে দেখিল, বউ সমস্ত জিনিষপত্র নীচে রাখিয়া আলিশার উপর হেঁট মাথায় বসিয়া আছে। কিন্তু মাথাটা তার টলিতেছে। যদি ওই অবস্থায় পিছন দিকে পড়িয়া যায়, তাহা হইলেই ত সে মরিবে ! দেখিয়াই সে তাহার দিকে ছুটিয়া গেল।

যা ভয় করিয়াছিল তাই, ভাবিনী নিকটে উপস্থিত হইয়াছে মাত্র, এমন সময় ফুলী টাল খাইল। ভাবিনী দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। সন্তর্পণে মত ফুলকুমারী

তাহার মুখের পানে চাহিতেই ভাবিনী বলিল, "যা সর্ব্বনাশ করবার তা ত ক'রেই এসেছিস্, ভাইটিকে আবার খুনের দায়ে ফেল্‌ছিলি!"

আবার মাথাটা নামাইয়া ফুলকুমারী বলিল, "এইগুলো সব নিয়ে আমাকে ঘরে দিয়ে আস্‌তে পারবি, ঠাকুরঝি?"

"সব রকমে মরেছিস্ দেখছি যে!"

"আমাকে ঘরে দিয়ে আয়। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।" তাহার অবস্থা দেখিয়া ভাবিনীর কেমন একটু করুণা জাগিয়া উঠিল। সে জিনিষপত্রগুলা উঠাইয়া এক হাতে লইয়া অন্য হাতে ফুলকুমারীর বাহু ধরিল। ঘরিয়াই বলিল, "আর এ ঘর ওঘর কেন, তোর নিজের ঘরেই চল।"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ফুলকুমারী বলিল, "আর যাবার উপায় নেই।"

"এ কথা বেশ বলছিস্। দাদাকেও ওই কথা বলেছিস্?"

ফুলী মাথা হেঁট করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল। তাহার পর ঘূর্ণিত মদির-চক্ষু ভাবিনীর চোখের উপর স্থাপিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম করিয়া বলিয়া উঠিল, "নিয়ে যেতে যদি না যেতে চাস্, সে আমার সব জিনিষ ফিরিয়ে।"

ইঙ্গিতসরে ভাবিনী কথাটার অর্থ বুঝিয়া লইল। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার সারা অন্তরটা ভরিয়া গেল। সে একটা হুঙ্কার ত্যাগ করিল।

ফুলকুমারীর মত্ততা এইবারে পূর্ণ ভাবেই যেন ছুটিয়া উঠিল। অতি আবেগভরে সে বলিয়া উঠিল, "বুঝতে পারলিনি অভাগী? বিধাতা আমার ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দিয়েছে যে!"

ভাবিনীও তেমনই আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "আ অভাগী, ঘরে ছেলে মেলে ক'রে কত দেবতার মানত করলি, কত অমুখ খেলি, এই নরককুণ্ডে এসে কি না তার ফল খেলি!"

"আমি আর দাঁড়াতে পারবো", বলিয়াই সে তখনও ভাবিনীর মুষ্টিতে ধরা বাহু আকর্ষণ করিল।

ভাবিনী মুষ্টি ছাড়িল না। দৃঢ়তর মুষ্টিতে বাহু ধরিয়া অপর হস্তে, প্রবলবেগে বহির্গত অশ্রু অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে সে সঙ্কুচিতা ভ্রাতৃজায়াকে ধরিয়া লইয়া চলিল। আর তাহাকে ভরসার কথা সে খুঁজিয়া পাইল না।

দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে মাধবের চোখে তন্দ্রা আসিতেছিল। একটা বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে পৃষ্ঠ দিয়া সে অবসন্ন দেহকে সেই তন্দ্রার কোলে ফেলিয়া দিয়। তন্দ্রাটি ঘনীভূত হইয়া তাহাকে চিন্তার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি দিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় তাহার কানে শব্দ গেল, "দাদা ওঠ!" চোখ মেলিয়াই সে দেখিল ভাবিনী ফিরিয়াছে।

ভাবিনী বলিল, "আর এখানে প'ড়ে থাকতে হবে না, উঠে পড়।"

"কি জন্য সে তোকে দেখতে চেয়েছিল, ভাবি?"

"তার মরণের কথা শোনাতে। ওঠ দাদা, তার প্রত্যাশা ত্যাগ কর।"

"আমি ত অনেক কালই করেছি ভাবি, তুই করলি কি না বল্।"

"করতেই হ'ল রে ভাই, বিধাতা তার ফেরবার উপায় মেরে দিয়েছে।"

নিশ্চিন্তের মত সে মাধবকে উঠিতে অনুরোধ করিল। নিশ্চিন্তের মত মাধব উঠিল।

১২

বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় মাধব তাহার পিসীকে বলিয়া গিয়াছিল, আমি একবার নামাম যাচ্ছি, মনিবকে বলবি পিসি, ফিরতে আমার দিন সাত আট বিলম্ব হবে। তত মামাকে আমি ব'লে গেছি, যে ক'ঘর ভদ্রী বাকি আছে, সে হাল দিয়ে দেবে।

পিসী মাধবের সে কথা নরহরিকে বলিয়াছিল। তাহাতে নরহরি বুঝিয়াছিলেন, মাধব ফুলীর সন্ধান পাইয়াছে এবং তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় চলিয়া গিয়াছে।

লাঙ্গল দিবার যে সামান্যমাত্র জমী অবশিষ্ট আছে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে জানিয়া নরহরি মাধবের এই চলিয়া যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ দেখিলেন না। তবে সে বোকাটা সে কথা তাঁহাকে বলিয়া যাইতে পারিত। তিনি তাহা হইলে তাহাকে শুধু অনুমতি দিতেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাতায়াতের ব্যয়টাও দিতেন। যাহাই হউক, তাঁহার ধারণার ভ্রম হইবার বিশেষ কোনও কারণ ছিল না, সুতরাং মাধবের যাওয়া যে ফুলীকে ফিরাইতে, ইহাতে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু তুলী ফিরিলে অজবা কি করিবে ? সে কি তাহার ঘর বাড়ী, মা, বোনকে ফেলিয়া একেলা বিদেশে থাকিতে পারিবে ? গ্রামে তাহাকে ফিরিতেই হইবে। এই ফিরিবার কথাটা নরহরির ভাবিবার বিষয় হইল। কেন না, অজবা ফিরিলে তাহাকে যদি শাসন করা না হয়, তাহা হইলে তাহার ভৃত্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের একটা বিশেষ ত্রুটি হইবে। অজবাকে শাসন করা কঠিন কথা নয়, তবে সে কায করিতে গেলে মধু মাধার সঙ্গে একটা যে গণ্ডগোল বাধিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে গণ্ডগোলের জন্যও তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

আপাততঃ অনুমান মাত্র। হয় ত অজবার স্বগ্রামে ফিরিয়া আসা নাও ঘটিতে পারে। তথাপি নরহরি তাহার আসাটা সাব্যস্ত করিয়া মধু পরীক্ষার মনের ভাব বুঝিবার জন্য প্রিয় বন্ধু গোলগোবিন্দ সিংহকে তাহার সঙ্গে কথা কহিবার অনুরোধ করিতে তাঁহার বাড়ী চলিয়া গেলেন।

দলুবাবু নরহরির বন্ধু হইলেও মধুর সহিত তাঁহার কোনও বিবাদ ছিল না। মধু, নরহরি, গোলগোবিন্দ তিন জনেই ছিলেন প্রায় সমবয়সী। বিবাহসূত্রে মাতুলের সঙ্গে ভাগিনেয়ের বিবাদ হইবার পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। মধু ও দলুবাবুর মধ্যে সে সদ্ভাবটা এখনও আছে।

নরহরি দলুবাবুর কাছে মাধবের হঠাৎ নাবাল চলিয়া যাওয়া হইতে অজবার গ্রামে ফিরিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত সব কথা বলিয়া তাহার শাসন সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করিলেন। দলুবাবুরও মতে তাহার শাসন অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে মাধবের ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনও কথা মধুর কাছে উত্থাপন করা তিনি যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না। দলুবাবুর মতে অবস্থা জানিয়া ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সুতরাং মাধার মনোভাব বুঝিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া নরহরি আড়তের কাযে বাঁধিয়া চলিয়া গেলেন।

মাধবের নাবাল যাওয়ার পর পূর্ণ এক সপ্তাহ চলিয়া গেল। অজবার ফিরিয়া আসা সম্বন্ধে কথা—নরহরি এখন মাধবেরই ফিরিয়া না আসায় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। মাঠের কায অনেকটা সে আগাইয়া দিয়া গেছে বটে, তথাপি তাহার করিবার মত কায এখনও যথেষ্ট বাকি আছে। অন্য বার এত দিন তাহার হইয়া কায করিতেছিল, অন্য স্থানে আবদ্ধ থাকায় সপ্তাহ শেষে সেও চলিয়া গেল।

আশার মধ্যে মাধবের খুড়া অটল ও তাহার কন্যা ভাবিও আজও পর্য্যন্ত ফিরে নাই।

মাধবের কেরার আশ্বাসটা তিনি দলুবাবুর কাছেই পাইলেন। অটল তাঁহাকে পত্র দিয়াছে, মাসের চব্বিশ দিনে তাহারা মাধববাটীতে ফিরিয়া আসিবে। মাধব তাহাদেরই সঙ্গে আছে। সেও উক্ত দিবসে তাহাদের সঙ্গে ফিরিবে।

পত্রটাতে একটা চিন্তা করিবার বিষয় ছিল। অটল তুলী সম্বন্ধে একটা কথাও লিখে নাই। ইহাতে বুঝিবার এই ছিল, মাধব হয় চিত্তের অস্থিরতায় শান্তিলাভের জন্য দুই চারি দিন কাযে কামাই করিয়া তাহার আত্মীয়গণের কাছে গিয়াছে, নয় তুলীকে খুঁজিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। হয় তাহার সন্ধান পায় নাই, নয় পাইয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারে নাই।

সে দিন জ্যৈষ্ঠের বিশ তারিখ, তথ্য জানিতে হইলে আরও চারি দিন তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে বুঝিয়া নরহরি মাধবের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন।

মধু পরীক্ষার মনোভাব জানিবার জন্য দলুবাবু যে বাউরীদের গ্রামে ফিরিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা আর তাঁহাকে করিতে হইল না। সপ্তম দিনে মধুসূদন নিজেই তাঁহার ঘরে আসিয়া তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া গেলেন।

তখন রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাটীর বাহিরে একটি সুরচিত বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ। এ দেশে তাহাকে দুর্গামেলা বলে। পৈতৃক ব্যবস্থায় বৎসর বৎসর ইহাতে দুর্গা পূজা হইয়া থাকে। পূজার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দলুবাবুর পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক অনেক ভূমি-সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। মেলাটি তাঁহার ও জ্ঞাতিবর্গের সাধারণ সম্পত্তি।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেক লোকেরই এখানে সমাগম হয়। দুর্গা পূজার কয়টী দিন বাদে সারা বৎসর, কখন গান, কখন বাজনা, কখন তাস, কখন পাশা, নানাবিধ গল্প-গুজব, পরচর্চ্চা, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি নানা বিষয়ক কথায় মণ্ডপটি সর্ব্বদাই মুখরিত থাকে। এই সমস্ত নিত্য প্রতিপাল্য কর্ম্ম শেষ হইলে, কেহ কেহ হরিসঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে, কেহ তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতে অথবা শুনিতে অন্য অন্য স্থানে চলিয়া যায়। রাত্রি নয়টার পর অনেক

সময় একমাত্র মধুবাবুই মালাটি ঘুরাইবার জন্য সেখানে বসিয়া থাকেন। সঙ্গের প্রভাব সময়ে সময়ে তাঁহারও উপরে ক্রিয়া করিত। তাঁহাকেও তাস-পাশা গল্প-গুজবে মধ্যে মধ্যে যোগ দিতে হইত। তবে তাঁহার নাম-জপে অনেকটা অনুরাগ ছিল। খেলার ভিতরে, গল্পের ভিতরেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখ হইতে সীতারামের নাম উচ্চারিত হইত।

সে দিন গল্পটা একটু বিশেষ রকমই জমিয়াছিল। বছর সতেরো পূর্ব্বে গ্রামের পচা মুচি একটা বিজেপুলি বাঘ মারিয়াছিল। বাঘটা কোথাকার কোন জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া কেমন করিয়া মাধববাটীর প্রান্তস্থ মাঠে আসিয়াছিল। আসিয়া পড়িয়াছিল সেটা দিনের বেলায়। চারিদিকে গ্রাম। বাঘটা সেই সব গ্রাম ভেদ করিয়া জঙ্গলে পলাইবার পথ পাইতেছিল না। সুতরাং ততক্ষণ না তাহার পলাইবার উপায় হয়, ততক্ষণ জীবনটা রক্ষা করিবার জন্য অদূরালে একটি হৃষ্টপুষ্ট ছাগকে সে মুখে পুরিয়াছিল। তাহার এই অপরাধে গ্রামের সমস্ত লোক তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। জনতার মধ্যে ছিলেন ভোজনানন্দ ভদ্রু পরখে, দেশের মধ্যে তাঁহার ভোজন-শক্তির একটা বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। আট দশ সের ওজনের একটি পাঁঠা অবলীলাক্রমে তিনি উদরস্থ করিতে পারিতেন। যখন যেখানে যে ভোজের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইত, অনিমন্ত্রিত অবস্থাতেও তিনি সেখানে উপস্থিত হইতেন। পূর্ব্বরাত্রিতে ওইরূপ একটি ভোজে তিনি একটি ছাগের আপুচ্ছমস্তক উদরস্থ করিয়া সেই স্থান দিয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন। আসিবার সময় মাঠের মধ্যে একটা বেশ বড়-গোছের জনতা দেখিয়া, আবার একটি বিরাট ভোজের আয়োজন হইতেছে এই বিশ্বাসে কৌতূহলপরবশ হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ওই বিজাপুলি ব্যাঘ্রদর্শন। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই একটি পিতৃনাম সংযুক্ত বিকট চীৎকারে সেই আপুচ্ছমস্তক ছাগটাকে উদর হইতে মাঠে নিক্ষেপ করিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত কথা লইয়া সেখানে সকলে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। বাস্তবিকই পচা মুচি অসমসাহসিকতায় শুদ্ধ মাত্র লাঠির প্রহারে সেই বাঘটাকে হত্যা করে। এই ব্যাঘ্রহত্যায় তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল ভৈরবা বাউরী। সে ছিল অজবার পিতা। সুতরাং বাঘ ও ভদ্রু পরখে হইতে ওই গল্পকথা অজবায় আসিয়া পড়িল। এক জন বলিল, "মধু পরখে অজবাকে আনতে লোক পাঠাইছে।"

কথাটা শুনিবামাত্র নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র গতি বলিয়া উঠিল, "সে আসিলে তার হাড় চূর্ণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না।" সেই কথায় তাহার সহচরবৃন্দ একবাক্যে সায় দিল।

মধুবাবু সমস্ত জানিয়াও না জানার মত প্রশ্ন করিলেন, "অজবাকে আনতে মধু খুড়ো কাকে পাঠিয়েছেন রে?"

কদু রাণা বলিল, "মাধব নিজে গিয়েছে, জ্যেঠাবাবু।"

মধুবাবু বলিলেন, "তাই বটে, মাধবাকে ক'দিন দেখতে পাচ্ছি না!" বলিয়াই গতিকে তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে গতি, তা হ'লে কেমন ক'রে তোরা অজবার শাসন করবি?

রমানাথ গতির হইয়া উত্তর দিল, "তাতে কি, সে বেটা ত অপরাধী।"

মধুবাবু বলিলেন, "যদি তাদের আপনা-আপনির ভিতর মিল হয়ে যায়?"

এটা একটা ভাবিবার কথা বটে! নীচ জাতীয়ের সমাজ—যদি সকল বাউরী অজবাকে ক্ষমা করে, আর কুলী তাহার স্বামীর কাছে ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে ভদ্রলোকদিগের পক্ষে সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার বিশেষ যে প্রয়োজন আছে, অনেকেই সেটা মনে করিল না।

গোঁ ধরিয়া রহিল কেবল কয় জন যুবক। তাহারা অজবার এই গুরু অপরাধ উপেক্ষার চোখে দেখিতে চাহিল না।

কিন্তু মধু পরীক্ষা যখন সমস্ত জানিয়া অজবাকে আনিতে পাঠাইয়াছে, সে কি তাহার রক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইয়াছে? তবে গ্রামের ষোল আনা লোক যদি অজবাকে শাসন করিতে যায়, একা মধু পরীক্ষা কি করিতে পারে?

অনেক বিচার-বিতর্কের পর কোনও একটা বিশেষ কিছু মীমাংসা যখন হইল না, তখন ওই বাউরীকুলের নায়াল হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কেহ উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিবার প্রয়োজন বুঝিল না।

এই পরচর্চ্চা নিষ্পন্ন করিয়া সকলে নিজ নিজ কার্য্যে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ মালা ঘুরাইয়া মধু

বাবুও বাড়ীর ভিতরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সদরের দ্বার হইতে শব্দ উঠিল, "দলু বাবাজী ঘরে আছ ?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়াই দলু বাবু বুঝিলেন, মধু খুড়া।

বালার থলিটি গলায় ঝুলাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের সোপানের নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "আছি খুড়া, এসো।" মধুসূদন নিকটে আসিতেই তিনি তাহাকে মণ্ডপের উপরে উঠিয়া আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

মধুসূদন মণ্ডপে উঠিলেন না। উঠানে দাঁড়াইয়াই বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হে দলু বাবু, গতে ছোঁড়া নাকি বলেছে, অজবা এখানে এলে সে তার হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবে ?"

দলু বুঝিলেন, মেলায় বসিয়া অল্পপূর্ব্বে অজবার শাসন কথা লইয়া যাহারা তর্ক করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে কেহ না কেহ মধু খুড়াকে লাগাইয়া চলিয়া গিয়াছে। গতির ও সেই সঙ্গে নিজেরও একটা কৈফিয়ৎ দিতে তিনি বলিলেন, "সেটা কথার কথা খুড়া, সে কথার কোনও মূল্য নাই। তবে তার শাসন যে প্রয়োজন, এতে খুড়ো সকলেরই প্রায় একমত।"

"কেন ? কিসের শাসন ? কি সে করেছে ? আর ওর জন্য অজবাকে যদি শাসন করতেই হয়, তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে করতে হয় অনেক ভদ্রলোকের ছেলেদের। শুধু কি দেখছ তুমি একা অজবারই দোষ ? ছি ছি, নীচ ছোট লোকের কথা, তাই নিয়ে তুমিও কি না মাথা ঘামাচ্ছো ! কতকগুলা অসৎ সঙ্গে প'ড়ে, তোমারও মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল, বাবাজি ! শাসন করতে হ'লে, দলু বাবু, আগে নিজের নিজের ঘর শাসন করতে হয়।"

"ঘর শাসন করতে হয়, মানে কি খুড়া ?"

"আমার হাতে প্রমাণ আছে, দেখিয়ে দেবো।"

রমানাথ আহার করিতে ভিতরে গিয়াছিল। সেখান হইতেই মধুসূদনের তীব্র স্বর তাহার কানে প্রবেশ করিতেছিল। আহারে আর তাহার ধরা হইল না। সে আসিয়া মণ্ডপের ভিতর দিকের দ্বারের কবাটের অন্তরালে কথা শুনিবার জন্য দাঁড়াইল।

মধুর শেষ কথা শুনিতেই তাহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। সে অন্তরাল হইতে বাহির হইয়াই বলিয়া উঠিল, "যা মুখে আসে বল না, ঠাকুরদা।"

"কেন বলবো না ? প্রমাণ হাতে আছে, দেখিয়ে দেবো—দেখিয়ে দেবো।"

"একটু মুখ সামলে কথা কয়ো ঠাকুরদা !"

"কেন ? সত্য কথা কইব, মুখ সামলাবো কি ! মারবি না কি ?"

"চল, কি প্রমাণ দেবে, দিতেই হবে। নইলে—"

বলিতে বলিতে রমানাথ মধুসূদনের দিকে চলিয়া আসিল। দলু বাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। 'নইলে' বলিয়া সে কোনও একটা অসম্মানের কথা মুখ হইতে বাহির করিতেছিল। মুখে তাহার হাত দিয়া দলু বাবু তাহা রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং ভিতরদ্বারের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাড়ীর ভিতরে যাইতে আদেশ করিলেন।

মধুসূদন রমানাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গতেকে বলিস, অজবার হাড় ভাঙ্গা সে ত অনেক পরের কথা, মধু পরথের গায়ে একবিন্দু রক্ত থাকতে তার গায়ে সে যেন নখের আঁচড় পর্য্যন্ত দিতে না আসে।"

"দিলে কি হবে ?"

কথাটা বাহিরের দিক্ হইতে উঠিল। সকলেই বুঝিল, গতিও মধুসূদনের অনুসরণে আসিয়া দূর অন্তরাল হইতে তাহাদের কথা শুনিতেছে।

মধুসূদন মুখ ফিরাইয়াই বলিলেন, "কি হবে, দিয়ে দেখিস না !"

"আলবৎ দেবো। একবার তাকে পেলে হয়,—"

দেখিতে দেখিতে উভয়ে বিষম কলহ বাধিয়া গেল। যে যাহার প্রতি অপভাষার প্রয়োগ আরম্ভ করিল। এ দেশের পল্লীগ্রামে কলহে ভাষার প্রয়োগে অনেক সময় ইতর-ভদ্রের ভাষায় বড় একটা প্রভেদ থাকে না। দলু বাবু উভয়কে শান্ত করিতে অকৃতকার্য্য হইলেন।

সর্ব্বশেষে মধুসূদন গতিকে বলিয়া উঠিলেন, "অজবাকে আমি এখনি এখানে নিয়ে আসছি। যদি বাপের বেটা হ'স, তবে গায়ে তার হাত ঠেকাতেই হবে।"

গতি বলিল, "নিয়ে এসো। তার হাড় এক ঠাঁই যদি এক ঠাঁই করতে না পারি, তা হ'লে আমি গোবিন্দ চট্টরাজের বেটাই নই। আর আমিও দেখবো—তুমি কত বড় বাপের বেটা, কেমন ক'রে তাকে রক্ষা কর।

এইখানেই উভয়ের কলহের সেই সময়ের মত অন্ত হইল।

একদিকে বদু বাবু প্রধানপর মধুসূদনের হাত ধরিয়া ফেলিলেন; অপর দিকে গতির মা পুত্রকে টানিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। গণ্ডগোল শুনিয়া তিনি ঘর হইতে সেখানে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

এ কলহের শেষ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, বুঝিতে না পারিলেও বদু বাবু এইটা বুঝিলেন, অজবা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি রমানাথকে শুধু তিরস্কার করিয়া সে রাত্রির মত বিশ্রাম লইতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সে দিন অনেক রাত্রিতে বাঁকুড়া হইতে নরহরি গৃহে ফিরিলেন। আসিয়া সমস্ত কথাই শুনিলেন। তিনিও বুঝিলেন, অজবা ফিরিয়াছে। কলহের জন্য তিনিও ভ্রাতুষ্পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। একটা নীচের জন্য বদু পত্নীকার সঙ্গে অনর্থক কৌজদারী বাধানো তিনি পছন্দ করিলেন না। তিনি গতিকে বলিলেন, "ওরূপ ভাবে অজবাকে শাসন করিতে গেলে আইনদিগকেই কৌজদারীতে পড়িতে হইবে। কেন না, বদু পত্নীকা তাহার ধনিবকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টার কিছু মাত্র ত্রুটি করিবে না। তা না করিয়া, মাধবা ফিরিলে তাকে দিয়া অজবার নামে কৌজদারী আদালতে নালিশ করাইব। কেন না, অজবা মাধবার বিবাহিতা স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাতে অজবার বেরাদ যে হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

এরূপ শাসন অজবাকে প্রহার করা অপেক্ষা অনেক গুণে কঠোর, ইহা বুঝিয়া গতিক্ষণ তাহাকে প্রহারের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল।

১৩

পরদিন প্রাতঃকালে নরহরি নিজেই দেখিতে পাইলেন, অজবা বদু বাবার মাঠে লাঙ্গল দিতেছে। তিনি তখন গতি ও রমানাথ উভয়কেই ডাকাইয়া তাহার প্রতি কোনওরূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, মাধবা ফিরিলে যাহা কর্ত্তব্য, তিনিই করিবেন। উভয়কে উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বদু বাবুকে উপদেশ দিয়া বাঁকুড়ায় চলিয়া গেলেন। গ্রামবাসীরাও শুনিল, অজবা ফিরিয়াছে। কিন্তু ফিরিয়াছে সে একা, ফুলী তাহার সঙ্গে আসে নাই। লোকের কাছে লজ্জিত হইবার ভয়ে সে নিজের ঘরে আসে নাই, বদু পত্নীর বাড়ীতেই আশ্রয় লইয়াছে।

ফুলী সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল সকলেরই মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু বদু ঠাকুর তাহাকে সারাদিন এমন করিয়া আগুলিয়া রহিলেন যে, কাহারও কৌতূহল নিবৃত্তির সুযোগ ঘটিল না।

গ্রামের প্রায় সকলেই বুঝিল, ফুলী আবার তাহার স্বামীর কাছে ফিরিয়া গিয়াছে। এই বুঝাটুকু সম্বল করিয়া তাহারা মাধবের আগমনের প্রতীক্ষায় রহিল।

চতুর্থ দিবসে গ্রামের সমস্ত বাউরী নামাল হইতে ফিরিয়া আসিল। মাধবও তাহাদের সঙ্গে আসিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ফুলী তাহাদেরও সঙ্গে আসিল না। শুধু তাহাই নহে, প্রশ্ন করিয়া তাহারা জানিল, মাধব অথবা তাহার সঙ্গীরা কেহই বলিতে পারিল না, কোথায় সে।

এই সংবাদ শুনিয়া নরহরিও বিস্মিত হইলেন। গতি, রমানাথ ও তাহাদের সঙ্গীরা ত অবাক্ হইয়া গেল। তবে কি ফুলী অজবার সঙ্গে পলাইয়া যায় নাই?

ফুলীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মাধব কাহাকেও জানায় নাই। ভাবিনীকেও সে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গী বাউরীরা পর্য্যন্ত ফুলী-তত্ত্ব অবগত হয় নাই। তাহারা এই টুকুমাত্র বুঝিয়াছিল, মাধব ফুলকুমারীর অন্বেষণে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার সন্ধান পায় নাই।

নরহরিও মাধবকে ফুলীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রথমে মাধব বলে নাই, অসঙ্কোচে সমস্ত সত্য গোপন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মুখের ভাব মাঝে মাঝে তাহার অন্যমনস্কতা, কাযে অনাস্থা ইত্যাদি দেখিয়া এক দিন তাহাকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া অসঙ্কোচে সমস্ত কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিতে বলিলেন।

প্রশ্নে মাধব বিপুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাহাকে শুনাইয়া দিল।

ঘটনার বর্ণনায় ফুলীর উপর মাধবের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া নরহরি মাধবের দুরবস্থায় বিশেষ কাতর হইলেন। তাহাকে আশ্বস্ত করিতে বলিলেন, "তুই যদি তাকে ঘরে নিতে চাস্, বল্। আমি তাকে আনা করাবার ব্যবস্থা করি।"

ক্ষণিকের জন্য নিস্তব্ধ থাকিয়া মাধব বলিল, "কোথায় আছে সে, কি ক'রে জানবে হুজুর?"

"সে যেমন ক'রে জানি না কেন, তোর ভাবনা কি? আমি বুঝতে পারছি, অজনা কোথাও তাকে লুকিয়ে রেখে এসেছে। চাষের কাযটা ভুলে গিয়েই বেটা সেখানে চ'লে যাবে।"

"কথাটা মনে নিচ্ছে, হুজুর!"

"সেখানে তাকে লুকিয়ে রাখুক না কেন, আমি তার সন্ধান পাব।"

মাধব চুপ করিয়া রহিল।

নরহরি তাহার নীরবতার অর্থ না বুঝিয়া বলিলেন, "আর যদি অজবাকে জব্দ করতে চাস্ ত বল্, তোকে দিয়ে তার নামে ফৌজদারী করিয়ে দিই।"

"তাতে কি হবে, হুজুর?"

"তোর বিয়ে করা স্ত্রীকে সে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। প্রমাণ হ'লেই তোর মুন্নীও ফিরে আসবে, তারও মেয়াদ হবে।"

"অজবার মেয়াদ হবে?"

"নিশ্চয়। তোর বিয়ে করা স্ত্রী নয়, এ কথা ত গ্রামের কেউ হলফ ক'রে বলতে পারবে না। গাঁয়ের পোনের আনা লোক তোর বিয়েতে নাচনীর নাচ দেখেছে। কি বলিস্? মোকদ্দমা করবি?"

মাধব একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা নাড়িল।

"আমার কথায় অবিশ্বাস করছিস্?"

"না হুজুর। তবে অজবাকে মেয়াদ দিলে মুন্নী যে কষ্টে পড়বে!"

মুন্নী তোর কাছে ফিরে আসবে, কষ্টে পড়বে কেন? নিজের ইচ্ছায় সে আসতে না চায়, হাকিম পেয়াদা সঙ্গে দিয়ে তাকে তোর ঘরে পাঠিয়ে দেবে। কি করবি বল্—আ ম'ল, চুপ ক'রে রইলি কেন?"

"হাকিম মুন্নীকে ডিক্রি দিতে পারে, তার ভালবাসা ত ডিক্রি দিতে পারবেক্!"

"পাগলের মত যা তা বলিস্ নি মাধবা, তুই তাকে ঘরে নিতে চাস্?"

"আমি ত নিতে চাই হুজুর—"

"তাই বল্, আমি তাকে আনা করাই।"

আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাধব বলিল, "দেখে মনে হ'ল, সেও যেন ফিরে আসতে চায়।"

"তবে তাকে ফিরিয়ে আনতে তোর আপত্তি কি? তোর সমাজে তাকে নেবে না? সমাজে তাকে তোলবার জন্য যা কিছু খরচ লাগবে, আমি দেবো।"

"হুজুর, তার ফিরে আসবার আর উপায় নেই।"

"উপায় নেই?" অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত নরহরি মাধবকে প্রশ্ন করিলেন। "উপায় নেই—মানে কি মাধবা?"

হাঁটুর ভিতরে মাথা লুকাইয়া মাধব ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, প্রভুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

বুদ্ধিমান্ নরহরি মাধবের এই ক্রন্দনে ও উত্তর দেওয়ার সঙ্কোচে একবারেই বুঝিয়া ফেলিলেন, অভাগিনী অবৈধ সংসর্গে গর্ভবতী হইয়াছে। তাহা হইলে সত্যই তাহার স্বামীর কাছে ফিরিবার উপায় নাই। অজবাকে জেলে প্রেরণ করাইলে মুন্নী যে কেন কষ্ট পাইবে, সেটাও বুঝিতে বাকি রহিল না। কিছুক্ষণ তাঁহাকে দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইল; ভাবিতে হইল, এই নীচজাতীয়ের সঙ্গে সেই নীচজাতীয়ার স্নেহের সম্বন্ধ। মাধব মুন্নীকে পাইতে এখনও ব্যাকুল! হঠকারিতায় একটা কায করিয়া মুন্নীও এখন অনুতপ্ত! সেও স্বামীর কাছে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তাঁহার অনুমান নিশ্চিত করিবার জন্য মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তোর স্ত্রীর মুখে শুনেছিস্, না আর কারও মুখে?"

"সে নিজেই বলেছে।"

"ও রকম অবস্থাতে কি তাকে ঘরে আনতে পারিস্ না?"

"না ত!"

"তবে আর তার জন্য হা-হুতাশ ক'রে শুকিয়ে মরছিস কেন? যখন জানছিস্ তোদের দু'জনের ইচ্ছা থাকলেও তার সঙ্গে ঘর করবার তোর উপায় নেই, তুই একটা সাঙা কর।"

"করব হুজুর।"

"করব কি, যত শীগগির পারিস্। এমনই ক'রে উদাসী হ'য়ে কত দিন থাকবি?"

"ভাবিও ওই কথা বলেছে।"

"যে তোকে স্নেহ করে, সেই ওই কথা বলবে।"

মাধব আশ্চর্য্যের ভাব দেখাইল।

অজবার শাসন আর কোনও মতেই চলিতে পারে না বুঝিয়া নরহরি মাধবকে আবার সংসারী হইতে উপদেশ

দিলেন এবং ওই বিধবা-বিবাহের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহে প্রতিশ্রুত হইলেন।

১৪

অজবার সঙ্গে যখন কুলী আসিল না, আর সেই জন্য মাধবাতেও সামান্যমাত্রও উত্তেজনা দেখা গেল না, তখন গ্রামে অতি অল্পদিনের মধ্যেই কুলীর কথা নিবিয়া গেল। বাউরীদের মধ্যে সে সম্বন্ধে বিশেষ একটা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল না। জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতেই সে বৎসর বর্ষার আরম্ভ হইয়াছিল। বাউরী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তখন বিশেষ রূপেই মাঠের কাযে লিপ্ত। দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ওই সব কথা লইয়া আলোচনার কাহারও আর সাধ থাকিত না।

অজবা মাধবাবাটীতে আসিয়া অবধি মনিবের গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার নিজের গৃহে বাস করিতে আসে নাই।

গ্রামের অনেকেই, বিশেষতঃ পতি রমানাথ প্রভৃতি মুরুব্বী মনে করিয়াছিল, চিরকাল যাহা হইয়া থাকে, স্বামি-ত্যাজিনী তাহার পলায়নের সহচরকে ত্যাগ করিয়া গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, অথবা এমন এক জনকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহার বিশ হাত দূরে দাঁড়াইতে বাউরী অজবার সাহস নাই।

কুলীর কথা লোকের মুখ হইতে শুধু মিলাইল না, যাস দুইটের মধ্যে তাহাদের মন হইতেও মুছিয়া গেল।

মুছিল না কেবল মাধবের মন হইতে। অজবাকে দেখিলে সে মুখ ফিরাইয়া লইত। অজবাও তাহাকে দেখিতে ভয় পাইত। দেখিলে দূর হইতেই সরিয়া পড়িত।

তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, চাষের কায শেষ হইল। মাধব যাহা মনে করিয়াছিল, তাহা হইল না—কুলীর কাছে যাইবার জন্য অজবার কোনও আগ্রহ সে দেখিতে পাইল না। বরং, চাষের সময়টা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই, মনিবের ঘর ছাড়িয়া সে গাঙ্গুলিপোড়ের পাড়ে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ইহার পূর্ব্বে মাধব অন্তরাল হইতে অনেক বার অজবার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছিল। আকাশের অবস্থায় কখন কখন মাঠে লাঙ্গল দিবার সুবিধা হয় না। মাধব সেই সেই দিন আগ্রহের সহিত লক্ষ্য রাখিত, অজবা গ্রাম ছাড়িয়া কুলীর সুকান স্থানে যায় কি না। লক্ষ্য করিয়া সে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারে নাই। পূর্ব্বে প্রায় প্রতিদিন অজবা কদমাহাটিতে গিয়া পচাই পান করিত। এ কয় মাস সে তাহাকে তাহাও করিতে দেখে নাই।

এই সমস্ত কারণে মাধবের মনে স্বতঃই একটু সন্দেহ জাগিয়াছিল। অজবা ঘরে ফিরিতেই তাহার সন্দেহ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল।

মাধব অজবাকে শুধু ঘরে ফিরিতে দেখিল না। সে দুই এক দিন তাহার ধামসা বাজানো শুনিতে পাইল। এক দিন অজবার বাঁশীর সুর তাহার কানে গেল। আর এক দিন সে শুনিল, অজবা মাতাল হইয়া অতি উল্লাসে গান গাহিতেছে।

শুনিয়া মাধবের সন্দেহ দৃঢ় হইল। তবে কি ওই পাপিষ্ঠটা কুলীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে?

তথাপি সে মনকে বুঝাইল। অজবা নির্লজ্জ, গ্রামে ফিরিয়াছে। কুলী লজ্জায় তাহার সঙ্গে আসিতে পারে নাই। চাষের কায শেষ করিয়া, ধান কাটিয়া, মনিবের খামারে তুলিয়া তাহার পর কাযে ইস্তফা দিয়া সে কুলীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হইবে। তাহা করিলে মাঘ মাস পর্য্যন্ত তাহাকে মাধবাবাটীতে থাকিতে হইবে।

মাধব ওইরূপ বুঝিয়া মনকে কতকটা নিশ্চিন্ত করিল।

ভাবিনীও নিজের দিক্ হইতে অজবার আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু নিজের মনোভাব একটি দিনের জন্যও তাহার ভাইকে জানায় নাই। বউ ত জন্মের মত তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে। আসিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও আর ত তাহার ধাপার সংসারে ফিরিয়া আসিবার উপায় নাই! সুতরাং তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া লাভ কি?

অজবার একাকী ফিরিয়া আসায় তাহারও মনে প্রথমটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল। অজবা কি বউকে ফেলিয়া আসিয়াছে? অথবা বউ তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও আশ্রয় লইয়াছে?

সেও এই কয় মাস মনটাকে একরূপ বুঝাইতেছিল। কিন্তু অজবার ফুলকুমারী সম্বন্ধে নির্লিপ্ততায় তাহারও মনে একটা ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল।

সে কয় দিন ধরিয়া অজবার ধামসা বাজানো, বাঁশীর

রাস

Block & Printing—By Bengal Photo Engraving Co.]

[শিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

আলাপ, স্ফূর্তির গান—সমস্ত শুনিল। আর সে মনকে বুঝাইতে পারিল না। তবে কি মানবটা তাহার ভাত-জামাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে?

অন্যবার ওইরূপ গান শুনিতে শুনিতে নিজের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া এক দিন সন্ধ্যার পর মাখন সাধাটি হেঁট করিয়া কাঁদিতেছিল। এমন সময় দূর হইতে সে ভাবিনীর স্বর শুনিল, "দাদা, ঘরে রইছিস্?"

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া, মাথা তুলিয়া মাখন দেখিল, ভাবিনী তাহার কাছে আসিতেছে। সে উত্তর দিল, "রইছি রে!"

ভাবিনী একবারে ভাইয়ের সমীপস্থ হইয়া বলিল, "ব্যাপারটা কি বল্ দেখি।"

"কিসের ব্যাপার?"

"শুনতে পাচ্ছিস্ না?"

"অন্যবার গানের কথা বল্‌ছিস্!"

"বেহারা বেটা কেমন ক'রে অত স্ফূর্তি করছে?"

"তা আমি কেমন ক'রে বলব!"

"বউএর খবর কিছু পেয়েছিস্?"

"না। আর পেয়ে লাভ?"

"তা তো বুঝি! তবু যে মন বুঝে না রে! ও বেটা যে একা এলো—"

ভাবিনীর কথা শেষ না হইতেই মাখন বলিল, "যদিই আসে, তা তুই আমি কি করব?"

"আমার মনে নিচ্ছে, দুষ্টুটা তাকে ফেলে চ'লে এসেছে।"

"আবার!" ঈষৎ ক্রোধের বশে মাখন বলিল, "আবার! যদি ফেলেই আসে, তুই আমি কি করতে পারি!"

একটা দীর্ঘশ্বাসে ভাবিনী বুঝাইল, কিছুই সে করিতে পারে না। আর সে সম্বন্ধে কোনও কথা না কহিয়া ভাবিনী কেবল বলিল, "তোর খাওয়া হয়ে গেছে?"

"অনেকক্ষণ।"

ভাবিনী ফিরিল। কিছুদূর যাইতেই মাখন বলিল, "আমারও তাই মনে নিচ্ছে। কিন্তু ওকি তাকে ত্যাগ ক'রে আসতে পারে, ভাবি?"

ভাবিনী মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "ও নীচটা সব পারে।"

"ফুলীর সেই অবস্থায়?"

"ওর অসাধ্যি কিছু নেই রে ভাই!"

"মাঘ মাস না গেলে কিছু বলতে পারবো রে বোন্।"

চলিতে চলিতে ভাবিনী একবার মুখ ফিরাইল। তখন সে অনেকটা দূরে গিয়াছে। সেই স্থান হইতে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে সে বলিল, "মনিব যখন সব খরচ দেবে বলেছে, তখন সাঙ্গা করতে আর দেরি করছিস্ কেন?"

"এর-ভিতর সময় পেলুম কখন যে, সাঙ্গা করব।"

"বেশ ত, এখন ত সময় হয়েছে, এখন বিয়ে করতে ত দোষ নেই।"

অন্যমনস্কের ভাবে মাখন উত্তর দিল, "দোষ কি?"

"তা হ'লে কথা আবার পাড়ি? এ ভাদ্র মাসের ক'টা দিন বাদে, আশ্বিনের গোড়ায় গোড়ায় একটা ভালো দিন দেখে—কি বলিস্?"

"ও আর বলাবলি কি রে?"

"দেখিস, সেবারে কথা দিয়ে রাখতে নারলি, এবারেও যেন তাই না হয়!"

"কিসের লেগে আর হবে রে?"

ভাবিনীর উচ্চ স্বর তাহার পিতা অটলের কর্ণগোচর হইল। ভাবিনী ফিরিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "মাখমার সঙ্গে তোর কি কথা হচ্ছিল রে?"

ভাবিনী বলিল, "সাঙ্গার কথা।"

"ও সাঙ্গা করবে?"

"এই ত আমাকে বললে।"

অটলের এ কথাটায় কেমন বিশ্বাস হইল না। সে তখন নিজে গিয়া মাখনকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে, মাখমা!"

ভাবিনীর প্রস্থানের পরেই আবার মাখন সেইরূপই মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল। খুড়ার কথা শুনিতেই সে মাথা তুলিয়া উত্তর দিল, "কি খুড়া?"

"তুই সাঙ্গা করবি?"

"না তো!"

ভাবিনী বাপের পিছন পিছন আসিয়াছিল, এই কথা শুনিয়াই সে বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "তবে তুই আমাকে কি বললি?"

মাখন বলিল, "কি বললুম?"

অটল বলিল, "আর শুনতে হবে না ভাবি, চল। ও মা, বলেছে, আমি তা না শুনেও শুনেছি।"

৮

তথাপি ভাবিনীর অবিরাম অনুরোধের উৎপাতে, মাধবকে স্বীকার করিতে হইল, সে ভাবিনীর বিধবা ননদীকে বিবাহ করিবে। সকলই ত সংসারে যখন তাহাকে থাকিতেই হইবে, তখন তাহার ভব-ঘুরের অবস্থায় চিরটা কাল থাকিলে চলিবে কেন? এক রকমে ত আর দিন যাইবে না, শরীরের অসুখ বিসুখ আছে ত! তখন কে তাহার সেবা করিবে? ভাবিনী ত সকল সময়ে তাহার কাছটিতে বসিয়া থাকিতে পারিবে না। পেটের চিন্তায় তাহাকে ত এদিক্ ওদিক্ কাষ খুঁজিয়া ঘুরিতে হইবে!

ভাবিনীর নির্ব্বন্ধে পড়িয়া মাধব বিবাহে সম্মত হইল। তবে ভাবিনী ভাইয়ের বিবাহ যতটা শীঘ্র দিবে মনে করিয়াছিল, তত শীঘ্র হইল না। মাধব আশ্বিনে বিবাহ করিতে চাহিল না। ভগিনীকে আশ্বাস দিল, হয় অগ্রহায়ণ, নয় মাঘ এই দুই মাসের মধ্যে যেটায় সুবিধা বুঝিবে, সেই মাসে বিবাহ করিবে।

ভাদ্র ত গেলই, আশ্বিন, কার্ত্তিকও চলিয়া গেল, অন্যবার গ্রামত্যাগের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। বরং পূর্ব্বে পূর্ব্বে, এর ওর তার সঙ্গে কথায়, তাহার একটুকু আধটুকু যা সঙ্কোচ ছিল, ক্রমে ক্রমে সে সঙ্কোচও তাহার চলিয়া গেল। এখন তাহার পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তি একরূপ পূর্ণ মাত্রায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

ইহার মধ্যে গ্রামের কেহই কি তাহাকে ফুলকুমারী সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করে নাই? করিয়া থাকিতে পারে। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, অন্যবা সেই প্রশ্নের যে কোনও একটা উত্তর দিলেও আজিও পর্য্যন্ত তাহা মাধবের কর্ণগোচর হয় নাই। এখনও পর্য্যন্ত মাধবের বিশ্বাস, এই সমস্ত স্ফূর্ত্তির মধ্যেও অন্যবা ফুলকুমারীর সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইবার দিন গণিতেছে।

ইতোমধ্যে ভাবিনী ছাতার কানালি গ্রামে যাইয়া সাদার কথাটা একরূপ ঠিক করিয়া আসিয়াছে। কথাটা পাকা হইতে সামান্য মাত্র বাকি আছে। অলঙ্কারপত্র মাধবকে যাহা দিতে হইবে, তাহার জন্য বাধিবে না। প্রভু নরহরি সর্ব্ববিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। একবার মাত্র কন্যাটিকে মাধবের নিজের চোখে দেখা এবং তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা কওয়া। ফুলকুমারীর সেই কথা, 'তোকে আমার ভালো লাগতো না' শেলের মত মাধবের হৃদয়টা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া বালিকা অবস্থা হইতেই সে তাহার চির-অপ্রিয়ের সঙ্গ করিয়া আসিতেছিল। বাহির হইবার সুযোগ সে পায় নাই, তাই সে বাহির হয় নাই। এ মেয়েটার বেলায়ও যদি তাহাই হয়! এখন ত আর সে বালিকা নয়। তার চোখ ফুটিয়াছে। অনেকটা ভালমন্দ বুঝিবার শক্তিও তাহার জন্মিয়াছে। তাই মেয়েটির সঙ্গে দেখা ও কথাবার্ত্তা করিয়া মাধবের জানার প্রয়োজন, ভাবিনীর ননদীর তাহাকে ভাল লাগিল কি না। ভাল তাহার লাগে—তাহাকে সে বিবাহ করিবে; না লাগে, তাহার সংসারে কলঙ্কের পুনরভিনয় সে দেখিতে চায় না। অগ্রহায়ণ মাসে মাধবের ছাতার কানালি যাইবার সুবিধা হইল না। তখন মাঠে ধান কাটার কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পৌষের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তাহার আর অবকাশ থাকিবে না।

ভাবিনীও সেটা বিলক্ষণ জানিত। তাই দাদাকে তাহার শ্বশুর-গৃহে যাইবার জন্য পীড়ন না করিয়া সে একদিন নিজে সেখানে যাইয়া তাহার ননদীকে মাধববাটীতে ধরিয়া আনিল। এইরূপে সে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া দিল।

তাহার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণের কথায় মাধব তাহার নিকট হইতে ভালবাসাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল।

এইবারে ভাবিনী তাহার শ্বশুরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, মাঘমাসের প্রথমে যে কোনও শুভদিনে তাহার ননদীকে দাদার বধূ করিয়া দিবে।

কিন্তু অগ্রহায়ণ শেষ হইতে না হইতে এক দিন সন্ধ্যায় ভাবিনী ও মাধব উভয়েই অন্যবার বাড়ীতে হঠাৎ লোক-সমাগম দেখিতে পাইল।

পর দিন প্রাতঃকালে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া ভাবিনী যাহা শুনিল, তাহাতে সে একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে শুনিল, অন্যবা অতি সঙ্গোপনে ছাতার কানালিতে গিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া তাহার ননদীকেই সাদা করিয়া আসিয়াছে।

বাউরী যুবতীদিগের চিত্তাকর্ষণ করিবার অনেকগুলা গুণ অজবার ছিল। যে 'বাউরি-কাটা' চুল এখন ভদ্র যুবকগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে, সেটা বিশেষরূপেই অজবার মাথার শোভা সম্পাদন করিত। তাহার উপর বাউরীদের মধ্যে গায়ক বলিয়া তাহার একটা প্রসিদ্ধি ছিল। সে সুন্দর বাঁশী বাজাইতে পারিত। সবার উপর এমন অদ্ভুত সে ধামসা বাজাইতে পারিত যে, 'নাচনীর' নাচের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে যখন দুই হাতে দুইটা কাঠির সাহায্যে সে তাহার বাদ্যযন্ত্রের চর্ম্মকে মুখরিত করিয়া তুলিত, তখন শুধু বাউরি-অঙ্গনা কেন, পুরুষরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না।

একটা বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া অজবা ছাতার কানালি গিয়াছিল। সেখানে নাচনীর নাচে সে ধামসা বাজাইয়াছিল। সেই বাদ্য শুনিয়া ও অজবার চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিনীর ননদী তাহাতে আকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে উভয়ের বিবাহ।

শুধু রূপ-গুণের আকর্ষণেই যে এ বিবাহ হইয়াছিল, তাহা নহে; কেন না, ভাবিনীর শ্বশুর ত শুধু উক্ত কারণে মুগ্ধ হইবে না। অজবা এই সাঙ্গা করিতে তাহার কন্যাকে যে অলঙ্কার দিয়াছিল, তাহা তাহার পুত্রবধূর ভাইয়ের দেয় অপেক্ষা মূল্যে অধিক, তথাপি বিশেষ গোপনে সে কন্যার বিবাহ নিষ্পন্ন করিয়াছিল। করিয়াছিল, যাহাতে ভাবিনী অথবা তাহার ভাই না জানিতে পারে।

মাখমও এ সাঙ্গার কথা শুনিল। শুনিতেই তাহার মর্ম্ম-জ্বালা অগ্নিশিখারূপে তাহার দেহের প্রতি লোমকূপ দিয়া যেন বাহির হইয়া গেল।

এ জ্বালা ভাবিনীর ননদীকে অজবার বিবাহের জন্য নহে। তাহার আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। শুধু স্নেহময়ী ভগিনীর একান্ত অনুরোধে সে বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছিল। ভাবিনী যে প্রতি সন্ধ্যায় দাওয়াটিতে তাহার ভাইয়ের সেই মাথায় হাত দিয়া একাকী বসিয়া থাকা দেখিতে পারিত না।

তাহার ননদীর অন্যকে বরণ করায় প্রকৃতই সে হাঁফ ছাড়িয়া যেন বাঁচিল। বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর সেই মেয়েটাকে অপরের হাতে হাত দিতে দেখিয়া নারীকে জীবনের সঙ্গিনী করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি রহিল না।

মর্ম্ম তাহার জ্বলিয়া উঠিয়াছে—কুলীর জন্য। এ পাষণ্ড তবে কি তাহাকে নিঃসঙ্গে নিষ্ঠুরে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে? আসিয়াছে—তাহার সেই গর্ভবতী অবস্থায়?

কুলকুমারীর কথা মনে উঠিতেই মাখমের মাথাটা ঘুরিয়া গেল। বিশেষতঃ সেই অসহায়া অভাগীর কি হইয়াছে—কোথায় সে, কিরূপ অবস্থায় সে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, এই সব জানিবার জন্য সে যেন ক্ষিপ্তের মত হইয়া গেল।

ভাবিনী পূর্ব্বাহ্নে এই সংবাদ পাইয়াছিল। মাখম শুনিল, অপরাহ্নে—মনিবের গৃহ হইতে নিজের ঘরে ফিরিবার সময়ে—পথে।

ঘরে আসিয়াই সে উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিল, "ভাবি!"

উক্ত সংবাদ শুনিবার পর অবধি ভাবিনী ননদী ও শ্বশুরের আচরণ স্মরণ করিয়া মরমে মরিয়া গিয়াছিল। ভাইয়ের সঙ্গে আর সে দেখা করিতে সাহস করে নাই।

ভাইয়ের উত্তেজিত কণ্ঠের আহ্বান যখন তাহার কানে ঠেকিল, তখন সে সত্য সত্যই একবারে মরার মত হইয়া গেল। তাহার উত্তর দিবার কথা জোগাইল না। সমস্ত দিনটা ধরিয়া হরির কাছে সে মানত করিতেছিল, দাদা যেন ঐ বিবাহের কথাটা শুনিতে না পায়। এ কথা দাদার অবিদিত থাকিবে না জানিয়াও স্ত্রী-স্বভাববশে সে ঐরূপ করিয়াছিল। কি জানি, কেন তাহার মনে হইয়াছিল, মাখমের ঐ কথা শোনায় একটা বিষম অনর্থের সৃষ্টি হইবে। মাখমের ডাকার ভাবেই ভাবিনী বুঝিতে পারিল, সংবাদ তাহার ভাইয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সে যাহা ভয় করিয়াছিল, তাই সংবাদ শুনিয়া বিশেষভাবেই উত্তেজিত হইয়াছে।

"ভাবি, ভাবি, ভাবি—"

ভাবিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে মাখমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিল। ঘর ছাড়িয়া মাখমের ঘরের দিকে কিছু দূর আসিতেই সে দেখিল, ভাই তাহার লম্বভাবে উপর দিকে মুখ করিয়া দাওয়ার উপর শুইয়াছে।

"আরে মর, তুইও ম'রে গেছিস্ নাকি—ভাবি?"

"অমন ক'রে শুয়ে থাকিস্‌নে দাদা, ওঠ।"

মাখম উঠিয়া বসিতেই তাহার মুখের পানে একবার মাত্র চাহিয়াই ভাবিনী ডুকরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"কাঁদছিস্ কেন, একটা কথা তোকে বলবার জন্য

ডেকেছি,—আরে মর, কাঁদতে লাগলি কেন ? কাঁদবার ব্যাপার কি হয়েছে ?"

"এমন বিশ্বাসঘাতকি করবে, কেমন ক'রে জানবো ?"

"কে করলে যে বিশ্বাসঘাতকি ? তোর ননদ ? না রে, সে ঠিক করেছে।"

"আমাকে এত কথা ব'লে শেষকালে আবার—"

"আবার ! ঠিক করেছে রে, ঠিক করেছে। বিয়ে করতে আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। করলে আমি সুখী হতুম না। শুধু তোর জেদে রাজি হয়েছিলুম। হরি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে রে !"

কোনও উত্তর না-দিয়া ভাবিনী অঞ্চল দিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল। মুছা শেষ হইলে ননদীর উদ্দেশে, তাহার শ্বশুরের উদ্দেশে সে কতকগুলা গালিপাড়িতে লাগিল। হতভাগা শ্বশুর অন্য কোনও স্থানে কন্যার বিবাহ দিলে ভাবিনীর তত আক্ষেপ থাকিত না। অন্যত্র সম্বন্ধে জানিয়া শুনিয়া তাহাকে কন্যা দিয়া সে তাহার ও তাহার ভাইয়ের মাথাটা মাটীতে লুটাইয়া দিয়াছে।

"বড় অপমানটা করলে, দাদা !"

"তা করেছে বটে, ভাবি ! তবে তাতেও আমার কোনো দুঃখু নেই রে !" বলিয়া মাধব কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইল।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াও যখন ভাবিনী দেখিল, ভাই তাহার আর কোনও কথা কহিল না, তখন জিজ্ঞাসা করিল, "কি জন্য আমাকে ডাকলি, দাদা ?"

উত্তরে মাধব বলিল, "নাঃ, তোকে দিয়ে হবে না। আমাকে নিজেই দেখতে হবে। যা ভাবি, ঘরে যা।" বলিয়াই মাধব উঠিয়া বসিল।

ভাবিনী বলিল, "কিছু যদি আমার করবার থাকে বল্।"

মাধব কোনও কিছু বলিল না দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখতে হবে তোকে ? এমন কি কাজ যে, আমি পারব্ না ?"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া মাধব ভাবিনীকে প্রতিপ্রশ্ন করিল, "হাঁ রে ভাবি, তোর কি মনে হয় ? ফুলীকে অজয় কি পরিত্যাগ ক'রেছে ?"

"তার সুখ আর তুলছিস্ কেন, দাদা ? যদি তাকে ত্যাগই ক'রে থাকে, তা হ'লে তার ঠিক শাস্তিই হয়েছে।"

"ঠিক বলেছিস্ ভাবি, ঠিক বলেছিস্" বলিয়াই মাধব উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভাবিনী তাহার উঠার ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "উঠে দাঁড়ালি কেন ?"

"ঠিক বলেছিস্ ভাবি, তার শাস্তি ঠিক হয়েছে।"

"বোস্ তুই, ভাত এনে দি, খা।"

"কিন্তু ও শালা তার সর্ব্বনাশ ক'রে কেমন ক'রে পরিত্যাগ ক'রে এলো, ভাবি ?"

ভাবিনী ভাইয়ের ভাবটা কেমন কেমন দেখিয়া নিজের মনোভাব চাপিয়া অতি সাবধানে কথা কহিতেছিল। মাধবের এই কথা শুনিয়া সেও আর স্থির থাকিতে পারিল না। ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "শুধু ত্যাগ করলেও দুঃখ হ'ত না, দাদা। তাকে সেই অবস্থায় সেই বিদেশে ফেলে এসে বেঁচে কি না, এমন ক'রে আমোদ করছে ! তোর বুকে ছুরির ওপর ছুরি মারছে। এমন পাপিষ্ঠটাকেও তুই সাদাৎ করেছিলি !"

"ভাবি, তুই একটু থাক্, আমি একবার ঘুরে আসি", বলিয়াই মাধব এক লম্ফে দাওয়ার উপর হইতে উঠানে নামিয়া পড়িল।

"কোথায় যাবি ?" ভাবি প্রশ্ন করিল।

উত্তর না দিয়া মাধব চলিল।

"না, না, এখন তোকে কোথাও যেতে হবে না।"

চলিতে চলিতে মাধব মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তোর কি মনে হয়, ও শালা ফুলীকে মেরে ফেলেছে ?"

"তা কি পারে ! সেটা পারা কি সহজ কথা ! করলে কি সে দেশে একটা হৈ চৈ প'ড়ে যেত না ! করলে ওর এ রকম ক'রে আমোদ করবার সাহস হ'ত !"

"ঠিক্, ঠিক্।"

"যাচ্ছিস্ কেন ? খাওয়া-দাওয়া কর্।"

"ফুলী ক'মাস চলে গেছে রে ?"

"কেন আর তার কথা তুলছিস্ দাদা ?" ফিরে আয়।"

তথাপি মাধব চলিতে লাগিল দেখিয়া ভাবিনী ছুটিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "নাঃ ! এখন কোথাও তুই যেতে পাবি না।"

"একবার সেই শালাকে জিজ্ঞাসা করব রে ভাবি ?"

"নাঃ! তাকে কি জিজ্ঞাসা করসি? সে যেটা কি তোকে সত্যি কথা কইবে?"

ঠিক এই সময়ে অজবার বাড়ীর দিক হইতে একটা হাস্তকোলাহল উঠিল। মাধব ভাবিনীর হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল।

ভাবিনী দুই হাতে তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া মাধবের হাত বাঁধিয়া বলিল, "আমাকে মেরে না ফেলে তুই যেতে পারবিনি। দেখছি তোর মাথায় খুন চেপেছে। বেশী টানাটানি করলে বাপকে ডাকবো।"

এতক্ষণের পর মাধব যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল, বলিল. "যাব না ভাবি, হাত ছাড়্।"

"মিছে কইছিস্ না?"

"না।"

ভাবিনী ভাইয়ের হাত ছাড়িয়া দিল এবং তাহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল।

মাধব বলিল,"খেতে কিন্তু একেবারেই ইচ্ছা নেই, বোন।"

ভাবিনী বলিল, "যা পারিস্, ভাই!"

মাধবের মতি যে চঞ্চল হইয়াছে, এটা ভাবিনী তাহাকে দেখার একটু পরেই বুঝিয়াছিল, কিন্তু কতটা যে তাহার চাঞ্চল্য, ইহা সে বুঝিতে পারে নাই।

অনুনয়-বিনয়ে ভাইকে যখন সে আহার করাইতে বসাইল, তখন মাধব বিশেষ একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, "তাই ত রে ভাবি, তোর মত আপনার জন আমার এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই রে!"

"সত্যই কি দাদা, তোর মাথায় আজ খুন চেপেছিল?"

মাধব কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিল।

মোরগের লড়াই বাউরিদের মধ্যে একটা প্রধান কৌতুক। লড়াইয়ের সময় তাহারা মোরগের পায়ে ওইরূপ ছুরি বাঁধিয়া দেয়।

ভাবিনী মাধবের হাত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইল।

১৬

ভাবিনীর কথায় মাধবের চিত্ত অনেকটা শান্ত হইল। ফুলকুমারীর চিন্তায় তাহার ত সত্যই কোনও লাভ নাই! মাধব মনে মনে বলিল, কেন তবে সেই অবিশ্বাসিনীর চিন্তায় আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করি? ভগিনীকে সে আশ্বাস দিল, আর সে যখন ওরূপ উত্তেজিত হইবে না।

অগ্রহায়ণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল। যেন কোথাও কিছু হয় নাই, এইরূপ ভাবে মাধব তাহার দৈনন্দিন কার্য্য করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে ভাবিনী ভাইয়ের জন্য আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ লইয়া আসিল। সেটিও বাল-বিধবা। দেখিতে সে তাহার ননদী হইতে অনেক ভাল। শুধু তাহাই নহে, তাহার বাপ বাউরী সমাজের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিল। মৃত্যুকালে সেই ব্যক্তি তাহার কন্যাকে এক বরাই ধান ও কিছু নগদ টাকা দিয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে সাঙ্গা হইলে মাধবকে হয় ত আর মনিষগিরি করিতে হইবে না। গ্রামের যে সমস্ত ভদ্রলোকের দু'দশ বিঘা জমি আছে, অনেকেই তাহার সমস্ত অংশ নিজেরা চাষ করিয়া উঠিতে পারেন না। কতক জমি তাঁহারা সাজায় বিলি করেন। অর্থাৎ খাজনা, টাকার পরিবর্ত্তে ধান্যে আদায় করেন। কতক বিলি করেন ভাগে। জমি হইতে উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রজার নিকট হইতে তাঁহারা লইয়া থাকেন। মাধব যদি চাপাতোড়া গ্রামের ওই কন্যাটিকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে ওইরূপ ভাগ চাষের জমি লইয়া কৃষিকার্য্যে নিজের অবস্থার অনেক উন্নতি করিতে পারিবে। বাউরিদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য করিবার ভাগ্য কদাচ কাহারও ঘটিয়া থাকে।

এরূপ প্রলোভনের বিবাহ, মাধব অস্বীকার করিতে পারিল না। খুড়া অটলও তাহাকে অনুরোধ করিল এবং মাধবের ইচ্ছামত কন্যাটিকে দেখিতে ও তাহার আত্মীয়দের সঙ্গে কথার মীমাংসা করিতে চাপাতোড়া গ্রামে চলিয়া গেল।

আড়তের কাযের উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য নরহরিকে পুরুলিয়ায় থাকিতে হইয়াছিল। সুতরাং মাধবের এই দ্বিতীয় লাঞ্ছনা সম্বন্ধে কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই। মাধবের বিবাহের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, বিবাহের বিলম্ব আছে জানিয়া তিনি তাহার কোনও ব্যবস্থা করিয়া যান নাই।

ঘরে ফিরিয়া সব কথা যখন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন। এ পরাভব মাধবের নহে, তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন। অজবার এই বিবাহে মধু পরামর্শ

চাল আছে। তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য মধু অর্থ অলঙ্কার সবস্ত দিয়া অজবাকে সাহায্য করিয়াছে। তিনি থাকিলে কিছুতেই এই বিবাহ হইতে দিতেন না।

তিনি বুঝিলেন, মাখনের নির্ব্বুদ্ধিতায় অজবাকে শাসন না করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন।

কিন্তু এখন আর তাহাকে শাসন করিবার কোনও উপায় নাই। ফুলকুমারীকে লইয়া অজবার পলায়নের পর বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তার উপর যাহাকে উপলক্ষ করিয়া অজবার নামে ফৌজদারী করা হইবে, কোথায় সেই ফুলী?

তথাপি তিনি, মাখন কিম্বা অন্য কাহাকেও না বলিয়া, বাঁকুড়ায় গিয়া উকীলদের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। জানিলেন, অজবার অপরাধের বিচারে ফুলীর থাকার একান্ত প্রয়োজন।

আর কাহারও কাছে সন্ধান জানিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তিনি এক দিন মাখনকেই ফুলীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি জানিতে পারিয়াছে কোথায় ফুলী?"

মনিবের মুখ হইতে ওইরূপ অভাবনীয় প্রশ্ন শুনিয়া মাখন প্রথমটা স্তব্ধের মত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ সে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল মাত্র।

তাহাকে অবাক্ দেখিয়া নরহরি পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "মুখের দিকে চাইছিস্ কি? তোর স্ত্রী কোথায় আছে জানিস্?"

সবিস্ময়ে মাখন বলিল, "তাকে দরকার কি হুজুর?"

নরহরি বলিলেন, "দরকার আছে।"

মাখন অবনত মস্তকে কেবল মাথা নাড়িয়া বুঝাইল, "কোনও দরকার নেই।"

"তোর নেই, আমার আছে। হতভাগা তখন যদি আমার কথা শুনতিস, ওই বদ্‌মায়েসটার নামে ফৌজদারী করতিস্, তা হ'লে এত দিন বেটা জেলে পচে মরতো। আমাকে এই অপমানটা ভোগ করতে হ'ত না।"

"আপনার অপমান? কে করলে হুজুর? অজবা?"

"অজবা আমার অপমান করবে কি রে মাখনা! করেছে মধু পরামর্শে—মামা, ভাগিনা দুজনের সঙ্গে সেই উদ্যোগ ক'রে অজবার বিয়ে দিয়েছে। নইলে অজবার বাবারও সাধ্য কি, তাকে অত গয়না দেয়! মামা বার বার আমার অপমান করছে। নির্ব্বোধ বেটা, শুধু তোর জন্যই আমি সে অপমানের শোধ নিতে পারছি না। জানিস্ ত বল্, কোথায় ফুলী। তুই না করতে চাস্, আমি তাকে দিয়ে সেই বেটার নামে ফৌজদারী করাবো। ওর আবার সাদা করার মজাটা টের পাইয়ে দেবো। কি ভাবতে লাগলি? জানিস্ ত বল্।"

মাখন উত্তর করিল, "জানি না হুজুর।"

"না জানিস্, জানতে হবে। তাও বেশী দিন নয়, দু'চার দিনের মধ্যে। না পারিস্, আমার মনিষী আর তোকে করতে হবে না। তোর মত হতভাগা চাকরের জন্য আমি যে বার বার 'দারাগে'র কাছে অপমান ভোগ করব, তা পারবো না। কি বলিস্, তার খোঁজ করতে পারবি? সে বেশী দূরে নেই। অজবা আশেপাশের কোন্ গাঁয়ে তাকে লুকিয়ে রেখেছে।"

নরহরির এটা বুঝা উচিত ছিল, নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামেই যদি অজবা ফুলীকে লুকাইয়া রাখিবে, ফুলীর প্রতি তাহার যদি ঐরূপই টান থাকিবে, তা হইলে সে আবার সাদা করিবে কেন? অভিমানের দিক দিয়া হিসাব করিতে তাঁহার ভুল হইয়া গেল। ফুলকুমারীর অনুসন্ধানে তিনি জিদের সহিত আবার মাখনকে আদেশ করিলেন। মাখন স্বীকার করিল না।

অতি কঠোর বাক্যপ্রয়োগে নরহরি এবার মাখনকে স্থান ও কার্য্যত্যাগে আদেশ করিলেন।

মাখন চলিয়া গেল।

গতি অন্তরাল হইতে তাহার খুল্লতাতের সঙ্গে মাখনের কথোপকথন শুনিতেছিল। মাখনের জড়তায় সেও ভিতরে ভিতরে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। মাখন বাটীর সম্মুখদ্বারের বাহিরে আসিতেই তাহাকে প্রহার ও কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া দূর হইয়া যাইতে আদেশ করিল।

নরহরি নিজে অতি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। অনেকটা কর্ত্তব্যের দিক দিয়া, কতকটা মধু পরীক্ষার সঙ্গে 'দারাগ'সম্পর্কের অভিমানের মধ্য দিয়া অজবার শাসন তাঁহার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ একমাত্র মাখনের জড়তার জন্য তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সেই জন্য তাঁহার উত্তেজনা নিতান্ত অল্পায় হয় নাই। জাতি ও শিক্ষার অভিমানে আমরা অনেক

সময় নীচ, অস্পৃশ্য অশিক্ষিতের মনস্তত্ত্ব উপেক্ষার চোখে দেখিয়া থাকি। কদাচ মনে করি, উচ্চ শিক্ষিতের ঘরে মাখনের মত ঐরূপ একটি দুর্ঘটনা যেরূপ মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে, স্বল্পবুদ্ধি অশিক্ষিতদের ভিতরে কখন সেই ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিতে পারে না। অন্য ভদ্রলোকদিগের মত নরহরিও ফুলকুমারীর পরিত্যাগ নীচের ঘরের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার একটা উদাহরণ মনে করিতেন। তাই এতদিনের মধ্যে এক দিনও বাক্-সম্পদহীন ভৃত্যের হৃদয়ের দিকটা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। কখনই মনে করেন নাই, স্ত্রীর পলায়ন মাখনের হৃদয়ে কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছে। তাহার স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার বিষাদ ক্ষণিক, ভাবিনীর ননদকে বিবাহ করিতে মাখনের অনিচ্ছার কথা শুনিয়া, তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। তবে মাখনের মুখ হইতে উচ্চারিত দুই একটা কথা তাঁহার কানে ঠেকিয়াছিল। 'অজবাকে জেলে দিলে ফুলী যে কষ্ট পাবে!' 'হাকিম ফুলীকে ডিক্রী দিতে পারে, কিন্তু তাহার ভালবাসা ত ডিক্রী দিতে পারে না।' কথাগুলা তাঁহার কানে ঠেকিয়াছিল মাত্র। মাখনের অন্তরের গভীর অর্থ লইয়া তাহা যে তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে, সেটা তাঁহার মনে হয় নাই।

যাহাই হউক, নিতান্ত তিরস্কৃত হইয়া, মাখনের চলিয়া যাওয়ার পরেই নরহরির মন বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল। ভৃত্যদিগের প্রতি তিনি কদাচ কঠোর ব্যবহার করিতেন।

বিশেষতঃ উদ্ধত ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই নিরপরাধ ভৃত্যের প্রতি দুর্ব্যবহার, তাঁহার চিত্তকে আরও ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিল। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র যে অপরাধ করিয়াছে, তিনি নিজেও সেই অপরাধে অপরাধী বলিয়া, তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি মাখনকে আবার ডাকিয়া আনিতে গভিকে আদেশ করিলেন। বলিতে বলিলেন, 'মাখনের নিজেরই যখন অজবার উপর প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা নাই, তখন তিনিও তাহাকে শাস্তি দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।'

গভি গেল, কিন্তু মাখনকে দেখিতে পাইল না। তৎপরিবর্ত্তে সে ভাবিনীকে সঙ্গে করিয়া খুড়ার কাছে আনিল।

তাহারই মুখে ফুলকুমারীর দুর্দ্দশার কথা সমস্তই নরহরি অবগত হইলেন। এতদিন পরে মাখনের কথা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। ফুলীর আর মাখনের গৃহে ফিরিবার উপায় নাই।

সেই সঙ্গে নরহরি ভাবিনীর মুখে মাখনের নূতন সম্বন্ধের কথা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি পরমানন্দিত হইলেন। বলিলেন, এ বিবাহে যাহা ব্যয় হইবে, সমস্তই তিনি বহন করিবেন। ভাবিনীর ভাইকে ঘর হইতে একটি পয়সাও বাহির করিতে হইবে না। মেয়ের পক্ষ মাখনের নিকট হইতে যে সকল অলঙ্কার চাহিবে—হউক তাহা যত মূল্যের—তাহাও তিনি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভাবিনী ভাইকে মনিবের কাছে লইয়া আসিতে চলিয়া গেল। বিবাহের পাকা কথা কহিতে অটল চলিয়া গেল চাপাতোড়ায়। নরহরি জানিলেন, এ বিবাহ ভাবিনীর ননদীর সঙ্গে বিবাহ অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল এবং এ বিবাহে মাখনের সম্পূর্ণ মত আছে।

ননদীর সঙ্গে দেখা হইলে তৎপ্রতি কোনও কটূক্তি প্রয়োগ করিতে ভাবিনীকে তিনি নিষেধ করিয়া দিলেন।

১৭

কিন্তু কোথায় মাখন? ভাবিনী ঘরে আসিয়া মাখনকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু দেখিল, তাহার ঘরের কবাট একবারে হাট-করা খোলা রহিয়াছে। মাখন যে তাহার প্রভু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহা সে জানিত না। মনে করিল, ঘরের নিকটে কোথাও না কোথাও সে রহিয়াছে। ঘর ওই-রূপ অবস্থায় রাখিয়া সে দূরের কোথাও যাইতে পারে না।

সে ভাইকে ডাকিল। উত্তর পাইল না। কিয়ৎক্ষণ তাহার ফিরিবার অপেক্ষায় তাহারই দাওয়ার উপরে বসিল। গৃহ লোকশূন্য দেখিয়া কুঁকড়াগুলা তাহার ঘরের ভিতরেই প্রবেশ করিয়াছিল। সেগুলাকে সে তাড়াইল।

অনেকক্ষণ বসিয়াও ভাবিনী যখন দেখিল, মাখন ফিরিল না, তখন সে ঘারে শিকল দিয়া ভাইয়ের অন্বেষণে বাহির হইল। মনিব মাখনকে শীঘ্র তাঁহার কাছে পাঠাইতে বলিয়াছেন।

যেখানে যেখানে মাখনের অবস্থিতির সম্ভাবনা, সেই সেই স্থানে ভাবিনী তাহার অন্বেষণ করিল। তাহার দেখা পাওয়া দূরে থাক্, কেহ তাহাকে প্রাতঃকাল হইতে দেখিয়াছে—এ কথাও বলিতে পারিল না।

তখন বেলা প্রায় দশটা। হয় ত মাধব গৃহে না ফিরিয়া পথ হইতেই মনিবের গৃহে চলিয়া গিয়াছে, এই মনে করিয়া ভাবিনী সেই স্থানেই তাহার তত্ত্ব লইতে চলিল। যাইয়া জানিল, মাধব সেখানে আসে নাই।

আবার সে ঘরে ফিরিল। দেখিল, ঘর তাহার তেমনই রহিয়াছে। এইবারে মনে তাহার কেমন একটা সন্দেহ জাগিল। ওই সমস্ত বিবাহের কথার ভিতরেও অভাগী বউয়ের উপরে মাধবের একটা প্রবল স্নেহ সে অনুভব করিত। সে বিলক্ষণ বুঝিত, বিবাহ করিতে আর মাধবের ইচ্ছা নাই; শুধু তাহারই একান্ত অনুরোধে সে বিবাহে সম্মতি দিয়াছে। সেওয়া মাত্রই তাহার সার হইয়াছে। যে পাষণ্ড একবার তাহার ভাইকে মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা দিয়াছে, আবার সে তাহাকে লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনা দিল। অথচ সেই প্রচণ্ড অপরাধীর শাস্তি হইল না। মনের দুঃখে তবে কি ভাই কাহাকেও না বলিয়া ঘর ফেলিয়া কোথাও চলিয়া গেল!

আবার সে তাহার প্রভুর গৃহে চলিয়া গেল এবং তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বলিল। এইবারে সে প্রভুর মুখে মাধবের তিরস্কৃত হইবার কথা শুনিল এবং কেন যে চট্টরাজ মহাশয়ের মত দয়ালু প্রভুর কাছে তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহাও ভাবিনী জানিতে পারিল। জানিয়া ভাবিনীর চিত্ত অনেকটা শান্ত হইল। গতি ঠাকুরের কাছে মার খাইয়া অভিমানে দুঃখে মাধব ঘরে ফিরে নাই। বাঁকুড়া অথবা অন্য কোনও নিকটবর্ত্তী গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। একটু মনটা তাহার শান্ত হইলেই সে ফিরিয়া আসিবে। বউকে আনিতে যখন তাহার ইচ্ছা নাই, তখন সাঙ্গা করিয়া নূতন সংসার করিতেই তাহার ইচ্ছা হইয়াছে। অপমানের ক্ষোভটা দূর হইলেই, যেখানে থাকুক, সেই স্থান হইতে সে চলিয়া আসিবে।

দশটা, এগারোটা, দুপুর—ক্রমে অপরাহ্ণ, মাধব ফিরিল না। তথাপি ভাবিনী তাহার ঘরে ফিরিয়া না আসা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করিল না। তখন তাহার মনে হইল, পথের মধ্যে দেখা পাইয়া হয় ত দাদা তাহার বাপের সঙ্গে, চাপাতোড়ায় চলিয়া গিয়াছে। এবারেও সে নিজের চোখে মেয়েটাকে দেখিবে, তাহার সঙ্গে কথা কহিবে। তাহাকে তাহার ভাল লাগিল কি না জানিবে। তাহার ভাইকে নিশ্চয় মেয়েটার ভাল লাগিয়াছে, তাই তাহার আত্মীয়রা দুই জনকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, মধ্যাহ্নে অমনই অমনই ছাড়িয়া দেয় নাই।

ভাবিনীর বাপও তখনও পর্য্যন্ত ফিরে নাই। সুতরাং সে বাপের সঙ্গেই ভাইয়ের ফিরিয়া আসার প্রত্যাশা করিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মেয়ের মামা ও এক জন বিজ্ঞ আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া অটল ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই ভাবিনীর কাছে মাধবের তত্ত্ব লইল।

বাপের সঙ্গে ভাইকে না দেখিয়া ভাবিনী চমকিয়া গেল, কিন্তু বুদ্ধিমতী আসল কথাটা প্রকাশ না করিয়া তাহাদিগকে শুনাইল, মনিবের বিশেষ একটা প্রয়োজনে তাহাকে ভিন্ন গ্রামে যাইতে হইয়াছে। সে দিন সে আসিতেও পারে, না-ও আসিতে পারে। ইহার পর গোপনে সে তাহার পিতাকে লইয়া সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিল।

ব্যাপারটা শুনিয়া অটলের বিশেষ চিন্তার বিষয় বলিয়া বোধ হইল না। ওরূপ অভিমানে সেও পূর্ব্বে অনেকবার গৃহত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে অভিমান দুই দিনের বেশী তাহাকে বাড়ীর বাহিরে রাখিতে পারে নাই।

অটল বাড়ীতে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া, সঙ্গীদিগকে চট্টরাজ মহাশয়ের কাছে লইয়া গেল।

সেই স্থানে মাধবের অনুপস্থিতিতেই বিবাহের পাওনার সব কথা স্থির হইয়া গেল। চাপাতোড়া গ্রাম মাধববাটীর নিকটে, একখানা মাত্র গ্রাম পরে। মেয়ের মামা মাধবকে পূর্ব্বে অনেক বারই দেখিয়াছে। সুতরাং বরকে দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন তাহাদের হইল না।

পাঁজি দেখিয়া নরহরি ৪ঠা বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া দিলেন। মাঘ মাসের ৪ঠা। হউক এ সাঙ্গা, পৌষ মাসটা যখন হিন্দুর বিবাহের পক্ষে একবারেই নিষিদ্ধ, তখন সে মাসটায় বিবাহ হওয়া তিনি যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না।

১৮

এক দিন দুই দিন—তৃতীয় দিনেও যখন মাধব আসিল না, তখন নরহরি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। মাধব সম্বন্ধে ব্যাপারটা তিনি দনু বাবুকে বলেন নাই। এইবারে সেটা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিতে হইল। শুনিয়া তাঁহাকেও চিন্তিত হইতে হইল বটে, কিন্তু তিনি নরহরিকে আশ্বাস

দিলেন। বলিলেন, এক যদি সে চা বাগানের কুলী হইয়া চলিয়া না যায়, তা হইলে যেখানেই সে থাকুক না কেন, সন্ধান তাহার মিলিবেই। কেন না, সে নিঃসম্বল অবস্থায়, কেবলমাত্র অভিমানের ঝোঁকে ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছে। শুধু হাতে শুধু দৈহিক শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া বাহিরে বাহিরে অধিক দিন থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ বাউরী জাতিটা স্বভাবতঃই ভীরু। গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যখন তাহারা কাষ করিতে যায়, যায় তাহারা দলবদ্ধ হইয়া; যখন গ্রামে ফিরিয়া আসে, তখন ওইরূপ দলবদ্ধ হইয়াই আসে। চারগুণ বেতন দিলেও কোন বাউরী একাকী বিদেশে চাকরী করিতে চাহে না।

নরহরিকে শুধু আশ্বাস দিয়াই মধুবাবু ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি মাধবের অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিলেন। যেখানে যেখানে তাহার যাওয়া সম্ভব, সেই সেই স্থানে লোক পাঠাইলেন।

সন্ধান মাধবের মিলিল না, কিন্তু তাহার সন্ধানের আভাস মিলিল। এক জন তাহার শ্বশুরগৃহ জুনবেদে গিয়া জানিল, যে দিন মাধব নরহরির কাছে তিরস্কৃত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, সেই দিনই সে ফুলকুমারীর বাপ-মা তাহাদের কন্যার কোনও সন্ধান জানে কি না জানিতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা তাহাদের কন্যার কোনও সংবাদ তাহাকে দিতে পারে নাই।

আর এক জন ভাহুল গ্রামে মাধবের মাতুলালয়ে গিয়া জানিয়া আসিল, সে তাহার মামাতো ভাইয়ের নিকট হইতে পাঁচ টাকা ধার লইয়া গিয়াছে। বলিয়াছে, আমি ফুলীকে খুঁজিতে চলিয়াছি। যদি তাহাকে পাইতে একমাসের অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তা হইলে তাহার মনিব চট্টরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে সে ওই টাকা চাহিয়া লইবে।

এইটুকু জানিয়া নরহরি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। মাধব তাহা হইলে অভিমানে গৃহত্যাগ করে নাই। তাঁহারই মর্য্যাদা রাখিতে তাঁহার আদেশ পালন করিতে চলিয়া গিয়াছে।

ভাবিনী ও অটল মাধবের ওইরূপ ভাবে চলিয়া যাওয়াটা পছন্দ না করিলেও তাহার শীঘ্র ফিরিয়া আসার সম্বন্ধে সন্দেহ করিল না। তবে মাধব ফুলীকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ফিরিলে, নূতন বিবাহ সম্বন্ধটার কি হইবে?

পূর্ব্ব-স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিয়াছে শুনিলে মেয়েটির আত্মীয়স্বজন আর ত মাধবকে তাহার সহিত সাঙ্গা দিতে চাহিবে না।

আর ফুলীর গর্ভের অবস্থা জানিয়া অটলই বা কেমন করিয়া তাহাকে তাহাদের ঘরে স্থান দিবে। দিলে বাউরী সমাজ তাহাদিগের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার সম্পর্ক রাখিবে কেন?

যাহাই হউক, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া সকলেই মাধবের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু মাধব যে কেন চলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রকৃত কারণ মাধববাটীর এক জন ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে নাই। সেই এক জন অজবা। প্রভুর কাছে তিরস্কার আর গতির কাছ হইতে প্রহার খাইয়া মাধব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত চট্টরাজদিগের বাগানপথ ধরিয়া তাহার ঘরে ফিরিতেছিল। ঘটনাক্রমে অজবাও সেই পথ ধরিয়া তাহার মনিবের গৃহের দিকে আসিতেছিল। আসিতে আসিতে পথের মাঝে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। ইহার পূর্ব্বে আরও অনেকবার অজবার সঙ্গে মাধবের পথের মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু অজবাকে দেখিলেই মাধব মুখ ফিরাইয়া পথের এক দিক দিয়া চলিয়া যাইত। অজবাও চলিয়া যাইত সঙ্কুচিতভাবে পথের অন্য দিক দিয়া।

আজ হঠাৎ যে যাহার মুখোমুখী হইয়া পড়িল। কিন্তু মাধব এবার মুখ ফিরাইল না। অজবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সঙ্কুচিতভাবে একটু পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল। মাধব তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে শালা, একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ ক'রে, আর একটাকে যে সাঙ্গা করলি, তাকে কোথায় ফেলে এলি?"

প্রথমে অজবা কোনও উত্তর দিল না। সে পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

মাধব পথরোধ করিয়া বলিল,—"চ'লে যাচ্ছিস কি ে শালা, বল্।"

"কি বল্‌ব?"

"কি বল্‌ব!"

"সে কোথায় আমি কি জানি?"

"তুই তাকে কুলের বার ক'রে নিয়ে গেলি, কোথায় ে তুই জানিস না? জানবো আমি? অজবা, তোর সঙ্গ

বিশ্বাসঘাতকি আমি মাপ ক'রে এসেছি। সাবধান হয়ে কথা ক'। সত্য ক'রে বল্।"

তথাপি অজবা সত্য কহিল না। বলিল, "আমার সঙ্গে সে যায় নাই।"

শুনিবামাত্র প্রচণ্ড ক্রোধে বাঘের মত মাখম অজবার দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিল। অজবা মাখম অপেক্ষা বলিষ্ঠা ছিল। কিন্তু অপরাধীর অন্তর্দুর্বলতায় সে মাখমের শক্তিকে রোধ করিতে পারিল না।

ভূমিতে ফেলিয়াই উন্মত্তের মত অজবাকে প্রহার করিতে করিতে ও কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে দিতে মাখম বলিল, "আমি নিজের চোখে দেখে এলুম, তাকে টাকা কাপড় দিয়ে এলুম—এখনো মিথ্যা কইবি।"

শেষ কয়টা কথা শুনিতেই তড়িতাহতের মত অজবা চমকিয়া উঠিল। বলিল, "আমাকে ছেড়ে দে, আমি বলছি।"

মাখম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সে দাঁড়াইল ও হেঁটমুণ্ডে গায়ের ধূলা ঝাড়িতে লাগিল।

ইতাবসরে মাখম কুলকুমারীর সঙ্গে কিরূপে, কোথায়, তাহার কিরূপ অবস্থায় দেখা হইয়াছিল, কোথায় সে থাকিত, সমস্ত কথা তাহাকে শুনাইল।

অজবা দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিল। সে সকল কথার উত্তর দিবার তাহার কিছুই ছিল না।

মাখম এইবারে কুলকুমারীর শেষ দুর্দশার কথা, যে দুর্দশা তাহাকে স্বামীর ঘরে ফিরিয়া আসিতে নিরস্ত করিয়াছে, অজবাকে যখন জিজ্ঞাসা করিল, তাহার যে অবস্থায় পিশাচেরও তাহার উপর দয়া হয়, কুলী সেই অবস্থায় কেমন করিয়া সেই পাষণ্ড তাহাকে অজানা বিদেশে ফেলিয়া আসিল। তখন অজবা বলিল, "আমি তাকে ফেলে আসি নাই। সেই আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে।"

"সত্যি?"

"যে দিন তুমি গিছলে, তার পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে আর তাকে দেখতে পাইনি।"

"সত্যি বলছিস্ অজবা?"

"তাকে সঙ্গে ক'রে এনে আমার বোনের শ্বশুর ঘরে রাখবো কথা ছিল; কিন্তু আর তাকে দেখতে না পেয়ে একা চ'লে এসেছি। সমস্ত দিন ধ'রে খুঁজেছি, কেউ বলতে পর্যন্ত পারলে না, তাকে দেখেছে কি না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাখম বলিল, "কোথায় সে যেতে পারে, তোর মনে হয়?"

"তা ত বলতে নারছি।"

"তিন মাস তোরা কি বস্তিবাটীতেই ছিলি?"

অজবা বলিল, "না। ছিলুম সেখানে এক মাস।"

এই বলিয়া পলাইবার সময় পথে যে যে স্থানে তাহারা অবস্থিতি করিয়াছিল, অজবা মাখমকে বলিল।

শুনিতে শুনিতে অতি উত্তেজনায় মাখম অজবাকে প্রবলভাবে এক পদাঘাত করিল। সে আঘাতের ভার অজবা সহ্য করিতে না পারিয়া পড়িয়া গেল।

আর পিছন দিকে না চাহিয়া, আবার একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিতে করিতে বলিল, "যা, বেঁচে গেলি। তোকে খুন ক'রে আমার বুকের জ্বালা নিবারণ করব মনে করেছিলুম, বেঁচে গেলি।"

বলিতে বলিতে মাখম দূর হইতে দূরে চলিয়া গেল। নিজের বাড়ী যাইবার পথ ধরিয়াছিল। সে পথে আর না যাইয়া শ্বশুরের গ্রাম জুনবেদে অভিমুখে চলিল। কুলীকে খুঁজিতেই হইবে। কোথায় আছে, কেমন আছে না জানিতে পারিলে ইহজীবনে আর প্রাণে শান্তি আসিবে না।

১৯

অজবা মাখমকে মিথ্যা কথা কহে নাই। সত্যই সে কুলকুমারীকে ত্যাগ করে নাই, কুলকুমারীই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

বাজার হইতে এক সের তাড়ি খাইয়া পুরা মাতাল হইয়া যখন অজবা তাহার সেই বাগানের কুটীরটিতে ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় আটটা হইয়াছিল।

টলিতে টলিতে আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, ঘরে অন্ধকার। মত্ততার ভিতর দিয়া যতটুকু বিস্ময় তাহার আসিতে পারে, সমস্তই আসিল।

অনেকটা সম্বিতের ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সে তীব্র দৃষ্টি দিয়া অন্ধকার ভেদ করিবার চেষ্টা করিল। সে ঘরে যে কোনও প্রাণী আছে, তাহা তাহার বোধে আসিল না।

পাশের বন—কুলীর যে ফুলচক্ষু দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে,

কাষ করিতে করিতে অনেকবার সে দেখিয়াছে, সেই চক্ষু দুইটির উপর অনেকেরই তীব্রদৃষ্টি পতিত হইয়াছে—এমন কি ঠিকাদার বাবুটিরও পর্য্যন্ত। অবশ্য ইহাতে ফুলকুমারীর কোনও দোষ না থাকিলেও অজবা অনেক সময় তাহার প্রতিবিধি সন্দেহের চোখে নিরীক্ষণ করিত।

আলোকশূন্য ঘর দেখিয়া এই মন্তের সন্দিগ্ধ হৃদয়টা তীব্র স্পন্দনে কাঁপিয়া উঠিল। সে তখন পা টিপিয়া টিপিয়া, আঙ্গিনার পার্শ্বস্থ একটা আমগাছের অন্তরালে যাইয়া গাছের গুঁড়িতে ভর দিয়া দাঁড়াইল। সে স্থান হইতে ঘরে লোকের যাতায়াত সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়াও যখন কোনও মানুষের যাতায়াত তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন আবার সে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই ডাকিল, "মতি!" সে ঐ নামেই ফুলকুমারীকে এ দেশে পরিচিত করিয়াছিল।

ঘর হইতে কোনও উত্তর আসিল না। আবার ডাকিল, "মতি!" এবারেও উত্তর না পাইয়া সংশয় তাহার শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

সে যথাসম্ভব দ্রুতপদে কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "ফুলী!"

ঘরটা অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার তিন দিকে খালি ছিল। তাহার এক দিকে হইত তাহাদের রন্ধনকার্য্য, অপর দিকে কাঠ-কুটা রাখা হইত।

ফুলকুমারী এইবারে উত্তর দিল। উত্তর দিল সে ঘরের ভিতর হইতেই। কিন্তু অজবার মত্ত মস্তিষ্কে বোধ হইল, সে যেন কাঠ-কুটা রাখার চালির দিক্ হইতে উত্তর দিতেছে।

"এত রাত্রে ওখানে কি করছিস্?"

ফুলকুমারী উত্তর দিল না।

"ফুলী!"

"কি বলছিস?"

অজবা এবারে বুঝিল, ফুলী ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল। সে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল এবং চৌকাটে হাত রাখিয়া মাথাটা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া ফুলকুমারীকে দেখিবার চেষ্টা করিল—দেখিতে পাইল না। দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াই বলিল, "ঘর অন্ধকার কেন?"

"চেরাগ জ্বালি নাই।"

"জ্বালিস্ নাই, জ্বাল্।"

"তুই ধরিয়ে নে।"

"কেন, তুই?"

"আমার গায়ে সুখ নাই।"

"তা কেমন ক'রে থাকবে!"

অজবার এ রহস্যের অর্থ ফুলকুমারী ভাল বুঝিতে পারিল না। সে মনে করিল, হয় ত মাতালটা তাহার স্বামীর আগমন জানিতে পারিয়াছে।

তাই মনে করিয়া আবার তাহাকে সে আলো জ্বালিতে বলিল। অজবা তথাপি ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। এখনও সে ফুলকুমারীকে দেখিতে পায় নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় রইচিস্?"

"শ্মশানে রইচি রে! কেন, আসতে কি তোর ভয় লাগছে?"

"কোথায় গিয়েছিলি?"

"ঘরের ঘর। আ মর, ঘরকে আয়।"

অজবা ঘরে প্রবেশ করিল এবং ফুলকুমারীর নির্দ্দেশমত স্থান হইতে দীপ ও দেয়াশলাই সংগ্রহ করিয়া আলো জ্বালিল। জ্বালিতেই দেখিল, দুই হাতের উপর ভর দিয়া ফুলকুমারী হেঁট মাথায় মাটির উপর বসিয়া রহিয়াছে।

প্রথমটা সে ওইরূপ বসার মর্ম্ম ভাল বুঝিতে পারিল না। সত্যই কি তবে ফুলীর অসুখ হইয়াছে? সে তখন জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে রসুই করিস্ নাই?"

ফুলকুমারী বলিল, "না।"

"হুঁ, কি খাব?"

"নিজে রসুই ক'রে নে।"

"তুই নাবি?"

"না তো।"

কথা কহিতে কহিতে মাথমের দেওয়া ফুলকুমারীর সেই নূতন সুন্দর পাড়যুক্ত কাপড় অজবার চোখে পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ওটা কি রে, ফুলী?"

"আঁখ ত রইছে, দেখ না"

"ও কাপড় কোথায় পেলি?"

উত্তর দিতে ফুলকুমারীর কণ্ঠ হঠাৎ কেমন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে মুখ ফিরাইয়া বাম হস্ত কাপড়ের উপর রাখিয়া অন্যমনস্কার ভাবে অঙ্গুলি দিয়া তাহার পাড় পরীক্ষা করিতে লাগিল।

"কোথায় পেলি ?"

অতি রুক্ষস্বরে অভয়া প্রশ্ন করিল।

ফুলকুমারী মুখ ফিরাইয়া অভয়ার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "যেখানেই পাই না কেন, তোকে যে সব কথাই বলতে হবে, তার মানে কি ?"

"না বললে খুন করব" বলিয়াই অকথ্য ভাষায় সে গালি দিয়া উঠিল।"

ফুলকুমারী বলিল, "আমায় ভালবাসা দিয়েছে যে !"

এই কথা শুনিবামাত্র প্রচণ্ড ক্রোধে হুঁয়াম্মা ফুলকুমারীর কেশাকর্ষণ করিয়া গালি দিতে দিতে তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ ফুলকুমারী প্রহার নীরবে সহ্য করিল। যখন আর পারিল না, তখন কোনও উপায়ে সেই মত্তের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া দৌড়িয়া কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অভয়া তাহার অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু মত্ততার জন্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন টলিতে টলিতে ফিরিয়া ঘরের দাওয়ার উপর বসিল। বসিয়া যতক্ষণ পারিল তাহাকে নানা অপভাষায় গালি দিল। অপর কোনও পুরুষে আসক্তির জন্যই সে নারী যে ওই নূতন সুন্দর বস্ত্র উপহার পাইয়াছে, ইহাতে তাহার কোনও সন্দেহ ছিল না।

গালি দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া সে সেই দাওয়ার উপরেই শুইয়া পড়িল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে ফুলকুমারীর দিক্ হইতে কোনও উত্তর পায় নাই। শুইয়া শুইয়া এইবারে তাহার ফুলীর উত্তরের প্রয়োজন হইল। তাহার অনুমান সত্য কি না, ফুলীর কথা হইতেই তাহাকে বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহার বিশ্বাস, ফুলকুমারী অন্ধকারে আঙ্গিনার কোন না কোন স্থানে লুকাইয়া আছে।

শুইয়া একটা হাতে ভর দিয়া মাটীর দিকে মুখ করিয়া নিমীলিতনেত্রে সে ডাকিল, "ফুলি—মতি! আমার ডাকে আর উত্তর দিবি না ? মতি! কেন তুই এ বিশ্বাসঘাতকি করলি ? জানিস্, আমি তোকে কত ভালবাসি। তোর জন্যে আমি কি না করেছি ? ওঃ! আমার বড় ঘর-বাড়ী দেশ—শুধু তোর জন্যে আর, আর আমি তোকে মারব না। ফুলি—মতি!"

বার বার ওই দুই নামে ফুলকুমারীকে সম্বোধন করিতে করিতে এবং অস্পষ্ট ভাষায় তাহার সেই অজানা নবানুরাগের পাত্রকে হত্যা করিবার প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে অভয়া গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

পর দিন সূর্য্যোদয়ের অনেক পরে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিল, ঘরে ফুলী নাই, কেবল তাহার ছেঁড়া কাপড়-খানা ঘরের একপাশে পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত দিন ধরিয়া সে ফুলকুমারীকে অন্বেষণ করিল। সন্ধান ত সে পাইলই না, এমন এক জনকেও সে দেখিতে পাইল না, যে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে দেখিয়াছে।

অগত্যা পর দিন প্রভাতে মাধববাটীতে রওনা হইবার জন্য অভয়া বৈষ্ণবাটী পরিত্যাগ করিল। মাধব মধু পরীক্ষার যে কথা অভয়াকে বলিবার জন্য ফুলকুমারীকে অনুরোধ করিয়াছিল, সেটা আর তাহার বলিবার অবসর হয় নাই। আর কোথাও যাইবার স্থান না দেখিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া নিজের ইচ্ছামতই অভয়া মাধববাটীতে ফিরিবার মন করিল। এ পর্য্যন্ত সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, সমস্তই তাহার নেশাতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পথে দুই চারি দিনের বিলম্ব ঘটিলেও তাহাকে অনাহারে মরিতে হইত।

তৃতীয় দিবসে অভয়া মাধববাটীতে উপস্থিত হইল। গ্রামের সন্নিকটে যখন সে উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্যাস্ত হয় নাই। সে সময়ে সে গ্রামে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। একটু রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে অপেক্ষা করিয়া নির্জ্জন পথ অবলম্বনে সে একবারে মনিবের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মনিব তাহাকে আশ্বাস দিলেন। বলি-লেন, "আমার ঘরেই তুই রহিয়া যা। কেউ কিছু তোকে বলে, তার নাকে মুখে জল না ঢেলে ছাড়বো না। সে জন্য বাঁকুড়ার সব কটা আদালত ত দেখবোই, তাতেও না হয়, হাইকোর্ট অবধি না দেখে ছাড়বো না।"

কিন্তু একমাত্র মাধব ভিন্ন আর কেহ তাহার প্রতি কুবাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ করে নাই। সুতরাং মধুসূদনেরও আর হাইকোর্ট দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই।

মাধবের মুখ হইতে শুনিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত অভয়া ফুলকুমারীর বস্ত্র-প্রাপ্তি-রহস্য বুঝিতে পারে নাই। বরাবরই তাহার ধারণা ছিল, সে বস্ত্র ফুলী কোনও না কোন অবৈধ উপায়ে অর্জ্জন করিয়াছে। সেই বদ্ধমূল বিশ্বাসে ফুলকুমারীকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাহার মনে সামান্য মাত্রও অনুতাপ জাগে নাই। প্রাতঃকালে তাহাকে কুটীরে না দেখাতে

সে অনুমান করিয়াছিল, কুলী তাহার সেই বন্ধুদাতা "ভাগ্য-বিধাতার" অনুসরণ করিয়াছে। সেই বিশ্বাসে সে তাহার অন্বেষণে ক্ষান্ত দিয়া দেশে চলিয়া আসিয়াছে। আসিয়া আবার একটা সান্ত্বনা করিয়াছে। মাধবের মুখ হইতে যখন সে সমস্ত তথ্য জানিতে পারিল, তখনই সে একবারে যেন জীবন্মৃত হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত দৈহিক শক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। নহিলে কখনই সে ঐরূপভাবে মাধবের কাছে লাঞ্ছিত হইতে চাহিত না।

মাধবের তীব্র পদাঘাতে যখন সে মাটীতে পড়িয়া গেল, তখন তাহার অনুতপ্ত মনে ফুলকুমারীর প্রতি তাহার সেই পাষণ্ডের আচরণটাই জাগিয়া উঠিল মাত্র।

মনিবের ঘরে সে দিন আর অঞ্জবার যাওয়া হইল না। ঘরে ফিরিয়া দারুণ শিরঃপীড়ার অছিলা লইয়া নববিবাহিতা স্ত্রীর সম্মুখে মাথায় হাত দিয়া সমস্ত দিনটাই একরূপ সে বসিয়া কাটাইয়া দিল।

২৩

কুটীর হইতে বাহির হইয়াই ফুলকুমারী একটা দিক্ ধরিয়া ছুটিল। মদের নেশা তাহার অনেকক্ষণ আগেই ছুটিয়াছিল। মদ হইতে হাজার গুণে তীব্র মনের নেশা এখন তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। অঞ্জবার পৈশাচিক আচরণ—তাহার সেই নিষ্ঠুর প্রহার, সেই নেশার মাত্রা আরও যেন অধিক করিয়া তুলিয়াছে।

তাই ত যাহার উপর সে চরম অত্যাচার করিয়াছে, সে তাহার উপর অত্যাচারেরও কিরূপ প্রতিশোধ লইল! ফুলকুমারী ও মনকে শতভাবে বুঝাইয়াও স্বামীর ঐরূপ প্রতিশোধ লওয়া মস্তিষ্কে আনিতে পারিতেছে না। অথচ তাহা জলন্ত সত্যের মত তাহার দৃষ্টির সমস্ত মত্ততাকে পুড়াইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আর এই পাষণ্ড অঞ্জবা?—বৃষ্টির মোহে মনটাকে আবিষ্ট করিয়া যে তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া দিয়াছে?

ভাবিনীর রাখিয়া যাইবার পর হইতে অঞ্জবার আসিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ফুলকুমারী কেবল তাহার স্বামীর আচরণের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। চিন্তায় সে এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, কুটীরে ফিরিয়া আহারাদির উদ্যোগের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলা এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে উদিত হয় নাই।

স্বামীর স্নেহ, তাহার ননদীর স্নেহ, সমস্ত অপমান ভুলিয়া অতি যত্নে তাহার পরিত্যক্ত ভাইজাকে ধরিয়া তাহার সেই বাগানের ঘরটিতে লইয়া আসা, ঘুম-পাড়ানো গানের মত তাহার উত্তপ্ত হৃদয়টাকে প্লাবিত করিতেছিল।

অঞ্জবার মূর্ত্তি মাঝে মাঝে তাহার মনের উপর আঘাত করিতেছিল। মনের চোখ দিয়া এক একবার স্বামীর মূর্ত্তি ও অঞ্জবার মূর্ত্তি পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া সে দেখিতেছিল, আর দুইটা মূর্ত্তিকে তুলনায় সমালোচনা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল, এত কাল মরা-চক্ষু দিয়া সে তাহার স্বামীকে দেখিয়া আসিয়াছে।

অঞ্জবার সেই পাষণ্ডের আচরণের পর তাহার স্বামীর প্রকৃত মূর্ত্তি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল।

সে পাগলের মত দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই অন্ধকারেই ছুটিল।

কোন্ পথ সে অবলম্বন করিয়াছে, কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে, এই রাত্রিকালে একাকিনী কোথায় কত দূর সে যাইতে পারে, সে সব চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে উদিত হইল না।

কিছুক্ষণ চলিয়া তাহার মনে হইল, যেখানে স্বামীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইখানে সে উপস্থিত হইয়াছে। যে বাগানের ভিতর দিয়া মাধব আসিয়াছিল, তাহা সে একবার দূর হইতে দেখিয়াছিল।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সে সেই পথ অবলম্বন করিল। বুঝি তাহার মনে স্বামীর পুনর্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। সে আকাঙ্ক্ষার মূল্য কি, তাহার বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না। আর ত সে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবে না! মুষ্টিপ্রহার, পদাঘাত—সর্ব্বপ্রকারে যখন অঞ্জবা তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছিল, তখন সে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। এখন সে মনে মনে বলিল, হায়, সে সময় তাহার পদাঘাতটা কুক্ষিতে গ্রহণ করিল না কেন? তাহা হইলে গর্ভস্থ পাপটা বিনষ্ট হইয়া যাইত—তাহা হইলে স্বামীর গৃহে ফিরিবার কোনও বাধা তাহার থাকিত না।

সত্য সত্যই মদ হইতে শতগুণ মাদকতা লইয়া ফুলকুমারী অন্ধকারে পথ চলিতেছিল।

কতক্ষণ চলিয়াছে, কত দূর চলিয়াছে, কোথায়

আসিয়াছে, কিছুই তাহার বোধ ছিল না। হউক সে নীচজাতীয়া, তথাপি সে নারী, পথের মাঝে কোনও দুর্বৃত্তের সম্মুখে পড়িলে সর্ব্বপ্রকারে তাহার লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা, এ সকল চিন্তা, চলিবার মুখে একটিবারের জন্যও তাহার মনে উঠে নাই। সে চলিতেছিল ত চলিতেই ছিল। সে চলার বিরাম হইবে কি না, তাহার বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না।

সহসা লোকের উল্লাস-কোলাহল শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। মাথা তুলিয়া দেখিল, সে সেওড়াফুলির বাজারের অতি নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। আর যেখানে সে দাঁড়াইয়াছে, তাহার একরূপ সম্মুখেই মদের দোকান। দোকান বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু তখনও কতকগুলা মাতাল দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানা রঙ্গ-কথায় মদের প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতি রুদ্ধ হইল। সে পিছাইল, সদর পথ ছাড়িয়া একটা গ্রাম্যপথে প্রবেশ করিল।

তাহার বোধ হইল, সেই সকল মাতাল তাহাকে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে।

আত্মরক্ষার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া সে পথি-পার্শ্বের একটা বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল।

২১

"কে রে, কে রে? বিন্দি, আলো—চোর চোর—বিন্দি, আলো।"

তখন রাত্রি প্রায় দশটা। অন্ধকারময় রাত্রিতে পল্লী-গ্রামে সে সময় লোকের বাড়ীতে চোরের প্রবেশের অসম্ভাবনা ছিল না। একটা কোঠাঘরের বারান্দা হইতে সহসা ওরূপ ভীতিব্যঞ্জক শব্দ উঠা, সুতরাং নিতান্ত অস্বাভাবিক হয় নাই। চোরের নাম শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী অথবা বৃন্দারাণী ঘরের ভিতরে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল কি না, সেটা তখন জানিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, বারান্দা হইতে তাহার নাম ও চোর চোর শব্দ সত্য সত্যই ছুই চারিবার অতি উচ্চকণ্ঠেই উচ্চারিত হইল।

ধীর অচঞ্চল পদক্ষেপে ফুলকুমারী সেই বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হইল। হইয়া দেখিল, এক বৃদ্ধের মত লোক একটি হুঁকা হাতে সেই বারান্দায় বসিয়া আছে। উপস্থিত হইয়াই সে বলিল, "বাবা, আমি চোর নই।"

বৃদ্ধ দেখিল এক নারী। বুঝিল চোর না হইতে পারে। জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?"

ফুলকুমারী বলিল, "এক অনাথা। আজ রাত্রির মত তোমার এখানে আশ্রয় মাগন করি।"

ভিতরের যে কোনও স্থান হইতে বিন্দু এ কথা শুনিতে পাইল। সে তখন আলো লইয়া সেখানে আসার ভয় করিবার কিছুই দেখিল না, তথাপি ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল,—"কোথায় চোর?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বৃদ্ধ ফুলকুমারীকে বলিল, "না, এখানে থাকতে পাবি না।"

"আজ রাত্রির মতনটি বাবা, তোরেই আমি চ'লে যাব।"

ফুলকুমারীর মুখ হইতে তখনও মদ্যগন্ধ বিলুপ্ত হয় নাই। সে গন্ধ বৃদ্ধের নাকে প্রবেশ করিল। সে বলিল, "না, এখানে তুই থাকতে পাবি না।"

"একটা রাত্রির মত, বাবা!"

"না, না—এখনই তুই চ'লে যা। নইলে চৌকিদার ডেকে ধরিয়ে দেব। বেটী বেউশ্যে, মাতলামি করবার আর জায়গা পাও নি!"

এ কথার উপর আর কোনও কথা চলে না বুঝিয়া ফুলকুমারী আবার পথের দিকে মুখ ফিরাইল। বৃদ্ধের বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে ক্ষণেক দাঁড়াইল, পথে পড়িলে এবারে তাহাকে সর্ব্ববিধ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে! হউক না কেন সে নীচজাতীয়া, তথাপি তাহার নারীত্বের মর্য্যাদা আছে। বাজারের পথ, তাহার কোথায় কত ছুই লোক আছে—কে জানে? তাহাদের মধ্যে কাহারও চোখে পড়িলে কি লাঞ্ছনা তাহার না হইতে পারে, তাহা সে কেমন করিয়া বলিবে?

"দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগলি, চ'লে যা।"

"যাচ্ছি বাবা!"

"যাচ্ছি না, এখনি! এ গেরস্তর বাড়ী। মাতলামি করবার জায়গা নয়।"

ফুলকুমারী চলিল। মনে করিল, রাত্রিটার মত আবার অজবার কাছে ফিরিয়া যাই। কিন্তু সে ছুই পদ না চলিতেই

বিন্দু ঘরের ভিতর হইতে একটা আলো লইয়া বাহিরে আসিল। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ?"

বৃদ্ধ বিন্দুকে অন্য কোনও উত্তর না দিয়া, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বাহিরের দ্বার রুদ্ধ না করিবার জন্য তিরস্কার করিল।

ইতোমধ্যে ফুলকুমারী দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। বাহির হইতে গিয়া আসার সে লোকেগুলার হাস্য-পরিহাস শুনিতে পাইল। আবার সে দাঁড়াইল।

"আ মর, আবার দাঁড়ালি কেন ? যা বিন্দি, মাতাল বেটীকে বার ক'রে কবাট বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়।"

বিন্দু তখন আলোটা হাতে লইয়া বাহিরের দ্বারের দিকে চলিল। ফুলকুমারী তখনও বাহিরে যায় নাই। বিন্দু নিকটে আসিতেই সে অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "মা আজকার রাতটা রইতে না দাও, ওই পুরুষগুলা চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমাকে এইখানে একটু দাঁড়াতে দাও। থাকব না মা, ওরা চলে গেলেই চলে যাচ্ছি।"

তাহার পরিধেয় বস্ত্র মলিন ছিল। মজুরী কার্য্য সে শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছিল মাত্র, বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অবকাশ পায় নাই। মাথার চুলগুলাতেও পারিপাট্য ছিল না। আলোকের সাহায্যে বিন্দু তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ অবজ্ঞার ভাবেই প্রশ্ন করিল, "তোর ঘর কোথা ?"

ফুলকুমারী উত্তর দিল, "ধাঁকুড়া।"

"এ দেশে মজুরী করতে এসেছিস্ বুঝি ?"

ফুলকুমারী বলিল, "হাঁ মা, কলে মাটীর কায করতে আইচি।"

—বিন্দু বুঝিল, মেয়েটা আর যাই হ'ক, স্বামী তাহার যে অভিধান দিয়া তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইতেছিল, তা সে নয়। তখন তাহার অনুমানটা স্থির করিবার জন্য সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা কি জাত ?"

ফুলকুমারী বলিল, "বাউরী।"

এই সময় বৃদ্ধ বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিল, "আরে মর্ মাগী, মাতাল বেউশ্যেটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি কথা কইতে লাগল ? ওকে বিদেয় ক'রে কবাটে খিল দিয়ে চলে আয়।"

"যাচ্ছি রে ! বেউশ্যে তার কি হয়েছে, খেয়ে ফেল্‌বে না কি !"

"রাত্তির কত হয়েছে তা জানিস্ ?"

"হ'ক। ব'সে থাকতে না পারিস্, শু'গে যা।"

বিন্দুর এই এক দৃঢ় আদেশেই বৃদ্ধের বাক্য বন্ধ হইয়া গেল।

ফুলকুমারী এতক্ষণ মুখ ফিরাইয়াই কথা কহিতেছিল। সে বুঝিয়াছে, তাহার মুখের গন্ধ পাইয়াই বৃদ্ধ তাহার প্রতি অত কঠোর ব্যবহার করিতেছে।

বিন্দুকে অবস্থা জানাইতে তাহার বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

বিন্দু কিন্তু ফুলকুমারীর মুখ দেখিতে বড়ই উৎসুক হইয়া পড়িল। তাহার মুখ ফিরাইয়া কথা বিন্দুর ভালো লাগিতেছিল না। সে বলিল, "মুখ ফিরিয়ে কথা ক'।"

"মারবো মা !"

"মদ খেয়ে মরেছিস্ বুঝি ?"

"আজ আমাদের কায শেষ হয়ে গেছে। ঠিকেদার বাবু তাই আমাদের খেতে দিতেছিল।"

"তোদের বাউরী জাতের বুঝি ও সকল খাওয়ার দোষ হয় না ?"

"না তো।"

"তবে আর লজ্জা কেন, মুখ দেখা।"

ফুলকুমারী মুখ ফিরাইল। লণ্ঠনটা তাহার মুখের কাছে ধরিতেই বিন্দু চমকিয়া উঠিল। তাহার এক কন্যা হইয়াছিল। দশ বৎসর বয়সে সেই কন্যা মরিয়া যায়। তাহার পর পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। বিন্দুর বয়স এখন পঞ্চান্ন। আর তাহার পুত্র অথবা কন্যা কিছুই হয় নাই। এ বয়সেও সময়ে সময়ে তাহার সেই মৃত কন্যার স্মৃতি জাগিয়া উঠে। ফুলীর সেই মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুর কন্যার স্মৃতি তীব্র বেগে জাগিয়া উঠিল। অনাথনাথের ইচ্ছা, সে যেন দেখিল, তাহার কন্যা পূর্ণ যুবতীর রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

"তোর নাম কি, মা ?"

"দেশে আমার নাম ফুলী, এখানে নাম করেছি মতি।"

"আমার মেয়েটার নাম রেখেছিলুম লক্ষ্মী।"

ফুলকুমারী কথাটা ভালো বুঝিতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল; "সে তোমার কে, মা ?"

বিন্দু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। অর্দ্ধরুদ্ধ

কণ্ঠে সে প্রতিপ্রশ্ন করিল, "এখানে এ অবস্থায় তুই কেমন ক'রে এসে পড়লি ? তুই কার সঙ্গে এ দেশে এসেছিস্ ?"

"দেশের লোক আইছে।"

"তোর কি সোয়ামী নেই ?"

"রইছে ত।"

"সে কোথায় ?"

"বৈকালে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।"

"তবে অনাথা বল্‌লি যে ?"

ঠিক এমনি সময়ে সদর রাস্তা হইতে কে বলিয়া উঠিল, "পলা খুড়ো জেগে আছ ?"

বৃদ্ধ উত্তর দিল, "আছি রে বাবা !"

"তামাক খাচ্ছ না কি ?"

বৃদ্ধ একটি কলিকা শেষ করিয়া, আর একটি সাজিয়া অগ্নিসংযোগে সবে মাত্র দুই একটি টান দিয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে ওই প্রশ্ন।

বৃদ্ধ বলিল, "খাচ্ছি।"

পথের লোক বলিল, "প্রসাদটা পাবো না কি ?"

বিন্দু বৃদ্ধের উত্তরে বাধা দিয়া বলিল, "না, আর প্রসাদ পেতে হবে না, ঘরে যা কেষ্টা !"

অতি তীব্র স্বরে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বিন্দু বলিয়া উঠিল, "আমার শরীর ভালো নয়, দিনরে এখনো বাইরে ব'সে আছিস্ ! ঘরে যা।"

"যাচ্ছি" বলিয়া প্রহ্লাদ ওরফে পলা খুড়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

"কেও, খুড়ি ?"

"হাঁ রে বাবা।"

"সঙ্গে ওটি কে গা ?"

"আমার—আমার—বোন্-ঝি।" বলিয়াই বিন্দু কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

বিন্দুর অলঙ্ঘনীয় আবেশে প্রহ্লাদ ঘরে গিয়া শুইয়াছিল, কিন্তু ঘুমায় নাই। বাহিরে দ্বারাঘাত শব্দশব্দ শুনিয়া শুইয়া শুইয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, "বেটীকে বিদায় ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে এলি ?"

"বন্ধ করা হয়েছে, তুই ঘুমো। কি তোর নশো পঞ্চাশ টাকা আছে যে, সে চুরি করবে !"

"বেটীর মুখে মদের গন্ধ।"

"গন্ধ তোর নাকে ঢুকেছে।' আমি গন্ধ পেলুম না, উনি পেলেন ! নিজে বড় সাধু কি না।"

"মেয়েটা কে জেনেছিস্ ?"

"জানবো আবার কি ? অনাথা—অবলা, বিদেশে ঘর। এসেছিল এ দেশে কাষ করতে। বাসা খুজে পাইনি, ভয়ে অস্থির হয়ে ঘুরছে, পড়েছে—ক' বেটা মাতালের মুখুমুখে—ছুটে আশ্রয় নিতে এসেছে। না জেনে না শুনে তাকে যা মুখে এলো তাই ব'লে—ছেলে পুলে নেই বলে প্রাণে কি একটু মমতাও থাকতে নেই !"

"তাকে যেতে দিস্‌নি ত ?"

বিন্দু ডাকিল, "লক্ষ্মী—মতি। উপরে উঠে যোদ।"

এই ডাকেই প্রহ্লাদের প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। সে কেবল বলিল, "যদি সে না খেয়ে থাকে, তাকে মুড়ি টুড়ি যা থাকে খেতে দে।"

প্রহ্লাদ নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইবার জন্য চক্ষু মুদিল।

২২

হাত, পা, মুখ, চোখে জল দেওয়াইয়া, বিন্দু কুলকুমারীকে প্রথমে একখানা পরিষ্কৃত বস্ত্র আনিয়া দিল। তাহার পর দুধ, মুড়ি, গুড় সে রাত্রিতে ঘরে আহার্য্যের মধ্যে যা যা ছিল, সমস্ত দিয়া সে তাহাকে পরিতোষের সহিত আহার করাইল। তাহার পর প্রহ্লাদের গভীর নাসিকাধ্বনি যখন তাহার গভীর নিদ্রা সাব্যস্ত করাইয়া দিল, তখন বিন্দু কুলকুমারীকে বারান্দার মেঝের উপর নিজের নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবান্‌ই আমার মুখ দিয়ে তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক ক'রে দিয়েছে। মনে কর্ আমি তোর মাসী।"

কুলকুমারী আবেগভরে বিন্দুর চরণতলে বার বার প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "মা হও, মাসী হও—এখন থেকে সবই আমার তুমি।"

"তা ত হলুম রে, কিন্তু সকাল হলেই ত তুই চ'লে যাবি ! কোন্ বিদেশে তোর ঘর, আর হয় ত এ জন্মে তোকে দেখতে পাব না।"

"তা কেন, আমি রইবো।"

"রইবি !"

"তুমি যদি রাখো,—"

জাপানী গায়েসার বেশবিন্যাস

প্রথম প্রকাশিত জাপানী-চিত্র। [শিল্পী—উটমারু।

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের চিত্রসংগ্রহ] [জাপানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

"আমরা কি জাত জানিস্ ?"

"যা হও—তুমি মা, মাসী হও—তুমি মাসী—জাতের কথা কইছিস্ কেন মা। আমরা বাউরী, এক ডোম আর বেদে ছাড়া সবার ঘরেই থাকতে পারি। তুমি যদি রাখো, তা হ'লে ত অকূলে আমি কূল পাই।"

কথাটা বিন্দুর কানে কেমন একটা হেঁয়ালীর মত ঠেকিল। অত্যন্ত বিস্মিতার মত সে জিজ্ঞাসা করিল, "অকূলে কূল মানে কি রে, মতি ?"

ফুলকুমারী চেষ্টা করিয়াও উত্তর দিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার মত হইল।

"তুই ত বল্‌লি তোর সোয়ামী আছে !"

"রইছে ত !"

"তবে আপনাকে অনাথা বল্‌লি কেন ? এই ত বল্‌লি বিকালে তার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে।"

"হইছে ত !"

"তবে ?"

ফুলকুমারী উত্তর দিতে পারিল না।

বিন্দুও চিন্তান্বিতার মত ক্ষণেক বসিল। তথাপি ফুলকুমারীর মুখ হইতে কোনও উত্তর না শুনিয়া ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "মা বলিস্, মা ; মাসী বলিস্, মাসী—মতি, কোনও কথা আমার কাছে গোপন করিস্ নি। সত্য ক'রে বল্ দেখি, ব্যাপারখানা কি !"

"বললে আমাকে খেদাড়ে দিবে না ?"

"তুই কি বেরিয়ে এসেছিস্ ? আ মর্, চুপ ক'রে রইলি কেন ? বল্। তাড়িয়ে দেওয়ার মত বুঝি, আজ দেবো না।"

ফুলকুমারী বলিতে আরম্ভ করিল। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা—স্বামীর গৃহত্যাগ হইতে বৈষ্ণবাটীর সেই বাগান ছাড়িয়া চলিয়া আসার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত।

শুনিতে শুনিতে বিন্দুর কখন ফুলকুমারীর উপর ক্রোধ, কখন বা তাহার জন্য দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু অজস্র নির্দ্দয় ভাবে প্রহার ও স্বামি-দত্ত তাহার সেই কাপড়খানা টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িবার কথা বলিতে বলিতে যখন ফুলকুমারী তাহার পৃষ্ঠে গণ্ডে আঘাত-চিহ্ন বিন্দুকে দেখাইতে লাগিল, তখন বিন্দু আর রোদন সংবরণ করিতে পারিল না ; কাঁদিতে কাঁদিতে তখন সে বলিয়া উঠিল, "তোর সোয়ামী, ননদ যখন তোকে ঘরে নিতে চাইলে, তখন তাদের সঙ্গে চ'লে গেলি না কেন আবাগী ?"

অগত্যা ফুলকুমারীকে স্বামীর সঙ্গে না যাইবার কারণ বলিতে হইল।

শুনিয়া একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বিন্দুকে বলিতে হইল, "তাই ত রে মতি, অনাথাই ত তুই বটে ! ভালো আজকের মত ঘুমো, কাল বিন্দুকে জিজ্ঞাসা ক'রে যা করবার করা যাবে।"

গ্রীষ্মকাল, সুতরাং বিন্দু বারান্দাতেই ফুলকুমারীর শয়নের ব্যবস্থা করিবার জন্য একখানা মাদুর আনিতে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে ফুলকুমারী তাহার পরিত্যক্ত বস্ত্রাঞ্চল হইতে টাকা কয়টি ও নাকছাবি বাহির করিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া মাদুর বিছাইয়া বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "একলা বাইরে থাকতে পারবি ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া ফুলকুমারী সেই টাকা ও অলঙ্কার বিন্দুর পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া বিপুল উচ্ছ্বাসের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মাসী, এই তোমার চরণে লাগছি, আমাকে আর ফেলে দিস্ না।"

"এ কি" বলিয়াই বিন্দু টাকা কয়টা ও নাকছাবি উঠাইয়া লইল। টাকা গণিল, নাকছাবিটাকে আলোর সম্মুখে লইয়া পরীক্ষা করিল।

"আমাকে ঘুস দিচ্ছিস্ না কি ?"

"তুমি খেদাড়ে দিলেও আমি যাব না ত।"

"বালাই, ভগবান্ তোকে এখানে পাঠিয়েছে—এই বাড়ীটার ভিতরে আছি মাত্র দু'টো কুড়োকুড়ী—একটা মেয়ে ছিল তাও ভগবান্ অনেককাল কেড়ে নিয়েছে।"

অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত স্বরে এই সকল কথা বলিতে বলিতে বিন্দু টাকাগুলা রাখিতে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই আর একটা মাদুর লইয়া সে ফুলকুমারীর পার্শ্বেই সেটাকে পাতিয়া শয়ন করিল।

শুইতে না শুইতেই ফুলকুমারী ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু বিন্দুর ঘুম আসিল না। কিছুক্ষণ মাদুরে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া সে উঠিল। ঘরে প্রবেশ করিল এবং স্বামীকে উঠাইয়া তাহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিল।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া প্রফুল্ল

দেখিল, মেয়েটা তখনও ঘুমাইতেছে। সেই অবস্থায় প্রহ্লাদ ফুলকুমারীকে ভালো করিয়া দেখিবার সুবিধা পাইল। বৃদ্ধ দেখিল, কৃষ্ণাঙ্গী হইলেও এমন সৌষ্ঠব-সম্পন্না নারী সে কমই দেখিয়াছে।

প্রহ্লাদ ডাকিল, "মতি!"

ধড়মড়িয়া ফুলকুমারী উঠিয়া বসিল এবং সম্মুখে বৃদ্ধকে দেখিয়া, অতি ব্যস্ততার সহিত সে আপনার নারী-দেহ আবৃত করিতে লাগিল।

প্রহ্লাদ বলিল, "তোর মেসোকে অত লজ্জা দেখাবার দরকার নেই রে, বেটি!"

ফুলকুমারী প্রহ্লাদের পায়ের কাছে প্রণাম করিতেই বৃদ্ধ বলিল, "তোর মাসী-মেসোর কাছে থাকবি?"

"বইতেই ত এসেছি, বাবা!"

"৪' দিন থেকে মাসী বাড়িয়ে আবার পালিয়ে যাবি না ত?"

"না তো!"

"দেখিস্!"

"তুমি বেদাড়ে দিলেও যাবো না, বাবা!"

"তবে থাক্। আমাদের ছেলে-মেয়ে নেই, আজ থেকে মনে কর, এ তোর বাপের ঘর।"

কৃতজ্ঞতা দেখাইতে ফুলকুমারী বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথাটা লুটাইয়া দিল।

২৩

মাধব ফুলকুমারীর কোনও সন্ধান পাইল না। প্রথমে বৈদ্যবাটী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান—একদিকে চন্দননগর, অন্যদিকে শ্রীরামপুর—সর্ব্বত্র বিশেষভাবে অন্বেষণ করিয়াও যখন তাহাকে পাইল না, তখন যে পথ দিয়া তাহাদের বৈদ্যবাটী আসার কথা সে অন্যের মুখে শুনিয়াছিল, সেই পথ অবলম্বন করিয়া তারকেশ্বর, আহানাবাদ প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া ফুলীকে অন্বেষণ করিতে করিতে, নিজের অন্নাভাবের উপক্রম দেখিয়া সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। জানিবার মধ্যে কেবল সে জানিল, সে মেয়ে অন্যের নাম হইয়াছে—অতুল, আর ফুলির নাম হইয়াছে—মতি।

ফুলীকে ত সে পাইল না, লাভের মধ্যে চাপাতোক্কার সেই মেয়েটার সঙ্গেও তাহার সাক্ষা হইল না, যখন সে আসিল, তখন মাধবের চৌঠা পার হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীর প্রতি মাধবের একান্ত নিষ্ঠা জানিতে পারিয়া, মেয়েটির আত্মীয়গণ তাহাকে কন্যা দিতে সাহস করিল না।

মাধবের দুর্ভাগ্য দূর করা মানুষের অসাধ্য বুঝিয়া ভাবিনী, অটল, নরহরি, নন্দবাবু—সকলেই তাহার সান্ত্বার চিন্তা হইতে ক্ষান্ত দিলেন।

মাঘ মাস শেষ হইয়া গেল। ফাল্গুনের আরম্ভ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত বাউরীরা নামাল যাইতে আরম্ভ করিল।

অটল, ভাবিনীও চলিল। যাইবার সময় সে ভাইকে অনুরোধ করিয়া গেল, আর যেন সে সেই বিশ্বাসঘাতিনীর জন্য ঘর ছাড়িয়া না যায়। নিশ্চয় সে গঙ্গাতীরের কোনও সহরে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

মাধব স্বীকার করিল, ফুলীর মোহ এইবারে তাহার ঘুচিয়াছে। তবে সে যদি জানিতে পারিত, ফুলী বাঁচিয়া আছে, আর যে কোনও হীনবৃত্তিই অবলম্বন করুক, সুখে আছে, মাধব তা হইলে ইহজীবনের মত তাহার নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনিত না।

অটল গেল, ভাবিনী গেল, অন্যরাও তাহার ভগিনী ভগিনীপতি, এমন কি নববিবাহিতা স্ত্রীটিকে পর্য্যন্ত লইয়া চলিল। এবারে বাউরীর দল একবারে শূন্য। সেখানে রেলে তাহারা মাটী কাটার এক বড় রকমের কায পাইয়াছে। এখানে রোজ বড় জোর আট আনা, সেখানে পুরুষ চৌদ্দ আনা, স্ত্রীলোক দশ আনা, কায়ও পূর্ণ তিন মাস হইবার সম্ভাবনা। বাউরীরা সে লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। গ্রামের মধ্যে যে যেখানে কর্ম্মক্ষম ছিল, প্রায় সকলেই প্রস্থান করিল। রহিয়া গেল শুধু মাধব।

এবারকার নির্জ্জনতা সে যেন মধুময় অনুভব করিতে লাগিল। সে পূর্ব্বে অন্যান্য বাউরীদের সঙ্গে মিশিত, কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যটা স্মরণ করিয়া মিলনে সুখ পাইত না।

সে এবারে প্রায়ই কইমাহাটিতে যাইত, একটু একটু নেশা করিত এবং গ্রামের কাহারও সঙ্গে মেশামিশি না করিয়া একবারে নিজের ঘরে চলিয়া আসিত। সেখানে দাওয়াটির উপরে একাকী বসিয়া যতক্ষণ না ঘুম আসিত, নানা প্রকার সুরের আলাপ করিত।

এইরূপ করিয়া কুড়ি পঁচিশ দিন সে অতিবাহিত করিল, ফাল্গুন শেষ হইতে বড় বিলম্ব নাই। এক দিন মাধব

কদমাহাটি না গিয়া বাঁকুড়া হইতে পাঁটি মদ কিনিয়া আনিল। তৎপূর্ব্বদিনে নরহরির গৃহে তাহার দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে উৎসব হইয়াছিল। এ সেই দৌহিত্র, যাহার মায়ের তত্ত্ব লইতে গিয়া সে ফুলীকে হারাইয়াছে।

ঐ উৎসবটার সঙ্গে সঙ্গেই মাধবের ফুলীর শোক জাগিয়া উঠিয়াছিল। নরহরির জামাতা মাধবকে দুই টাকা পুরস্কার দিয়াছে। সেই পুরস্কারের টাকায় ফুলীর শোক জন্মের মত ভুলিবার জন্য আজ সে বাঁকুড়া হইতে পাঁটি মদ আনিয়াছে।

সে দিন শুক্লা চতুর্দ্দশী, ফাল্গুনের মেঘমুক্ত পরিপূর্ণপ্রায় চাঁদ। বিমল জ্যোৎস্না তাহার বাড়ীর উঠান হইতে দূরস্থ গোকুলবাঁধের ধার পর্য্যন্ত সমস্ত প্রান্তরটায় ফাল্গুন-হাওয়ার যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে!

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই মাধব সেই তীব্র সুরার এক পাত্র পান করিয়াছে। পানের সঙ্গে সঙ্গেই গান—নানা জাতীয় শব্দ-বিন্যাসে সুরের আলাপ।

তাহার পর কিছুক্ষণ আলাপ বন্ধ করিয়া, সে মাথা হেঁট করিয়া বসিল। কিছুক্ষণ ওইরূপ নিস্তব্ধ ভাবেই কাটিল। গাছে বাতাস-লাগার শব্দ ভিন্ন কোনও দিক্ হইতে কোনও শব্দ সেখানে পৌঁছিতেছিল না।

নিঃশব্দে সে আর এক পাত্র গ্রহণ করিল।

দুই দুইবার সে পান করিল বটে, কিন্তু মাধবের বোধ হইল, তাহার যেন আশানুরূপ নেশা হইতেছে না। পঁচাই পান করিয়া অন্য দিন সে যে আনন্দ উপভোগ করে, সে আনন্দও তাহার আসিতেছে না। সে মনে করিল, মদের বদলে গুঁড়ী বেটা তাহাকে এক বোতল জল দিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া, গা-মাথা দুলাইয়া সে নেশা আনিবার চেষ্টা করিল।

নেশা আসিয়াছে, কিন্তু মনোমত আসিতেছে না। মাধব তৃতীয় পাত্র পূর্ণ করিল।

"যা ফুলী, এইবারে আমি তোকে জন্মের মত ভুলতে চল্লুম" বলিয়া মাধব সেই তৃতীয় পাত্র মুখে তুলিতে যাইতেছে, এমন সময় তাহার ঘরের পার্শ্বের দিক্ হইতে শব্দ উঠিল, "দাদা, ঘরে রইছিস্?"

অতি বিস্ময়ে মাধবের হাত হইতে পাত্রটি পড়ে নাই এই মাত্র। পাত্র ভূমিতে রাখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "কে রে তুই? ভাবি?"

ভাবিনী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ব্যাপার কি রে? তুই কি একাই চ'লে এলি?"

"এখন একাই বটে!"

"খুড়ী?"

"সে সে দেশেই রইছে।"

"ব্যাপার কি ভাবি?"

"তুই ও কি করছিস্ দাদা?"

"ফুলীকে জন্মের মতন ভুলছি।"

"বেশ করছিস্! দাদা, আর একটা বউ নিবি?"

"আর না: ! ঢের হইছে রে ভাবি!"

"দেখ না, এমন বউ আর পাবি না। ভাল না লাগে, না নিবি।"

মত্ত মাধব ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিল না। সে অসহিষ্ণুভাবে বার দুই না:, না: বলিয়া ভূমি হইতে পাত্র গ্রহণ করিতে গেল।

ভাবিনী তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপরে উঠিয়া মাধবের হাত ধরিয়া ফেলিল।

"একবার তাকে দেখ। ভাল না লাগে, দেখে চ'লে আয়। তার পর যত পারিস্, নেশা কর। আমি রইতে নারবো।"

"রইতে নারবি!"

"কিরিষ্টি গাড়ী ক'রে কোলকাতায় চ'লে যাব। কেবল তোর জন্যই ত আটচি রে! তোর দুঃখু আর দেখতে নারলাম।"

এমনই সময়ে বাহির দিক্ হইতে শব্দ উঠিল, "কৈ রে ভাবি, কোথায় তোর ভাই?"

বলিতে বলিতে এক দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠকায় বৃদ্ধ, হাতে লাঠী, মাথায় পাগড়ী মাধবের গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ইনি কে হইছেন রে, ভাবি?"

ভাবিনী ভাইকে কোনও উত্তর না দিয়া আগন্তুককে বলিল, "এই গো মেসো, এই আমার ভাই।"

আগন্তুক অন্য কেহ নহে, প্রহ্লাদ। বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে মাধবকে সম্বোধন করিল, "তোর স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে এনেছি। সে আমার বাড়ীতে আট মাস আশ্রয় নিয়ে আছে। এই আট মাস আমার স্ত্রী তাকে সন্তানের মত কাছে রেখেছিল। বড় গুণবতী মেয়ে, বড় লক্ষ্মী,

গেরোর ফেরে একটা ভুল করেছিল। দেখ, তাকে ঘরে নিবি? না নিস্, তাতেও আমার দুঃখু নেই। যত দিন আমরা বুড়োবুড়ী বেঁচে থাকবো, তত দিন তাকে মেয়ের মতনই যত্ন-আদর করব। আমাদের ছেলেমেয়ে ছিল না—দেখ বুকে মাখব।"

"কোথায় সে রইছেন মেসো?"

"আগে বল,—আমাকে এই রাত্রেই ফিরে যেতে হবে। তোর বোনকেও আমি তার অনেক ক্ষতি ক'রে সঙ্গে এনেছি। সেখানে সে রোজ দশ আনা ক'রে মজুরী পাচ্ছিল। তোর স্ত্রীর জন্যই ধ'রে এনেছি। আগে বল্।"

তাবিনী ছুটিয়া প্রহ্লাদের পা জড়াইয়া বলিল, "আর কেন মেসো, বিছে সেবী করিস্। দে, তোর বেটিকে ভাইয়ের হাতে ধ'রে দে।"

"দে মেসো, মেসো রে, আমার জীবনটা ফিরিয়ে দে।"

"আয় রে বেটা, সঙ্গে আয়।"

২৪

গোকুলবাঁধের পাড়ে একটা আম্রবৃক্ষের তলদেশে নির্জ্জনে ফুলকুমারী বসিয়া ছিল। বসিয়াছিল সে স্বামীকে দেখিবার ব্যাকুল প্রতীক্ষায়! সম্মুখে জোৎস্না, পশ্চাতে জ্যোৎস্না, শুধু সেই আম্রতলে তাহার অন্তরের প্রতিচ্ছবি লইয়া অন্ধকার।

বসিয়া বসিয়া সে দেখিল, কে এক জন পাড়ের অপর দিক্ ধরিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। কে সে, দূর হইতে ফুলকুমারী ভাল বুঝিতে পারিল না। পাছে স্বামী না হইয়া সে গ্রামের আর কেহ হয়, তাহাকে দেখিলে এবং চিনিলে লজ্জায় সে মরিয়া যাইবে বুঝিয়া ফুলকুমারী গাছের গুঁড়ির অন্তরালে আত্মগোপন করিল।

মাধবকে না চিনিবার অনেকটা কারণ ঘটিয়াছিল। ফুলীর অন্বেষণে বাহির হইয়া পথে সে একবারেই ক্ষৌর-কার্য্য করিবার সুবিধা পায় নাই। বাড়ীতে আসিয়াও দেহের উপর অনাস্থাবশে সে একবারেই ক্ষৌরকার্য্য উঠাইয়া দিয়াছিল। তাহার শ্মশ্রু, কেশ বর্দ্ধিত হইয়া ফুলকুমারীর দৃষ্টিতে তাহাকে না চিনিবার মতই করিয়াছিল। বিশেষতঃ, সেই রাত্রিকালে। আসিতে আসিতে মাধব আম্রবৃক্ষের সমীপস্থ হইলেও ফুলকুমারী তাহাকে চিনিতে পারিল না। সে বিশেষ সঙ্কুচিতভাবে নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাধব নিজে বুঝিতে না পারিলেও, তাহার নেশা কম হয় নাই। আমগাছের নিকটে আসিয়া নেশার ঝোঁকে সে দেখিল, সেখানে কেহই নাই। সে একবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে মেসো, কৈ আমার ফুলী?"

"চিচাস্ না, রইছি রে" বলিয়াই ফুলকুমারী একটু অগ্রসর হইল।

"রইছিস—আয়, আয় ফুলি, একটা বছর আমার ঘর আঁধার রইছে রে!"

মত্ততায় অতি আনন্দের বেগে ফুলকুমারীকে বাহুপাশে বাঁধিতে আসিয়া তাহার সম্মুখে মাধব আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

ফুলকুমারী ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। উঠাইয়া বসাইতে বসাইতে বলিল, "এ কি ভূতের মত হইছিস্ রে, আমি তোকে চিন্‌তে পারি নাই।"

"আমাকে যে তোর ভাল লাগে নাই রে ফুলি, তাই ভূত হয়েছি", বলিয়া মাধব উপবিষ্ট হইয়াই ফুলকুমারীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল।

পরস্পরের কণ্ঠ জড়াইয়া বিপুল আবেগে উভয়েই উভয়ের পৃষ্ঠে কিছুক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করিল।

"হাঁ রে, আমাকে ঘরকে লিবি?"

"লিবে—উঠে পড়, মেসো চ'লে যেতে চাচ্ছে" বলিয়া তাবিনী তাহাদের কথোপকথন উপক্রমেই বন্ধ করিয়া দিল।

"এখানে আর লোক-জানাজানি করতে হবেক না, উঠে পড় বউ, আমার পাগল ভাইকে ধ'রে ঘরকে নিয়ে যা।"

"সতি!"

প্রহ্লাদের কথা শুনিবামাত্র সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল।

দূর হইতে সম্বোধন করিয়া প্রহ্লাদ তাহাদের নিকটে আসিল। আসিয়াই বলিল, "এইবারে আমি যেতে পারি মা?"

"আজকে তোকে ছেড়ে দিতে পারব না বাবা।" বলিয়াই মাধবের কানে কানে ফুলকুমারী বলিল, "মদ খেয়েছিস্?"

মাধব বলিল, "টুকচ্যা খায়েছি।"

"আর রইছে?"

"সবই রইছে, পুরা বোতল।"

"মেসোকে ধর, ছাড়িস্ না, তাকে একটু খেতে দে। বড় কষ্ট ক'রে আইচে।"

প্রহ্লাদ বলিল, "খাবার যে উপায় নেই মা! দেখে ত এসেছিস, তোর বাবী একা।"

ভাবিনী বলিল, "কেন মেসো, বাপকে ত তোমার বাকুল আন্‌ডাতে রেখে আইচি।"

সকলে মিলিয়া প্রহ্লাদকে থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিল—মাখন তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল আর মন্তের অস্তিত্বের আভাস দিয়া মেসোকে তাহার গায়ের ব্যথা দূর করিতে অনুরোধ করিল।

প্রহ্লাদের মাঝে মাঝে মন্ত সেবনটা চলিত। সত্য সত্যই পথের কষ্টে তাহার শরীরটা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিল। সে ক্লান্তি দূর করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বলিল, "যেতে পারলেই ভাল হ'ত। তবে তোর মামী কাটাতে পারছি না যে মতি!"

"যেখানে থাকি, আমি তোমারই ত বটচি বাবা! তোমার আর আমার সেই ঘরামনী মা'র।"

ফুলকুমারী হাতে ধরিয়া তাহার বহুদিনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার মেসোকে ধরিয়া লইয়া আসিল।

ভাবিনী নরহরিকে সেই রাত্রিতেই সংবাদ দিল। কেন না,মেসোকে খাওয়াইতে হইলে তাহাদের ঘরে ত চলিবে না।

নরহরি শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন, বলিলেন, সমাজে ফুলীকে তুলিয়া লইবার জন্ত তাহাদের যত ব্যয় হইবে, তাহার ভার তিনি গ্রহণ করিবেন।

সমস্ত রাত্রিটাই নবপরিচিত জামাতার সঙ্গে আনন্দ করিয়া প্রহ্লাদ সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে ভাবিনীকে লইয়া মাধববাটী হইতে প্রস্থান করিল। লোক-জানাজানি করাটা তখন কাহারও ইচ্ছা ছিল না।

যাইবার সময় প্রহ্লাদ মতির গচ্ছিত টাকা কয়টি এবং বিন্দুর দত্ত দুইখানি বস্ত্রোপহার মাখনের হস্তে তুলিয়া দিল। আর বলিল, সে এক জন সে দেশের খ্যাতনামা রাজমিস্ত্রী, মাসে তাহার ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয়, বিন্দুও দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া দিন প্রায় বার চৌদ্দ আনা উপার্জ্জন করে, সংসারে খাইবার মধ্যে মাত্র তাহারাই দুই জন—যদি জামাতা তাহার কন্যা মতিকে লইয়া তাহার ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করে, কোনও কায কর্ম্ম না করিলেও সে অক্লেশে তাহাদের ভরণপোষণের ভার লইতে পারে।

* * * * *

মাখনের সংসারে আবার আনন্দ ফিরিয়াছে। ফুলকুমারীর পুনরাগমন লইয়া গ্রামের কেহই আর বিশেষ কোনও তর্ক-বিতর্ক করিল না। বাউরীরা ফিরিয়া আসিয়া মাখনের বাড়ীতে একটা ভোজে তাহাকে সমাজে নির্দ্দোষ করিয়া লইল।

* * * * *

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও মাখন মতিকে লইয়া তাহার মেসোর বাড়ীতে উপস্থিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

ফুলকুমারীর গর্ভস্থ সন্তানের কি হইল, প্রথম প্রথম দুই এক বার মাখনের জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সাহস হয় নাই। এখন তাহারই একটি পুত্র হইয়াছে। সেই সঙ্গে মাখন ফুলকুমারীর পূর্ব্বাবস্থা একরূপ বিস্মৃতই হইয়াছে।

* * * * *

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে। বিন্দু তাহার বাড়ীর ভিতরে গো-সেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। একটি আড়াই বৎসরের কন্যা তাহার পিঠের উপর পড়িয়া মাথার চুল টানিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিতেছিল। বৃদ্ধ হুঁকা হাতে সেই বারান্দার উপর হইতে তাহার দুর্দ্দশা দেখিতেছিল। ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া বিন্দু বলিয়া উঠিল, "দেখছিস্ কি মিন্‌সে, মেয়েটাকে ধর্। জ্বালাতন ক'রে মারলে যে আমাকে।"

এমন সময়ে বাহিরের কবাটে ঘা পড়িল,—"মামী।"

শ্রীঅবোধপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

ছুটী *

"ছুটী! ছুটী! ছুটী! গ্রীষ্মের লম্বা ছুটী! চৈত্রে চড়কের ঢাকে কাঠী পড়িতে আরম্ভ, আর 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' নহে, আষাঢ়স্য অষ্টাদশদিবসে শেষ, পূরা ১।০ মাস, ৩২ দিনে পাকি ওজনের মাসের হিসাবেও এক দিন বাড়তী থাকিয়া যায়। ছুটী পাইলে ছাত্রদিগের মুক্তির আনন্দ, শিক্ষক-দিগেরও মুক্তির আনন্দ। ছুটী হইলেই প্রাণ বলে কোথাও ছুটি। ইচ্ছা করে কোথাও গিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত মনটা জুড়াই, রাজধানীর কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে গিয়া একটু আরাম খাই।" ইত্যাদি কথা বারো বৎসর আগে মনের স্ফূর্ত্তিতে লিখিয়াছিলাম। (১) আবার বারো বৎসর পরে সেই মামুলি কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। তবে এখন বলিতেছি, প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে নহে—প্রাণের দায়ে; তখন অবসর পাই-লেই ছুটিয়া বাহির হইতাম—সখের বশে, সুখের লোভে, আনন্দের আশায়; আর এখন ছুটিয়া বাহির হই—শান্তি-লাভের বৃথা চেষ্টায়। এ যেন সেই কথামালার গল্পের আহারের চেষ্টায় দৌড়ান (২) ও প্রাণভরে দৌড়ানর মধ্যে বিষম প্রভেদ। বারো বৎসরে না কি এক যুগ! আমার জীবনে এই বারো বৎসরে সত্য সত্যই যুগান্তর ঘটিয়াছে। ছুটী-সম্বন্ধে উদ্ধৃত উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্যগুলি খড়্গ অবস্থায় থাকিতেই লোকদিগুর একটি প্রবল ধাক্কা খাইয়া আমার জীবনের প্রবাহ ফিরিয়াছে এবং তাহার পর ধাক্কার উপর ধাক্কায় আমাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়া সকল শক্তি ও সুখ-স্বস্তি-শান্তি হরণ করিয়াছে। যাক্ সে বেদনার প্রসঙ্গ।

২

এই যে ছুটী হইলেই প্রাণ বলে—কোথাও ছুটি, ইহার কারণ কি? (শব্দদ্বয়ের মধ্যে কি ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক আছে, সেই জন্যই মনের এই প্রবৃত্তি ফোঁকে আসে? বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের এই সমস্যা-সমাধানের ভার প্রবীণ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত বিহরচন্দ্র মজুমদার ও নবীন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সুপণ্ডিত-ত্রয়ীর উপর দিয়া মূল প্রশ্নটির বিচারে প্রবৃত্ত হই।) অবশ্য ইহার সহজ উত্তর তো পড়িয়াই রহিয়াছে। উল্লিখিত পুরাতন প্রবন্ধে সে উত্তর দিয়াছি: 'গুরুশ্রমের পর বিশ্রাম, ইহাই প্রকৃতির আদেশ।' (জানি না, এ ক্ষেত্রেও উপসর্গ-ঘটিত ব্যাকরণ-রহস্য আছে কি না—শ্রম ও বিশ্রাম!) শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহমন জুড়াইতে, জিরাইতে, মানবের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। প্রকৃতি-দেবীই সন্তানের মঙ্গলার্থ, তাহার স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য বজায় রাখিবার জন্য, এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। (অবোধ অবাধ্য সন্তান সকল সময়ে এই ব্যবস্থা বুঝে না বা মানে না, ফলও অবিলম্বে বা বিলম্বে পাইয়া থাকে।) ইহাতে আরাম তো আছেই, তাহার উপর একটা বড় লাভ আছে। রাত্রিতে সুনিদ্রার পর দিবারম্ভে কার্য্যে প্রবৃত্তির ন্যায়, বিশ্রামের পরে অবসর দেহে নূতন বলাধান হয়, অবসন্ন মনে নূতন শক্তিসঞ্চার হয়, ফলে নূতন উদ্যমে নবীকৃত বেগে কার্য্যভার পুনরায় গ্রহণ করা যায়। প্রাণটা তাজা (fresh) হয়, নবীনতা আসে। সুতরাং ইহা জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-সম্পাদনের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিশ্রামের সময়টা বৃথা নষ্ট হয় না, ইহা অদূর ভবিষ্যতে সুফল-প্রসূ। পতিত জমি আবাদ করিলে সোনা ফলে। (তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া আরাম খাইলে শেষে জড়তা আসে, তাহাতে কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা, যেমন অধিক ঘুমাইলে হয়। লম্বা ছুটীর পর অনেকে এইরূপ জড়তা অনুভব করিয়াছেন।) (৩)

---

* বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র-সমিতির বর্ষারম্ভ বর্ষের প্রারম্ভিক (inaugural) অধিবেশনে লেখক-কর্ত্তৃক পঠিত। (১১ই শ্রাবণ ১৩৩৩)

(১) 'পাঁঠবাল'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পাকা ধোনা, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৪২-৪৩ পৃঃ।

(২) লেখকের পক্ষে এ বয়সে আহারের চেষ্টায় দৌড়ান বিচিত্র বটে, কেন না, পেটে আর ক্ষুধার সহ্য না। এখন হজম ও উদরের মধ্যে ছাতার প্রয়োজন হইয়াছে। বহুমূত্র একেবারেই বরদাস্ত হইবার সম্ভাবনা।

(৩) The peculiar mentality that characterises most of us on our return to work after the annual holiday is an interesting psychological fact. . . . . For a few days we are strangely dull and depressed. We work because we have got to do so, but the salt of work has lost its savour and we are apt to feel bored. The main feature of the mental make-up

এক জায়গায় চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিলে বা আড় হইয়া শুইয়া পড়িলে (এবং তোফা নিদ্রা দিতে পারিলে) শ্রান্তি-শান্তি হয়, আরাম হয়, ভিতরে ভিতরে শরীরের নষ্ট বস্তুর ও শক্তির পুনরুদ্ধার হয়। অধিকাংশ লোক এই উপায়েই শ্রান্তি দূর করিয়া নববল লাভ করেন। কিন্তু ইহার একটি দোষ, ইহা বড় একঘেঁয়ে, বৈচিত্র্যবর্জ্জিত, সুতরাং সত্বর সজীবতা-সঞ্চারের বাধা হয়। পক্ষান্তরে নানা স্থানে ভ্রমণে ইহা অপেক্ষা শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়, নব নব দৃশ্য-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের স্ফূর্ত্তি হয়, শীঘ্র শীঘ্র অবসাদ কাটিয়া যায়, কর্ম্মে প্রবৃত্তি ফিরিয়া আসে। অবশ্য দেহ-যন্ত্রটা দুর্ব্বল থাকিলে পদব্রজে বা সাইকেল্ চালাইয়া দেশ-ভ্রমণ করা সম্ভব নহে, করিতে গেলেও উপকার না হইয়া অপকারই হইবে। সে সব ক্ষেত্রে মোটরে, রেলগাড়ীতে, ষ্টীমারে জাহাজে দেশভ্রমণ করিলে, আরাম হয় না, কিন্তু 'আয়েস' হয়, শরীরের উপর জুলুম করা হয় না, কিন্তু মনের সজীবতা-স্ফূর্ত্তি হয়; ফলে বিশ্রামের উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সিদ্ধ হয়। এই জন্যই মানুষ ছুটী পাইলেই কোথাও ছুটিতে চাহে, শুইয়া বা বসিয়া আরাম করিতে চাহে না।

এ সম্বন্ধে হালের এক জন ইংরাজ লেখক বেশ একটী মজার কথা বলিয়াছেন। অবশ্য কথাটা তিনি সম্পূর্ণ গম্ভীর-ভাবে বলেন নাই, বেশ একটু কৌতুকের ছিটা আছে; কিন্তু এই 'পরিহাসে'র ভিতর যে 'পরমার্থ' একেবারে নাই, তাহা বলা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, এরূপ বিশ্রাম হইতে সুফল আদায় করিতে হইলে, শুধু অভ্যস্ত কার্য্য বন্ধ করিলে চলিবে না, তখনকার মত নিজস্ব প্রকৃতিও ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি সাধু, তিনি যেন দিন কতকের জন্য অসাধু-বৃত্তি অবলম্বন করেন—চুরি, জাল, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি ধরেন! তাহাতে যদি কাহারও আর্থিক বা অন্য প্রকার ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি পরে 'ধাতে' ফিরিয়া আসিলে পূরণ করিলেই চলিবে! তাঁহার সুন্দর কথাগুলির এইভাবে 'চুম্বক' করিয়া দিলে মূলের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। অতএব পাদটীকায় অবিকল উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (৪) পাঠকবর্গ লেখাটুকুর তারিফ করিবেন।

যে সব দেশে নিসর্গের অফুরন্ত শোভা, আধুনিক বিলাত ও মার্কিন দেশের লোক অনেকে সেই সব দেশে বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যলাভ এবং তৎসঙ্গে সৌন্দর্য্য-উপভোগে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি-লাভ এই উভয় উদ্দেশ্যেই গিয়া থাকে। (৫) শুধু বিলাসী ধনিসম্প্রদায় নহে, সামান্য দোকানী পসারী বা চাকুরিয়া পর্য্যন্ত ছোট ছোট ছুটী-ছাটাতে, এমন কি (week-end) সপ্তাহান্তে নিকটবর্ত্তী মনোরম স্থানে ট্রেণে বা মোটরে, নৌকায় বা ষ্টীমারে, অল্প সময়ের জন্যও গিয়া স্বাস্থ্য ও সজীবতা লইয়া ফিরে। ইহার অনুকরণে ও অনুসরণে বাঙ্গালীও আজ কাল এই পথ ধরিয়াছে। মধুপুর, দেওঘর, শিমুলতলা,

for the time being is a curious inability to concentrate . . . the disinclination for work, both mental and physical—that accompanies the first week of return. [AFTER THE HOLIDAY: *The Indian Daily News*: *23rd Oct., 1923*]

(৪) The secret is that our holidays should rest not only our minds and bodies but characters too. Take, for example, a good man. His goodness wants a holiday as much as his poor weary head or his exhausted body. I wonder if he should not rest it by becoming for three weeks a bad man. Instead of sitting quietly on the pier, as he now does, he might pick a pocket or two. On returning from a sail in a boat he could furtively bore a hole in it. In his hotel he could mix up the boots, turn out the electric light and decamp without paying his bill. Such expenditure as his holiday involved might be met with a forged cheque. On returning to town all the errors of three weeks could be rectified: the handkerchiefs and purses returned to his victims on the pier; provision made for the survivors of those who had been drowned when the boat filled and sank; and so forth. But that is not the point. The point is that he would have had a complete holiday. Similarly a wicked man should rest his wickedness and devote his month in Brighton to good works.

I do not, I must confess, see in England, any period of prosperity for my plan; but it is sound, none the less. Perhaps the nearest practicable advice to it that one dares to give is that on a holiday we should endeavour to change the conditions of our life in every way as completely as possible. Only thus can a holiday be, for those of us who are active and restless in mind, a genuine rest. For it is not idleness that such require, but a change of employment. E. V. LUCAS: *Listener's Lure.*

(৫) "What we want is rest," said Harris. "Rest and complete change," said George, "the overstrain of our brains has produced a

গিরিডি প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানে, দার্জ্জিলিং, শিলং, সিমলা, মুসুরী প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে, এমন কি সুদূর কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাইতেছে। চাকুরীর এলাকারীর বা ব্যবসায়ের কলাটের ভিতর একটু ফুরসৎ পাইলেই চাকুরী-স্থান বা ব্যবসার স্থান হইতে পৈতৃক ভদ্রাসনে না যাইয়া, প্রবাস-ভূমি হইতে জন্ম-ভূমি পল্লীভবনে না ফিরিয়া, অবকাশ-কালের সুযোগে জ্ঞাতি-কুটুম্ব আত্মীয়-প্রতিবেশীদিগের সহিত মিলনসুখ ভোগ না করিয়া, বাঙ্গালীও সাহেবদিগের দেখাদেখি আজ-কাল এই ভাবে বিদেশে অবসর যাপন করিতেছে, কষ্টার্জ্জিত অর্থ জলের মত ব্যয় করিয়া ভিন্নপ্রদেশবাসীর পেট ভরাইতেছে, এ জন্য অনেকে অর্থনীতি ও সমাজনীতির দিক্ হইতে নিন্দা করেন। কিন্তু কালের প্রভাব, যুগধর্ম্ম (zeitgeist) কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এখনকার আবহাওয়াই এইরূপ। তবে হিন্দুর সাত্ত্বিক প্রকৃতি অধিকাংশ স্থানেই বাঙ্গালীর এই দেশ-ভ্রমণকে একটি বিশেষত্ব দিয়াছে। অধিকাংশ বাঙ্গালী এইরূপ সুযোগ পাইলে তীর্থভ্রমণ করিয়া ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও পারত্রিক মঙ্গল একত্র উভয় আনন্দই উপভোগ করেন। (যদিও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাকে 'সৌখীন তীর্থযাত্রা' বলিয়া টিপ্পনী কাটেন।)

২

এই ভাবে প্রশ্নটির যে মীমাংসা করা হইল, তাহা অবান্তর না হইলেও নিতান্ত মোটা কথা। 'এহো বাহ্য'। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ইহার গভীরতর উত্তর মিলিতে পারে।

জড়বিজ্ঞানে দুইটা শক্তির কথা শুনি, একটা কেন্দ্রানুগ (Centripetal), আর একটা কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal), একটা সন্ধর্ষণ আর একটা বিপ্রকর্ষণ। আমার ধারণা—শুধু জড়জগতে কেন, মনোজগতেও এই উভয় শক্তিই কার্য্যকরী। একটি শক্তি আমাদিগকে মায়ার বন্ধনে নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, 'not বড়ন চড়ন, not কিছু,' আমরা দেশভুঁই, ভিটামাটী, বাগান-বাগিচা, জমি-জায়গা, 'বিত্ত-পসার,' স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শী, আঁকড়াইয়া আছি, গণ্ডীর বাহির হইতে চাহি না, তাহাদিগকে ছাড়িতে হইলেই জগৎ শূন্য, চক্ষুঃ অন্ধকার দেখি। (আমাদের শাস্ত্রে, ইহার নাম 'বিষ্ণুমায়া'); এই শক্তির বলেই সংসার চলিতেছে, ইহারই প্রভাবে সমাজের স্থিতি; নতুবা সব এলোমেলো, ছত্রছাড়া, ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। ইহারই গুণে লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন সুসংহত সমাজ গ্রাম নগর রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি। (রাষ্ট্রনীতিতে Conservatism স্থিতিশীলতার উদ্ভবও এই শক্তির বিকাশ।)

আবার বিপরীত শক্তির প্রভাবে মানুষ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে না, ভিটামাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে না। তাহাদিগের মনোভাব, 'তাতস্ত কূপোঽয়মিতি ক্রুবন্তঃ ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি।" 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।' এই অসন্তোষের তাড়নায়, এই লক্ষ্মীলাভের কামনায়, উদ্যমশীল পাশ্চাত্য জাতিগণ কত দূরদেশে, কত দুর্গম বিপৎসঙ্কুল অপরিচিত স্থানে প্রয়াণ করিতেছে, উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, রাজ্যবিস্তার বা বাণিজ্যবিস্তার করিতেছে, প্রকৃতির সহিত সমরে বিজয়লাভ করিতেছে।

"দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ক্ষেপার ক্ষেপা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব ত তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রৈব না আর কভু।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।"

রবীন্দ্রনাথ—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। কণিকা।

ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত উন্নতি হইতেছে, রাষ্ট্রেরও ধনবৃদ্ধি হইতেছে। ফলতঃ এই শক্তির গুণে জগতের মহা উপকার হইতেছে। অথচ স্বদেশপ্রেমে, মাতৃভূমির প্রতি ভক্তিতে তাহারা কম নহে। (রাষ্ট্রনীতিতে Liberalism উন্নতিশীলতার উদ্ভবও এই শক্তির বিকাশ।) এক কালে

general depression throughout the system. Change of scene, and absence of the necessity for thought, will restore the mental equilibrium."

I agreed with George, and suggested that we should seek out some retired and old-world spot, far from the madding crowd, and dream away a sunny week among its drowsy lanes—some half-forgotten nook, hidden away by fairies, out of the reach of the noisy world—some quaint perched eyrie on the cliffs of time, from whence the surging waves of the nineteenth century would sound far-off and faint.—JEROME K. JEROME: *Three Men in a Boat, Ch. I.*

ভারতীয় আর্য্যগণের এই উদ্ভব, এই উল্লাস, এই উন্নতির আশা ছিল। এখনও যে একেবারে লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে। মাড়োয়ারী প্রভৃতি ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়, তথা 'জামা জন্মধা' বঙ্গমাতার আঁচল-ধরা বাঙ্গালী জাতি ভারতের, এমন কি জগতের বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তবে মনস্বী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিবেন, প্রভেদ এই যে, মাড়োয়ারী যায় বোঝা ঘাড়ে করিয়া ও তুলাদণ্ড বা গজকাঠি হাতে লইয়া ; আর বাঙ্গালী যায় অস্ত্র-আইনের কল্যাণে অবশিষ্ট একমাত্র আইনসঙ্গত অস্ত্র—লেখনীহস্তে।

আবার এক শ্রেণীর মানব, আর্থিক উন্নতির জন্য নহে, জ্ঞানের উন্নতির জন্য, রাষ্ট্রের নহে, জ্ঞানের সীমানা বাড়াইবার জন্য, সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে, কাননে কান্তারে, মরুভূমে তুষারক্ষেত্রে, এমন কি গগনে পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেছে। কোন্ দিন বা ভূগর্ভে বা অতল সাগর-তলে (যন্ত্রের সাহায্যে) অবতরণ করিয়া নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার করিবে। এই উচ্চভাবভাবিত মানবের জীবনের মূলমন্ত্র,—'জ্ঞানাৎ পরতরং ন হি।' (৬)

ভারতীয় আর্য্যগণও এক দিন এই পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তবে তাঁহাদিগের উদার উদ্দেশ্য ছিল—জ্ঞান-বিতরণ। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা তিব্বত-চীনে, ব্রহ্মতাতারে, 'অসভ্য জাপানে', শ্যাম-সুমাত্রায়, বলি-দ্বীপে, যবদ্বীপে, চম্পার কাম্বোডিয়ায়, আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিয়া 'বৃহত্তর ভারতে'র সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অতটা উচ্চভাবভাবিত না হইলেও এই শক্তির স্ফুরণেই অনেকের বাতিক দেশ-পর্য্যটন—য়ুরোপ-আমেরিকায় তো ইহা সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। জানি না, ইহা আদিম মানবের (nomadic habit) যাযাবর-বৃত্তির জের কি না। পক্ষপালের মত tourist বা globe-trotterএর দল পৃথিবীর আনাচ-কানাচ পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। 'ঘর-বোলা', 'ঘরকুণো', 'ঘরমুখো', 'ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ' ইত্যাদি অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গালীও আজ এই শক্তির প্রভাবমুক্ত নহে। তাই ইদানীং সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে আর মন টেকে না। এ যেন বদ্ধ ঘরে থাকিয়া দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে—তাই বাহির হইবার জন্য প্রাণ আঁকু-পাঁকু করিতেছে। (তাই বলিয়া ইহারা vagabond, ভবঘুরে, ছাড়াতে, লক্ষ্মীছাড়া নহে। বরং ইহারাই জাতির ভবিষ্যতের আশাস্থল।) বাঙ্গালী যুবকদিগের পদব্রজে, সাইকেলে, মোটরে, দেশভ্রমণের কথা আজকাল প্রায়ই সংবাদপত্রে পাঠ করা যায়। যাহারা অতটা উদ্যমশীল, কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু নহে, তাহারাও সুযোগ পাইলেই রেলগাড়ীতে চড়িয়া দেশ-বিদেশ, হিল্লী-দিল্লী বেড়াইতেছে। এই সবই সেই জীবনের একঘেয়ের-নিবারণের চেষ্টার, (freshness) সজীবতালাভের আকাঙ্ক্ষার ফলেও ইহার ভিতর উল্লিখিত সূক্ষ্মতর শক্তি কার্য্য করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুলেখক জীবনানন্দের কথাগুলি এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য।—(৭)

'That divine unrest, that old stinging trouble of humanity that makes all high achievements and all miserable failure, the same that spread wings with Icarus, the same that sent Columbus into the desolate Atlantic.

R. L. Stevenson : *Will of the Mill.*

এই কারণেই ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিতে এত ভাল লাগে। (আমার নিজের তো গল্প ও জীবনবৃত্তান্তের পরেই ভ্রমণ-কাহিনী প্রিয় পাঠ্য।) যে বেচারা অর্থ ও অবসরের অভাবে দেশভ্রমণে অসমর্থ, সে ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিয়া সুখের তৃষ্ণা ঘোলে মিটায়। এরূপ 'পরের মুখে' (ঝাল খাওয়ায় নহে)

---

(৬) For always roaming with a hungry heart
Much have I seen and known;
To follow knowledge like a sinking star,
Beyond the utmost bounds of human thought.

. . . . . .

To strive, to seek, to find and not to yeild.'

—TENNYSON : *Ulysses.*

Men my brothers, men the workers, ever reaping something new;
That which they have done but earnest of the things that they shall do.

. . . . . .

Not in vain the distance beacons. Forward, forward let us range!

TENNYSON—*Locksley Hall.*

(৭) এই সব লম্বা লম্বা ইংরেজী 'কোটেশান্' কেবল লেখকের ইংরেজী বিদ্যা জাহির করা, অনেকে এই টীকা করিবেন। আমার এই মাত্র কৈফিয়ৎ—নিজের রচনায় সরসতার অভাব বৈদেশিক সুলেখকদিগের সুন্দর রচনা উদ্ধৃত করিয়া পূরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। জানি না, ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। তবে যাঁহারা রাজভাষায় অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহাদিগের মনেই বিভ্রান্তির কারণ ঘটে। সেজন্য তাঁহাদিগের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

মিষ্ট খাওয়ার তৃপ্তি আছে। তাই ইংরেজ কবি কূপার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-পাঠে আনন্দ পাইয়া ভ্রমণকারীর উদ্দেশে বলিয়াছেন,

He travels and I too . . . . . .
. . . . . with kindred heart
Suffer his woes and share in his escapes.
—THE TASK, *Bk. IV.*

(তবে উদ্যমশীল ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রতিনিধিতে কাষ সারিয়া সুখ পান না। ভ্রমণবৃত্তান্ত-পাঠে তাঁহাদিগের ভ্রমণ-প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত হয়।)

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মভাবে, গভীরভাবে প্রশ্নটির মীমাংসা করা যায় না কি? দ্বিতীয় কারণটি প্রথমটি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর গভীরতর হইলেও, খুব বেশী দূর যায় না। আমার যেন মনে হয়, 'এহো বাহ্য।' ইহারও উপর কিছু আছে। অর্থাৎ এই 'কেন'রও আবার 'কেন' আছে। এইবার সেই কথা বলি।

দেহ ও আত্মা লইয়া মানুষ; বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণে বর্ণিত আছে, জীহোভা (বিধাতা পুরুষ) মাটী দিয়া মানব-দেহ গড়িয়া পরে সেই জড়-পিণ্ডের নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। দেহটা স্থূল উপাদানে, পঞ্চভূতে গঠিত মৃন্ময়; আত্মা সূক্ষ্ম উপাদানে, ঐশ্বরিক তেজে অনুপ্রাণিত—চিন্ময়। এ যেন খড়মাটীতে নির্ম্মিত প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা। দেহ—সান্ত, দেশকালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ; আত্মা অনন্তকাল ও দেশব্যাপী; দেহ সসীম, আত্মা অসীম; দেহ বদ্ধ, আত্মা মুক্ত; দেহ ধ্বংস, আত্মা নশ্বর; দেহ finite, limited, আত্মা infinite, unconfined; মানবের মাটীর দেহ, তাই তাহার চরণ মাটীতে সংলগ্ন, মানব অমৃতের সন্তান, তাই তাহার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। এই সৃষ্টি-তত্ত্ব হইতে প্রশ্নটির রহস্যভেদ হয় না কি?

বনের পাখী বলে—"আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার।"
খাঁচার পাখী বলে—"খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।"
বনের পাখী বলে—"আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের সঙ্গে—একেবারে।"
খাঁচার পাখী বলে—"নিরালা সুখ-কোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।"
বনের পাখী বলে—"না, সেথা কোথায়
উড়িবারে পাই।"
খাঁচার পাখী বলে—"হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।"

রবীন্দ্রনাথ—(দুই পাখী—ক্ষণিকা ॥)

মানবের সান্ত দেহ (সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত) পরম আরামে মাটী কামড়াইয়া থাকে, বন্ধনে আনন্দ ও শান্তি পায়, পরিচ্ছিন্ন স্থান-কালে ঘর-গৃহস্থালী গুছাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। (মানব-ঘুড়ী মাটীতে লুটায়) আর অনন্ত আত্মা মুক্ত আকাশে, বিপুল বিশ্বে বিচরণ করিতে ব্যগ্র, অস্থিপঞ্জরে, দেহ-পিঞ্জরে, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ (Cribb'd, cabin'd, confined') থাকিতে চাহে না। তাই মানবাত্মার স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার এই আকুলতা। (এ যেন ঘুড়ির সূতা ছাড়া।) ইহাই কি ভাবুক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় ফুটিয়া উঠে নাই?

"'It would be a wildish destiny. . . . .
Of something without space or bound,
And seemed to give me spiritual right
To travel through that region bright.
. . . . . .
Of travelling through the world that lay
Before me in my endless way."
—STEPPING WESTWARD.

এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র কি 'কেন'র উত্তর মিলে না?

"সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥"

—রবীন্দ্রনাথ—(সীমার গান।)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আতিথ্য-ধর্ম্ম

অতিথিদের বলির যূপে হে দেশ, আছ বাঁধা,
আতিথ্যটা ধর্ম্ম কি পাপ লাগিয়ে দিলে ধাঁধা।
অতিথি যে 'গুরুর গুরু' কয় তব পুরাণ,
মুখের অন্ন বুকের রক্ত তাহারে প্রদান,—
রাজকন্যা,—রাজা দিয়ে শ্মশানে আশ্রয়,—
পুত্র-বলি ইত্যাদি সব, মিথ্যে কিছুই নয়।
শত্রু-সখা-ধর্ম্ম-জাতি-নির্ব্বিশেষে তাই
দরাজ তোমার দরদালানে অতিথিদের ঠাঁই।

যুগে যুগে আসল যত লুণ্ঠক-মণ্ডল
মঠদেউলে করলে বরণ, অতিথি-বৎসল!
কোষাগারের হদিশ দিলে, রত্নই ঘরের চাবি
পরলোকের মোক্ষ-চূড়ার খুলবে তাতেই ভাবি'।
এলো কুশান শক হুন গ্রীক ঐ আতিথ্য-লোভে,
ঘর ছেড়ে তায়, ভাবলে না হায়, আপনি কোথায় শোবে।
বন্ধুতৃষায় কাতর হয়ে পরে এলেন যাঁরা
তৃষ্ণা-নিবারণে তাঁদের দিলে শোণিতধারা।
বিশেষতঃ 'গোঘ্ন', তাঁরা, গোয়াল ছিল ভরা
শাস্ত্রে মধুপর্কে পশুবধের আছে ছড়া।
কামাখ্যা-মা'র যন্ত্র তোমার সিদ্ধ ছিল বেশ,
কিন্তু বুক বুকই র'লেন, হলেন নাক মেষ।

এঁরা ছিলেন মানুষ তবু, নিত্য সেবার ফলে,
কালক্রমে ঠাঁইও পেলে এঁদের চরণ-তলে।
বন্যা এলো মড়ক এলো কাল আকালের সনে,
নয়ন-জলের পাত্ত দিয়ে বরুণে পরাণ-পণে।
বসতে তাদের দিলে সবুজ গালচেখানা পেতে,
বদা শোওয়ার সখা হলো, চায় না কেহই যেতে।
নতুন নতুন ব্যাধি এলেন যমের সুপারিশে,
সসৌরবে সবার সাথে দিব্যি গেলেন মিশে।
তামাক এলেন, সুরা এলেন, নেশায় হ'য়ে বুঁদ,
নতুন নতুন বিলাস এসে চাহেন বাপের সুধ।
কেউ বা ঘরে আগুন-লাগান, কেউ বা কাদান কেসে,
কেউ বা কেবল বমন করেন ভোজন ক'রে ঠেসে।
সইলে সবি, নইলে পরে ধর্ম্ম পাবে লোপ,
বেচে যাবে ওলাইচণ্ডী শীতলা মা'র কোপ।

অনেক পীড়াই সেপা দিলেন রীতি-প্রথার বেশে
অসদাচার লোকাচারের রূপে এলেন শেষে,
কেউ বা রাজার পক্ষা নিয়ে, পত্নী নিয়ে কেহ,
কেউ বা ঢেকে গেরুয়াতে কুষ্ঠভরা দেহ।
সংসারের ভূত-প্রেতেরা এলো শ্মশান থেকে,
গয়ায় পিণ্ড না দিয়ে তা' ঘরেই দিলে ডেকে।

পাপেরা সব আসল ক্রমে বন্ধুগণের ডাকে,
কারো মাথায় লম্বা টিকি, তিলক কারো নাকে,
জালকরা কেউ পুঁথি আনে তৈলবটের লোভে
স্বার্থপরের হাড়ের পাশা কারুর হাতে শোভে।
কারো আদার নেইক বাধা, নেই ফেরানর রীতি,
অ-তিথি ঠিক কেহই নহেন সবাই চির-তিথি।

সত্য কেবল উঁকি দিয়েই পলায়ে যান দূরে,
মুক্তি এসে ঠাঁই না পেয়ে বারবারই যায় ঘুরে।
শক্তি এলে সবাই মেলে তাড়ায় পরিহাসে,
লক্ষ্মী এসে পক্ষীবেশে উড়ে পালায় ত্রাসে।
দেবতারা সব আসেন বটে ভিড়ের ঠেলা দেখে,
যা'ন চলে হায় অশ্রুধারায় রোষ অভিশাপ রেখে।

এম্‌নি ক'রে পালছ তুমি আতিথেয় ব্রত,
দেখুক জগৎ মহাব্রতের মাহাত্ম্যটা কত।
গৃহে তোমার ঠাঁই জোটে নি আজ গোয়াল-ঘরে,
গো-দেবতার চরণতলে কুণ্ঠিত অন্তরে।
এঁটো পাতার নেইক অভাব গোয়াল ঘরেই জড়ো
লেহন এবং চর্ব্বণে তার ভাগ বখারা করো।
দেবতা তোমার চিবায় পাতা, তুমি তাহাই চাটো,
দুগ্ধ তোমার ভোগা নহে যতই গোবর ঘাঁটো।
অঙ্গে তোমার বস্ত্র না থা'ক শাস্ত্র আছে ঘিরে,
সঙ্গে তোমার গোবর আছে গণ্ডী দিয়ে ঘিরে।
অতিথ-সেবার ধর্ম্ম তোমার ঠিকই থেকে গেছে,
মৃত্যু যদি হয়ও তোমার, চক্ষু যাবে বেঁচে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

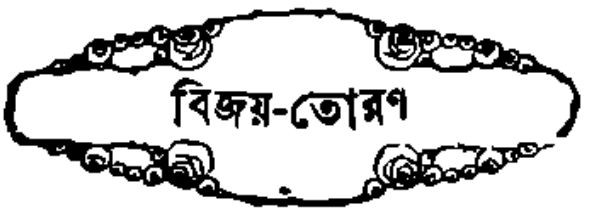

বঙ্গের বিজয়-কীর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে,
কত কথা একে একে জাগিল স্মরণে,
বিদ্যুৎকৃপাণ-প্রভা চমকিল মনে
বিজয় সিংহের স্মৃতি উদ্ভাসিত চিতে।

কোথা বঙ্গ! কত দূরে কোথা সে সিংহল!
লবণাম্বুরাজিবুকে মরকতমণি!
নীলোৎপল-স্নিগ্ধকান্তি যে দেশে রমণী—
সিন্ধুমণি যোনি যথা ইন্দু সমুজ্জ্বল।

কামরূপ শিশুমূর্ত্তি মৈনাক-বৈনাকী—
সিন্ধুমাঝে স্বর্ণগৃহে প্রবাল আসনে
স্বর্ণাঞ্চলে বসি সহাস-আননে
মধু শোভা প্রেমরসে বিলসিত আঁখি।

মন্থর করত কৃষ্ণ শিলারাজি মাঝে,
হেমাম্বরা মনোহরা বেলাভূমি 'পরে
তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়ে অট্টকলস্বরে—
ঈর্ষা দীপ্তফেন যেথা ফণিসম নীচে।

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম প্রসারিয়া পাখা
ঘনে দলে উঠে পড়ে সাগরের বুকে—
চলে ধীবরের ডিঙ্গা পরম কৌতুকে—
ডিঙ্গামুখে রক্তবর্ণ হস্তচিহ্ন আঁকা।

নীলাম্বুবিস্তার হ'তে ভেসে আসে ধীরে
গম্ভীর মধুর মৃদু সারঙ্গের সুর।—
মুক্ত সিক্ত কেশদাম ঘন সুপ্রচুর
বামবালা গায় গান সিন্ধুতরী ঘিরে।

সে কোন বিজয় বাহু লিখিল লঙ্কায়
বীরসিংহ জয়গাথা বীরের রুধিরে,
ধরিল বিজয়-বাল্যকীর্ত্তি দীপ্ত শিরে
পরাজিত শত্রু নত, কুণ্ঠিত শঙ্কায়।

সে দিন কি এ বঙ্গের মনসা-মন্দিরে
জেগেছিল কোন বুকে নব উদ্দীপনা?
মন্দাকিনী বীণাতন্ত্রে নূতন বাসনা
বেজেছিল নবরাগে মধুর গম্ভীরে?

শুনি কুহকিনী ছিল সে সিন্ধু-আলয়ে
কুহকবিদ্যা-বিনোদিনী যৌবন-গর্ব্বিতা,
কটাক্ষে গাহিল তার যেই কামগীতা—
মুগ্ধ হ'ল তাহে বীরসিংহের হৃদয়।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর বরনারী—
জয়গর্ব্বে প্রেমস্বপ্ন জাগিল মধুর
দুটি প্রাণ এক করি মিলন চতুর
ফুটাল প্রেমের চিত্র চিরচিত্তহারী।

বীরসিংহে পালি গর্ব্বে সে সুন্দরী পুরী—
ধরিলা সিংহলা নাম বঙ্গের গৌরব।
স্মৃতি তার আজো যেন চন্দন-সৌরভ
ফুটায় অতীত স্বপ্ন-বিস্মৃত মাধুরী।

শ্রান্ত মন, চিন্তা যেন স্বপ্ন হয়ে আসে,
ভাবিলাম বঙ্গের সে বীরতীর্থতীরে
কি আছে স্মরণচিহ্ন? অবনত শিরে
কাহার বন্দনা করি মনের উল্লাসে?

ডুবিল চেতনা মোর নিদ্রাচ্ছায়া মাঝে,
অসতর্ক করভ্রষ্ট রয় যেন জলে।
তার পর? প্রবেশিয়া প্রশান্ত অতলে
প্রবেশিয়া দেখিলাম সে বিজয়রাজে।

সিংহলার সিংহকুম্ভ "বিজয়" তোরণ—
পুরমুখ অর্দ্ধবৃত্ত শোভার আধার
করিছে এ বাঙ্গালার গৌরব প্রচার—
মুকুটে ত্রিসিংহকুম্ভ চিত্ত-বিমোহন।

সুকুমার সেন

পক্ষী বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তাই বোধ হয়, অতি প্রাচীন যুগ হইতেই সকল দেশের সভ্য মানব এই বিচিত্র সৃষ্টীবের বন্দনায় মুক্তকণ্ঠ। কবির লেখনী পাখীর স্তুতি-গানে পবিত্র হয়, শিল্পীর তুলিকা চিত্রপটে তাহাকে অঙ্কিত করিয়া শাশ্বত সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে। আদিম মানব যখন গিরিগুহায় অবস্থান করিত, তখন তাহার চিত্তে সৌন্দর্য্য-বোধের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ গিরিগাত্রে পাখীর চিত্র ক্ষোদিত করিয়া চরিতার্থ হইত।

অতি প্রাচীন যুগ হইতেই মানব-মনে পক্ষিপ্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল, প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার ফলে তাহা এখন সর্ব্বজনবিদিত। সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবিগণ তাঁহাদের অমর রচনায় বিহগজাতিকে নানাভাবে কল্পনায় ও বাস্তবতার বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া মানবমনে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ ইহা অত্যুক্তি নহে যে, সর্ব্বদেশের সর্ব্বপ্রকার কবির রচনাতে পাখী অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

শুধু কবি-কল্পনায় নহে—প্রাচীন যুগের বিভিন্ন ধর্ম্মেও পাখী নানাভাবে গৃহীত হইয়াছিল। কোন কোন দেশের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে পাখীর পূজাও প্রচলিত ছিল। কোন কোন দেশে প্রাচীন যুগে দৈবজ্ঞগণ পাখীর বিমান-পথে দ্রুত ধাবন দেখিয়া নানাবিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিত।

নর-নারী—শিশু, যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ, সকলেই পাখীকে ভালবাসে। সম্ভবতঃ বিধাতার অজস্র সুন্দর সৃষ্টি বলিয়াই পাখী মানব-মনে এতখানি স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় দেখা যায়, মানুষ পাখী পুষিয়া থাকে। সুসভ্য মানব বলিয়া যাহারা আপনাদিগকে [illegible]

পক্ষীকে শিকারে বধিয়া পক্ষিপ্রীতির পরিচয় দেয়, যাহারা কোন আলোক-রশ্মির প্রাবনে পবিত্র হয় নাই, সেই অসভ্য নরনারীরাও পাখী পুষিয়া তাহাদের অমার্জ্জিত পক্ষিপ্রেমের বিচিত্র রূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেখায়। কিন্তু মানব-জীবন-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই হিংসা বা চেতন-প্রবৃত্তি মানবের হৃদয়ে আপনা হইতেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এ জন্য বিধাতার এই মধুর, পবিত্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করিবার জন্য আদিমকাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত পক্ষিশিকার অবাধে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং লতাপুষ্পিত বিতান, অথবা নবকিসলয়-পরিশোভিত বৃক্ষচূড়ে সুখ-সমাসীন বিহগদম্পতির কল-কাকলী অকস্মাৎ ব্যাধের বাণাঘাতে অথবা শিকারীর গুলীতে স্তব্ধ হইয়া যায়। আদিমকালেও মানব যেমন অসঙ্কোচে পক্ষিশিকার করিত, বর্ত্তমান যুগেও শিক্ষিত মানব তেমনই কুণ্ঠাহীনভাবে বিধাতার সুন্দর, মধুর, পবিত্র সৃষ্টিকে অকস্মাৎ লোকান্তরে পাঠাইয়া দেয়।

আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশের কৃষকগণ সাধারণতঃ পাখীর উপকারিতা সম্বন্ধে কোন সন্ধান রাখে বলিয়া মনে হয় না। মার্কিণ দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে, এ দেশে যদি তাহা অনুসৃত হয়, তাহা হইলে বহু শস্যাদি যে কীটপতঙ্গের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আমাদের দেশের পাখীর সহিত মার্কিণের কোন কোন পাখীর আকার ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিতে পারে। এ জন্য কতিপয় পাখীর বহু বর্ণচিত্র পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সন্নিবিষ্ট করা হইল। আশা করি, ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের কোন কোন পরিচিত পাখীর সন্ধান মিলিতেও

ব্লু-বার্ড বা নীলপাখী

রবিন্

পুরু

রিংলেট্

আবিস থ্রস্
ভিমারী

আরণ্য থ্রস্
চিঁ

নীলপক্ষী (Blue Bird)

এই পাখী দৈর্ঘ্যে সাড়ে ৬ ইঞ্চি। যুক্তরাজ্যে ইহারা সাধারণতঃ থাকে। আরিজোনার পশ্চিম প্রান্তে, কলোরোডো, উইওমিং এবং মন্টানা প্রভৃতি স্থানে এই পাখী বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-কানাডা, মেক্সিকো, গোয়াটিমেলা প্রভৃতি স্থানে নীল পাখীর সংখ্যাও আছে।

এই পাখী সাধারণতঃ গোলাবাড়ী ও খামারবাড়ির পাকিতে ভালবাসে। ইহাকে সকলেই বসন্তের অগ্রদূত বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকে। 'রবিন্', 'ফিবি' এবং 'রেন' পাখীর ন্যায় অত্যন্ত শৌখিন মানিয়া থাকে। কীটপতঙ্গ-ভক্ষণে নীল পাখী অগ্রগণ্য এবং শস্য প্রায়ই ভক্ষণ করে না।

শতকরা ৬৮ ভাগ কীটপতঙ্গ এবং ৩২ ভাগ শাকসব্জী ইহার ভক্ষ্য। নীলপাখী অগ্রে ফড়িং, পরে গুবরে পোকা ভক্ষণ করিয়া থাকে। কাচপোকাও ইহার ভক্ষ্য, তবে প্রথমোক্ত দুই প্রকার পতঙ্গ যদি একান্তই না মিলে, তখন সে উহার প্রতি মনোযোগ দেয়। শস্যের পক্ষে এই কয় প্রকার পতঙ্গই অনিষ্টকারী। শাকসব্জী-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ফলের শস্য, তন্মধ্যে ভ্রমোৎপাদিত ফলের অংশ অতি সামান্যই থাকে। সাধারণতঃ বন্য জাম অথবা অন্যবিধ আরণ্য ফলের অংশই বেশী।

ইহা হইতেই প্রতীতি হইবে যে, নীলপক্ষীর দ্বারা শস্য-হানি হয় না; বরং কীটপতঙ্গাদি সংহার করার ফলে সে কৃষি-শস্যের সমূহ মঙ্গল সাধিত করিয়া থাকে।

ঈষৎ পীতাভ খুস

এই পক্ষী দৈর্ঘ্যে ৭½ ইঞ্চি। খুস্-জাতীয় অন্যান্য পক্ষীর মস্তকের উপরিভাগ ও পুচ্ছের বর্ণ পৃষ্ঠের বর্ণের অনুরূপ। কিন্তু ইহার চঞ্চুর উপরিভাগ ও গণ্ডদেশের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ।

আলাস্কা, কানাডা, ক্যালিফোর্ণিয়া, কলোরোডো, মিচিগান প্রভৃতি স্থানই খুস পাখীর আবাসস্থান। শীতের সময় ইহারা মেক্সিকো হইতে দক্ষিণ-আমেরিকায় বসবাস করে।

মার্কিণের গায়ক পাখীদিগের মধ্যে খুসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই জাতীয় অনেকগুলি পক্ষী আছে, তাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য বিস্ময়জনক।

উল্লিখিত খুস পাখী একান্ত ফলের ভক্ত; কিন্তু নির্ব্বিবাদে ইহার অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ বলিয়া, যে সকল ফলের গাছের কাছে জলধারা নাই, এই পাখীদের সকল বৃক্ষকে অনায়াসে অবহেলা করিয়া থাকে। চেরী যখন পাকিতে থাকে, সেই সময় খুস পাখীর দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়, কারণ, খুসের শাবকগুলি তখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নীড়মধ্যে ডাকিতে থাকে। ইহা হইতেই অনেকে হয় ত সিদ্ধান্ত করিবেন যে, শাবকগণ ফল খাইয়া বাঁচে। কিন্তু তাহা সত্য নহে। শাবকদিগের জনকজননী ফল, আর শাবকগণ কীট-পতঙ্গ খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। গুবরেপোকাই ইহাদের প্রধান খাদ্য; তৎপরে পিপীলিকা। ফলজাতীয় আহার্য্যের ৫ ভাগের ২ ভাগ মাত্র উৎপাদিত ফলের শস্য।

রবিন্

এই পাখীর দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি। যুক্তরাজ্য, কানাডা, আলাস্কা এবং মেক্সিকো অঞ্চলে ইহারা বাস করিয়া থাকে, শীতকালে যুক্তরাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্র এবং দক্ষিণে গোয়াটিমালায় ইহারা যাপন করিয়া থাকে।

রবিন্ পক্ষী মার্কিণ সাধারণের অতি প্রিয়। প্রীয় ঋতুতে ইহার আনন্দসঙ্গীত এবং পরিচিত আকৃতি মানবমনে তৃপ্তি ও আনন্দ দান করিয়া থাকে। রবিন্ সকল প্রকার কীট-পতঙ্গই ভক্ষণ করিয়া থাকে। অরুচি ইহার কিছুতেই নাই। কেঁচো ইহার অত্যন্ত প্রিয়; কিন্তু ফলশস্যপ্রীতিও ইহার অল্প নহে। শতকরা ৪৮ ভাগই শস্যজাত পদার্থ। প্রায় ১২ শত রবিনের পাকস্থলী পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, কৃষিজাত ফলাদির ৫ গুণ বন্যফলই তাহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। বন্য জামজাতীয় বৃক্ষ ফলের বাগানের কাছে রোপণ করিলে মূল্যবান্ ফলগুলি তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার ফলের বাগান রক্ষার জন্য কোন উদ্যানস্বামী ক্ষুধার্ত্ত রবিন্দিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি একটি পাখীকেও গুলী করিয়া হত্যা করেন নাই।

রক্তচূড় ফিংচেস্

দৈর্ঘ্য ৫½ ইঞ্চি। মস্তকের চূড়া রক্তবর্ণ। দক্ষিণ-কানাডা, দক্ষিণ-আলাস্কা এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহারা বাস করিয়া থাকে। ফিংচেস্ পাখী অত্যন্ত চঞ্চল ও তীক্ষ্ণ। খাদ্যান্বেষণে সর্ব্বত্র দ্রুত উড়িয়া উড়িয়া যায়। বসন্তকালে যখন গান গাহিতে আরম্ভ করে, তখন ইহার কণ্ঠস্বরে চমৎকৃত হইতে হয়। দেহের তুলনায় ইহার

কণ্ঠস্বরে শক্তি অধিক আছে। ইহার খাদ্যের ৯ ভাগের ৩ ভাগ বোলতা, ছারপোকা এবং মক্ষিকামাত্র।

পাখী ক্ষুদ্র হইলেও কীট-পতঙ্গ-সংহারে ইহার ক্ষমতা অল্প নহে। ফলের শত্রু ইহাদের খাদ্য বটে, কিন্তু বিষাক্ত আইভি, বিষাক্ত ওক বা দেবদারু এবং অন্যান্য কতিপয় বন্যফলই তন্মধ্যে প্রধান।

ব্লু-বার্ড

এই পাখী ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ। ইহার ঘন-কৃষ্ণ পুচ্ছ এবং মস্তকের মসীকৃষ্ণ বর্ণ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র যুক্তরাজ্যে এই পাখীকে দেখিতে পাওয়া যায়।

গোপের ভিতর ইহারা সাধারণতঃ বাসা বাঁধে। ইহার কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। যখন গান গাহে, মানুষ মুগ্ধ হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বিড়ালের ন্যায় মিউ মিউ ধ্বনি করিয়া পাখী রসভঙ্গ করিয়া দেয়।

বিড়াল-পক্ষীর খাদ্যের অর্দ্ধেকই উৎপাদিত ফলমূল। কালো জাম, চেরী, ব্লুবেরী প্রভৃতি ইহারা পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়া থাকে। গুবরেপোকা, পিপীলিকা, ঝিঁ ঝিঁ-পোকা প্রভৃতিও ইহার প্রিয় আহার্য্য।

কীট-পতঙ্গাদি এই পাখী ধ্বংস করে বটে, কিন্তু উৎপন্ন ফলের যে প্রকার সর্ব্বনাশ করে, তাহার তুলনায় উপকার অতি অল্প।

ব্রাইক্স

ধূসরবর্ণের—কালো-সাদায় মিশ্রিত এই পাখী দৈর্ঘ্যে ৯ ইঞ্চি। সমগ্র যুক্তরাজ্যের সর্ব্বত্রই এই পক্ষী বিরাজিত। ইহার কণ্ঠস্বর কর্কশ—মাধুর্য্যের লেশমাত্র নাই।

ব্রাইক পক্ষী সাধারণতঃ কীট-পতঙ্গভোজী; কিন্তু সরীসৃপ-জাতীয় জীবও ইহার খাদ্যের অন্তর্গত। ব্রাইকের চঞ্চুর গঠন-প্রণালীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিকারকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্যই উহা গঠিত হইয়াছে।

ফড়িং ইহার প্রধান খাদ্য; অবশ্য ঝিল্লী, গুবরেপোকা, বোলতা, উর্ণনাভ, পিপীলিকা কিছুই ব্রাইক্ পক্ষী বাদ দেয় না। ইহাকে কসাই-জাতীয় পক্ষী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সময়ে সময়ে ক্ষুদ্রাকার পক্ষীকেও ইহা শিকার করিয়া থাকে। মূষিক, গিরগিটী প্রভৃতি এই মাংসাশী পক্ষীর কবলে পড়িলে কখনই পরিত্রাণ পায় না।

আর্টল্ ওয়ারব্লার

এই পাখীর মস্তক, পার্শ্ব ও পুচ্ছ-সন্নিহিত প্রদেশে পীত-চিহ্ন বিদ্যমান। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫½ ইঞ্চ হইয়া থাকে। কানাডার সমগ্র আরণ্যপ্রদেশ, মিনেসোটা, মিচিগন, নিউইয়র্ক এবং মেসাচুসেট্স অঞ্চলে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

এই পাখী দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই সুকণ্ঠ। ইহার শোভন গতিভঙ্গী, বিশেষতঃ আহার্য্যসংগ্রহকালে—মানবের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া থাকে। 'রেন', 'ক্রিপার' ও 'ফ্লাই-ক্যাচার' জাতীয় বিহঙ্গগণ যে ভাবে খাদ্যান্বেষণ করে, 'আর্টল্ ওয়ারব্লার'ও সেই ভাবে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকে।

যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বভাগে ইহারা চির প্রবাস করিয়া থাকে সত্য; কিন্তু সমগ্র দেশের বনভূমিমধ্যে ইহারা এমনভাবে ছড়াইয়া পড়ে যে, প্রত্যেক পর্য্যটক ইহার সহিত পরিচিত।

ইহার খাদ্যাংশের ৯ ভাগের ৩ ভাগ কীট-পতঙ্গে পূর্ণ; প্রত্যেক জাতীয় কীট-পতঙ্গই শস্যহানিকারী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুবরেপোকা,—তন্মধ্যে উইভিলজাতীয় কীটও আছে—পিপীলিকা, উই এবং বোলতাও তাহার অন্তর্গত। ওয়ারব্লার এমন ক্ষুদ্রাকৃতি, ক্ষিপ্র এবং লঘুগতিবিশিষ্ট যে, অতি সূক্ষ্ম কীটও ইহার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। মক্ষিকা ইহার প্রধান খাদ্য। শতকরা ২২ ভাগ মাত্র ফলের শস্য ইহার পাকস্থলীতে পাওয়া যায়, তাহাও নানাবিধ বিষাক্ত আইভি ও দেবদারু-জাতীয় বৃক্ষের ফলমাত্র।

সোয়ালো

সোয়ালো পাখীগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ৭ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ইহার পুচ্ছের বৈশিষ্ট্য আছে। সমগ্র যুক্তরাজ্যে ঐ পাখী দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পাখী কৃষকগণের অত্যন্ত পরিচিত। ইহার মত কীটপতঙ্গবিনাশকারী পক্ষী আর নাই। উষার আলোক আকাশপথে আবির্ভূত হইলেই এই সোয়ালো পাখী শিকার অন্বেষণে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে উড়িয়া বেড়াইতে থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে তখন প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহার মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্রও তাহার বিশ্রাম নাই। অনুক্ষণই কীটানার ভর দিয়া উড়িতেছে, ক্ষেত্রের মধ্যে কীটের সন্ধানে ফিরিতেছে—এমন অক্লান্তকর্ম্মী পাখী আর দেখা যায় না। অসংখ্য কীট সোয়ালোর পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হয়।

কৃষকের গোলাবাড়ীর কড়ির ফাঁকে ইহাদের নীড় রচি

ম্যাগপাই

ফিবি

ফে

আরণ্য পিউই

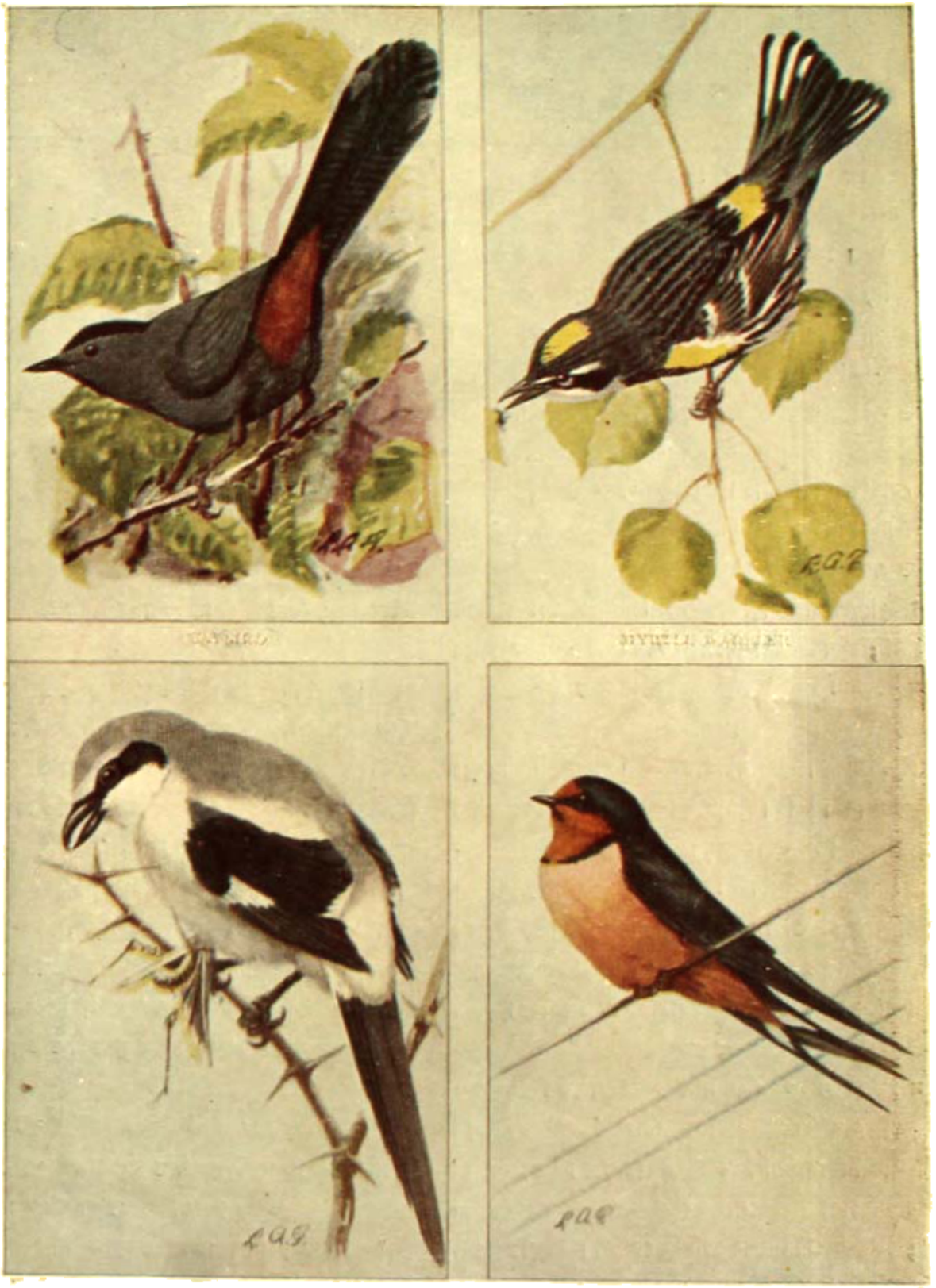

ক্যাটবার্ড
গ্রাইব্

বার্টন সোয়ালোর
সোয়ালো

হয়। অধুনা আমেরিকার গোলাবাড়ীগুলি এমন ছিদ্রশূন্য অবস্থায় নির্ম্মিত হয় যে, সোয়ালো পাখী আর আশ্রয়স্থান খুঁজিয়া পায় না। এ জন্য অনেক স্থানে এই জাতীয় পাখীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। ইহা তত্রত্য কৃষি-জীবীর পক্ষে আশঙ্কার কথা।

ম্যাগপাই

ইহার দৈর্ঘ্য ১৮ হইতে ২১ ইঞ্চি। ইহার মস্তক ও দেহ কৃষ্ণবর্ণের, তলদেশ শ্বেত, পক্ষের স্থানে স্থানে শ্বেতচিহ্ন। ইহার দীর্ঘ পুচ্ছ প্রকৃতই মনোজ্ঞ ও বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক। পীতপুচ্ছ-সমন্বিত ম্যাগ্‌পাই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার।

এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা, আরিজোনা, নিউ-মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে উহার বসবাস। দুই জাতীয় ম্যাগ্‌-পাই দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পীত-পুচ্ছ পক্ষী ক্যালি-ফোর্ণিয়া অঞ্চলেই বিদ্যমান। কিন্তু উভয় জাতীয় পক্ষীর প্রকৃতি এক।

ম্যাগ্‌পাই অত্যন্ত সামাজিক পক্ষী। কখনও একা থাকিতে পারে না; দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। কীট-পতঙ্গ ইহার প্রধান ভোজ্য। আরণ্য ফলও ইহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে

স্কিঞ্চি

দৈর্ঘ্যে ৭ ইঞ্চি। আমেরিকার পূর্ব্বপ্রান্তে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কিণগণ ইহার বিশেষ ভক্ত। বসন্তের অবসানে ইহার মধুর কণ্ঠ কৃষকপ্রাণে আনন্দের সঞ্চার করে। প্রথমতঃ পাহাড়ের অঙ্গে বাসা বাঁধিয়া ডিম্ব প্রসব করে। তাহার পর মনুষ্য-আবাসে ফিরিয়া আসে। একই পক্ষিদম্পতি তাহার পুরাতন স্থানে প্রতি বৎসর বাস করিয়া থাকে। কীটপতঙ্গই ইহার প্রধান উপজীব্য।

জে

পৌসে ১২ হইতে ১৩ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়া থাকে। মস্তকের উচ্চ চূড়ার দ্বারা 'জে' পক্ষীকে চিনিতে ভুল হয় না। উত্তর-আমেরিকার পশ্চিমভাগে ইহার বাস। কৃষি-প্রধান দেশের অধিবাসী না হইলেও ইহারা শস্য ও ফল ভোজন করে; কিন্তু শস্যের বিশেষ হানি করে না। কীটভোজী হইলেও, কীটপতঙ্গ ইহার প্রধান ভোজ্য নহে। জে পাখী অন্যান্য পাখীর ডিম্ব নষ্ট করিয়া ফেলে। এ জন্য ইহার দ্বারা বিশেষ উপকারলাভ ঘটে না।

আরণ্য পিউই

এই পাখী দৈর্ঘ্যে ৬॥০ ইঞ্চি হইয়া থাকে। মানিটোবা এবং কানাডার দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে ইহারা বাস করিয়া থাকে। 'পিউই' নির্জ্জনতার ভক্ত এবং ইহার অঙ্গ-ভূষণের বৈশিষ্ট্য তেমন নাই। শুধু মিষ্ট কণ্ঠস্বরেই এই পাখী মানবের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। কীট-পতঙ্গই ইহার প্রধান ভক্ষ্য। কৃষি-ক্ষেত্রে যে সকল কীটের ভীষণ উৎপাত, 'পিউই' তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকে।

ব্যাক্সিড থ্রস্

ইহার দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি। ইহার কৃষ্ণবর্ণ বক্ষ এবং পীতাভ দেহের বর্ণ অন্যান্য 'থ্রস'জাতীয় পক্ষী হইতে ইহাকে চিনিবার সুবিধা করিয়া দেয়। প্রশান্ত-সমুদ্রকূলে প্রধানতঃ ইহা অবস্থান করে। 'ব্যাক্সিড থ্রস' পাখী 'রবিন্'কে মনে করাইয়া দেয়। শীতকালে এই পাখী অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া উদ্যান ও উপত্যকা-ভূমি-সমন্বিত স্থানে গমন করিয়া থাকে। উদ্ভিদ্ ও কীট-পতঙ্গ উভয় জাতীয় খাদ্যই ইহার প্রিয়।

ভিরিডী

৭½ ইঞ্চি দীর্ঘ। উত্তর মিচিগান ও ওন্টারিও প্রভৃতি স্থানে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাখীও নির্জ্জনতা-প্রিয়। সুকণ্ঠের জন্য 'ভিরারী' পাখীর প্রসিদ্ধি আছে। ইহার গানে মানবের হৃদয়-তন্ত্রী অপূর্ব্বভাবে সাড়া দিয়া থাকে। এমন আর কোনও মার্কিণ পাখীর গানে হয় না।

আরণ্য থ্রস্

সওয়া ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ। দক্ষিণ-ডাকোটা, মধ্য-মিনেসোটা প্রভৃতি স্থানে এই পাখীর বাস। ইহার কণ্ঠস্বর চিত্তাকর্ষক। কীট-পতঙ্গ এবং কিছু কিছু ফলমূল ইহার খাদ্য। আরণ্য 'থ্রস্' যেমন কবির প্রিয়, তেমনই কৃষকেরও উপকারী।

ভিউ

৪ হইতে সাড়ে ৬॥ ইঞ্চি দীর্ঘ। দক্ষিণ-বৃটিশ কলম্বিয়া হইতে নিম্ন-কালিফোর্ণিয়া পর্য্যন্ত স্থানে এই পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র পক্ষী অত্যন্ত সামাজিক। দলে দলে 'চিট' পাখী উড়িয়া বেড়ায়। ওক্‌বৃক্ষে সাধারণতঃ ইহারা নীড়-রচনা করিয়া থাকে। কীট-পতঙ্গ ইহার বিশেষ প্রিয়। অবশ্য ফল ও শস্যকণাও ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। কৃষি-ক্ষেত্রের শত্রু কীটগণকে ইহারা ধ্বংস করিয়া থাকে।

তাম্রের যুগের ভারতবর্ষ

ধাতুর অস্ত্র তৈয়ারী করিতে শিখিয়া মানুষ সর্ব্বপ্রথমে তাম্রের অস্ত্র তৈয়ারী করিল এবং পরে তাম্রের অস্ত্র কঠিন করিবার জন্য তাহাতে কঁাসার বা টিন মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পাথরের অস্ত্রের যুগের পরে পৃথিবীর সকল দেশেই তাম্র ও টিন-মিশ্রিত কাঁসা বা ব্রঞ্জের যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগকে সেই জন্য পৃথিবীর সকল দেশে ঐতিহাসিকরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন;—পুরাতন

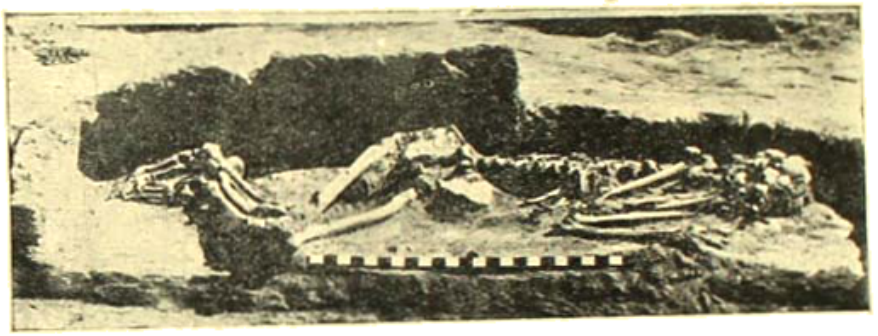

তাম্রের যুগের সমাধি, নাল, বেলুচিস্তান

পাথরের যুগ (Paleolithic age), নূতন পাথরের যুগ (Neolithic age), এবং তাম্র ও ব্রঞ্জের যুগ (Copper and Bronze age)। ভারতবর্ষে এত দিন তাম্র ও ব্রঞ্জের যুগের নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় নাই। হিন্দুস্থান বা উত্তর-ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে তাম্রের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু কেবল তাহা হইতে তাম্রের যুগের উৎকর্ষের অবস্থা স্থির করিতে পারা যায় নাই। Civilasion শব্দটা আধুনিক বাঙ্গালায় "সভ্যতা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে

তাম্রের পাত্র ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র, মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত

বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "সভ্যতা" বলিলে ইংরাজী শব্দটির শক্তির সমস্তটা প্রকাশ হয় না। "সভ্যতা" বোধ হয় নূতন পাথরের যুগেও ছিল। কারণ, তাহারাও কাপড় বুনিতে জানিত, ভাল ভাল মাটীর বাসন তৈয়ারী করিত এবং সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিত। উৎকর্ষ শব্দে তাৎকালীন মানব-সমাজের আপেক্ষিক উন্নতির পরিচয় বুঝিতে পারা যায়। নূতন পাথর এবং তাম্র বা ব্রঞ্জের যুগের প্রভেদ আপেক্ষিক, সুতরাং উৎকর্ষ শব্দই ব্যবহার করা উচিত।

মুহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তাম্রের যুগের উৎকর্ষ বুঝিবার কোনই উপায় ছিল না। কেবল ইহাই নহে, অতি প্রাচীন ভারতবাসীর সহিত প্রাচীন পারস্য বা ব্যাবিলোনিয়ার কোনও সম্বন্ধ ছিল কি

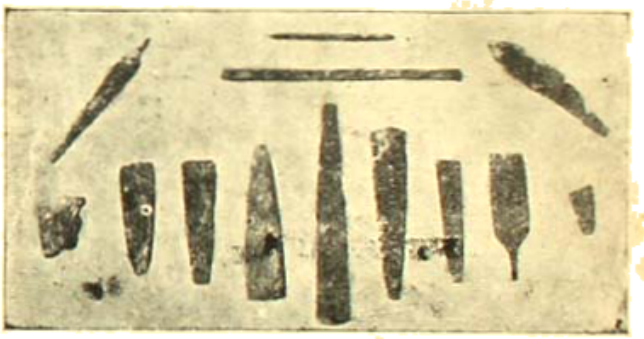

ব্রোঞ্জের কুঠার, তীরের ফলা, বাটালি, বল্লম, ছুরী
মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত

না, তাহাও বুঝিতে পারা যায় নাই। এখন বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, তাম্রের যুগের পরে আমাদের দেশেও ব্রঞ্জের যুগ আসিয়াছিল এবং তাম্রের যুগের উৎকর্ষ সুদূর ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে ক্রীট দ্বীপে যে প্রাচীন জাতি বাস করিত, তাহাদের উৎকর্ষের সহিত তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীতীরবর্ত্তী দেশের এবং আমাদের ভারতবর্ষের সিন্ধু ও বেলুচিস্থান প্রদেশের উৎকর্ষের

অর্থ বুঝিতে পারা যায় নাই; সুতরাং ভারতীয় ও সুমেরীয় চিত্রলিপি যে এক নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। তবে অনেক বিষয়ে ব্যাবিলোনের সুমেরীয় উৎকর্ষের সহিত ভারতের তাম্র ও ব্রঞ্জের যুগের উৎকর্ষের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সাদৃশ্য শঙ্খের ব্যবহার, টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উভয় তীরের দেশে প্রাচীনতম

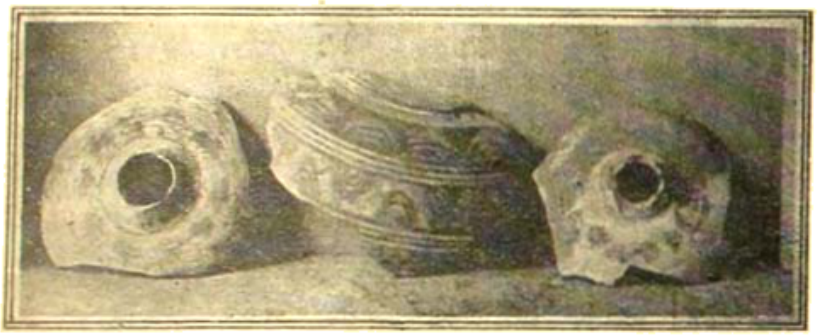

মুহেন-জো-দড়োর কাচের গুঁড়ার রঙীন পাথরের ও প্রবালের মালার দানা বা পুঁতি

যুগের ধ্বংসাবশেষগুলিতে প্রচুর পরিমাণে শঙ্খনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রতি বৎসর আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেমন কেবল শঙ্খ হইতে বলয় প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ মেসোপোটেমিয়ার স্ত্রীব্যবহার্য্য নানা-রূপ অলঙ্কার কেবল শঙ্খ হইতেই নির্ম্মিত হইত। কেবল তাহাই নহে, শঙ্খের পুঁতি, চমস বা কোশা, ছোট কৌটা, নল প্রভৃতিও তৈয়ারী হইত। মুহেন-জো-দড়ো নামক স্থানে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমি যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া-ছিলাম, তাহাতেও এইরূপ নানাবিধ শঙ্খ-নির্ম্মিত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। সহস্র সহস্র শঙ্খনির্ম্মিত বলয়ের সহিত শঙ্খনির্ম্মিত কৌটা, বোতাম, কর্ণের অলঙ্কার, নল আবি-ষ্কৃত হইয়াছিল এবং তাহা এখনও কলিকাতার মিউজিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায়।

টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীতীরে প্রাচীনতম যুগে সুমে-রীয় অধিবাসিগণ কাচের ব্যবহার জানিতেন না। আমরা এখন পাশ্চাত্য শিক্ষকদিগের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছি যে, কাচ মিশরদেশে গ্রীকজাতি কর্ত্তৃক খীশুখৃষ্টের জন্মের দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে আশ্চর্য্যরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মরুভূমির বালুকার উপরে রন্ধনকালে বালুকা গলিয়া কাচের আকার ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কাচের ব্যবহার খ্রীষ্ট খীশুখৃষ্ট জন্মিবার অন্ততঃ ৩ হাজার বৎসর এবং বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশে অন্ততঃ ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ছিল। বেলুচি-স্থানের যে সমস্ত কাচপাত্র কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে, তাহা ভিনিসদেশীয় মধ্যযুগের বহুবর্ণ কাচ-পাত্রের ন্যায় বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। এই সকল রঞ্জিত কাচ-পাত্র আধুনিক যুগের কাচ-পাত্রের ন্যায় চিত্রিত নহে; গলিত কাচ পাত্রের আকারে পরিণত হইবার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই জাতীয় বহুবর্ণে রঞ্জিত একটি কাচ-পাত্র শ্রীযুক্ত কজেন্স্ দ্বারা (H. Cousens) ব্রাহ্মণাবাদ বা মনসুরার ধ্বংসাবশেষমধ্যে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও মুহেন-জো-দড়ো আবিষ্কার

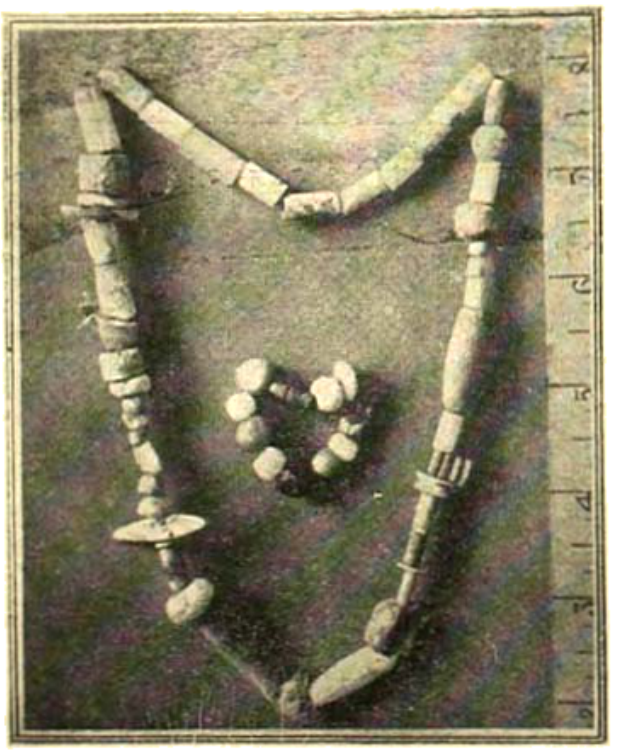

হাতীর দাঁত হইতে মালার দানা বা পুঁতি মুহেন-জো-দড়োয় আবিষ্কৃত

হয় নাই বলিয়া এই কাচ-পাত্রটি তাম্রের যুগের নিদর্শন বলিয়া পরিচিত হইতে পারে নাই।

ক্রীটদ্বীপের কাচের নিদর্শনের সহিত ভারতবর্ষের তাম্রের যুগের নিদর্শন-সমূহের একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য সর্ব্বপ্রথমে মুহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত নিদর্শন-সমূহে বুঝিতে পারা গিয়াছে। কাচের গুঁড়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া নানাবিধ অলঙ্কার, পাত্র ও খেলনা নির্ম্মিত হইত। অনেক সময়ে এই সমস্ত অলঙ্কার বা খেলনায় এক প্রকার নীলবর্ণের উজ্জ্বল প্রলেপ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রীটদ্বীপে এই জাতীয় যে সমস্ত পুঁতি বা অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে, তাহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ইহা কাচের গুঁড়া বা বালি একত্র মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া পরে পোড়াইয়া লওয়া হইত ;—

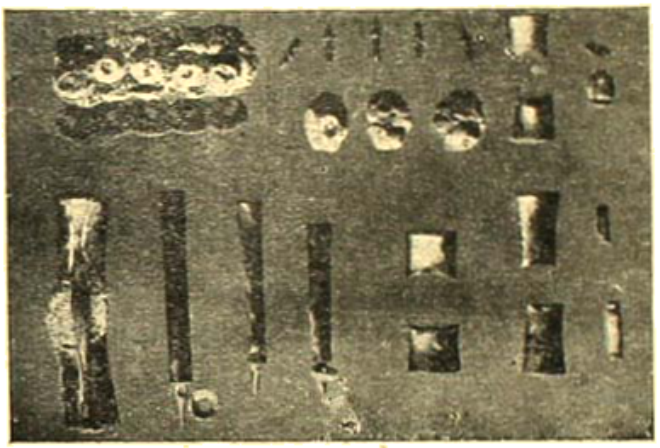

সুবর্ণ ও প্রবালের পুঁতি ও সোনার কলস

The very careful examination and analysis of various specimens of this glazed ware by Professor A. H. Church and Mr. Noel Heaton show that they represent a true faience technique. The material is almost pure sand and clay, and was moulded into shape. The true character of the manufacture appears from the fact that at times not only the surface but the whole composition of the objects consisted of vitreous paste. In that case they were intermediate between mere glazed ware and the moulded glass beads and plaques that came into vogue in Late Minoan & Mycenaean times

ভারতবর্ষে রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী কর্ত্তৃক হরপ্পা নামক স্থানে এইরূপ কাচনির্ম্মিত বলয় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু তখন তিনি ইহা তাম্রের যুগের নিদর্শন

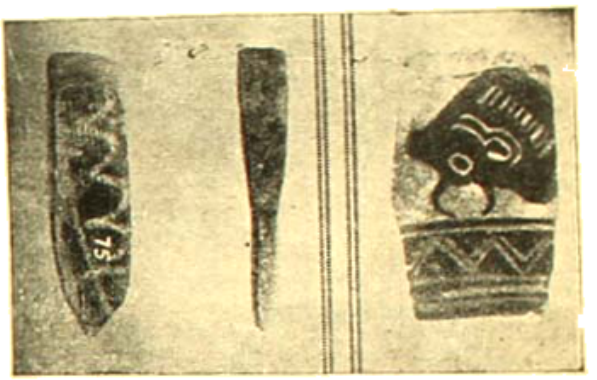

নালে আবিষ্কৃত বৃষমূর্ত্তিযুক্ত চিত্রিত ভাণ্ড

অথবা কাচের গুঁড়া-নির্ম্মিত অলঙ্কার বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। মুহেন-জো-দড়োতে এই জাতীয় পুঁতি, দাবা খেলিবার গুটী, ছোট ছোট পাত্র বা পেয়ালা, মানুষের মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পুঁতিগুলিতে উজ্জ্বল নীল-বর্ণের প্রলেপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাচের গুঁড়ার টুক্‌রা ভাঙ্গিয়া ছুরি দিয়া চাঁচিলে ইহা যে মাটী অথবা বিশুদ্ধ কাচ নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই জাতীয় কাচের গুঁড়া-নির্ম্মিত পদার্থ মুহেন্-জো-দড়ো এবং হরপ্পা ব্যতীত ভারত-বর্ষের আর কোনও স্থানে পাওয়া যায় নাই। তক্ষশিলা, রাজগৃহ, মথুরা, কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র, এমন কি,

ক্রীটদ্বীপের বক্রকণ্ঠ চিত্রিত পাত্র

সিন্ধুদেশের মীরপুরখাস বা খুল মীরস্ কন্ প্রমুখ অপেক্ষাকৃত

সুবর্ণের অলঙ্কার মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত

আধুনিক ধ্বংসাবশেষমধ্যেও পাওয়া যায় নাই। পাটলি-পুত্র-খননকালে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩ শত বৎসর পূর্ব্বের কাচের শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মিশ্র কাচের অর্থাৎ কাচের গুঁড়া ও মাটী মিশান পাত্র হরপ্পা এবং মুহেন্-জো-দড়ো ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। এই সকল কারণে বুঝিতে পারা যায় যে, কাচের গুঁড়া —ও—মাটী—মিশ্র নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষের তাম্রের যুগে উৎকর্ষের নিদর্শন।

তাম্রের যুগে আমাদের দেশে উৎকর্ষের আর একটি প্রধান নিদর্শন চিত্রিত পাত্র। মাটীর ভাঁড়ে চিত্র কিছু নূতন কথা নহে, ইতুপূজার ঘট, নব পত্রিকার ঘট, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ছাতিপালনার ঘট প্রভৃতি নানাপ্রকারে চিত্রিত ভাণ্ড ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। এই সকল চিত্র ভাঁড় পোড়াইবার পরে আঁকা হয়, কিন্তু তাম্রের যুগে চিত্রিত ভাণ্ড সে রকম নহে। তাম্রের যুগে ভাণ্ড দগ্ধ হইবার পূর্ব্বে এক, দুই বা বহু বর্ণের চিত্র আঁকিয়া তাহার পরে অগ্নিতে দেওয়া হইত।

এই জাতীয় চিত্রিত মৃৎভাণ্ড হরপ্পা গ্রামে রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি তাঁহার আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মুহেন-জো-দড়োতে বহু চিত্রিত মৃৎ-ভাণ্ডের খণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ায় এই জাতীয় পাত্র যে তাম্রযুগের সভ্যতার একটি প্রধান নিদর্শন, তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল এবং তখন হইতে হরপ্পার চিত্রিত মৃৎভাণ্ডের কদর বাড়িয়া গিয়াছে। ২২ বৎসর পূর্ব্বে বেলুচিস্তানের ঝালাওয়ান জিলার নাল নামক গ্রামে সোহর-ডাব নামক প্রাচীন সমাধির মধ্যে অনেকগুলি চিত্রিত মৃৎভাণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু তখনও আমাদের দেশের পণ্ডিতরা তাম্রের যুগের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না বলিয়া এই সমস্ত চিত্রিত মৃৎভাণ্ডের বিশেষ আদর হয় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে নালে খননকালে বহু চিত্রিত মৃৎভাণ্ড তাম্রের যুগের সমাধির মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কাশী-নাথ নারায়ণ-দীক্ষিত কতকগুলি অতি সুন্দর বহুবর্ণে রঞ্জিত চিত্রিত মৃৎভাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সমস্ত চিত্রিত মৃৎভাণ্ডের বিশেষত্ব এই যে, পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষের কোনও স্থানে এই জাতীয় মৃৎভাণ্ড আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা সুন্দর ও সুগঠিত এবং কখনও মৃৎভাণ্ডের গায়ের প্রলেপের উপর চিত্রিত এবং কখনও বা প্রলেপ ব্যতীত চিত্রযুক্ত। কতক-

মুহেন-জো দড়োর চিত্রিত ভাণ্ড

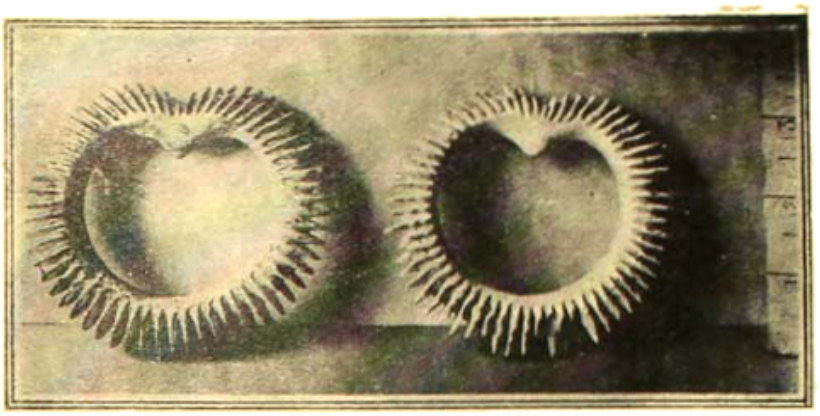

কাচের গুঁড়ার মালা, হরপ্পায় আবিষ্কৃত

গুলি চিত্রিত মৃৎভাণ্ড অগ্নের আবরণের ন্যায় পাতলা এবং তাহার ভিতরে বাতি জ্বালিয়া দিলে বাহির হইতে আলো দেখা যায়।

ভারতবর্ষের যে যুগে চিত্রলিপি, কাচের ও কাচের গুঁড়ার বাসন, অলঙ্কার ও চিত্রিত মৃৎভাণ্ড ব্যবহৃত হইত, সে যুগের মানুষ বহুমূল্য মণিরত্ন এবং সুবর্ণের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে জানিত। পলা বা প্রবাল, গজদন্ত, রক্তপ্রস্তর প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন দ্রব্য কাটিয়া মালা গাঁথিবার জন্য কেমন করিয়া পুঁতি তৈয়ারী করিতে হয়, তাহা তাহারা বুঝিত। নব্য প্রস্তরের যুগে গজদন্ত লম্বা করিয়া কাটিয়া পরে গোল করিয়া তাহার পরে ঘষিয়া যে প্রকারে মালার দানা বা পুঁতি তৈয়ারী করা হইত, তাহার নিদর্শন করাসী দেশে দোর্দ্দোন প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। (The Ancient Hunter, by W. G. Sollas, London 1924 pp. 365—67, Fig. 178,) ক্রীটদ্বীপে ও মিশরদেশে ঠিক এই রকম করিয়াই কঠিন প্রস্তর হইতে পুঁতি বা মালার দানা কাটা হইত। তাম্রের যুগে ভারতবর্ষের মণিকারেরা প্রবাল, রক্তমণি, নীলমণি এবং নানাবিধ বহুবর্ণের প্রস্তর কাটিয়া প্রথমে লম্বা ও পরে গোল করিয়া যেমনভাবে পুঁতি বা মালার দানা তৈয়ারী করিত, তাহার নিদর্শন মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণ বা সোনার ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, তখন এই ধাতু এখন হইতে সুলভ ছিল, কিন্তু রূপা মুহেন-জো-দড়োতে বা হরপ্পায় অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় নাই। অলঙ্কারনির্ম্মাণকালে অনেক বহুমূল্য প্রস্তর ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে হীরা, চুণি, পান্না বা মুক্তা পাওয়া যায় নাই। প্রবাল ও কর্ণেলিয়ান প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

তাম্রের যুগে ভারতবাসী পাথর কাটিয়া মূর্ত্তি বা প্রতিমা তৈয়ারী করিতে জানিত। মুহেন-জো-দড়োতে যে দুই চারিটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, তাম্রের যুগের ভারতবাসীর সহিত এখনকার ভারতবাসীর আকারগত কোনই সাদৃশ্য নাই। দুই একটি মূর্ত্তিতে যে গাত্রবস্ত্র আছে, তাহা এখনকার "আলেওয়ালের" মত; ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বয়ন-শিল্প প্রচুর উন্নতিলাভ করিয়াছিল। একটি বড় পাথরের মূর্ত্তিতে যে গাত্রবস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হয় আলেওয়ালের মত বোনা অথবা 'বুন্দাবনীর" মত ছাপা। মুহেন-জো-দড়ো বা হরপ্পাতে যে দুই এক টুকরা কাপড় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মাটী হইতে তুলিতে পারা যায় নাই। কারণ, টানা ও পোড়েন

নালে আবিষ্কৃত চিত্রিত কৌটা

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—মাটি হইতে গিয়াছিল। তাহাদের যুগে ভারতবাসীর অনেক দূর হইতে সিন্ধু দেশে রেলপথে লইয়া আসিয়া ছোট ছোট থান, ব্রোঞ্জের নালি ও নানাবিধ বাসন তৈয়ারী করিত। তাহারা তামের পাত্রও অল্প ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু তাহাদের বড় লোকরা

নালে আবিষ্কৃত চিত্রিত ভাণ্ড

লিখিবার সময় সোনার কলম ব্যবহার করিত। এই সমস্ত কলম উড়িয়ার তালপাতে লিখিবার লোহার কলম এবং প্রাচীন রোমের মোমের উপরে লিখিবার কলম বা Stylusএর ন্যায়।

যে সমস্ত শিলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখন হইতে অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হস্তী, বাঘ্র ও গণ্ডার সিন্ধুদেশের লোকের নিকট সুপরিচিত ছিল। কিন্তু গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে এই তিনটি চতুষ্পদ সিন্ধুপ্রদেশের লোকের নিকট একবারে অপরিচিত।

মুহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পা তাহের যুগের উৎকর্ষের যে

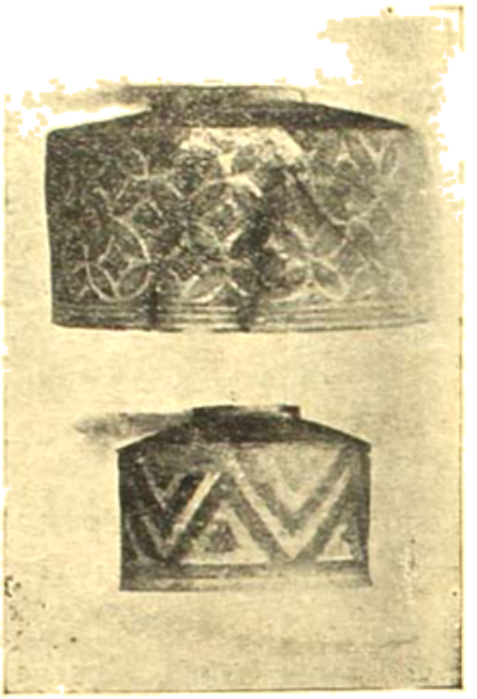

নালে আবিষ্কৃত বক্রকণ্ঠ চিত্রিত ভাণ্ড

সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সে যুগের ভারতবাসী ঋগ্বেদসংহিতা যুগের আর্য্যজাতি হইতে অনেক উন্নত ছিল, তাহারা গোচারক আর্য্যগণ অপেক্ষা ধনী এবং জ্ঞানী ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদিক সাহিত্যে যে আদা পনিজাতির উল্লেখ আছে, তাহের যুগের ভারতবাসীরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু এই কথা প্রমাণ করিবার কোনও উপায় এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়িনী

২

ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্!—ঝম্ ঝম্ ঝম্!—মেঘমেদুর শ্রাবণ-গগন ভেদ করিয়া অবিশ্রান্ত বারিধারা তৃষ্ণার্ত্ত ধরণীর বুক ভরিয়া পড়িতেছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য-হীন বর্ষণলীলা হৃদয়-মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। আর ভাল লাগিতেছে না।

স্ফটিক-স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে ডাকাসুন্দরীর দেহ-নিষিক্ত কনককান্তি তরলাধার ফেণপুঞ্জিত হইয়া উঠিল। নিয়মিত তৃতীয় পাত্র নিঃশেষপীত রাখিয়া সিগার ধরাইয়া লইলাম। যৌবনের অপরাহ্ণে সন্ধোপনে যাহাকে জীবনসঙ্গিনীর পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম, সে কখনও আমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নাই। ক্রীতদাসীর ন্যায় সে আমার তুষ্টি-বিধান করিয়াই আসিয়াছে, অথচ লোক-সমাজে এক দিনের জন্যও আমাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে নাই—আমার সুনাম ধূলাবলুণ্ঠিত করিবার জন্য কোনও দিন তাহার 'আবদার' আত্মপ্রকাশ করে নাই। এ জন্য তাহাকে আমি বড় ভালবাসি।

সারাদিন বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারি নাই, দশাশ্বমেধ ঘাটে নিত্যস্নান আজ বন্ধ ছিল। সে জন্য দুঃখ নাই; কিন্তু স্নানার্থিনী তরুণীদিগের যৌবন-সুষমা, বিচিত্র লীলায়িত গতিভঙ্গীর মাধুর্য্যদর্শনে তৃষিত নেত্রযুগল আজ বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, ইহারই জন্য আজিকার বর্ষাকে অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

কিন্তু এখন বৃষ্টি থামিয়া আসিতেছে না?—বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কাহার মায়াদণ্ড স্পর্শে ঘনকৃষ্ণ মেঘজাল সত্যই অন্তর্হিত হইয়াছিল। ও কি! শুক্লপক্ষের চাঁদ পর্য্যন্ত আকাশে দেখা দিয়াছে! পশ্চিমের আকাশে এমন হয় বটে।

"বাবু সাব্! কেমন আছেন?"

রঘুবীরের দীর্ঘদেহ দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। কাশীধামে এই ব্যক্তি আমার বিশেষ বিশ্বাসভাজন। যখনই এখানে আসিয়াছি, রঘুবীর আমাকে নানাভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছে। বাঙ্গালীর সাহচর্য্যে আসিয়া লোকটি বাঙ্গালাভাষায় চমৎকার কথা বলিতে শিখিয়াছিল। সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং কার্য্য-কুশলতার জন্য ইহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসিতাম। প্রায় বিশ বৎসর ইহার সহিত আমার পরিচয়। আমার অগাধ ঐশ্বর্য্যের কাহিনী ইহার নিকট গোপন ছিল না। অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেশবিদেশে সুখের সন্ধানে আমি দীর্ঘকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এ সংবাদ সে রাখিত এবং আমি সে নারী-সৌন্দর্য্যের একান্ত ভক্ত, সে জন্য সে প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কোনও দিন আমার নিন্দা করিয়া বেড়ায় নাই। বরং উৎসাহ সহকারে সে আমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিত। প্রচুর অর্থদানে আমিও তাহাকে প্রসন্ন রাখিতাম।

"বাবুজি! আজ বড় বাদল?"

"হাঁ, রঘুবীর, মেজাজটা আই ভাল নেই।"

"আকাশ বেশ ধরে গেছে, একটু বেরুবেন না কি?"

চন্দ্রালোকে কাশীধাম হাসিয়া উঠিয়াছিল। শ্রাবণের আকাশকে বিশ্বাস করা যায় না সত্য; কিন্তু সহসা বৃষ্টি আসিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতেছি। বেড়াইবার জন্য মনটা ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

"চল, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে যাওয়া যাক্।"

রঘুবীর প্রস্তুত হইল। প্রসাধন সারিয়া লইলাম। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে বেশের পারিপাট্য ও প্রসাধনে যে মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়াছিল, এখনও তাহা অব্যাহত আছে। সৌন্দর্য্যচর্চ্চা যে সভ্য মানব জাতির একটা বিশেষ লক্ষণ, তাহা আমি কায়মনো-বাক্যে বিশ্বাস করি। সর্ব্বদা সুন্দর, সলজ্জ থাকাই কর্ত্তব্য। অসুন্দরকে কেহ দেখিতে পারে না; সুন্দরকে সকলেই

ভালবাসে। শুনিয়াছি, ভগবান চিরসুন্দর, চিরনবীন। বয়সে মানুষ বুড়া হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত আমি সৌন্দর্য্যের পূজা করিয়া চলিব।

কাশী বড় চমৎকার স্থান। বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে, অমনই দলে দলে দর্শনার্থীরা দেবমন্দিরে চলিয়াছে। ভক্তিপ্রবণ হিন্দু নরনারীকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সত্য বলিব, ভক্তি-নত হৃদয় লইয়া আমি বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাইতেছি না। আমি হিন্দু, হিন্দুর পূজা অর্চ্চনায় আমি অবিশ্বাস করি না—আমার কলিকাতার পৈতৃক বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইয়া থাকে, আমিও পূজাক্ষেত্রে উপস্থিত থাকি, কিন্তু ভগবানে ভক্তি? তাহা এ পর্য্যন্ত আমার মানসক্ষেত্রে, সহস্রদলে ফুটিয়া উঠে নাই। আমি সৌন্দর্য্যের পূজারী, শুধু তাহারই সন্ধানে চলিয়াছি। দেবতার মন্দির—চির-সুন্দরের লীলাভূমি, সেখানে সৌন্দর্য্যের অভাব কখনই থাকিবে না।

'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্! মহাদেও শঙ্কর!'—মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দর্শনার্থীর সংখ্যা কম নহে—বেশ ভীড় হইয়াছে। তখন বিশ্বনাথের আরতি আরম্ভ হইয়াছিল। রঘুবীর পাণ্ডাদিগের অন্যতম। সে আমাকে একটি ভাল জায়গায় দাঁড় করিয়া দিল। দর্শকের দল মুগ্ধ-নেত্রে বিশ্বনাথের দেশবিশ্রুত আরতি দেখিতেছিল। বিশ্বেশ্বরের বন্দনাগান মন্দির-প্রাঙ্গণের সীমা ছাড়াইয়া চন্দ্রা-লোকিত গগনপথে উত্থিত হইতেছিল। মুহূর্ত্তে আমারও হৃদয় যেন আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু বন্দনাগান শুনিবার জন্যই ত আমি আসি নাই। আমার রূপপিপাসু অন্তর, নূতন সৌন্দর্য্যের আধার অন্বেষণ করিতেছিল।

কে ঐ তরুণী?—চমৎকার! বাস্তবিক এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী দীর্ঘকাল কোথাও দেখি নাই! কাশীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিলাসভ্রমণ কত বারই ঘটিয়াছে। শত শত বিভিন্ন জাতীয় সুন্দরীর সংস্পর্শে আসিয়াছি; কিন্তু এমন গঠনভঙ্গী, এমন রূপ-মাধুর্য্য, এমন লীলায়িত যৌবন হিল্লোলের একত্র সমাবেশ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না! আমার রূপপিপাসু চিত্তের বিনোদনের জন্যই কি ভাগ্যচক্র এই তরুণীকে আমার নয়নপথে আনিয়া দিল? 'তন্বী, শ্যামা শিখরিদশনা' এ সকল বর্ণনা শুধু কাব্যেই লিখিত হয় না, জীবনে দেখিয়াছি, উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু ঐ স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় রূপবতী, অমন আয়ত লোচনের রসরাগোজ্জ্বল দৃষ্টি, দেহ-লতিকায় এমন অনবদ্য যৌবন-সুষমা সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। নয়ন মুগ্ধ হইল, লুব্ধ চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। আমার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও কি ইহাকে লাভ করা যাইবে না?

রঘুবীর পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমার দৃষ্টি দেখিয়াই বোধ হয় আমার অন্তরের কথার আভাস পাইয়াছিল।

আরতি শেষ হইলে তরুণী যুক্তকরে দেবতাকে প্রণাম করিয়া সঙ্গীদিগের সাহায্যে ভীড় হইতে বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল। দেখিলাম, তাহার ললাটে, সীমন্তে সিন্দূরের চিহ্নমাত্র নাই।

চত্বরে নামিয়াই রঘুবীরকে সন্ধান লইতে বলিলাম। যদি অর্থের প্রয়োজন হয়? রঘুবীর জানাইল, সে পরে চাহিয়া লইবে।

কিন্তু শেষে ব্যর্থকাম হইলে চলিবে না। যেমন করিয়াই হউক, তরুণীকে হস্তগত করা চাই।

রঘুবীর বলিল, "যেমন করেই হোক্, বাবুজী?"

না, না, বল-প্রকাশের দ্বারা নহে। জীবনে কাহারও প্রতি বলপ্রকাশ করি নাই। আমি সুন্দরের পূজারী। বল-প্রকাশ—পাশব শক্তির প্রকাশে সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য রস নষ্ট হইয়া যায়। আমি বলের ভক্ত নহি।

কল্য সন্ধ্যার মধ্যে রঘুবীর সংবাদ লইয়া জানাইবে প্রতি-শ্রুতি মিল।

জনতার মধ্যে রঘুবীর অন্তর্হিত হইল। একাকী বাসায় ফিরিলাম।

২

আজও আকাশে মেঘ জমিয়া আছে, কিন্তু বৃষ্টি নাই।

আমারও অন্তরাকাশ মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। আজ সর্ব্বপ্রথম আমার জীবনে ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা অনুভব করিলাম। রঘুবীর বলিয়া গিয়াছে, কোন আশা নাই। তরুণী ধনী পিতার সন্তান—কুমারী; এখনও বিবাহ হয় নাই। তবে আমাদের স্বজাতীয়া।

বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম, লর্ড মারল্‌বরো বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক মানুষকেই ক্রয় করা যায়, মূল্য বেশী আর কম। জীবনেও তাহার যাথার্থ্য শত শত বার পরীক্ষিত হইয়াছে। রঘুবীরকে বলিয়া দিয়াছি, তবে বিবাহই করিব। এই

সুন্দরীকে আমার প্রয়োজন। যদি সকল উপায় ব্যর্থ হয়, তবে বিবাহ-বন্ধনেই তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে। আমার মত পাত্রে কন্যাদান কি প্রার্থনীয় হইবে না?

বিদ্যা?—তাহা কি আমার নাই? কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম্, এ। তাহার উপর সারা জীবন ধরিয়া য়ুরোপীয় সাহিত্য মন্থন করিয়া আসিতেছি। রসজ্ঞ—সাহিত্য-রসিক বলিয়া কলি-কাতার সমাজে সুনাম ত আছে।

অর্থ?—তাহার অভাব কোথায়? কলিকাতার কোন সুপ্রসিদ্ধ এটর্নীর একমাত্র সন্তান। মৃত্যুকালে পিতা যাহে ৩০ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুদে আসলে তাহা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাহা ছাড়া বৎসরে ৫০ হাজার টাকা মুনাফার বিস্তৃত জমীদারী এবং মাসিক ৬৭ হাজার টাকা শুধু বাড়ীভাড়া হইতেই আসিয়া থাকে। পৈতৃক এটর্নীর ব্যবসার ভাগে অপর অংশীর তত্ত্বাবধানে চলিয়া আসিতেছে। তাহাতেও লাভের অংশ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

যশঃ?—তাহা ত প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়াই জানি। কোনও চাঁদার খাতা কখনও শুধু ফিরাইয়া দেই নাই। বাঙ্গালার যাবতীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানে বিনয়কুমার চৌধুরীর ধনভাণ্ডারের সংস্রব আছেই।

রূপ?—যৌবনের গৌরকান্তি ভোগায়তন দেহে লুপ্ত হইবার কখনই অবকাশ পায় নাই। সৌন্দর্য্যকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য আজীবনের প্রচেষ্টা এখনই ব্যর্থ হইবে? তার পর যৌবনের উত্তেজনা—এখনও দেহে প্রচুর শক্তি এবং মনে অক্ষুণ্ণ উৎসাহ বিদ্যমান।

সৌন্দর্য্যের পূজারী, সুখের উপাসক আমি, সে কথা সত্য; কিন্তু বুদ্ধির প্রাধর্য্য ও অর্থের প্রাচুর্য্য মানুষের সুশৃঙ্খল ব্যভিচারকেও জনসমাজে তেমনভাবে প্রচারিত হইতে দেয় না। অবশ্য নিন্দকের রসনাকে কেহ চাপিয়া রাখিতে পারে না, তবে অনেক ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ ছাড়া অপরে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই আমি নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষপাতী, এ জন্য পরিচিতের সংখ্যা বহু হইলেও, আমার বন্ধু-বান্ধব ছিল না বলিলেই চলে। সুতরাং ব্যবহারিক জগতে আমার অনাদর হইবার কথা নহে।

সন্ধ্যা আলবোলায় তামাকু সাজিয়া দিয়া গেল। কুণ্ডলী-কৃত ধূমরাশির সঙ্গে অন্তরের মেঘকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রঘুবীর সেন কি জবাব লইয়া আইসে, দেখা যাউক। আমার নাম ধাম প্রকাশ করিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছি। শুধু গুণগ্রাম ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় শুনিয়া যদি চারে মাছ আসে, তাহার পর আত্মপ্রকাশ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। নহিলে অহেতুক আত্মপরিচয় দিয়া নিন্দকের সমালোচনার প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নহি। এমনই কৌশল সহকারে জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছি বলিয়াই আমি জনসমাজের শ্রদ্ধা হারাই নাই।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ভৃত্য আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল। একখানি বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলাম। মন বসিতে চাহিতেছে না।

বিবাহ?—এতকাল পরে আবার বিবাহ-বন্ধনের মায়া-জালে বদ্ধ হইবার বাসনা প্রবল হইল! প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের একখানি লাবণ্য-চলচল সুন্দর মুখের ছবি মনে পড়িল। সতের বৎসর তাহার সহিত একত্র বসবাস করিয়াছিলাম। আমি কি তাহাকে ভাল বাসিতাম? বলিতে পারি না। কিন্তু আমার ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য ও ভোগবিলাসের মধ্যেও তাহার সেবাপরায়ণ পবিত্র হৃদয়ের মাধুর্য্য ও একাগ্রভক্তির প্রবাহধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তাহা উপলব্ধি করিতাম।

বিবাহের এক বৎসর পরে, পিতা ও মাতা ছয় মাসের ব্যবধানে ইহলোকের সংস্রব ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তরুণী পত্নীকে সেই বয়সেই গৃহিণীর আসন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমার সৌন্দর্য্যপিপাসু হৃদয়, সুখপ্রয়াসী চিত্ত, পৈতৃক বাসভবনের কোলাহলের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাই চৌরঙ্গীতে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া পত্নীসহ তথায় নির্জ্জনবাস করিতে গিয়াছিলাম। ক্রিয়াকলাপ পৈতৃকভবনেই হইত; সেই সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্ব-পুরুষগণের নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা মত কাষ করিয়া যাইতাম।

২৩ বৎসর বয়সে কন্যাসন্তানের পিতা হইলাম। উহাই প্রথম এবং উহাই শেষ। গৃহিণী আর সন্তানের জননী হন নাই। আমার গৃহের নির্জ্জনতার সুখ সুতরাং বহু পুত্র কন্যার উপদ্রবে অন্তর্হিত নাই। ভাদ্রের কূলভরা নদীতে পাল তুলিয়া সুখের তরী তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছিল।

ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ধনী পিতার শিক্ষিত সন্তান—ব্রহ্মদেশে কোন ডিষ্ট্রীক্টের এঞ্জিনিয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কন্যা সেই-খানেই চলিয়া গিয়াছিল। সন্তানসম্ভবা কন্যা দুই বৎসর পরে গৃহিণীর কাছে ফিরিয়া আসিয়াছিল। পুত্র কোলে লইয়া সে স্বামীর কাছে চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই গৃহিণী অকস্মাৎ মহাপ্রস্থান করেন। নির্জ্জনতাপ্রয়াসীর সকল স্নেহবন্ধনই ঘুচিয়া গেল। মহা সমারোহে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছিলাম। সেই শোক-সম্মেলনে সপুত্র কন্যাও আসিয়াছিল।

ব্যস্, তার পর মহামুক্তি! বন্ধনহীন জীবন ভোগ-সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছে। অনেকে পুনরায় বিবাহ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। কন্যাদায়গ্রস্ত বহু পিতা আমার দ্বারস্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু কে এমন নির্ব্বোধ আছে যে, বন্দি-দশা হইতে মুক্তি পাইয়া স্বেচ্ছায় আবার কারাজীবনকে বরণ করিতে চাহে?

মন যখন যাহা পাইতে চাহে, অবাধে করিয়া যাও। বাধা দিবার কেহ নাই—কৈফিয়তের দাবী কেহ করিবে না। এমন মুক্তজীবনকে কেহ শৃঙ্খলিত করিতে চাহে?

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিদর্শনের সুযোগ পাইয়া ধন্য হই-য়াছি। মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়া কিছুদিন থাকিবার পর আবার বাহির হইয়া পড়ি! মাঝে মাঝে কন্যা পত্র লিখিত, তাহার ওখানে আমি কেন যাই না। সে পত্রে কাতর রব যথেষ্ট থাকিত; কিন্তু আমি যে সুখপথের যাত্রী, তাহাতে কন্যার ওখানে কি যাওয়া পোষায়? না, তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকাই আমার বাঞ্ছনীয়। প্রথম প্রথম দুই একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম; তাহার পর আর পত্রের উত্তর দিতাম না। অনেক সময়, বহু বিলম্বে তাহার পত্র হস্তগত হইত। প্রায়ই আমি বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছি।

দেখিবার বাসনা?—না, সত্যই বলিব। কোনও দিন কন্যাকে স্নেহভরে কাছে ডাকি নাই। বালক কাল হইতে আমি শিশুদিগকে এড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং কন্যাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ আমার ছিলই না। ভাল আছে—সুখে আছে, যথেষ্ট।

আকাশের মেঘমালার মধ্যে বুঝি ইন্দ্রজাল আছে! নহিলে আজ যত পুরাতন স্মৃতি মনে আসিতেছে কেন? ইহা কি মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, না আর কিছু? কই নিয়মিত তিন পেয়ালার অধিক ত পান করি নাই? তবে?

বাতায়নপথে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম। অন্ধকার আকাশপথে ও কাহার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে! বিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই প্রেমপূর্ণ, ভক্তিবিহ্বল আনন মমতাভরা, দীর্ঘ, দীপ্ত নয়নযুগল! মৃদু হাস্যরেখা রক্তাধরে ফুটিয়া উঠিতেছে। পুনরায় বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি বলিয়া কি এই হাসি? বিবাহ ত একটা পবিত্র সামাজিক বন্ধন। সে বন্ধনের পবিত্রতা স্বীকার না করিয়াও এত কাল ধরিয়া নানা কামিনীকে তোমার আসনে বসাইয়া আসি-য়াছি, কই তখন ত তোমার মূর্ত্তির প্রকাশ দেখি নাই?

কিছু না, কিছু না—সদা, তামাক দিয়ে যা।

রাত্রি কত? মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে চাহিলাম। না, বেশী রাত্রি হয় নাই।

"বাবুজি!"

চমকিয়া উঠিলাম। রঘুবীরের কণ্ঠস্বরে এমন নৈরাশ্যের বেদনা কখনও ধ্বনিত হইতে শুনি নাই।

"কি খবর, রঘু?"

"ভাল না, হুজুর।"

জোরে আলবোলার নলে টান দিলাম। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বল্‌লেন তাঁরা?"

"সে কথা না শোনাই ভাল—তাঁরা কাল সকালের গাড়ীতেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন।"

বিনয়কুমার চৌধুরী! অর্থ, সম্ভ্রম, যশঃ, প্রতিপত্তি—কিছুই আজ কাযে লাগিল না? প্রত্যাখ্যান আজ সব ভাসাইয়া দিল?

৩

শয্যাত্যাগ করিয়া যখন উঠিলাম, রৌদ্রে স্নান ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সারা রজনী নিদ্রা যাইতে পারি নাই—ভোরের দিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সদা, তামাক দিয়া গেল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বেলা প্রায় দশটা বাজে। গঙ্গাস্নানে যাইতে হইবে; কিন্তু আজ যেন কোন উৎসাহ, কোন আগ্রহ, কোন সঙ্কল্পই নাই।

বড় ডাকঘর হইতে আমার লোক প্রত্যহ চিঠি-পত্র লইয়া আসিত। টেবলের উপর আজিকার ডাক পড়িয়াছিল। অন্যমনস্কভাবে চিঠিগুলি তুলিয়া লইলাম। একখানা পত্রের শিরোনামার নীচে ঠিকানা কাটিয়া লেখা। পত্রখানি অনেক ঘুরিয়া আসিয়াছে—ডাকঘরের অনেকগুলি ছাপই তাহার পরিচয়। কাশী আসিবার পূর্ব্বে কিছু দিন লক্ষ্ণৌএ ছিলাম। সেখানকার ডাকঘরে আমার কাশীর ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলাম। এ কাহার পত্র? এমন হস্তাক্ষরের সহিত আমি পরিচিত নহি। বেশ স্পষ্ট করিয়া মেয়েলী ছাঁদে ইংরাজীতে শিরোনামা লেখা। বার কয়েক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া খাম ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।—এ কে লিখিয়াছে?—

"দাদু!"—এ সম্বোধনের মধ্যে চমৎকার মাদকতা আছে দেখিতেছি!

কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। পত্রের ভাষার মধ্যে যেন একটা নূতন—সম্পূর্ণ অভিনব সুরের আভাস পাইলাম।

"দাদু,

তুমি আমাকে কখনও দেখ নাই—আমিও তোমাকে দেখি নাই। তুমি আমার মা'র বাবা, আমার পূজনীয়, তোমাকে আপনি বলিলে হয় ত শোভন হইত। কিন্তু মন বলিল, না।

মার কাছে, বাবার কাছে তোমার কথা প্রায়ই শুনি। তুমি আমার দাদু; কিন্তু দাদু যে কেমন, তাহা ত এত দিনে জানিতেও পারিলাম না। দিদিমণি চলিয়া যাইবার পর হইতেই তুমি না কি সন্ন্যাসীর মত দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? মার পর্য্যন্ত কোন খোঁজ লও না। পত্র লিখিলেও উত্তর দাও না। অথচ মা তোমার একমাত্র সন্তান! আমার অনেক সময় ইচ্ছা হইত তোমায় পত্র লিখি; কিন্তু অভিমান আসিয়া বাধা দিত। কেন? যে দাদু, তাঁহার নাতি, নাতিনী, মেয়ে জামাইয়ের কোন সংবাদ লন না, যাচিয়া কেন তাঁহার কাছে পত্র দিব? কিন্তু এতকাল পরে, আজ না লিখিয়া পারিলাম না। খুব গোপনে এ পত্র লিখিতেছি। মা, বাবা কেহ জানেন না।

দাদু, শুনিয়াছি তুমি না কি বড় সুন্দর! মা না কি দেখিতে তোমার মত? হাঁ দাদু, তুমি কি আমার মার মত এত সুন্দর? মাকে সকলে জগদ্ধাত্রীর মত সুন্দরী বলেন। তোমার ফটো মার কাছে আছে। তাতে তোমায় শুধু চেহারা দেখি। যন্ত্র ত রূপের ছবি তুলিতে পারে না!

তুমি আমাদের ভুলিয়া আছ; কিন্তু আমরা তোমাকে ত ভুলিতে পারি না। আমাদের ত আর দু'টা দাদু নেই! তোমার সঙ্গে সারাজীবন আড়ি করিয়াই চলিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু আজ পারিলাম না। কারণ আমরা কলিকাতায় যাইতেছি। বাবা ৮ মাসের ছুটী লইয়াছেন। কলিকাতায় আমাদের বাড়ী ঠিক হইয়াছে। শ্যামবাজারে ৯নং—ষ্ট্রীট। না, তোমার বাড়ীতে আমরা কখনই যাইব না। তুমি ত কখনও আমাদের ডাক নাই; কেন যাইব? তবে তোমাকে দেখিতে বড় সাধ, সেটা লুকাইব না। যদি সাধিয়া না লইয়া যাও, কখনও যাইব না।

তুমি ত কোন খবর লও না, লইবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু একটা সুখের সংবাদ দিয়া রাখি। আমার দাদা তোমার মত লেখাপড়া শিখিয়াছে। এবার সে এম্, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

খুব হয় ত বিরক্ত হইতেছ? গায়ে-পড়া মেয়েটাকে শাস্তি দিবার সাধও বোধ হয় তোমার হইতেছে। সবাই আমাকে মুখরা বলে। তা কি করিব, সত্য কথা বলিতে আমার কখনও ভয় হয় না।

প্রণাম দিলাম, লইবে কি না জানি না। যদি সত্যই রাগ হইয়া থাকে, দুষ্ট রমাকে ক্ষমা করিও। ইতি"

দ্রুত তালে, নৃত্যচ্ছন্দে হৃদয়ের উপকূলে এ কাহারা আসিয়া দাঁড়াইল? অনেক উপন্যাস, কাব্য পড়িয়াছি, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব উন্মাদনা কোনও গ্রন্থের বর্ণনা পড়িয়া পাই নাই। বাঃ! বাঃ!—একটা নূতন সুর, অভিনব বাজনা! তুমি রমা? আমার একমাত্র সন্তানের কন্যা তুমি কেমন,—দেখিতে হইবে।

হাঁ, আজ এই নানাসুখপ্রয়াসী চিত্তকে তুমি যেন একটা অপরিচিত আনন্দরাজ্যের বার্ত্তা—আভাস আনিয়া দিতেছ!

আমার কন্যা উমার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল দেখিয়াছি। তারপর আবার সন্তান হইয়াছে? এই রমার জন্মের কথা ত শুনি নাই! না, সে জন্য দোষ দিব কাহাকে?

ওঃ! সে কত যুগের কথা!

শুধু স্বপ্ন—বিস্মৃতপ্রায়, স্বপ্নে দেখা চিত্রপট ধীরে ধীরে কেন আর খুলিয়া খুলিয়া তুলিয়া ধরিতেছে? কিন্তু—

দাঁড়াও! ভাবিয়া দেখি।—আমি বিনয়কুমার চৌধুরী, দশ লক্ষ টাকার মালিক। টাকার বস্তা খুলিয়া ছিনি-মিনি খেলিতে পারি! আজ রৌদ্রালোকিত কাশীধামের এই সুপ্রশস্ত কক্ষে বসিয়া কখনই স্বপ্ন দেখিতে পারি না। বাস্তব জীবনের রূপ, রস, আমোদ-প্রমোদ যে ব্যক্তি নিয়ত উপভোগ করিয়া আসিয়াছে—বাসনার তৃপ্তিসাধনে যে কদাচিৎ ব্যর্থতার দেখা পাইয়াছে, সে অলীক স্বপ্ন দেখে না। তবে?

কিন্তু 'দাদু';—কি মিষ্ট এই সম্বোধন! মিথ্যা বলিব, অফুরন্ত সুখ—আনন্দ ও মাধুর্য্যের রসসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে!

হে অপরিচিতা, হে মাধুর্য্যময়ী! অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি! জীবনের এই অপরিচিত, অপঠিত অধ্যায়ের পাঠ লইতে হইবে!—

"বাবু সাব্। আজ এখনও স্নানে যান নি?"

স্থির দৃষ্টিতে রঘুবীরের দিকে চাহিলাম। সে আমার বাল্যসঙ্গী এবং প্রিয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ঠিক এই সময়ে সে না আসিলেই ভাল হইত।

আলবোলার নলে জোরে টান দিলাম। অগ্নি অনেকক্ষণ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

"কি খবর, মিশিরজী!"

"ভাল খবর, বাবু সাব! গণেশ মহল্লায়—ভারী খাপসুরৎ—"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

"এখন ও-কথা থাক্, মিশিরজী—গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি।"

রঘুবীরের বিস্ময়-বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, তোমার ছেলে মেয়ে আছে, পাণ্ডাঠাকুর?"

"আছে বৈকি, বাবুজী। দুই মেয়ে, ছেলে নেই।"

"নাতি, নাতিনী আছে?"

"পাঁচটি নাতি-নাতিনী—তারাই আমার সব। তাদের নিয়েই দুঃখ-ধন্দা করে বেড়াই, বাবু সাব!"

রঘুবীরের দীর্ঘশ্বাস কি আমার বক্ষপঞ্জরে গিয়া আঘাত করিল?

নাঃ, রূপ ও রূপার বাহাদুরী আছে! শঙ্করাচার্য্য! তোমার মোহমুদ্গর শুধু শব্দের ঝঙ্কার তুলিয়া লোকের ছন্দের ধাই নির্ব্বাসিত হইয়া থাকিবে। মানুষ তোমার নীতিজ্ঞানের নীরস তত্ত্ব মানিতে চাহে কি?

"বাবু সাব, আপনার তবিয়ত আজ ভাল নেই? ভাল ঘুম হয়নি বুঝি?"

"হাঁ, মিশিরজী।—এখন একটু নিরিবিলি থাকতে চাই।"

রঘুবীর উঠিয়া দাঁড়াইল।—"আচ্ছা, আপনি স্নান করে আসুন। আমি বিকাল বেলা আস্‌ব।"

"দাঁড়াও, রঘুবীর।—"

ট্রাঙ্ক খুলিয়া একশত টাকার দশখানা নোট পাণ্ডার হাতে দিয়া বলিলাম, "আজ বিকেলে আমি কলিকাতায় যাচ্ছি। টাকাটা তোমার নাতি নাতিনীদের দিলাম। ভাল কাপড় চোপড় কিনে দিও।—আচ্ছা এস।"

হস্তসঙ্কেত দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও রঘুবীর বাহিরে চলিয়া গেল। আমার প্রকৃতির সহিত তাহার পরিচয় ছিল।

হাঁ, স্নান সারিয়া একবার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইতে হইবে।

৪

পল্লীর নব তৃণ-হরিৎ-শ্যাম-শোভা সৌধ-কিরীটিনী কলিকাতার সুপরিষ্কৃত, শৃঙ্খলিত দেহে না থাকিলেও কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"নমো নমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর শান্ত সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!"

উদ্দাম উচ্ছ্বাসে সারা ভারতবর্ষে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—এমন কতবার! কিন্তু যখনই বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছি, মনে হইয়াছে বুঝি এমন মনোহারিণী ভূমি আর কোথাও নাই। আজও ফিরিয়া মনে হইল, বুঝি স্বর্গধামে প্রবেশ করিতেছি। কিন্তু আবার কয়দিনেই বিরক্তি আসিবে, ইচ্ছা হইবে সব ছাড়িয়া আবার সমুদ্রের কূলে, হিমালয়ের অঙ্কে, বিন্ধ্যগিরির শৃঙ্গে ফিরিয়া যাই। কিন্তু যেখানেই যাই না কেন, অদৃশ্য আকর্ষণে আবার শ্যামা মায়ের বুকে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করি। এমন কতবার ঘটিয়াছে। কেন, জানি না।

সমগ্র অন্তর আজ যেন আকুল, অধীর হইয়া উঠিয়াছে—এমন অধীরতা জীবনে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করিয়াছি কি? ভিতর হইতে কে বা কাহারা যেন অনুক্ষণ ঠেলা দিয়া বলিতেছে—ওঠ, ওঠ! চল্, চল্! কে যেন হাতছানি দিয়া

ডাকিতেছে, আয় আয়। বাতাসে কাহার মধুর কণ্ঠ যেন শত সঙ্গীতের সুরে বলিতেছে—দেখ, দেখ!

বাড়ীখানা পূর্ব্বের মতই সযত্ন-রক্ষিত। ম্যানেজার এ বিষয়ে আমার আদেশ সকল সময়েই পূর্ণমাত্রায় পালন করিয়া থাকেন। আমি কখন ফিরিব, তাহা কাহারও জানা থাকে না। কিন্তু শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যের সম্মানরক্ষায় আমার কি খরদৃষ্টি, তাহা আমার কর্ম্মচারীদিগের অবিদিত ছিল না।

প্রত্যেক কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে। উদ্যানে একটিও অতিরিক্ত তৃণগুল্ম নাই। সমস্ত অট্টালিকা প্রতিক্ষণই যেন তাহার গৃহস্বামীর অভ্যর্থনার জন্য সাজিয়া রহিয়াছে। ভাল।

কিন্তু অকস্মাৎ একটা বিরাট শূন্যতা আজ এমন ভাবে আমার সমগ্র অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল কেন? এমন অনুভূতি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত—অন্ততঃ বিশ বৎসরের মধ্যে কখনও এমন ঘটে নাই ত!

আহারাদির পর চুপ করিয়া 'ড্রইং রুমে' বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন ভাবে সঙ্গী-হীন অবস্থায় অতিবাহিত করা পূর্ব্বে আমার পক্ষে কোনও দিন ক্লান্তিজনক মনে হয় নাই। ঘড়ির কাঁটা ৩টার ঘর পার হইয়া গেল। সঙ্কল্প স্থির করিয়া উঠিলাম।

প্রসাধন শেষে একবার অভ্যাসবশে আলমারীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দরজা খুলিয়া মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। প্রসারিত হস্ত গেলাসের অঙ্গ পরিত্যাগ করিল।

না—আজ দীর্ঘদিনের সহচরীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়াই তাহার কাছে যাইব। সমস্ত দিনটাই যদি তাহার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিয়া থাকি, আর কয়েকঘণ্টার জন্য পারিব না?

মোটর হু হু শব্দে শ্যামবাজারের দিকে ধাবিত হইল। বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল না। ৯ নং বাড়ীর দ্বারে মোটর আসিয়া থামিল।

বিনয়কুমার চৌধুরীর চরণ কম্পিত হয়? সঙ্কোচের সহিত যাহার কোনও দিন পরিচয় ঘটে নাই—এ কি তাহার দুর্ব্বলতা!

"আপনি কোথা থেকে আসছেন?—"

দীর্ঘাকার গৌরকান্তি সুদর্শন যুবকের মুখের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র সবিস্ময়ে চাহিলাম। আমারই যৌবন কি আজ আমারই সম্মুখে নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইয়াছে?

"আমি বিনয়কুমার চৌধুরী।"

মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত মাত্র যুবকের সদানন্দমুখে বিস্ময়ের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে তাহার উন্নত মস্তক আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

"দাদামশাই—দাদু!"

আলিঙ্গনপাশ হইতে সসম্ভ্রমে আপনাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া যুবক আমার হাত ধরিয়া অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল।

ঝড়ের দমন সমুদ্র-হৃদয় কি এমনই ভাবে ক্ষুব্ধ, আলোড়িত ও উদ্দাম হইয়া উঠে? বাম হস্ত বুকের উপর চাপিয়া ধরিলাম।

"মা, মা, দেখবে এস, কে এসেছেন! ওরে রমা, তুই কোথায়?"

অদূরে—বোধ হয় কলতলার ঘর হইতে তরুণ কণ্ঠে কেহ বলিয়া উঠিল, "আমি আস্‌ছি, দাদা!"

দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। সম্মুখের একটা আসনে বসিয়া পড়িলাম।

সত্যই জগদ্ধাত্রীর মত রূপে ঘর আলো করিয়া প্রসন্নাননা জননী ঘরে প্রবেশ করিল। আমার সেই কিশোরী কন্যা আজ সংসারপালনকারিণী মাতা!

অশ্রু?—এই কঠোর শুষ্ক নয়নে ইহারও উপদ্রব সুরু হইল না কি? মুদিত নয়নে কন্যার নত মস্তকে দক্ষিণ পাণি রক্ষা করিলাম। রসনা কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিল না।

"কে, দাদা?—" বলিতে বলিতে উচ্ছল নদীর মত, দীপ্ত বিদ্যুৎশিখার ন্যায় এক তরুণী চঞ্চল চরণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে জন্মের মত হারাইয়াছি, যে সর্ব্বদা আমার গৃহে, প্রাঙ্গণে—সর্ব্বত্র এক অপূর্ব্ব শোভা, মাধুর্য্য ও প্রীতির অলকনন্দা প্রবাহিত করিয়া আমার জীবনকে পবিত্র রাখিয়াছিল, সে কি আজ তাহার কিশোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘরাঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে?

শুভ্রচরণে কিশোরী—আমার মায়ের মা, মুহূর্ত্তমাত্র সবিস্ময়ে আমার পানে চাহিয়া রহিল। পরক্ষণে সে বলিয়া উঠিল, "দাদু?"

দুই হস্তে তাহার মস্তক তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিলাম।

"তোর দিদিমণির সবটুকুই কি তোর মধ্যে ফুটে উঠেছে, ভাই?"

তিন জোড়া নয়নের প্রসন্ন দৃষ্টি আমাকে পবিত্র করিয়া দিল। ইহারই নাম কি ত্রিবেণী-সঙ্গম?

উত্তমর্ণের কাছে আসল অপেক্ষা সুদ এবং সুদের সুদ আরও মিষ্ট কেন, আজ বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিলাম।

কথার ত শেষ নাই। কন্যা বলিল, "আপনি বসুন বাবা, আমি আস্‌ছি।"

দৌহিত্র সুরেশ বলিল, "আমি বাবাকে কোন্ ঘরে আসি। তিনি মিঃ গুপ্তের বাড়ীতে এখন আছেন।"

রমা বলিল, "দাদু, আজ তোমাকে এখানেই আটকে রাখব। যেতে পাবে না।"

তাই রাখ, তাই রাখ! এত তৃপ্তি, এমন আনন্দ হেলায় হারাইয়া হতভাগ্য, এত দিন কোন্ সুখের পশ্চাতে—মরীচিকার সন্ধানে ঘুরিয়া মরিয়াছিল্!

আমার মুখের দিকে দীর্ঘায়ত নেত্র স্থাপন করিয়া তরুণী রমা বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ দাদু, তুমি মা'র মতই সুন্দর। ঐ দেখ তোমার ফটো থেকে দাদা নিজের হাতে কত বড় ছবি এঁকেছে। কিন্তু—কিন্তু তুমি বুড়ো হয়ে গেছ!"

অকস্মাৎ আমি চমকিয়া উঠিলাম। বুড়া!—সত্যই আমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি? না, না, মিথ্যা কথা! আমার দেহে এখনও প্রচুর শক্তি, জঠরে প্রচণ্ড ক্ষুধা; মনে রস-পিপাসা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তথাপি আমি বুড়া হইয়া গেলাম! যৌবন কি তবে এখন স্বপ্নালোকের বিষয়?

মিথ্যা বলিব না। আমার সমগ্র চিত্ত এই কথায় যেন নিদারুণ ব্যথাভরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

কিন্তু কামনাদর্পণে আমার যথার্থ রূপ এতদিন যদি ধরা না-ও পড়িয়া থাকে, তরুণী নারীর নয়ন-দর্পণে প্রকৃত রূপ ফুটিয়া উঠিবেই—তথায় যে প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সহস্র মিথ্যা তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না।

অকস্মাৎ দ্বারপ্রান্তে অলঙ্কারের মধুর নিক্কণে চাহিয়া দেখিলাম। সত্যই কি আমি জাগ্রত? স্বপ্ন দেখিতেছি না?

না, স্বপ্ন নহে! কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ধ্যানরতা যে তরুণীর লোক-মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এ সে-ই! বাণ-বিদ্ধ মরণপথযাত্রী রাজহংস, বিকসিত শতদল পরিশোভিত স্নিগ্ধ শীতল সরোবরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য যেমন তাহার দুর্ব্বল পক্ষ মেলিবার শেষ প্রচেষ্টা করিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে স্তব্ধ হইয়া পড়ে, আমারও হৃদয় ঠিক তেমনই ভাবে উত্তেজিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অবসাদভরে ম্লান হইয়া পড়িল।

না, বিনয়কুমার! তুমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছ! তরুণীর দৃষ্টি অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, জরা ও বার্দ্ধক্য তোমার দেহে দেখা দিয়াছে। শীত কখনও বসন্তের সহযাত্রী হইতে পারে না—অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রোদয় অসম্ভব! মিথ্যা যৌবন-স্বপ্নবিভোর বিনয়কুমারের মৃত্যু হইয়াছে।

সঙ্কোচনম্রা সুন্দরীকে রমা আহ্বান করিল, "সই, লজ্জা কি? আয়, আমার দাদু।"

তরুণী ধীরে ধীরে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করিলাম, "সাবিত্রী সমা হও—সুখী হও।" মৌখিক নহে—এ আশীর্ব্বাদ আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই করিলাম।

"দাদু, আমার সইয়ের নাম গৌরী। কাকাবাবু—ওর বাবাকে আমরা কাকাবাবু বলে ডাকি—রেঙ্গুনে এডভোকেট—উকীল। বাবার সঙ্গে বড় বন্ধুত্ব। আমরা দুই সই এক স্কুলে পড়েছি। কাকাবাবু গৌরীর বিয়ে দেবেন ব'লে দেশে এসেছেন।"

গৌরী নতদৃষ্টিতে তাহার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। সত্যই এই তরুণী গৌরীর ন্যায়ই মনোহারিণী।

"দাদু, একটা মজার কথা শোন—তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ, তবু দেখছ মোটে আমার লজ্জা নেই—যেন কত-দিনের পুরানো দাদু! কেমন সত্যি নয়? ভাল কথা, যা বলছিলুম ভুলে গেলুম। মজার কথা শোন। গৌরীরা কাল কাশী থেকে এসেছে। সেখানে কত মজা হয়েছিল—"

গৌরী সতর্ক দৃষ্টি দ্বারা রমাকে যেন কি বলিতে গেল।

আমার হৃৎপিণ্ড সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

"তুই থাম্! দাদুর কাছে লজ্জা কি? শোন দাদু, সেখানে কে একটা বুড়ো গৌরীর রূপে পাগল হয়ে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। লোকটা না কি খুব ধনী! আচ্ছা, কি বিশ্রী বল ত! বুড়ো হ'লে লোভ বেশী হয়, না দাদু?"

লজ্জায়, ধিক্কারে, অনুশোচনার একটা সীমা নাই কি? রুমালে স্বেদধারা মুছিয়া ফেলিলাম। পাপ, অন্যায়, অবৈধ আচরণের শাস্তি না কি মানুষ কখনও এড়াইতে পারে না। এ শাস্তি ঠিকই হইয়াছে। সন্তানের সন্তান!—তোমাকে কখনও স্মরণ করি নাই, প্রভু!—তোমার এ দান বজ্রাঘাতের মত ভীষণ হইলেও উপযুক্ত আধারের মধ্য দিয়া পাঠাইয়াছ। মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে।

জ্বালা মর্ম্মান্তিক, আঘাত কঠোরতর, বেদনা অপরিসীম। তবু, তবু যেন একটা শান্তির তরঙ্গ অতি ধীর গতিতে হৃদয়-বেলায় গড়াইয়া পড়িল।

প্রাচীরগাত্রে আমার যৌবনের চিত্র এবং পার্শ্বে আমার সহধর্ম্মিণীর আলেখ্য দুলিতেছিল। নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলাম। তোমার চিরপ্রসন্ন হাস্তরেখা শিল্পী কি ওখানে অনন্তকালের জন্যই তুলিকার স্পর্শে সজীব করিয়া রাখিয়াছে!

দৃষ্টি ফিরাইয়া দিদিরাণীকে বলিলাম, "গৌরীদিদির বিয়ের সম্বন্ধ কোথায় ঠিক হ'ল?"

তরুণী গৌরীর সুন্দর আননে লজ্জার রক্তিম রাগ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিশোরী চলিবার উপক্রম করিতেই রমা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

"এখনও ঠিক হয় নি, দাদু! তবে এক জন বড় জমীদারের এম-এ, পাশ ছেলের সঙ্গে কাকাবাবু কথা পেড়েছেন। খুব সম্ভব সেখানেই হবে। ওঁরা বড় লোক ছাড়া এমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেবেন না।"

রমা অতি সন্তর্পণে যে শ্বাসটি ফেলিল, তাহা আমার বক্ষঃপঞ্জরে গিয়া আঘাত করিল।

"দাদু, দাদু, বাবা এখুনি আস্‌ছেন—"

তরুণ সহসা দ্বারপথে থমকিয়া দাঁড়াইল। সেই চির-পুরাতন, সনাতন, সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠীর নরনারীর শ্রেষ্ঠ কাম্য—রসলীলার চিরাকাঙ্ক্ষিত রূপতরঙ্গ, কিশোর-কিশোরীর আননে ললিত ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। দুই জোড়া নয়নের চকিত, চঞ্চল দৃষ্টি আমার চির অতিষ্ক নয়নকে প্রতারিত করিতে পারিল না।

রমার শিথিল করবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া গৌরী ত্রস্ত চরণে ভিন্ন দ্বারপথে অন্তর্হিত হইল।

"দাদু, আমার কাছে এস।"

তাহাকে কাছে বসাইয়া—তাহার বলিষ্ঠ করপল্লব বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নয়ন নিমীলিত করিলাম।

মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল।

৫

কন্যা জামাতা সহজেই রাজি হইয়াছিল। আমার প্রস্তাবে একটু অভিনবত্ব থাকিলেও আমার ঐকান্তিক কামনাকে তাহারা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। রেঙ্গুনের এড্‌-ভোকেট বন্ধুর নিকট আমার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে হইবে—এ সর্ত্তও তাহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আমার চৌরঙ্গীর বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে। তাহারা মালিক, আমি তথায় এখন অতিথি!

মেধাবিনী রহস্যময়ী রমা আমার নির্দ্দেশ মত তাহার সখী গৌরী ও তাহার মাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। জামাতা তাহার বন্ধু অক্ষয় বাবুর সহিত একটু পরেই আসিতেছেন।

ঐশ্বর্য্যের বিলাস দেখাইবার একটা বাসনা আজ আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। দিনয়কুমার চৌধুরী যখন সত্যই বুড়া হইয়া পড়িয়াছে, কালের আহ্বান যখন বাঁশী বাজাইয়া জানাইয়া দিয়াছে, গাড়ী ছাড়িবার বেশী বিলম্ব নাই, শেষ ঘণ্টা পড়িলেই যাত্রা সুরু হইবে, তখন রঙ্গমঞ্চে ভাল করিয়া অভিনয়টা দেখাইয়া লই!

আজ সমস্ত দিনটা মনে মনে শুধু হাসিয়াছি। সে হাস্ত উপভোগ করিবার আর কেহ ছিল না! আপন মনে শুধুই একাই হাসিয়াছি। কি চমৎকার এই জীবন-নাট্যশালা! মেঘে মেঘে বেলা বাড়িয়া ক্রমে অপরাহ্নের সূর্য্য পাটে বসিয়াছে, অথচ মূর্খ মন তাহার কোন হিসাবই রাখে নাই?

রমা শতবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "দাদু, আজ তোমার হয়েছে কি? বাড়ীটাকে যেন থিয়েটারের মত করে সাজিয়ে ফেলেছ!"

হাঁ, যে চিরন্তন পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয় মানবজীবনে চিরকাল অভিনীত হইয়া আসিতেছে, আজ তাহার

পুনরভিনয়ের প্রথম দৃশ্য এইখানে দেখা যাইবে! সুতরাং মহাসমারোহে তাহাকে অভ্যর্থনা না করিলে চলিবে কেন?

"কিন্তু দিদি, তোর সইকে আমার সব পরিচয় দিস্ নাই ত?"

"না দাদু, রেঙ্গুনে থাকতে তোমার কোন পরিচয় আমরা কাউকে দিতাম না। না, বাবার নিষেধ ছিল। শুধু নিজেরা আলোচনা ক'রতাম্।"

"ভাল, ভাল।—এখন তোর সইকে আবার সাবধান করে দিবি, সে যেন তার মা বাবাকে এখন আমার কথা না জানায়। এ বাড়ীটা তোদের তা বলেছিস্? কথাটা ত আর মিথ্যে নয়।"

অক্ষয়বাবু শুনিয়াছি মেয়েটিকে খুবই ভালবাসেন! ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার, সুন্দর ও সুশিক্ষিত পাত্র তাঁহার কাম্য।

কিন্তু কাশীতে আমার প্রেরিত প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কেন? আমি বৃদ্ধ বলিয়া?

আচ্ছা, বিনয়কুমার চৌধুরী প্রতিশোধ লইতে জানে। এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও কামনা নিরর্থক—ব্যর্থ হয় নাই!

সন্ধ্যার অবগুণ্ঠন নামিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে যেন সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিল। উদ্যানে—পল্লবঘন বৃক্ষদেহে, লতাকুঞ্জে নানা আকারের কাচের ফানুসের মধ্যে সৌদামিনীর রূপপ্রভা হাসিয়া উঠিল।

এইবার আসিবার সময় হইয়াছে বোধ হয়। ধীরে ধীরে অদূরবর্ত্তী একটি লতাগুল্মের অন্তরালে আশ্রয় লইলাম।

রমার নয়নদর্পণে দেখিয়াছি, আমার কেশে পাক ধরিয়াছে, জরা আসিয়াছে। তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু অন্তরে যৌবনের চাপল্য ত এখনও পঙ্গু হইয়া পড়ে নাই। পরিপূর্ণ যৌবনেও যে খেয়াল কখনও অপরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই, আজ স্তিমিত অপরাহ্নে সে এমন বিচিত্ররূপে আবির্ভূত হইল কেন?

মৃদুধ্বনিতে বুঝিলাম, মোটর আসিতেছে। অভিনয় আরম্ভের আর বিলম্ব নাই। সাবধান বিনয়কুমার! তুমি কত বড় দক্ষ অভিনেতা, আজ তোমার ভূমিকার প্রকাশ পাইবে!

পাঁচ মিনিট পরে, ধীরে ধীরে বিস্তৃত 'ড্রয়িংরুমে' প্রবেশ করিলাম। প্রসাধনের পারিপাট্য পূর্ণমাত্রাতেই ছিল—তবে আজ আগাগোড়া শুভ্রাম্বরধারী। রমা আমার বেশ দেখিয়া বলিয়াছিল, "দাদু, তোমাকে কি সুন্দরই মানিয়েছে। ঠিক যেন আমারই দাদু!"

সেই দিনই আমার দীর্ঘকালের ভ্রান্তি দূর করিয়া দিয়াছ, রাণি! তোর এই উপকার, এই স্নেহ ভুলিতে পারিব না।

ধীরে ধীরে আলোকিত কক্ষে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বশিক্ষামত জামাতা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। অক্ষয়বাবুর সহিত পরিচিত হইলাম, অবশ্য ভিন্ন নামে—আমার আসল নাম কেহ জানিত না।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। সাধারণতঃ নির্জ্জনতার ভক্ত হইলেও গল্প বলিবার শক্তি—মানুষকে কথায় আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না। জামাতা ভিতরের দিকে কি একটা কাযে চলিয়া গেল।

"অক্ষয়বাবু, আপনার একটি সুন্দরী অবিবাহিত মেয়ে আছে?"

"আজ্ঞে হাঁা! মেয়েটি বড় হয়ে পড়েছে, তার জন্যে বড়—"

অর্দ্ধপথে বাধা দিয়া হাসিয়া বলিলাম, "তা বেশ ত! মেয়েটি আমাকে দিন না?"

অক্ষয়বাবু পলকহীন নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ভাবিতেছিলেন, আমি প্রকৃতিস্থ কি না। তাঁহার বন্ধু অবিনাশ কি তাঁহাকে একটা পাগলের কাছে রাখিয়া গেল!

প্রশান্তভাবে হাসিয়া বলিলাম, "তা'তে আপনার আপত্তি কি? আমার যথেষ্ট ধন-দৌলত আছে। আপনার কন্যা অসুখী হবে না।"

অক্ষয়বাবু তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌ছেন, আপনি?"

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পূর্ব্ববৎ নিরীহস্বরে বলিলাম, "ঠিক কথাই বল্‌ছি। আপনার মেয়েটিকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে—ওকে আমার চাই, অক্ষয়বাবু!"

অক্ষয়বাবু উঠিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলাম।

"রাগ করবেন না। আচ্ছা, আপনি কি রকম পাত্র চান বলুন ত?"

অক্ষয়বাবু যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু বিরক্ত হইলেও ব্যবহারিক জগতে অনেক সময় মানুষকে

আত্ম-সম্বরণ করিতে হয়। বিশেষতঃ আমার ব্যবহারে অভদ্রতাসূচক কোন ইঙ্গিতই প্রকাশ পায় নাই।

"দেখুন, আমার মেয়ের বিবাহ প্রায় ঠিক হয়েছে। পাত্রটি এম্ এ পাশ, বাপের একমাত্র ছেলে। জমীদারীর আয় প্রায় ২৫।৩০ হাজার টাকা। দেখতে সুন্দর।"

"এখনও পাকা কথা দেননি ত? সুতরাং সে না হওয়ারই মধ্যে। দেখুন, এম্, এ আমিও পাশ করেছি। ব্যাঙ্কে কিছু বেশী ৪০ লক্ষ টাকা জমা আছে। জমীদারীর আয় ৫০ হাজার। তা ছাড়া মাসে ৯৭ হাজার টাকা বাড়ীভাড়া পেয়ে থাকি। আরও অন্য উপায় আছে। এ সম্বন্ধ আপনার পছন্দ হচ্ছে না?"

অক্ষয়বাবু চমকিয়া উঠিলেন। এবার সত্যই তিনি মনে করিলেন, আমার মস্তিষ্ক কখনই প্রকৃতিস্থ নাই। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"অবিনাশ দা গেল কোথায়?"

মনে মনে আমি খুব হাসিয়া লইলাম।

এমন সময় সুরেশ একখানি স্বর্ণপাত্রে পাণ লইয়া প্রবেশ করিল। এ ব্যবস্থা আমারই পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে হইয়াছিল।

অক্ষয়বাবু সোফার উপর নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "অবিনাশদাকে পাঠিয়ে দিও ত, সুরেশ।"

তাহার সুন্দর মূর্ত্তি দ্বারপথে অন্তর্হিত হইলে আমি বলিলাম, "এ পাত্রটি আপনার কেমন মনে হয়?"

বিনর্ষভাবে অক্ষয়বাবু বলিলেন, "পাত্রটি ত ভাল; কিন্তু পয়সা-কড়ি তেমন নেই। অবিনাশদার পৈতৃক ২০।২৫ হাজার টাকা ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। যা রোজগার করেন, সবই খরচ হয়ে যায়। তবে জীবনবিমা হাজার দশেক আছে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা থাকলেও, আমার ইচ্ছা গৌরীকে ধনবানের হাতে দেই।"

অক্ষয়বাবুর করযুগল সহসা গ্রহণ করিয়া আমি সবিনয়ে বলিলাম, "মেয়েটি আমায় দান করুন, অক্ষয়বাবু! অত নিষ্ঠুর হবেন না।"

"আঃ, আপনি আচ্ছা পা—"

"দাদু! কাকাবাবুকে কি বলছ তুমি?"

রমা গৌরীর হাত ধরিয়া লজ্জার ছায় মন্থরগতিতে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

অক্ষয়বাবুর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্র দেখিয়া গৌরী স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "উনি রমার দাদামশাই—জ্যেঠামার বাবা!"

"হ্যাঁ, অক্ষয়বাবু, আমার ৪০ লক্ষ টাকার জমিদারী, এই বাড়ী—সবই সুরেশ ও রমার। আমার আর কেউ ত নেই! এবার গৌরীদিদিকে আমায় ভিক্ষা দেবেন না? আমার দাদুর জন্য ওকে যে চাই!"

অক্ষয়বাবু পদধূলি লইয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি পিতৃতুল্য, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। গৌরী—আপনারই।"

প্রাচীরবিলম্বিত, আবেষ্টন-সীমার মধ্যে বসিয়া, কল্যাণি! বড় হাসিই হাসিতেছ! তোমারই জয় হউক। বিজয়িনি! অনন্তকাল তোমাদেরই বিজয়বার্ত্তা মর্ত্ত্যধামে ঘোষণা করিয়া কবি ধন্য হইবে!

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

বন্ধু-সম্মিলন

ইউনিভার্সিটির কন্‌ভোকেশন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ডিপ্লোমা দেওয়া হয়ে গেছে; সভা ভঙ্গ হয়েছে। কালো গাউন, চৌকা টুপী ও বিবিধ বর্ণের হুড প'রে ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে, বারান্দায় জড়ো হচ্ছে এবং নানান্ দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়্‌ছে। চ্যান্‌সেলার লাট 'সাহেব' তাঁর সোনালি-রূপালি জরির কাষ করা গাউন ছাড়তে সভা-গৃহের বাহিরের বারান্দার ধারে এক কক্ষে প্রবেশ করেছেন; তাঁর প্রকাণ্ড মোটরকার সভা-সৌধের মার্ব্বেল পাথরের সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা কর্‌ছে, সিঁড়ির দু-পাশে লাট সাহেবের এডিকং, প্রাইভেট সেক্রেটারী ও ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্‌সেলার, অধ্যাপক ও সদস্যগণ দুই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে চ্যান্‌সেলারকে বিদায় দিবার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। কাযেই যে সব সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা গাড়ীতে এসেছেন, তাঁরাও বারান্দার এক ধারে স্থানে স্থানে ছোটো ছোটো দলে মিলিত হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌ছেন, লাট সাহেবের ও তাঁর পুত্র-কন্যা ও পারিষদদের গাড়ী চ'লে না গেলে অপর কারো গাড়ী ত সিঁড়ির নীচের পথের উপর আস্‌তে যেতে পার্‌বে না।

কয়েকটি ছাত্রীও গাড়ীতে এসেছিলো; তারাও একটি দল ক'রে বারান্দার এক পাশে অপেক্ষা কর্‌ছে। যেহেতু কয়েকটি তরুণী অপেক্ষা কর্‌ছে, সেইহেতুই কয়েকজন ছাত্রও তরুণীদের নিকটেই দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—চুম্বকের আকর্ষণে লোহার মত তারা সেই স্থান ত্যাগ ক'রে যেতে পার্‌ছে না।

তরুণীদের রেশমী রঙীন শাড়ীর উপর কালো গাউন ও মাথায় কালো চৌকা টুপী এবং পিঠের উপর লাল-নীল রঙের হুড্ তাদের তারুণ্যের সহজ শ্রীকে সুন্দরতর ক'রে তুলেছে; তাদের সাফল্যের আনন্দ ও লোকচক্ষুর গোচর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার লজ্জা একত্র মিশ্রিত হয়ে তাদের মুখে লাবণ্য মাখিয়ে দিয়েছে। শীতান্তের স্নিগ্ধ রৌদ্র সোনালি আভায় বারান্দার মার্ব্বেল পাথরের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছে এবং সেই স্বচ্ছ মেঝে থেকে প্রতিফলিত স্বর্ণপ্রভা তরুণীদের গোলাপী হাসিতে সোনালি রঙের তুলি বুলিয়ে দিচ্ছে। কন্‌ভোকেশন-হলের সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সবুজ ঘাসের আস্তরণের উপর সোনালি রৌদ্র ছড়িয়ে পড়েছে; সেখানেও কত লোক, কত ছাত্র দল বেঁধে দাঁড়িয়ে লাট সাহেবের বিদায় নেওয়া দেখ্‌বে ব'লে অপেক্ষা কর্‌ছে। শস্যাস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে গুরুকী ফেলা লাল পথ ললিত-ভঙ্গীতে সুন্দর বক্ররেখায় বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে হারিয়ে গেছে। পথের ধারে ধারে জারুল গাছের সারির মাথায় নীল ফুলের স্তবক ফুটেছে, যেন বসন্ত-লক্ষ্মীর আগমনীর গান রূপের সুরে সুরময় ছড়িয়ে পড়েছে, যেন বসন্ত-লক্ষ্মীর আবাহনের জন্য ফুলের স্তবক সাজিয়ে সাজিয়ে বরণোন্মুখ শীত-ঋতু ফুলের মন্দির গ'ড়ে তুলেছে। দূর থেকে বন-কদম্বের ঘন গন্ধ উত্তুরে বাতাসে ভেসে আস্‌ছে। একটা নরুণ-নেজা কাজল-চোখী পাখী প্রকৃতির বুকের এক টুক্‌রা জবাট-বাঁধা আনন্দের মত বিনা প্রয়োজনে মাঠের উপর রোদ-মাখানো খোলা হাওয়ায় বিচিত্র ভঙ্গীতে ঘুরে ফিরে কাত হ'য়ে পাশ ফিরে উড়্‌তে পারার কায়দা দেখাচ্ছে; সোনালি রোদ লেগে তার সবুজ রঙের পালকগুলি ঝিক্‌মিকিয়ে চ'ম্‌কে চ'ম্‌কে উঠ্‌ছে। একটা ফিঙে কালো কুচ্‌কুচে চিক্কণ তীর-কাটা লেজ ঝুলিয়ে টেলিগ্রাফের তারের উপর ব'সে বিধি সুরে শিস দিচ্ছে; একটা নীলকণ্ঠ পাখী আকাশ-ভাঙা টুক্‌রোর মত উড়ে এসে ফিঙের পাশে বস্‌লো।

পুষ্করিণী

[অঙ্কন—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক]

প্রকৃতির এই বিচিত্র বাহুল্যের দিকে নজর দেবার অবসর তখন কারও ছিল না। তরুণদের মন জুড়ে ছিল কোন উপায়ে তরুণীদের মনোযোগ নিজেদের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিজের সম্বন্ধে তাদের মনে একটু পক্ষপাত, একটু অনুরাগ উদ্রেক করবার দুরাশা; আর তরুণীদের মন জুড়ে ছিল, কয়েকটি তরুণের দর্শনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকার লজ্জা, কাযেই তাদের উভয় দলের চোখ অপর কিছু দেখেও দেখছিল না।

তরুণরা তরুণীদের শুনিয়ে শুনিয়ে রঙ্গরসিকতা করছিল আর তরুণীদের মুখ থেকে থেকে লজ্জিত হাসির প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ছিল; তরুণীদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল কর্ণা রঙ্গের, তার কর্ণমূলে আর প্রফুল্ল কপোলে মনোভব থেকে থেকে মুঠি মুঠি আবীর ছড়িয়ে হোলী খেলে বেড়াচ্ছিল।

লাট-সাহেব চ'লে গেলেন। অভ্যাগত ও অধ্যাপকরাও একে একে চ'লে যেতে লাগ্‌লেন। ভিড় পাত্‌লা হ'য়ে এল। আর দাঁড়িয়ে থাকা শোভন হচ্ছে না দেখে একটি যুবক অপর এক জনের পিঠে চাপড় মেরে বল্‌লে—এই সুবন্ধু, এখন চল্—তুই যে এ জায়গায় 'লেপ্‌টে রইলি আটার মতন!'

সুবন্ধু আড়চোখে সেই কর্ণা মেয়েটির দিকে এক বার দেখে নিয়ে হাসিমুখের উপর বিষাদের ছায়া ফেলে বল্‌লে—আরে ভাই, একটু দাঁড়া না; এতদিন একসঙ্গে পড়্‌লাম, আজ এই তো একেবারে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাবে; কাল থেকে তো আমরা পৃথুলা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়বো; আর কখনও দেখা-শোনা হবে কি না, তা কে জানে—

সুবন্ধুর সতীর্থ সঙ্গীদের মুখের হাসি বিষাদাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো। তরুণীরা কি কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিল, তাদেরও কথা থেমে গেল, মুখের হাসি নিভন্ত হ'য়ে এল; কর্ণা মেয়েটির মুখ যে মলিন হ'য়ে গেল, তা তার গৌরবর্ণ গোপন করতে পারল না; সে চোখের কোণ দিয়ে সুবন্ধুর দিকে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এল, সঙ্গিনীদের কাছে ধরা পড়্‌বার ভয়ে সে বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠা দীর্ঘনিশ্বাসটা বুকের মধ্যেই গোপন ক'রে রাখ্‌ল।

সুবন্ধুর কথা শুনে তার সতীর্থ বন্ধু সতীশ তার কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লে—সত্যি ভাই, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমাদের সকলেরই কষ্ট হচ্ছে—তুমি ছিলে বাস্তবিক আমাদের সু-বন্ধু!

সুবন্ধু মুখের ম্লানিমার উপর হাসি ঢাকা দিয়ে বল্‌লে—আর তোমরাও তো ছিলে ভাই আমার সু-মিত্র!

সুবন্ধুর চোখের তারা তখনই একবার কোণের দিকে স'রে গিয়ে তরুণীদের মধ্যে বিশেষ ক'রে সেই গৌরাঙ্গীকেই দেখে নিলে।

সুবন্ধুর কথা শুনেই তরুণীরা খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ল—যেন খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে এক ঝাঁক টুন্‌টুনি পাখী গলায় গাঁথা রূপার ঘুঙুর বাজিয়ে উড়ে গেল। তরুণীদের মধ্যে সবচেয়ে যে মেয়েটি কালো, আর যার শ্রী-ছাঁদ তেমন দৃষ্টিচোরা নয়, সে হাস্‌তে হাস্‌তে গৌরাঙ্গীকে বল্‌লে—এই সুমিত্রা, শুন্‌ছিস্? তোর সু-বন্ধু কি বল্‌ছে? ও হচ্ছে সুবন্ধু মিত্র, আর তুই হলি সুমিত্রা বসো; দুজনের নাম তো একই; নাম মিলেছে, নামের মালিকরা মিল্‌লেই এখন ঠিক হয়!

সুমিত্রার মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল—যেন একটি মুক্তাফলের উপর জবার আভা পড়ল। সে কোনও কথা বল্‌তে পারলে না।

সুমিত্রার সঙ্গিনী সুরেখা হাসিমুখে সুমিত্রাকে বল্‌লে—সুমি, তুই বলিস্ তো আমরা না হয় বিয়ের ঘট্‌কালি করি।

এবার সুমিত্রা লজ্জিত লালিমামাখা মুখে কুণ্ঠিতকণ্ঠে জড়িতস্বরে বল্‌লে—নামের মানে মিল্‌লেই কি মনের মালা বদল করা চলে? এক সঙ্গে চার বচ্ছর পড়েছি, কিন্তু যার সঙ্গে একটা কথাও কই নি, তার কোন্ পরিচয়ে জীবন বিনিময় করবো? তোমাদের নিজেদেরই বুঝি স্বয়ম্বরা হবার সাধ হয়েছে, তাই আমার বেনামি মনের কথাটা ব'লে নিচ্ছ!

সুমিত্রার সঙ্গিনীরা ব'লে উঠ্‌ল—আহা রে! বড় দুঃখ! একটা কথাও কইতে পাও নি!——তুমি একটা কথাও কও নি; আমরাই করেছি নাকি!——আমাদের মনের মানুষ ঠিক করা আছে, তোমার বাহিতের উপর আমাদের একটুও লোভ নেই।

সুমিত্রা লজ্জিত স্মিতমুখে বল্‌লে—উনি যে আমার বাহিত, এমন অনুমান করলে কি লক্ষণ দেখে? ওঁর সঙ্গে তো আমার বরাবর প্রতিদ্বন্দ্বিতাই লেগেছিল···

কোনো বিষয়ে তিনি ফাষ্ট হয়েছেন কোনো বিষয়ে আমি—ওঁকে সব বিষয়ে পরাস্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি আমি, আর আমাকে সব বিষয়ে পরাস্ত করবার বিধিমত চেষ্টা করেছেন উনি—

সুরেখা হাসিমুখে বল্‌লে—আরে ঐ জন্যেই তো তোরা দুজনেই দুজনকে ভালবেসে ফেলেছিস! কংস যেমন কৃষ্ণের শত্রুতা করতে গিয়ে জগৎ কৃষ্ণময় দেখ্‌ত, তেমনি তোরাও পরস্পরের প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে তন্ময় হয়ে উঠেছিস—

ললিতা হেসে বল্‌লে—যেমন তেলাপোকা কাঁচপোকার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে কাঁচপোকা হয়ে যায়, তেমনি সুবন্ধুকে পরীক্ষায় পরাস্ত করবার চিন্তায় তোমার মন সুবন্ধুময় হয়ে উঠেছে, আর সুমিত্রাকে পরীক্ষায় জয় করবার চিন্তায় সুবন্ধুর চিত্তও সুমিত্রাময় হয়ে উঠেছে। এ খবর কি আমাদের কাছে গোপন আছে মনে কর?—

সুমিত্রার সখীরা যখন একে একে রঙ্গ ক'রে সুবন্ধুর প্রতি সুমিত্রার অনুরাগ নানা ভাবে প্রমাণ করতে চাইছিল, তখন সুমিত্রার শ্রবণ সেই সব কথার দিকে ছিল না, তার মন আকৃষ্ট হয়েছিল সুবন্ধুর বন্ধুদের কথার দিকে।

জগবন্ধু বল্‌লে—আচ্ছা ভাই, এক কাষ করা যাক। দি বছর আমরা এক দিন এক জায়গায় মিল্‌তে পার্‌লে ভাল হতো, কিন্তু তা হবে না হয় তো; আমরা অন্ততঃ পাঁচ বছর অন্তর গুড্‌-ফ্রাইডের ছুটীতে সবাই এক জায়গায় মিলতে পার্‌লে বেশ হয়।

সতীশ এই প্রস্তাব শুনে উৎসাহিত হয়ে বল্‌লে—বেশ কথা! এই হলের এই বারান্দায় আমরা পাঁচ বছর অন্তর এসে মিল্‌বো। সুবন্ধু, তুমি আস্‌বে?

সুবন্ধু সমবেত তরুণীদের দিকে চকিতে একবার চেয়ে নিয়ে সতীশকে বল্‌লে—তোমরা সবাই যদি আসো, তা হলে তোমাদের একবার শুধু দেখ্‌তে পাবার লোভেই আমি আস্‌ব।

সুবন্ধুর কথার মধ্যে সবাই শব্দটি একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে উচ্চারিত হোলো।

সুমিত্রার মুখ অকস্মাৎ প্রফুল্ল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সুমিত্রার সখী সুরেখা এই সময় ব'লে উঠ্‌ল—আর দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখাচ্ছে না ভাই। ভীড় পাতলা হয়েছে, এবার চ'লে চলো·····

সুরেখার প্রস্তাব মত সকলে অগ্রসর হয়ে চল্‌ল। যুবকদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যুবতীরা শুন্‌লে সতীশ বল্‌ছে—তা হ'লে কথা রইল, গুড্‌-ফ্রাইডের দিন আমরা সকলে পাঁচ বছর অন্তর এই জায়গায় সকাল সাতটায় এসে সম্মিলিত হবো·····

এই কথা শুনে প্রতিভা চুপি চুপি বল্‌লে—আমাদেরও এই রকম মিল্‌তে পার্‌লে বেশ হয়।

সুরেখা ব'লে উঠ্‌ল—আর আমাদের কে কোথায় থাক্‌বে, তার কি ঠিক থাক্‌বে? মেয়েমানুষ পরাধীন, এক জন পুরুষ-মানুষ সঙ্গে না থাক্‌লে আমরা একলা এক পা চল্‌তে পারি না; কারও কারও বিয়ে হয়ে যাবে, তখন পদে পদে স্বামীর অনুমতি চাই; ছেলেপিলে হয়ে পড়্‌লে তো দস্তুর মত করেদী·····

প্রতিভা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে—ঠিক ব'লেছিস ভাই। আমি শীগ্‌গির বিয়ে করছি নে·····

তারা সকলে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল। সুমিত্রা সখীদের কথাপ্রসঙ্গে একটি কথাও না ব'লে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। যখন গাড়ী চলতে আরম্ভ করল, তখন সুমিত্রা গাড়ীর জান্‌লা দিয়ে মুখ বা'র ক'রে যেখানে যুবকরা দাঁড়িয়ে ছিল, সেইখানটায় একবার দৃষ্টিপাত ক'রে নিলে। গাড়ী দেবদারুবীথির মধ্যে দিয়ে ছুটে বৃক্ষ-কুঞ্জের আড়ালে চ'লে গেল।

* * * * *

পাঁচ বছর পরে। গুড্‌-ফ্রাইডের দিন। সকাল বেলা সাড়ে ছটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে কন্‌ভোকেশন হলের সাম্‌নের মাঠে জনতা জমেছে। ইউনিভার্সিটি হোষ্টেলের ছেলেরা ও অধ্যাপকরা এসে জড় হয়েছে, তাহাদের প্রাক্তন বন্ধু ও ছাত্রদের মধ্যে কে কে আজ আস্‌ছে দেখবার জন্য; নবাগত ছাত্ররাও কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে দলে দলে এসে সমবেত হচ্ছে; আগন্তুক ছাত্রদের আত্মীয়-স্বজনরাও এসেছে; কৌতুক দেখবার জন্য সাধারণ লোকেরও সমাগম কম হয় নি; লোক কেন জ'মেছে না জেনেও কেবলমাত্র জনতা দেখেই পথিক লোকরাও সেখানে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং পূর্ব্বাগত লোকদের কাছে ভীড় জমবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করছে।

সতীশ এল। জগবন্ধু এল। মহীতোষ আর পবিত্র একসঙ্গে এল। সাতটা বাজ্‌তে আর পনেরো মিনিট মাত্র বাকী। আজাদ আর ইদ্‌রিসও এল।

সতীশ জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আর কেউ আস্‌বে না নাকি?

জগবন্ধু বল্‌লে—কি জানি? হিমাংশু তো লিখেছিল সে আস্‌বে.....

পবিত্র জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সুবন্ধুর খবর ভালো কি?

জগবন্ধু বল্‌লে—না, তার তো কোনও খবর জানি না। হিমাংশু এলে জান্‌তে পারা যাবে; হিমাংশু সুবন্ধুর মামার বাড়ীর গাঁয়ের লোক.....

কোন এক বন্ধুর অকস্মাৎ আগমনের প্রতীক্ষায় উৎসুক চিত্তে প্রত্যেক সেকেণ্ড গুণে গুণে আরও দশ মিনিট কাটল। জলের কলের কারখানার কারিগরদের আহ্বান-সঙ্কেত সাতটা বাজ্‌তে পাঁচ মিনিটের ভোঁ বাজল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি কম্পাউণ্ডের রেলিং-ঘেরা মাঠের মাঝে লাল শুরকী-ফেলা পথের উপর দেবদারু-বীথির ভিতর দিয়ে দু'খানি গাড়ী ছুটে আস্‌ছে দেখা গেল। সেই দু'খানি গাড়ীতে কে আসছে যথাসম্ভব সত্বর ও অপরের পূর্ব্বে দেখ্‌বার জন্য সকলে উচ্চকিত দৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল।

বসন্তের শুভাগমনে বনলক্ষ্মী পুষ্পাভরণে ভূষিতা হয়ে উঠেছেন; শুল্‌-মোহর ফুলের লালিমার অন্তরে হরিদ্রার আভা, জারুল-ফুলের নীলিমা ও কাঞ্চনীফুলের শুভ্রতা যেন আজ শুভ সম্মিলনের জন্য পথের মাথায় মাথায় আল্‌পনা দিয়ে রেখেছে, সেই পথ বেয়ে গাড়ী দৌড়ে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

মহীতোষ উল্লসিত স্বরে ব'লে উঠল—এই যে হিমাংশু এসেছে.....

সতীশ উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—পরের গাড়ীতে কে?

কেউ তো জানে না কে? কে কেমন ক'রে বল্‌বে কে আসছে? কাজেই সকলে কৌতূহলী দৃষ্টি গাড়ীর দিকে নিবদ্ধ ক'রে চুপ ক'রে রইল।

সকলে অবাক্ বিস্ময়ে দেখলে গাড়ীর মধ্যে সুমিত্রা! এই অপ্রত্যাশিত আগমনে সকলের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সুমিত্রার গরদের শাড়ীর চওড়া লাল পাড় তার কপালের উপর জ্বলজ্বল কর্‌ছিল, আর লজ্জায় লাল মুখের উপর সেই লাল পাড়ের আভা পড়েছিল।

সতীশ ব'লে উঠল—সুমিত্রা আসছেন। ওঁরা যে কেউ আস্‌বেন, এ তো আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি!

সুমিত্রার গাড়ী এসে মার্ব্বেল-পাথরের সিঁড়ির পাশে দাঁড়াল। সুমিত্রা মর্ম্মর-সোপানে পদার্পণ কর্‌তেই জলের কলের পেটা ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে সাতটা বাজতে আরম্ভ কর্‌ল।

অমনি সমবেত প্রাক্তন ছাত্ররা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার আল্‌মা মেটার!

অমনি সমবেত ছাত্ররা সমস্বরে আনন্দোল্লাসে ক'রে চেঁচিয়ে উঠল—হিপ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!

তার পর পুরাতন ছাত্ররা আবার চীৎকার ক'রে বল্‌লে—থ্রি চিয়ার্স ফর্ আওয়ার ডিয়ার কনরেডস্।

আবার জনতার জয়োল্লাসে আকাশ প্রকম্পিত হ'তে লাগল। অভ্যাগত ছাত্ররা সকলে এসে সুমিত্রাকে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—আপনি যে এসেছেন, এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এ আমাদের আশাতীত।

সুমিত্রার সুন্দর মুখখানি অধিকতর লজ্জারুণ হয়ে উঠল।

ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চান্‌সেলার অগ্রসর হয়ে এসে প্রথমে সুমিত্রার ও পরে একে একে অভ্যাগত পুরাতন ছাত্রদের সকলের কর-স্পর্শ করলেন ও সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর অধ্যাপকরা একে একে এসে সকলের অভিনন্দন করলেন।

সুমিত্রার সম্মুখে এক একজন অধ্যাপক আস্‌ছেন আর প্রত্যেক বার তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠ্‌ছে। এত বড় জনতার মধ্যে একাকিনী নিঃসঙ্গিনী রমণী সে, সে সকলের দৃষ্টির আঘাতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল।

সকল অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেলে ভাইস্ চ্যান্সেলার অভ্যাগত ছাত্র-ছাত্রীদের হলের ভিতর অভ্যর্থনা ক'রে আহ্বান কর্‌লেন।

সুমিত্রাকে পুরোবর্ত্তিনী ক'রে পুরাতন ছাত্ররা অধ্যাপকদের অনুসরণ ক'রে হলের ভিতর চল্‌ল।

সুমিত্রার লজ্জা-কুণ্ঠিত দৃষ্টি কিন্তু চঞ্চল হয়ে ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকে চকিত ভাবে সঞ্চারিত হচ্ছিল, সে যেন কাকেও খুঁজছে, তার দৃষ্টি কাউকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে, অথচ কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছে না। বারান্দা পার হয়ে হলের মধ্যে প্রবেশ ক'রেই সুমিত্রার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল; তার মুখের উপর লজ্জার লালিমা ভেদ ক'রে বিষণ্ণতার কালিমা ও শুষ্কতা ফুটে উঠ্‌ল।

হলের ভিতর ছোট ছোট টেবল পেতে চা আর জলযোগের আয়োজন সজ্জিত ছিল। এক এক টেবলে চার ধারে চার জন ক'রে বস্‌তে লাগল। এক টেবলে বস্‌লেন ভাইস-চ্যান্সেলার ও অপর দুজন প্রধান অধ্যাপক এবং সুমিত্রা। চা খেতে খেতে সকলে গল্প করতে আরম্ভ করলেন। অধ্যাপকদের কথোপকথনের উত্তর যতটুকু না দিলে নয়, ততটুকুই যথাসম্ভব সংক্ষেপে দিয়ে সুমিত্রা নত নেত্রে ব'সে রইল, পানাহারের দিকে তার বিশেষ প্রবৃত্তি প্রকাশ পেল না।

সুমিত্রার পাশের টেবিলে ব'সেছিলো হিমাংশু, সতীশ, মহীতোষ ও জগবন্ধু। তারা এখন কে কি করছে, তার পরিচয় জানার পর সতীশ হিমাংশুকে জিজ্ঞাসা করলে—সুবন্ধু এলো না যে? সুবন্ধুর খবর কি?

এই প্রশ্ন সুমিত্রার কানে যেতেই সে সোজা হয়ে বসল, তার চোখ উজ্জ্বল ও মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

হিমাংশু বিষণ্ণ ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—সুবন্ধু মারা গেছে।

সুবন্ধুর বন্ধুরা সমস্বরে ব'লে উঠল—সুবন্ধু মারা গেছে! কবে?

সুমিত্রার মুখ একবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল; তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল; তার ঠোঁট দুখানি থরথর্ ক'রে একবার কেঁপে উঠল; তার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে ঝিম-ঝিম্ করতে লাগল। সে শক্ত ক'রে চেয়ারের হাতল চেপে ধরলে।

ভাইস্-চ্যান্সেলার সুমিত্রার অকস্মাৎ ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি কোনো রকম অসুখ বোধ হচ্ছে?

সুমিত্রা অতি কষ্টে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বল্‌লে—না……

তার পরেই সে উন্মনা হয়ে গেল, তার সকল মনোযোগ শ্রবণেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত হল, সে শুনতে লাগল সুবন্ধুর বন্ধুদের আলাপ।

সুমিত্রা শুনলে হিমাংশু বল্‌ছে—বছর খানেক হবে।

—কি হয়েছিল?

—সে এক রোমান্টিক ব্যাপার!

—বিয়ে ক'রেছিল?

সুমিত্রার শ্রবণ আগ্রহে উৎসুক হয়ে এই প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

সুমিত্রা শুন্‌লে হিমাংশু বল্‌ছে—বাধ্য হয়ে বিয়ে ক'রে-ছিল, আর সেই বিয়ের জন্যেই তো সে মারা পড়ল…

এই কথা শুনে সুমিত্রার সর্ব্ব শরীর একবার থরথর করে কেঁপে উঠল, তার সর্ব্বাঙ্গে মূর্চ্ছা সঞ্চরণ ক'রে তার চেতনা আচ্ছন্ন করবার উপক্রম করল, কিন্তু সে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ ক'রে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইল। কিন্তু তার মুখের পাংশুবর্ণ ও বিশুষ্কতা তার অন্তর-বেদনা গোপন রাখতে দিলে না।

ভাইস-চ্যান্সেলার উৎসুক দৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তান্বিত স্বরে বল্‌লেন—তোমার নিশ্চয় শরীর সুস্থ নেই……

সুমিত্রা মৃদু স্বরে বল্‌লে—না, আমি ভালই আছি।

এবং সে যে ভাল আছে তা প্রতিপন্ন করবার জন্য একটা কেক ভেঙ্গে অল্প অল্প মুখে দিতে লাগল, কিন্তু তার মুখের গ্রাস আর গলা দিয়ে নাম্‌তে চায় না।

সুমিত্রা যদিও খাওয়ার ভাণ করছিল, তথাপি তার সমস্ত মনোযোগ ছিল হিমাংশুর কথার দিকে।

হিমাংশু বল্‌ছিল—সুবন্ধুদের গাঁয়ে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবা ছিল। তার নাম জয়ন্তী। গাঁয়ের মুসলমান জমিদার সেই মেয়েটিকে পাবার জন্যে অনেক রকম চেষ্টা করে, প্রলোভন দেখায়, ভয় দেখায়, তাকে নিকা করবার প্রস্তাবও করে; কিন্তু সেই বিধবাটি কিছুতেই জমিদারের প্রস্তাবে সম্মতি দেয় নি। তখন অন্য উপায় না দেখে জমিদার গুণ্ডা লাগিয়ে মেয়েটিকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে পাশের এক গাঁয়ে লুকিয়ে রাখে। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই সুবন্ধু ছুটী নিয়ে বাড়ীতে আসে—সুবন্ধু তখন মাদারীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে—সুবন্ধু ডেপুটি হয়েছিল বুঝি ?

হিমাংশু বললে—হ্যাঁ !—

জগবন্ধু সুবন্ধুর ইতিহাস জানবার আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—তার পর ?

হিমাংশু বলতে লাগ্‌ল—সুবন্ধু জয়ন্তী-হরণের ব্যাপার শুনেই গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে এক সার্চ পার্টি বা সন্ধানীদল তৈরি করলে। তার পর রীতিমত ডিটেক্‌টিভের মত সন্ধান ক'রে ক'রে তারা বিধবার ঠিকানা জান্‌লে আর গোপনে তাকে খবর দিয়ে রাখ্‌লে যে, একদিন তারা ওকে উদ্ধার করবে। চোরের উপর বাটপাড়ী ক'রে সুবন্ধু মেয়েটিকে উদ্ধার ক'রে আনে।

জগবন্ধু উৎসাহিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেমন ক'রে উদ্ধার করলে ?

হিমাংশু বললে—সে এক ডিটেক্‌টিভের গল্প।

সতীশ বললে—সে গল্প পরে শুনবো, আগে মোট ব্যাপারটা সংক্ষেপে শুনে নি। তার পর কি হল ?

হিমাংশু বলতে লাগ্‌ল—তার পর আমাদের দেশে যা হয়ে থাকে, তাই হল—মেয়েটির বাপ-ভাই মেয়েটিকে ঘরে নিতে রাজী হল না ; মেয়ের জাত গেছে, তাকে ঘরে নিলে সকলেরই জাত যাবে। তখন সুবন্ধু বিপদে পড়্‌ল, মেয়েটিকে কোথায় রাখ্‌বে। অগত্যা সে নিজের বাড়ীতেই তাকে রাখ্‌লে। অমনি গাঁয়ের লোক তাকে একঘ'রে করলে, আর তার নামে কুৎসিত অপবাদ ঘোষণাও করতে লাগ্‌ল—

সুমিত্রার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত আর একবার স'রে চ'লে গেল।

হিমাংশু বলতে লাগ্‌ল—এমন কি সুবন্ধুর মাও তাকে ছেড়ে ভাইয়ের বাড়ী চ'লে গেলেন। তখন সুবন্ধু জয়ন্তীকে বললে—"দেখো জয়ন্তী, আমি এক জন মেয়েকে ভালবাসি ; কিন্তু তিনি আমাদের জাত নয় ব'লে আমি তাঁকে বিয়ে করবার কথা ইঙ্গিতেও জানাতে পারি নি, কারণ আমি জান্‌তাম যে, আমাদের বিয়েতে তাঁর সম্মতি পেলেও মা কখন সম্মতি দেবেন না। কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় মা তো আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলেন, তবু আমি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে আবার ত্যাগ করতে পারলাম না। তুমি একলা আমার বাড়ীতে আছ ব'লে লোক অপবাদ রটনা করছে…"এই কথা শুনে জয়ন্তী বললে—"আপনি এখন বিয়ে ক'রে তাঁকে নিয়ে আসুন, আমি দাসী হ'য়ে আপনাদের দু'জনের সেবা করব—" তার উত্তরে সুবন্ধু বললে—"কিন্তু তাতেও আমাদের অপবাদ ঘুচবে না ; আর যাঁকে আমি আমার পত্নী করব, তিনি যদি এই সব মিথ্যা কথায় একটুও বিশ্বাস করেন, তা হ'লে তো আমাদের জীবনটাই বিষময় হ'য়ে যাবে। তাঁকে বিয়ে করার আশা আমি ত্যাগ করেছি। এখন তুমি যদি সম্মত হও, আমি তোমাকে বিয়ে ক'রে লোকের অপবাদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। কিন্তু একটি সর্ত্তে আমাদের এই বিয়ে হবে—কেবল নামে মাত্র আমাদের বিয়ে হবে, কিন্তু আমরা দু'জনে চিরজীবন নিঃসম্পর্ক ভাবেই থাকব।" তার পরে তাদের বিয়ে হ'ল। বিয়ের পরদিনই সুবন্ধুর বাড়ীতে জমিদারের লোকরা ডাকাতী করতে আসে, জয়ন্তীকে কেড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। সুবন্ধু ডাকাতদের বাধা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সে সেই রাত্রেই মারা যায়। সুবন্ধু ও জয়ন্তী দু'জনে ডাকাতদের এমন জখম ক'রে দিয়েছিল যে, পুলিশ সহজেই তাদের ধরতে পারে। জমিদারের পর্য্যন্ত জেল হ'য়ে গেছে। জয়ন্তী এখনও সুবন্ধুর বাড়ীতে আছে, কিন্তু তার ভয় দূর হয় নি, জমিদার ফিরে এলে আবার যে তার কি বিপদ ঘটবে, এই ভয়ে সে আড়ষ্ট হ'য়ে আছে। অথচ তার আশ্রয়ও আর কোথাও নেই।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে—সুবন্ধুর মা কোথায় আছেন এখন ?

হিমাংশু বললে—তিনি এখনও ভাইয়ের বাড়ীতেই আছেন, ভাই মারা গেছেন। তাই তাঁরও খুব কষ্ট হয়েছে। জয়ন্তীরও দিন চলা ভার হয়েছে ! কোন দিন খাবার জোটে, কোন দিন উপোস ক'রেই থাকতে হয়—

এই পর্য্যন্ত শুনেই সুমিত্রা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ভাইস্-চ্যান্সেলারকে মৃদু কম্পিতস্বরে বললে—আমার অসুখ বোধ হচ্ছে, আমি চ'লে যাবার অনুমতি চাইছি।

ভাইস্-চ্যান্সেলার বললেন—হ্যাঁ, আমি তো আগেই টের পেয়েছিলাম যে, তোমার অসুখ করছে। তোমার আগেই চ'লে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন তুমি কি একলা যেতে পারবে ? কোথাও একটু বিশ্রাম ক'রে যাবে কি ?

সুমিত্রা বল্‌লে—না, আমি যেতে পার্‌বো, তেমন বেশী কিছু অসুখ নয়—

সুমিত্রা গমনোদ্যতা হল।

সুমিত্রাকে গন্তব্যস্থানে যেতে দেখেই উপবিষ্ট অনেকে উঠে পড়েছিল। সম্মিলন থেকে এক জন উঠ্‌লেই সম্মিলনে ভাঙ্গন ধরে, সকলের মনে সভাভঙ্গের সঙ্কেত সঞ্চারিত হয়। সুমিত্রাকে যেতে দেখেই সভাভঙ্গ হ'য়ে গেল, আবার জনতা বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়্‌ল।

সুমিত্রা দ্রুতপদে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল। তার সহ-পাঠীরা দৌড়ে গিয়ে তাকে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—আপনি যাচ্ছেন?

সুমিত্রা কম্পিত মৃদুকণ্ঠে শুষ্কমুখে বল্‌লে—হ্যাঁ—

সতীশ স্মিতমুখে বল্‌লে—আবার পাঁচ বছর পরে ধরা ক'রে আস্‌বেন—

সুমিত্রা চলন্ত গাড়ী থেকে বল্‌লে—আস্‌বো···

গাড়ী ছুটে একটু অগ্রসর হ'তেই সুমিত্রার দুই চোখ ছাপিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল, তার বুক রুদ্ধ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি গাড়ীর কপাট টেনে বন্ধ ক'রে দিলে ও গাড়ীর গদীর উপর মুখ চেপে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

• • • •

আবার পাঁচ বছর পরের ওড-ফ্রাইডের প্রভাত। প্রাক্তন ছাত্রদের শুভ সম্মিলনের দিন। অধ্যাপক ও নূতন ছাত্ররা সমবেত হ'য়ে পুরাতন ছাত্রদের অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে। একে একে ছাত্রদের সমাগম হচ্ছে। এবারও এল সতীশ, জগবন্ধু, প্রদ্যোৎ, বিমল, ইয়্‌কান্, কাদের, তাহের। সকলেই উৎসুক হ'য়ে পথ চেয়ে আছে, এ বছর সুমিত্রা আস্‌ছে কি না। হিমাংশুও তো এখনও আসে নি।

একখানা গাড়ী ইউনিভার্সিটির হাতার মধ্যে প্রবেশ করল। সকলের উৎসুক দৃষ্টি আগ্রহে সেইদিকে আকৃষ্ট হ'ল।

গাড়ী পথের একটা বাঁক ফির্‌তেই সকলে দেখ্‌লে গাড়ীর মধ্যে বসে আছে সুমিত্রা। কিন্তু এবার তার মাথার উপর শাড়ীর লাল পাড় জল জল করছে না; বিধবার শুভ্র ধান ধুতির নির্মম নির্ম্মলতা তার বিষণ্ণ অথচ প্রশান্ত মুখখানিকে ঘেরাও ক'রে আছে।

সকলের মনের মধ্যে এক সময়ে এই কথাই সবিস্ময়ে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল—সুমিত্রা বিধবা হয়েছে! কবেই বা কোথায় কা'র সঙ্গে তার বিয়ে হল কেউ তো জানে না।

সুমিত্রার গাড়ী এসে সিঁড়ির সাম্‌নে থাম্‌ল। সুমিত্রা মর্ম্মর-সোপানে অবতরণ কর্‌লে। আজ কিন্তু কেউ তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা কর্‌তে পারলে না, সকলে বিষণ্ণ মুখে নীরবে নমস্কার কর্‌লে। সুমিত্রা স্মিতমুখে প্রতিনমস্কার ক'রে সোপানে আরোহণ কর্‌তে লাগ্‌ল।

সেই সময় জনতার ভীড় ঠেলে হিমাংশু সম্মুখে অগ্রসর হ'য়ে এল। তাকে দেখেই তার বন্ধুরা উল্লসিত স্বরে ব'লে উঠল—এই যে হিমাংশু এসেছে?

তখন সকল বন্ধু একত্র হয়ে নিজেদের জীবনের পাঁচ বৎসরের সংবাদ বল্‌তে ও জান্‌তে ব্যাপৃত হল; যারা এসে উপস্থিত হতে পারে নি, তাদের সংবাদও তারা পরস্পরের কাছে প্রশ্ন ও সন্ধান করে জানতে লাগল। এই পাঁচ বছরে কা'র কতখানি উন্নতি হয়েছে, কা'র স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, কা'র সন্তান হয়েছে বা মারা গেছে, কোন্ বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে ও তার পরিবারের অবস্থা এখন কেমন—এই সংবাদের আদান-প্রদানে বন্ধুদের মনে সুখদুঃখের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম চল্‌ছিল।

জগবন্ধু জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সুমিত্রা বিধবা হয়েছেন দেখ্‌ছি। কা'র সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছিলো—

হিমাংশু বল্‌লে—তা তো জানি না। তবে উনি এখন স্কুল ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্·····সুবন্ধুর মাকে আর স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন·····আমি সুবন্ধুর মার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলাম, দেখ্‌লাম সুমিত্রার বস্‌বার ঘরে একটা কাচের ফ্রেমে সুবন্ধুর ডিগ্রোমা আর মেডেল গুলি বাঁধানো আছে·····

সতীশ বল্‌লে—সুবন্ধু যে ব'লেছিল যে সে এক জনকে ভালোবাস্‌ত, সে বোধ হয় এই সুমিত্রাই হবে·····

হিমাংশু সতীশের সন্দেহের সম্ভাবনীয়তা চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে উন্মনস্ক ভাবে বল্‌লে—তাই হতে পারে·····

জগবন্ধু সন্ধানতরা দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে একবার তাকিয়ে সম্মানের স্বরে বল্‌লে—সে যাই হোক, সুমিত্রা যে সুবন্ধুর যথার্থ সু-মিত্রা তা সে সুবন্ধুর অনাথা মাকে ও স্ত্রীকে

আশ্রয় দিয়ে প্রমাণ করেছে·····আমরা বন্ধুর বিপদে কিছুই করতে পারি নি·····

এই সময় ভাইস-চ্যান্সেলার সুমিত্রাকে বলছিলেন—আমি ভাবছি প্রত্যেক বছর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলন করবার ব্যবস্থা করব—ওল্ড ষ্টুডেন্টস্ রি-ইউনিয়ন বছরে বছরে হবে। তোমরা বন্ধু-প্রীতির যে দৃষ্টান্ত দেখালে, এটিই পরবর্ত্তীদের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে·····

সুমিত্রা ম্লানমুখে হেসে বললে—কিন্তু স্পেনের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ধাদিত্তো বেনেভাবে বলেছেন—

বন্ধু হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা সকলেরই থাকে, কিন্তু ঠিক যে সময় তার দরকার হয়, তখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না!

ভাইস্-চান্সেলার বললেন—আশা করি, তোমাদের মধ্যে কেউ না কেউ ঐ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে।

সুমিত্রা লজ্জিত হয়ে মুখ নত করলে, কিন্তু তার মুখ আত্মপ্রসাদের স্নিগ্ধ অনাবিল আনন্দের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হরি বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দনা

নমি—বৃন্দাবনমনোময়-নবনীত
কান্ত সুন্দর ইন্দু।
প্রেম—মুগ্ধ-গোপীজন-চিত্তবিগলিত
দুগ্ধরসধারা-সিন্ধু।
তুমি—ভক্ত-বৎসল হরি হে।
জয়—জীবন-বল্লভ, ভুবন-দুর্ল্লভ
চরণ-পল্লব স্মরি' হে॥ ধ্রু॥

নমি—সিদ্ধ বেণুকর, ছন্ন রাধাধর-
পল্লরেণুহর ভৃঙ্গ।
তুমি—নন্দ-যশোমতী-হর্ষ-সৌরবে
তুঙ্গ গিরিবর শৃঙ্গ।
তুমি—গোষ্ঠপালিকার কণ্ঠ-মালিকার
শ্রেষ্ঠ নীলমণি রত্ন,
চির—তীর্থ-গোকুলের মূর্ত্ত দেহাকুল
আর্ত্তি মমতার যত্ন।
কল—বিম্ব-বিলসিত অম্বুকেলি-রসে
হংসরাজ সমতুল্য।
ঘোল—যমুনা-নীল-জল-সন্তরণ-চল
কান্ত শতদল ঘূর্ণ।

তুমি—নেত্র-মনোহারী বেত্র-বনচারী
চিত্র-চূড়াধারী রমা।
নমি—তিলক-বননীপ-পুলক-সন্দীপ,
বালক ব্রজাধিপ সোম্য।
তুমি—হিরণ-ধটীপট-শোভন-কটিতট,
মোহনপটু নট কুঞ্জে।
তব—অঙ্গ-পদতল গুঞ্জ-মুকুত
বহু মঞ্জীরপুঞ্জে।
ক্ষীর—নবনী-সর-চোর অবনীভার-হর
নবীননীরধর-কান্তি,
ধ্রুব—লক্ষ্যে দাও মতি, মোক্ষে দাও গতি
বক্ষে প্রেমরতি শান্তি।

তুমি—মোহন বেণুতানে ডাক' হে।
বাতুল অশরণ আতুর মূঢ়জনে
রাতুল শ্রীচরণে রাখ' হে॥ ধ্রু॥

শ্রীশৈলজানন্দ

চিরদিনের সুর

৮

বর্দ্ধমান জিলার আদিত্যপুর এক সময় একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল বটে, তবে এখন তাহার সেই আগেকার ক্রম-বর্দ্ধমানশ্রী সৌন্দর্য্যটুকু ক্রমশই হ্রাসের দিকেই নামিয়া চলিয়াছে; বৃদ্ধির সহিত কোনই সংস্রব দেখা যায় না। গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব নেহাৎই মন্দ নাই। ম্যালেরিয়ার উপকরণেরও বড় অভাব নাই। যথা,—পচা ডোবা, তাহার ধারেই ঘনসন্নিবিষ্ট বড় বড় বাঁশঝাড়। ঐ বাঁশের পাতা ঝরিয়া ডোবার জলে সহজেই পড়িতে পায় এবং তাহার পচা জলকে সর্ব্বাধিক পরিমাণেই পচাইয়া তুলে। এ ছাড়া গ্রামখানিতে মানুষের বাস যতই হ্রাস পাইতেছে, কালকাসন্দা, কচু ও ঘেঁটুবনের বৃদ্ধিটা ঠিক সেই হিসাবেই দ্রুততর বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে না কি, মানুষের অপেক্ষা ইতর প্রাণী এবং তদপেক্ষাও উদ্ভিদ্ রাজ্যের প্রজনন-শক্তিটা পারসেণ্ট ধরিয়া হিসাব করিলে অনেক গুণই উপরে উঠিয়া পড়ে, তাই সেই হিসাবের অনুপাতে মানুষ কমার চাইতে জঙ্গলাংশটাও বাড়িয়া চলিয়াছিল।

গ্রামের মধ্যে মিত্তিররা, চৌধুরীরা, বাচস্পোত (পূর্ব্বজন বাচস্পতির উত্তরপুরুষ)রা এবং চাটুয্যেরা পূর্ব্বে এ গ্রামের মধ্যে গণ্যমান্য এবং কেহ কেহ বেশ বর্দ্ধিষ্ণুও ছিলেন। চাটুয্যে-গিন্নীর প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীতে এখনও অবশিষ্ট গ্রামবাসীর পানের জলের সঙ্কুলান চলিতেছে, চৌধুরীদের আধভাঙ্গা প্রতিমা-আগমনশূন্য পূজার দালানে এখনও তাঁহাদের স্থাপিত পাঠশালা বর্ষা-শরতে ম্যালেরিয়ার আলায় বন্ধ থাকিয়া শীত-গ্রীষ্মে কোন মতে টিম্‌টাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বাচ-স্পোতরা তেমন নাম-রাখার হিসাবে কোন একটা স্থায়ী কীর্ত্তি করিতে পারেন নাই বটে, তবে মিত্তির বাবুর সংস্থাপিত ডাক্তারখানাটাই আপাততঃ এ গ্রামের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী হওয়ায় আপামর জনসাধারণের আশীর্ব্বাদের ভাগী তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইতে পারিয়া—বোধ করি বা সেই পুণ্যবলেই কলিকাতায় বসিয়া বড় আফিসে মোটা মাহিনা এবং মার্ব্বেল পাথরের কক্ষভূমি ইলেক্‌ট্রিক লাইটের আলো পাখা এবং প্রকাণ্ড কোল-কার তাঁহারাই ইঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ উপভোগ করিতেছিলেন।

এই হাঁসপাতালে একটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নেটিব ডাক্তার নিজের অস্থিচর্ম্মসার হাতখানিতে সকাল ৭টা হইতে বেলা ৯॥টা পর্য্যন্ত তথায় সমাগত তদবস্থ অতিথি-বর্গকে কুইনিন মিক্সচার বণ্টন করিয়া থাকেন। দেবাসুর যুদ্ধের পরে সুধাবণ্টন লইয়া দেবতা এবং অসুরের মধ্যে যে রকম হড়াহড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, তেমনই ঐ দুটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধির প্রচেষ্টায় রোগগ্রস্ত দেহ ও শুষ্ককণ্ঠ গ্রামবাসী কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দিত। বলা বাহুল্য, এই ম্যালেরিয়া-সুধা আহরণার্থ শুধু এ গ্রামের নয়, আরও দুই তিনখানা ভিন্ন গ্রামের লোকও এই মিত্র বাবুদের প্রতিষ্ঠিত সুধাভাণ্ডের চারি পার্শ্বে প্রত্যহ আসিয়া জমা হইয়া ক্রমশই হাঁসপাতালের খরচা বৃদ্ধি করিতেছিল। অবশ্য ইহার জন্য ডাক্তার বাবুর ঘরের পয়সা খরচ করিতে হইতেছিল, এমন কথাটা বলিতে পারিব না। রোগীর সংখ্যা যতই বাড়িতেছিল, মিক্সচারে একোয়া বর্দ্ধিত হইয়া কুইনিনের মাত্রা ততই কমিতেছিল। উপায় কি? এক প্রকারে দায়মুক্ত করিয়া লইতে হইবে ত? কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেওয়াও ত ভাল। আর ইহারা ত ভোজের নিমন্ত্রিত নয়, নিত্য-পোষ্য। তা' এ বিষয়ে

শান্তিজল !

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছদ্মবেশিনী মোহিনীর তুলনায় আমাদের ডাক্তার বাবুটি লোক ভাল!

আদিত্যপুরের প্রসিদ্ধি কিন্তু তাহার ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ অথবা ডাক্তার বাবুর তৈয়ারী ম্যালেরিয়া-মুণ্ডার জলাধিক্যের জন্য নহে, এই পূর্ব্বতন সুসমৃদ্ধ এবং ইদানীন্তন শ্রীভ্রষ্ট গ্রামের মধ্যে এক সুপ্রাচীন দেবমন্দির থাকাতেই ইহা প্রায় ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভের দাবী তুলিতে সমর্থ। হয় ত বা অদূর ভবিষ্যতে কোন দিন না কোন দিন তাহা তুলিবেও। ঐ মন্দিরের নাম আদিত্যেশ্বরের মন্দির। আদিত্যেশ্বর মহাদেবের নাম। জনশ্রুতিবন্দিত ভগবান্ সূর্য্যদেব যে সৌর ছিলেন, এই মন্দিরেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কবে, কি উপলক্ষে তিনি শিবভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন, ইতিহাস-পুরাণে সে কথা লিখিত না পাওয়া গেলেও প্রত্নতত্ত্ব ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যখন উপস্থাপিত করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া স্বীকারও করিয়া লইতে হইবে। পুরাকালে না কি গরুড়পক্ষী যখন গজ-কচ্ছপ লইয়া আকাশে উড়িয়া সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়াছিল, তখন দ্বিতীয় রাহু মনে করিয়া এবং এই নূতন রাহুর বিশালতায় সবিশেষ ভীত হইয়া সূর্য্যদেব না কি এইখানে আসিয়া,নির্জ্জন শতরূপা নদীতীরে বহু বর্ষের কঠোর তপস্যায় দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া মহাভয় ভঞ্জন করেন। সূর্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দির ও দেবমূর্ত্তিই আজ পর্য্যন্ত এই আদিত্যেশ্বর নামে বিখ্যাত। এখানে পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী ও দূরস্থ অনেক যাত্রীর ভিড় বার মাসই লাগিয়া থাকিত। ঠাকুরের দেবোত্তরের ভূমিও নেহাৎ কম নহে, তাহার উপর যাত্রীর আয়েও টাকা উঠিত। এখন কলির ও ম্যালেরিয়ার প্রবলতায় যাত্রিসমাগম অর্দ্ধেকও নাই, তবে শিবরাত্রির সময় একটি বড় রকম মেলা হয় এবং সেই সময় এখনও দুই চারি হাজার যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে। দেবোত্তরের আয় না কি পূর্ব্বে সত্তর হাজারের কাছে ঘেঁষিয়াছিল, এখন নানা কারণে আবাদ প্রভৃতি নষ্ট হওয়ায় তত্তটা নাই, তবু পঁচিশ হাজারের কম হইবে বোধ হয় না।

অন্যত্রও যেমন এখানেও তেমনই মোহান্ত-মহারাজের চেলা মহারাজদের মধ্য হইতেই এক জন মোহান্ত গদীতে বসেন। যিনি ভাবী মোহান্ত, তিনি পূর্ব্বাবধিই এক রকম মোহান্ত দ্বারা জনসাধারণে চিহ্নিত হইয়া থাকেন, এ ক্ষেত্রে এবার সে রকম কোনটিকেই দেখা গেল না।

মহেশ্বরানন্দ বলিয়া বহু পূর্ব্বে যাহার নামকরণ করা হইয়াছিল, সে নিজেও অনেকটা এবং সাধারণ লোক সম্পূর্ণরূপেই একদা মনে করিয়াছিল যে, ইনিই ভবিষ্যৎ মোহান্ত।

কিন্তু ইদানীং সত্তর পার হইয়া এবং অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের দ্বারা একবারে অসমর্থ হইয়া পড়িবার পরে যখন হইতে ভবানন্দ পুরী নিছক ধর্ম্মপথে মনোযোগী হইয়া পড়িলেন, তখন হইতেই তাঁহার এই মহেশ্বরানন্দের পরেই যেন কেমন একটা বিশেষ বিরাগ দৃষ্ট হইতে লাগিল। যে মহেশ্বর তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল, সে এখন একটা আঙ্গুলের হুঙ্কারেও লাগে না। কিন্তু তাই বলিয়াই তিনি যে মহেশ্বরানন্দকে খর্ব্ব করিয়া আর কাহাকেও তাঁহার বাহুমায় উঠাইয়া লইলেন, তাহাও নহে; ও ভারমাটী খালিই থাকিল।

মোহান্তজী তাঁহার সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ, চেলা ইত্যাদির ভিড় কাটাইয়া একটুখানি নির্জ্জন কোণের ভিতর নিজেকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিলেন। এতদিন যাহারা তাঁহার কাছে কাছে ফিরিয়াছে, এখনও কাছে কাছেই ভিড় করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে তাহারা নিরস্ত হইল না, তবে ঠিক কাছাকাছি পৌঁছিতেও যে পারা যায় নাই, সেইটুকুই তাহাদের মনে সর্ব্বদা স্পষ্ট হইয়াই থাকিল এবং ইহার জন্য অস্বস্তিও তাহাদের মনের মধ্যে নেহাৎ কম জমিয়া থাকিল না।

মোহান্তের এই হঠাৎ বৈরাগ্যকে অনেকেই তাঁহার আসন্ন-প্রায় বাহাত্তর বৎসরের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়াই খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেকেই আশা করিল, এতটা অস্বাভাবিক প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের ফলে তাঁহার এইবার এই নশ্বর দেহটারও বিবর্ত্তন ঘটা কিছু বিচিত্র নাও হইতে পারে; অতএব এই সময় হইতেই নিদানের বিধান লওয়ার সুযুক্তি গ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য! অবশ্য এই কর্ত্তব্য শিক্ষাটা শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যেই প্রচার করিতে লাগিলেন, শিক্ষার্থীর সম্মুখে এ কথার উল্লেখ করা অবশ্য একটুও সম্ভব ছিল না।

এই সময় সহসা একটি নূতন শিষ্যকে মনপুতা মোহান্তের পদে বসাইয়া দিয়া সত্য সত্যই ভবানন্দ

মহারাজ জনমতকে সার্থক করিয়া তুলিয়া দিবলোক অথবা অশিবলোকে যাত্রা করিলেন। নূতন মোহান্তের নাম হইল মহেশানন্দ। মহেশানন্দ শিক্ষিত, বিনীত, সুচরিত্র; তবে একান্তই অন্তর্ভাবী এবং লোকসঙ্গবিমুখ। তাই জনপ্রিয় হইতে পারিলেন না।

এই সবর একটা নূতন কিছু ঘটিল। বর্ষা চলিয়া গিয়াছে। শরতের হলদে আলো এবং সাদা কাশ এক সঙ্গে প্রচুর হইয়া দেখা দিয়াছে। শহরপ্রায় দুইটি তীর ভরিয়া সবুজ লতার ছোট ছোট বেগুনী রংএর অজস্র ফুল ফুটিয়া ঝুঁড়ি ধরিয়া রহিয়াছে। বাঁশঝাড় কোথাও ডোবার উপর, কোথাও বৃষ্টি-জমা জলের ধারে, কোথাও নদীজলে নত হইয়া পড়িয়াছে। কচুপাতা বাতাসে তর্ তর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এ-দিক ও-দিক বর্ষা-জলপুষ্ট ডোবার গায়ে তেলাকুচার লতা উঠিয়া তাহাদের যেন নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। উহারই গায়ে গায়ে তাহার রাঙা সবুজ ফল এবং সাদা সাদা ফুল বাহারের হিসাবে বড় দেখাইতেছিল না। বটগাছের কুরির খুঁটীতে দোলনা বাঁধিয়া রাখাল ছেলেরা ঝুলনপর্ব্বের পুনরভিনয় করিয়াছে—তাহারই চিহ্ন প্রকটিত। গাছের ডালে শালিক পাখীর ঝাঁক কিচির-মিচির করিয়া সবুজ ঘাসের বুকনলে চিত্রকরা চঞ্চুইগুলার ঘাসের বিচি খুঁটিয়া খাওয়ার আনন্দ-ভোজের চিক্‌চিকানীর সঙ্গে সঙ্গত করিতেছিল।

চারিদিক্ দিয়া একটা ভালর মন্দর মিশ্র গন্ধ জলধৌত প্রসন্ন বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

আদিত্যেশ্বরের নূতন মোহান্ত এখন আর নূতন নাই, তাহার পর সুদীর্ঘ ত্রাবিংশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আজ তিনি পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। এ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনটাই নিঃসঙ্গ নিরানন্দ ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। আজও সেই সুখ-হীন নিস্পৃহ জীবনেই তিনি অভ্যস্ত।

মোহান্ত মহেশানন্দ তাঁহার বসিবার ঘরের সামনের 'দৌড়দার' বারান্দায় একখানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ছিলেন। পূর্ব্বে এখানিতে যাহাই থাক, এখন সেই নরম ডেলভেটের উপর একখানি হরিণের ছাল আঁটা,গায়ে তাঁহার পূর্ব্বমোহান্তের মত কোমল স্প্রেক শিল্পের গেরুয়া আলখাল্লা ও তাহার ভিতর ঐ জিনিষেরই অন্তর্ব্বাস নাই এবং এগুলিকে এখন প্রত্যহ ধোলাই করিয়া প্রত্যহ নূতন গেরুয়া রংএ ছোপানও হয় না, তিনি এগুলি বড় জোর হপ্তায় একবার করিয়া সাবান দিয়া কাচাইয়া লয়েন। উহা মোটামুটি ভাবেই মোটাকাপড়ে প্রস্তুত। ধোপা বাড়ীর ধোয়া জিনিষ মোহান্তজী তাঁহার নিজের শরীরে ঠেকিতে যেন না, উহা মোহান্তদের নিয়ম নহে, তবে গুরু মোহান্তের কথা ছাড়িয়া দাও।

বারান্দার বাহিরে দুই পাশে দুইটি কদম গাছ যেন সুখ-কণ্টকিত শরীরে একরাশ ফুলের ভারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের দুই পাশে ফুলগাছের কেয়ারি সার বাঁধিয়া চলিয়া গিয়াছে। করবীর রাঙা সাদা ফুলে যেন আপনা হইতেই তোড়া বাঁধা হইয়া আছে। কিন্তু ফুলগাছের রঙের উজ্জ্বলতায় তাহাদেরও অতটা রূপ যেন জলুষ হারাইয়া ছিল, প্রজাপতিগুলা নানাবর্ণের রেখা গায়ে টানিয়া দিয়া মুক্তোজ্জ্বল প্রকৃতির মাঝখানে নিজেদের রূপ বিলাইয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু এতটা যে সৌন্দর্য্য চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, সে দিকে মোহান্তের দৃক্‌পাতই ছিল না। তাঁহার জড়তাময় চিত্ত নিজের মনের জীর্ণতায় আজও নিখিল প্রকৃতিকেই যেন জীর্ণ ও পুরাতন বলিয়াই বোধ করিতেছিল। ফুলফোটা ফল-ধরা, কিছুই যেন আর সেই বিস্ময়বিহীন-স্তিমিতদৃষ্টি নেত্রের সমক্ষে নূতনত্বের সমাবেশ করিতে পারে না, যে দিকেই তাঁহার চির-অস্বচ্ছন্দ মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া চোখ ফিরিতেছিল, মনে হইতেছিল, উহারাও যেন তাঁহারই মত রিক্ত ও চির-পুরাতন মন-প্রাণ লইয়া একঘেঁয়ে পড়িয়া আছে।

এখানকার সম্পত্তিতে যেন রীতিমত বড় একটা জমি-দারীর আয়। একটা বাঁধা আয় থাকিলেই, সেটা ভোগ করার জন্য লোক চাই। এই দেবোত্তর ভোগ করিবার জন্যও সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে অথবা তাহার অনতিবিলম্বিত দিন হইতে সেই বিপুল অর্থরাশির এক জন উপভোক্তাও স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল। অবশ্য এ রকম স্থলে যেমন হইয়া থাকে, বিধানকর্ত্তা বোধ করেন যে, ভোক্তাকে একখানা গেরুয়া পরাইয়া দিতে পারিলে আর তাহার উপভোগের উপায় থাকিবে না, অতএব তখন নিশ্চিন্ত হইয়া সমস্ত দেবোত্তরের উপস্বত্ব তাহার হাতে ফেলিয়া দিতে পারা যাইবে এবং ঐ অর্থরাশি লইয়া তিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-চিত্তে কদলীপত্রে কাঁচকলা দিয়া হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিতে করিতে সাধারণের জন্য

অসাধারণ পুণ্যকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। দেবতার সম্পত্তি নানারূপ দৈবকার্য্যে অতি সাত্ত্বিকভাবেই নিয়োজিত হইতে পারিবে। কিন্তু মানুষ যদি অতি সহজ পশু হইত, তাহা হইলে ইতর প্রাণীদের সমাজের মত মনুষ্য-সমাজটাও সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যবর্জ্জিত হইয়া যাইত। মানুষ নিজেকে অত সহজেই বঞ্চিত করিতে পারে না। ডেন্‌জার-সিগনাল্ স্বরূপ সৈরিক বাসখানা যদিও এ পুরীর মোহান্ত মহারাজদের পারিবারিক সুখসম্ভোগে বঞ্চিত রাখিয়াছিল, তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশই প্রকাশ্য বিবাহের পরিবর্ত্তে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়া লইয়া চলিতেন, যাহাতে তাঁহাদের গেরুয়ার সম্মানটা বজায় রাখিয়াই তাঁহাদের ঘর-করণার সাধটাও মিটিতে থাকে। তা' বিবাহের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অপেক্ষা এমন ধারা সন্ন্যাস করা যে আঠারোগুণেই প্রার্থিত, সে কথাটা তাঁহারাও বুঝিতেন, নতুবা ঠাকুরবাড়ীর প্রথম দলিলেই ত লেখা আছে, যে মোহান্ত মহারাজ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি তাঁহার প্রথম চেলার হস্তে মোহান্তী সঁপিয়া দিয়া অনায়াসেই তাহা করিতে সমর্থ, কিন্তু আবহমানকালের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা ঘটিবার একটিও নজীর নাই। অথচ সেই আবহমানকাল ধরিয়াই দেশের মধ্যে ইঁহাদের সম্বন্ধে এমন সব কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় যে, সময় সময় সে সব কথায় কানে আঙ্গুল না দিয়া থাকা যায় না এবং এ সব আলোচনায় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর দুইটি দল তৈয়ারী হইয়া কদাচিৎ লাঠালাঠিরও জোগাড় করিয়া তুলিয়া থাকে, এমনও জানা গিয়াছে। যাক্, সে সব অমন অনেক দেবস্থানেই ঘটিয়া থাকে। দেবতার পার্শ্বেই দানব থাকে, মানবের ভাগ্যে এ সৌভাগ্যটা দৈবাৎ ঘটিয়া উঠিতে দেখা যায়। এই দেখুন না, বাঙ্গালার তারকনাথ হইতে বেহারের বোধগয়া—আবার উত্তরাখণ্ডের ভুবনবিখ্যাত যোশীমঠ, বদরিকাশ্রম উর্দ্ধমঠ এবং গোপেশ্বর ইত্যাদি বিখ্যাত বড় বড় মঠ—আরও কতই না অখ্যাত ছোট বড় মঠের মঠাধীশদের ভাগ্যে এ সব কু-যশ কু-কীর্ত্তির মালা পরার অবসর ঘটিয়াছে, তাহার ঠিক কি? এক আধ জনকে ব্যতীত তাই বলিয়াই ত আর স্থানচ্যুত হইতে হয় নাই! বড় জোর সরকারের একটুখানি চোকরাঙ্গানি দেখিতে হইয়াছে বই ত নয়। তা হউক, পেটে খাইলে পিঠেও সহ্য করা যাইতে পারে।

কিছু দিন আগে এই আদিত্যেশ্বরের যিনি প্রধান পাণ্ডা বা মোহান্ত ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধেও জনমতটা বেশ অনুকূল ছিল না। সম্মুখে যাহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ওই সাক্ষাৎ শিবাবতারের চরণরেণুকণা প্রলিপ্ত করিত, অন্তরালে তাহারাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কুৎসা করিয়া বেড়াইত। নিন্দাটা অবশ্যই মুখের উপর হইলে কাহারও রুচিকর হয় না এবং এ দেশে একটি প্রবল প্রবাদ বাক্য আছে যে, আড়ালে রাজার মাকেও ডাইন বলা যায়। তখন রাজার মা না হইলেও স্বয়ং রাজতুল্য ঐশ্বর্য্য-ভোগপরায়ণ হইয়া যে মোহান্তঠাকুর কাহারও নেপথ্য আলোচনারও অযোগ্য হইয়া উঠিবেন, এতদূর তুচ্ছ তাঁহাকে আমরা মনে করি না।

মোহান্ত ভবানন্দপুরী ইদানীং অকালবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য তখনও বৎসর বৎসর তাঁহাকে প্রচুরতররূপেই উপস্বত্ব যোগাইয়া দিতেছে, ভোগের আকাঙ্ক্ষাও না কি মানুষের কোন দিনই নিবৃত্ত হইবার জিনিষ নয়, কাযেই সেটাও ঠিক বজায় আছে; তবে বিপদ ঘটিয়াছিল ভোগ করার শক্তিটাকে লইয়া। সে না কি ধরা-বাঁধা দেবোত্তর সম্পত্তিও নহে এবং অতি সূক্ষ্ম পদার্থও এক প্রকার অবস্তু স্বরূপ আকাঙ্ক্ষাও নহে। কাযেই তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করা আছে, ইহার বাহিরে সে এক পাও হাঁটিতে অসমর্থ। মোহান্ত ভবানন্দ যদিও সত্তরের কোঠায় চলিতে চলিতে আপনার ভোগ-দেহটাকে ভিতরের তীব্র আগ্রহ ও বাহিরের অজস্র উপকরণ দ্বারা অনেকটা ভোগক্ষম রাখিয়াছিলেন, যে দিন সে সত্তরটা পার হইল, সেই দিনই কিন্তু সে সজোরে এই চেষ্টার জবাব দিয়াছিল। খাওয়া আর হজম হয় না, ব্রহ্মচারী মোহান্তের পক্ষে যে জিনিষটা সর্ব্বাপেক্ষা নিষিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধীয় সেই নিষেধটা এত দিনে পালন করার কথা স্মরণে আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে এত দিনের ঘোর বিলাসী ভবানন্দ হঠাৎ একটি নৈষ্ঠিক সাধুসন্ত ধার্ম্মিক মোহান্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিলেন। তবে বেশী দিন এই বিড়ম্বনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল না, এইটুকুই তাঁহার শান্তি!

আদিত্যেশ্বরের মোহান্তরা দশনামী সম্প্রদায়ের মধ্যস্থ পুরী উপাধিধারী। ব্রহ্মচর্য্য ইঁহাদের সকলের জন্যই বিশেষ-বিধি, তদ্ব্যতীত ভবানন্দ নিজের 'মহাযাত্রার রথচক্রের

মহা নির্ঘোষ শুনিতে পাইয়া সহসা এমনভাবেই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এই মহা নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলে যে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হইবে, তত বড় পাপ হইতে বিরত থাকিবে, তেমন একটি ভাগী মোহান্ত কোথায় পাওয়া যায়? নিজের আশে পাশে চোখ বুলাইয়া তেমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না, যাহাকে এই কঠিন কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় একদা মহেশানন্দের অদৃষ্টের ঘটায় এই মহাচিন্তার হাত হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। মহেশ ঠিক গুরুর বিপরীত স্বভাবের লোক। অতি কঠোরভাবেই জীবন কাটাইয়া এতদিন পরে মহেশানন্দও যেন তাঁহার অভ্যস্ত জীবনে কিছু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন।

একটা অজানা নূতনের জন্য প্রাণ তাঁহার এতদিন পরে যেন মধ্যে মধ্যে হায় হায় করিয়া উঠিতেছিল। এ জীবন যেন আর সহ্য হয় না।

সে দিন অকস্মাৎ এই চিরপুরাতনের মধ্যে এক নূতনের অভ্যাগম ঘটিয়া গেল। অনতিবিলম্বিত সন্ধ্যায় একটি অচেনা পথিক আসিয়া হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল, "আমি একটুখানি আশ্রয় চাই; পাব কি?"

ভিখারী অতিথি। ইহাদের এতটা দূর পর্য্যন্ত আসিতে দেওয়া কোনকালেই এখানকার বিধি নহে। এই লোকটি সেই সনাতন বিধির বিধান হইতে কেমন করিয়াই যে মুক্তিলাভ করিয়া একবারে এই খাস দরবারে আসিয়া পৌঁছিল, ইহা একটুখানি বিস্ময়ের বিষয় বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মোহান্তকে সে সম্বন্ধে বিস্মিত হওয়ার অবসর দিল না যে জিনিষটা, তাহা ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়াই। সেটা এই আশ্রয়-প্রার্থীর কণ্ঠস্বর হইতে তাহার সমস্ত চেহারাটা! এই যে ছেলেটি একটুখানি তুচ্ছ আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, ইহার গলার স্বরে কিন্তু যথেষ্ট বিনয় থাকা সত্ত্বেও ইহাকে এত তুচ্ছ যাচ্ঞাকারী বলিয়া কোনমতেই প্রমাণ দিতে পারিল না। আর মানুষের চেহারা যে এত সুন্দর হয়, এ যেন বিশ্বাস করাই যায় না!

গায়ে একটা মুটিয়ার আলখেল্লা, সেটার একবারে আনকোরা গেরুয়ার রং। সে রং তাহার সেই রংয়ের সঙ্গে মিশিয়া পড়া গায়ের উপর জায়গা-জায়গায় উঠিয়া আসিয়াছে। মাথায় ঐ রংয়ের ঐ জিনিষেরই একটা প্রকাণ্ড পাগড়ী, হাতে একগাছা মোটা লাঠী। এই সাজ-পোষাকেই লোকটি যেন অপরূপ! সাধারণতঃ এ রকম সাজে কমবয়সী ছেলেদের একটু যেন ওস্তা গোছেরই দেখায়, কিন্তু এই নিতান্ত কিশোরবয়স্ক এবং অত্যন্ত সুরূপ চেহারার ছেলেটিকে এই পোষাক এত সুন্দর মানাইয়াছিল যে, উহাকে একবার দেখিলে যেন আর চোখ ফিরাইয়া লওয়া যায় না; মনে হয়, শত চক্ষু হইয়া জন্ম জন্ম ধরিয়া ইহাকেই চাহিয়া দেখি! প্রৌঢ় মহেশানন্দ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে এই তরুণ কিশোরের অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তিটির সমুদয় রূপ যেন তাঁহার লোলুপ পিপাসিত দৃষ্টি দ্বারা শুষিয়া লইতে লাগিলেন। আগন্তুকের প্রার্থনাটুকু পূর্ণ হইল, কি হইল না, এ সম্বন্ধে যে তাঁহার একটা জবাব দেওয়াও দরকার ছিল,সে কথাটা তাঁহার মনেও পড়িল না। এ দিকে ছেলেটি এমন করিয়া নিজেকে দ্রষ্টব্য হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং বিব্রত নতমুখে মৃদু-কণ্ঠে কহিয়া ফেলিল, "যদি আপনার সুবিধে না হয়, আমি চ'লে যাচ্ছি।"

এই বলিয়া সে যেন একটুখানি অনিচ্ছা-মন্থর পদে অত্যন্ত ধীরে ধীরেই পিছন ফিরিল।

আকাশে যতক্ষণ চাঁদ থাকে, যে ভাবুক ব্যক্তি-নির্বিশেষে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, হঠাৎ তাহাকে মেঘঢাকা হইতে দেখিলে সে যেমন নিজের এতক্ষণকার রূপ-তন্ময়তা হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠে, তেমনই সেই বিস্ময়কর কিশোর-সৌন্দর্য্যকে সহসা প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ দেখিয়া মহেশানন্দের চটকা ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি উহাকে ফিরিতে দেখিয়া ঈষৎ যেন উৎকণ্ঠা-শঙ্কিতভাবে ব্যগ্র হইয়াই কহিলেন,—"যেও না, আমি তোমায় রাখবো।"

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুন্দর মুখে এতক্ষণ যে একটা গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া পড়িয়াছিল, সেটা হঠাৎ সরিয়া গিয়া তাহার সেই অপরূপ মুখ যেন রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্রের মুখের মতই সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল।

ছেলেটি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে গড় করিয়া প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন, এই নিতান্ত অচেনা অথচ বিশেষরূপে সম্মানিত লোকটির সাগ্রহ আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিতে বোধ করি কিশোর ঈষৎ

কুণ্ঠানুভব করিতেছিল, বোধ করি, সেই জন্যই সে একটুখানি সন্ত্রস্তভাবে নিজেকে দূরে রাখিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া নিজের কপালে ঠেকাইল। মাথাটা তাহার সেই দীর্ঘ পাগড়ীতে একবারে এমনভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল যে, মাথার মনঃকল্পিত ধূলার মত সূক্ষ্মবস্তুরও প্রবেশ-পথ ছিল না।

মহেশানন্দের প্রথম আবেগ তরুণের এই কুণ্ঠিত ব্যবহারে ঈষৎ যেন বাধা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু বাধা পাইলেই নিজেকে প্রত্যাহৃত করা সকল বস্তুরই ধর্ম্ম নহে। জল যেমন বাধা পাইলে চারিদিক্ দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাঁহার এই নূতন আগ্রহ তেমনই করিয়াই যেন বর্দ্ধিতবেগে এই অপরিচিত ছেলেটিকে কেন্দ্র করিয়া উছলিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার অকালবার্দ্ধক্যে তেজোহীন দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সম্মুখে নতমুখে উপবিষ্ট তরুণের মুখখানি গভীর প্রীতিভরে দেখিতে দেখিতে আবেগোত্তেজিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"আমি কি তোরই পথ চেয়ে এত দিন বসেছিলেম রে? কোথায় ছিলি এত দিন?"

তাঁহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া বাতাস-লাগা গাছের পাতার জমা বৃষ্টিজলের মতই অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে অশ্রু যে কত সুখের—কত দুঃখের, সে কেবল এক তিনি এবং তাঁহার অন্তরের যিনি নিত্য অধিষ্ঠাতা, সেই তিনিই জানিলেন। ছেলেটি হয় ত ভাল করিয়া কিছু না বুঝিলেও সে যে এখানে তাহার দরকারের অতিরিক্ত ভাবেই গৃহীত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। কে জানে কেন সে-ও কাঁদিয়া ফেলিল।

৩

ঐ যে ছেলেটিকে সে দিন সন্ধ্যাবেলায় মোহান্তজী তাঁহার কাছে আশ্রয় দিলেন, তাহার নাম না কি ভবেশ! নামটি শুনিয়া মহেশানন্দ মুখে কিছু না বলুন, মনের মধ্যে তাঁহার এই কথাটাই তখন প্রবল হইয়া উঠিল যে, এই ছেলেটিকে ভগবান্ নিশ্চয় আমার জন্যই তৈরি করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ না হ'লে যার নাম কার্ত্তিক, বিনোদ, অথবা সুকুমার হইতে পারিত, সে ভবেশ হইল কেন? এক বার তাঁহার মনে হইল, এটি যদি তাঁহার নিজের সন্তান হইত! কিন্তু এই কথা তাঁহার মনে হইবামাত্র মনটা তাঁহার ভাঁ করিয়া চমকিয়া উঠিল,"—ভগবান্ রক্ষা করুন! ভাগ্যে তাহা হয় নাই! তাঁর ছেলে হইলে এর পরিণাম সম্বন্ধে কিছুমাত্র ত নিশ্চয়তা ছিল না, এ তবু পরের ছেলে হইয়াছে বলিয়া শিষ্যত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! এই ঢের, ইহার অধিক লোভে কাষ নাই। আদিত্যেশ্বর এইটুকুই এখন বজায় রাখিলে বাঁচা যায়।

ছেলেটি মোহান্তের কাছেই রহিল। অতিথিশালা, অথবা অন্য পরিজনবর্গের মধ্যে সে নিজের স্থান লইতে গেল না। মোহান্তও তাহাকে এ-সম্বন্ধে একটি কথাও বলিলেন না, তিনি যেন মনে মনে এইটুকুই চাহিতেছিলেন, অথচ সে নিজে হইতে এই ব্যবস্থায় না আসিলে তাহাকে এ সম্বন্ধে কিছু মুখ ফুটিয়া বলিতে তাঁহার যেন কোন্‌খানটায় বাধিতেছিল, বোধ হয়, সেটা সন্ন্যাসীর বাহ্যাড়ম্বরের খাতিরে অথবা গার্হস্থ্য-মগ্ন মোহান্তীর মর্য্যাদায়। যাহা হউক্, ভবেশ যখন আপনা হইতে বলিল যে, সে এইখানেই একটুখানি নিরিবিলিতে থাকিতে চাহে, অত লোকের মধ্যে সে যাইবে না, তখন যেন কৃতার্থম্মন্য হইয়া সেই চিরগম্ভীর-প্রকৃতি ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী হইয়াও পাইবার আকাঙ্ক্ষায় আকণ্ঠ পরিপূর্ণ সন্ন্যাসী, সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তাইয়া গিয়া তাহার আবেদন অনুমোদন করিলেন। ফলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সকলে দেখিল যে, এই নূতন আসা আগন্তুকটি তাহাদের সকলকার একান্ত প্রার্থিত স্থানটিতে যে রকম ভাবে দখল লইয়াছে, বন্দোবস্তের লেখায় ইহাকেই মৌরসী পাট্টা বলা যাইতে পারে।

সকলেরই বুক কম বেশী ঈর্ষ্যার জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল, মোহান্তজীর চেলাদের ভিতর প্রধান প্রধান জন কয়েকের, বিশেষতঃ গুরু-ভাই মহেশ্বরানন্দের এবং শিষ্য উমেশানন্দের মুখ ঈর্ষ্যায় কালো হইয়া উঠিল। না জানি কোথা হইতে এই দুগ্ধপোষ্য শিশু সহসা বামন-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া দেখিতে দেখিতে তাহার ছোট ছোট দুইটি পদে স্বর্গমর্ত্ত্য ঢাকিয়া ফেলিয়া তৃতীয় পদে এখন আরও কিছু চাপা দিতে চাহে। এ যেন একটা বিপ্লব, যেন আকস্মিক ভূমিকম্পের অগ্ন্যুৎপাত, মহাপ্লাবন। কোথাও কিছু নাই, একবারে হু হু করিয়া আসিয়া পড়িয়া পুরাতনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চাহে। এ আপদের কি কোন শাস্তি হয় না?

চৌধুরীরা এ দেশ ছাড়িয়া অবধি এ দেশে আলোচনার জিনিষটা কিছু কম পড়িয়াছিল; কারণ, ক্রিয়াকর্ম্ম, ব্রাহ্মণ-ভোজন, এ সব করার লোক আর কই? সংসারের নিয়মই

এই যে, যাহার কাছে পাওনা আছে, তাহারই কাবের খুঁৎ ধরিয়া পাওনাদারেরা খুঁৎ খুঁৎ করে, সেখানে পাওয়ার আশা একবারেই ব্যর্থ, সেখানে মিথ্যা কেহ কথা কহে না।

দেখে বড় লোক থাকিতে আলোচনাও বড় বড় হইত। এখন যেমন দরের লোক, তাহাদের বিতর্কও তদনুরূপ। দিন-কতক পূর্ব্ব-মোহান্ত যখন প্রথম ধার্ম্মিক হন, সেই সময়টায় কিছুদিন ধরিয়া গাঁয়ের লোক মেয়ে-পুরুষে দুইটা কথা কহিয়া বাঁচিয়াছিল, আর বর্ত্তমান এখন।

মোহান্ত এই বুড়া বয়সে একটা পাগড়ী-বাঁধা পাঞ্জাবীদের ছেলেকে যে পুষ্যি বানাইয়াছেন, এই খবরটা দেখিতে দেখিতে আদিতাপুর ছাড়াইয়া কাছাকাছি যে কয়খানা গাঁ ছিল, সব কয়খানাতেই ছড়াইয়া পড়িল। আজকাল মেয়ে-পুরুষের জলস্থলের সকল বৈঠকে কেবলমাত্র ঐ একটিমাত্রই আলোচনা যে, মোহান্ত ঠাকুর তাঁহার পুরানো চেলাদের বঞ্চিত করিয়া, এক নূতন চেলা খাড়া করিয়াছেন। এই সঙ্গে অনেকেই আবার অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা করিলেন, বড় বড় টীকা, ভাষ্যকারদের হারাইয়া অনেক রকম টীকা-টিপ্পনীও চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "ভিতরের কথাটা যে না বোঝা গেছে, তা নয়, তত বোঝা কেউ নেই। উইল করে দে'বার ত আর উপায় নেই, তাই চেলা বানিয়ে ওয়ারিশানটাকে বজায় রাখতে হচ্ছে!"

কেহ বলিল,—"ও কথা কাবের কথা নয়! সে রকম যে এ মোহান্ত ঠাকুরের কেউ আছে, তা ত কোন দিনই কেউ শোনে নি, সে বরং আগের মোহান্তের সময় বল্‌লে সাজতো, এ ত সে রকম মানুষ নয়। তা' নয়,—কুড়নোই বটে; তবে ছেলেটার কি ব্যাপার, সেইটেই ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না! এত সুন্দর আর অত কম বয়সী ছেলে, সন্ন্যাস নে'বার ওর এর মধ্যে কি হলো যে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো?"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "ও যে কে, সে আমি ঠিক ধ'রে ফেলেছি, সাপের হাঁচি বেদে বই কি আন্‌লোকের চেন্‌বার সাধ্যি আছে! কোন দিন তোমরা কেউ ওর গান শুনেছ? শোন নি? তা হ'লে বুঝতেই পারবে না। ও রকম সুর এক কল্‌কাতা, দিল্লী আর লক্ষ্ণৌএর বাইজীদেরই গলায় আছে! যখন গান করে, মনে হয়, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি আপনি বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে!"

শ্রোতৃবৃন্দ এ সংবাদে একবারে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল, "বল কি? এমন ধারা? তা ত আমরা জানি নে, আর জান্‌লেই বা করব কি? তোমার মত আমাদের ত মহারাজের কাছে যাওয়া আসা নেই। তা' একটা দিন নিয়ে যেয়ে শুনিয়ে আনো না,—কেমন গায়, দুটো শুনে আস্‌বো।"

যিনি ভেবেশের গান গাওয়ার খবর দিয়াছিলেন, তিনি মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর দিলেন, "ছোকরাটা তেমনই কি না! সে দিন আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছি, তাই শুনতে পেয়ে গেছলাম, তার পর কত সাধ্যি-সাধনা করা হলো, কোনমতেই আর গান শেষ করলে না। মোহান্ত পর্য্যন্ত বল্লেন, 'গাও না, তাতে ক্ষতি কি!' তবু না! ভয়ঙ্কর একরোখা ছেলে।"

শ্রোতাদের মধ্যে এক জন প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ঐ যে তুমি তখন কি বল্‌ছিলে যে, ও কে, তা জান্‌তে পেরেছ, তা কৈ বল্‌লে না ত? ও কে, বলবে কি?"

আর একটি লোক ঐ সময়েই প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, গান যে গাইছিল, তার ভাষাটা কি? হিন্দি? না ফার্সি?"

বক্তা এক জনের কথার উত্তরে কহিলেন, "ও কোন নামওলা বাইজীর ছেলে, ওর রূপ দেখে আর গলা শুনে আমি ধ'রে ফেলেছি, ওর মাকে আমি কলকাতার এক রাজ-বাড়ীতে মুজ্‌রো করতে দেখেছিলুম কি না, তাই একে দেখেই চিন্‌তে পারলুম, আর ঠিক সেই গলাটি যেন বসানো আছে।"

"সে কত দিন হবে গা, চক্কোত্তী মশাই? এখনও তোমার ঠিক মনে আছে? আমার ত এক বছর আগে দেখা লোকের মুখ মনে থাকে না, গলাও কানে থাকে না।"

চক্রবর্ত্তী একটুখানি কৃপার সহিত হাসিলেন, "এ চক্কোত্তীর বেটার মাথাটা ভগবান্ হাইকোর্টের জজের মাথার মালমসলা দিয়ে গ'ড়ে ছিলেন যে! কেবল ঐ দু দিনের রাতে মা বেটী আমার ঘুমিয়ে পড়েছিল ব'লে কপালের লেখন-খানিই অন্যের সঙ্গে বদ্‌লে গেছে। আমি যখন দিল্লীওয়ালী বাইজীর গান শুনি, তোরা তখন কেউ হামা দিচ্ছিস্, কেউ হয় ত মায়ের গর্ভে যোগাসনে আছিস্, তবু যা এক বার এই কানের তারে ঘা দিয়েছে, সে একবারে ঐখানে কায়েম হয়ে ব'সে গেছে। বলি, এই কলের গান শুনেছিস্ ত? ঐ এক বারই না ওর মধ্যে গাওয়া হয়েছে, অথচ সুরটা সেখানে রয়েই গেছে! আমারও ঠিক তেম্‌নি।"

একটি কমবয়সী শ্রোতা কহিল, "আর ঠাকুর্দার চোখে বোধ হয় ফটোগ্রাফের প্লেট বসানো আছে ?"

ঠাকুর্দা সোৎসাহে যুবার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কহিলেন, "ঐ যা বলেছিস্ ভাই ! হ্যাঁ, তার পর নবদ্বীপে কি জিজ্ঞাসা করছিলি রে ? গান ছিল্লি না কাদি ? তা কেন ? খাসা পরিষ্কার বাঙ্গালা গানই ত গাচ্ছিল। কি যে ঐ গানটা—আমাদের খুবই ত জানাশুনো রে ! বেশ যে কথা-গুলি, সুরটিও একটু গম্ভীর গম্ভীর, ঐ দাঁওতালদের মাদল বাজানোর মত, হ্যাঁ, ভাল মনে পড়েছে,—

'গাও হে তাঁহারই নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
ধরায় যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।'

খাসা গাইছিল, কিন্তু আমায় দেখে চুপ করলে, কিছুতেই আর গাইলে না। না মাগী পয়সা নিয়ে গাইতো কি না, ছোঁড়া কি কর ! যেখানে কোন পাওনা নাই, সেখানে গাইবে কেন ?"

শশী ইহার প্রতিবাদ করিল, "বাঙ্গালা গান, তা হ'লে দিল্লীওয়ালী বাইজীর ছেলে কি বল্‌লেন ?"

এই অপ্রতিকল্প আবিষ্কারের মধ্যে এবম্প্রকার প্রতি-বাদে ঈষৎ চটিয়া উঠিয়া চক্রবর্তী কিছু রূঢ়স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "তার আর আশ্চর্যিটা কিসের রে শশে ? ওদের কি কোন জাত আছে না ভাষা আছে ? আরে ভাই, যদি থাকবে, তা হ'লে মহম্মদ সার নাতির অন্নপ্রাশনেও নাচলে, আবার কলকাতার ওই মহারাজার পৌত্তুরের বিয়েতেও মুজরো করতে এলো কি ক'রে ? ওরা ত ঐ রকম ভোল ফিরিয়ে ফিরিয়েই বাদশা থেকে বাবু পর্য্যন্ত বশ ক'রে রেখেছে।"

তরুণটি কহিল, "তা' যেন মান্‌লুম, তবে বাইজী-পুত্র হঠাৎ সাধু হ'ল কেন, এর কি ঠিক করেছেন বলুন ত ?"

চক্রবর্তী তখন নিশ্চিন্ততার হাঁফ ফেলিয়া, নিজের বহু-দর্শিতার আনন্দ হস্ত দ্বারা প্রকটিত করিয়া, মৃদু মৃদু হাস্যের সহিত মিশাইয়া দিয়া মীমাংসাটাকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—

"তা—ওই রকমই ত সংসার-ক্ষেত্রে ঘটে থাকে রে ভাই ! ও যদি না সাধু হবে, তা হ'লে তুমি আমি কি হবো ? মনের বিকার রে দাদা ! মনের বিকারে মানুষকে যে কোন্ দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে, তার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে ? ভেবেছে, এই রকম সাধু হয়ে একটি কোণের ভেতর লুকিয়ে থাকলে ওর আসল পরিচয়টা আর বুঝি কেউ জান্‌তে পারবে না ! শাস্তরেও ত আছে কি না, মায়ের আর শ্বশুরের নামে যে পরিচয়—সে অধম।"

একটি লোক এতক্ষণ কোন কথাই কহে নাই, সে এতক্ষণ সব কথা শুনিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, "ছোঁড়াটা আসল জোচ্চোর ! বুড়টাকে তুতিয়ে-পাতিয়ে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে শেষে ওর মাথায় হাত বুলুবে, সেই ফন্দি-তেই এসে ঢুকেছে।"

"থিয়েটারের অ্যাক্টর হওয়াও বিচিত্র নয় !"

"হতেও পারে বোমার দলের পলাতক কেউ। তা যদি হয়, তা হ'লে মোহান্ত ঠাকুরটি শুদ্ধ ফাঁসবেন এবার ! একেই গবর্ণমেণ্ট এই সব মোহান্ত-হস্তীর পক্ষপাতী নয়, এটাকে যদি সিডিসনীষ্টদের আড্ডা ব'লে সন্দেহ হয়, তা হ'লে বুড়ো বয়সে ভদ্রলোককে পুলিসপোলাও না ক'রে ছেড়ে !"

"দেখ, এখন কার বরাতে কি নাচছে। মোদ্দা মহেশ্বর ঠাকুর আর মহেশ্বর পুরী হ'তে পাচ্ছেন না, এটুকুন ঠিকই হয়ে গেছে। আবার ইহারও প্রতিবাদ উঠিল।"

"তাই কি কেউ বল্‌তে পারে ? শাস্তরে বলেছে, 'স্ত্রিয়-শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'।"

তা দেব মানব যিনি যাহা জানুন বা না-ই জানুন, ভবে-শের প্রতি মহেশানন্দের প্রগাঢ় আসুরক্তির সংবাদটা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। সে এমন আকর্ষণ,—সে যদি ভবেশ একটি ছেলে না হইয়া তার উল্টা জাতের কেহ হইত, তবে তাহা লইয়া আর বলিতে বা কহিতে কাহারও কোন কিছুই বাধা পড়িত না। পূর্ব্ব-মোহান্ত ভবানন্দ তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত জানিয়াও পূর্ব্বে বেশ একটুখানি বেলায় উঠিতেন, তাহার পর ঘণ্টাখানেক সময়ও জন চার পাঁচ ভৃত্য তাঁহার প্রসাধনের সাহায্য করিত, তাহার পর তাঁহার প্রাসাদের অন্তর্গত একটি সুবৃহৎ বর্ম্মর-গৃহে তিনি উপাস্যকে স্মরণার্থ প্রবেশ করিতেন। কোমল শয্যায় সুখস্পর্শ ব্যাঘ্র-চর্ম্ম বিছাইয়া ফুল-চন্দন ধূপ-ধুনা কস্তুরী-কেশর ও তাহার সঙ্গে মিশাইয়া ফ্রেঞ্চ পুষ্পসারের গন্ধে ভারাক্রান্ত সেই হর্ম্ম্যতলে দেবতা বা বিলাস-সন্নিধান কাহাকে বেশী মনে পড়িত, তিনিই জানেন। মহেশানন্দের অভ্যাস ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভবেশ মহেশানন্দের ঠিক পাশের ঘরেই শোয়, অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিয়া সে আপনি জাগিয়া উঠে, অমনই সেই সঙ্গে এ ঘরের মধ্যে আসিয়া মহারাজেরও ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়। তাহার পর চাকর-বাকরের কোন সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র ভবেশের সাহায্যেই মোহান্তজীকে তাঁহার সমস্ত প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া লইতে হয়। ইহার পর তাঁহারা দুই জনেই গিয়া উপাসনা-গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন। কিছুক্ষণ ভবেশের গুরু-গিরি করিয়া, তাহার পর তাহার সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া এই বৃদ্ধকালে তিনি যে রকম নিশ্চিন্ত শান্তির সহিত ভগবানের উদ্দেশ্যে জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা, আসন-প্রাণায়াম করিয়া যান, তেমন তাঁহার জীবনে কোন দিন তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল বলিয়া কোন রাত্রি-স্বপ্নেও দেখিতে পান নাই। দীর্ঘজীবনটা শুধুই শুষ্ক কঠোরভাবে তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, ফল আজই যেন ফলিয়া উঠিয়াছে।

মহেশানন্দের গুরু উমেশানন্দ পুরী মহারাজ মানুষটা ভাকসাইটে বিদ্বান্ ছিলেন বলিয়া একটা নাম আছে। দুরূহ শঙ্করভাষ্যের একখানা ভাষা টীকা তিনি না কি লিখিয়া ছাপাইয়াছিলেন, ভবানন্দকেও তিনি পড়াশুনা নেহাৎ বন্ধ করান নাই, তবে তাঁহার মৃত্যুর পর স্বয়ং মোহান্ত হইয়া পূর্ব্ব-শিক্ষা আর সে সকলের চর্চ্চা বড় একটা করিতেন না। তাহা শুধু তিনি কেন? একজাবিন পাশ হইয়া চাকরীতে ঢুকিবার পর লেজার বুক বা জুরিস্‌ডিকসন্, এই ধরণের জিনিষ ছাড়া ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ আর কে কাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া চলিয়া থাকেন? মহেশানন্দ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তিনি পড়ার মধ্যে ঢুকিয়া থাকেন।

আজকাল এই নূতন শিষ্যের পাল্লায় পড়িয়া এই বয়সে আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া পুথি-পত্র খুলিয়া বসিতে হইয়াছে। মহেশানন্দের এই নূতন ছাত্রটি একবারে সংস্কৃত ভাষার স-টি পর্য্যন্ত জানিতেন না। এই বয়সে ক খ গ ঘ করিয়া অক্ষর-পরিচয় করানো বড় সোজা কথা নহে! বিশেষ যাহাকে ভাই-ভাইপো, ছেলেমেয়ের জন্য কোন দিনই ও কায করিতে হয় নাই, যিনি এম, এ, ক্লাশের ছাত্র পড়ান, তাঁহাকে হঠাৎ বসি পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরি করিতে হয়, তাঁহার যে দশা ঘটে, ইঁহারও তাহাই হইল! ভবেশ কিছু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, "গোড়ায় না হয় আর কারু কাছেই পড়া নিই? তাকে কিন্তু এইখানে বসেই পড়াতে হবে।"

মহেশানন্দ এ কথায় ব্যস্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "তাও কি হয়? ওরা না কি কোন যন্ত্র নিয়ে পড়াবে? তুমি আমার কাছেই শেখো না, শিখবে কি?"

ভবেশ মনে মনে খুসীই হইল, প্রকাশ্যে একটুখানি দ্বিধা জানাইয়া বলিল, "আপনার ভারি কষ্ট হবে।"

মহেশানন্দ বাধা দিয়া কহিলেন, "আহা, হয় একটু, তাই হোক না। কষ্টও ত একটু পাওয়া ভাল। নিছক মিষ্টি খেতে কি ভালই লাগে! মুখটা না হয় তেতো দিয়েই বদ্‌লাবে।"

মনে মনে বলিলেন, "ওরে আমার কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক! তোর জন্যে সকল কষ্টই যে আমার মাথার মুকুট করে নিতে পারি। এই যে আমার পরম সুখ।"

সকাল, বিকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, যখন তখন শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে পঠন-পাঠন চলিতে লাগিল। মহেশানন্দ একদিকে বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর একদিক দিয়া, তাঁহার এই অত্যন্ত জ্ঞান-পিপাসু ও মেধাবী ছাত্রটিকে দর্শনশাস্ত্রের অনেক দুরূহ ব্যাপার মুখে মুখেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ লিখিত কালিদাসের কাব্য লইয়া তাহাকে তাহা এতই সযত্নে বুঝাইয়া দিতেন যে, ব্যাকরণের সন্ধি-বিচ্ছেদ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ভবেশ সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রের সহিত অর্দ্ধ-পরিচিত হইয়া আসিল, এ ভিন্ন আরও নানা কথার আলোচনা তাহাদের মধ্যে হইত। মহেশানন্দ ইংরাজী ভালরূপই জানিতেন। কিন্তু তাহার কোন ব্যবহার করিতেন না। ভবেশও কিছু কিছু জানে। একখানা নামজাদা ইংরাজী দৈনিক তাহার জন্য আসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, উহা হইতে ভবেশ তাঁহাকে বাছিয়া বাছিয়া সংবাদ জানাইত। কোন সারগর্ভ প্রবন্ধ থাকিলে কাগজ-পেনসিল লইয়া সেটি বাঙ্গালায় তরজমা করিত। তাঁহাকে তাহা শুনাইত। মহেশানন্দ যত না তাহাদের প্রতি আকর্ষণে, শুধু ভবেশের তুষ্টির জন্যই অত্যন্ত আগ্রহের ভাণ করিয়া সেই সব তন্ময় হইয়া শুনিতেন। এই তন্ময়তাটুকুও তাঁহার আসিয়া পড়িত ভবেশের সেই মৃদু গম্ভীর অথচ সুসংযত সুললিত কণ্ঠস্বরের সুপ্রাচুর্য্যে। ভবেশ যে তাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, এই কথাটাই ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া তাঁহার মনের

ভিতরটাকে বাষ্পীজলে বাদন্তী সমীরোৎপল মৃদু মৃদু বীচি-বিক্ষেপের মতই সুধীরে আন্দোলিত করিত। কখন কখন সহসা দুই চোখ ভরিয়া জলের আভাস দেখা দিয়া অন্তরের অভ্যন্তরে একটা সুদীর্ঘতর দীর্ঘশ্বাস জমাইয়া তুলিত। পূর্ব্বস্মৃতির চকিতোদয়ে অনুতপ্ত চিত্ত, প্রাণ যেন এই বলিয়া নিজের কার্য্যফলের ভারকে কতকটা হাল্কা করিয়া লইতে চাহিত যে, যদিই ইহাকে দিলে, বছর কতক আগে দিলেই হইত!

৪

এমনই করিয়া দুঃখের মেঘে সুখের বর্ষণ লাভ করিয়া, মহেশানন্দের দিন কাটিতে লাগিল। ভবেশের এখানে আসার পরে প্রায় দুই বৎসর কাল কাটিয়া গিয়াছে। দুই বৎসর সময় নিতান্ত অল্প নহে। এই দুই বৎসরে জগতের আশাপোড়া সমস্তটাই বদলাইয়া যাইতে পারে। তা আশাপোড়া নাই হউক, এই দুই বৎসরে আদিত্যপুরের অনেক কিছুই বদলাইয়াছিল। প্রথমতঃ দেশের লোকের কাছে এখন ওই রহস্যময়—অজ্ঞাত-পরিচয় বালকাকৃতি কিশোর আর নিতান্ত দুর্গ্রহের প্রেরিত প্রতিনিধির মতই আতঙ্কের বিষয় ছিল না!

যদিও ভবেশ পূর্ব্বের মত আজও সেই কোণের ভিতরেই আব-ঢাকা হইয়া একমাত্র মহেশানন্দের অধীনেই জীবন যাপন করিতেছিল, তথাপি আজকাল মহেশানন্দের মধ্যে কত বড় পরিবর্ত্তনটা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্রাকৃতি তরুণটিরই যে সাহচর্য্যের অনিবার্য্য ফল, সে বিষয়ে এই গ্রামের ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকারই মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না।

একটি পাঠশালামাত্র এত দিন আদিত্যপুরের একমাত্র সম্বল ছিল, বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় এবং শুভঙ্করের সটীক, নামতা, কড়াঙ্কে, পণকিয়া, বুড়িকিয়া পর্য্যন্ত এখানকার বিদ্যাশিক্ষার সীমা ছিল। আমি প্রায় এক বৎসর হইতে যায়, তাহার স্থানে একটি মিডল্ ইংলিশ স্কুল এবং মহেশানন্দ বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অর্থাভাবে মিত্তিরদের প্রতিষ্ঠিত যে দাতব্য চিকিৎসালয়টির কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছিল, এখন সেখানে এক জন ভাল পাশকরা এম, বি ডাক্তার আসিয়া, জলের পরিবর্ত্তে কুইনিন, পিল, পুরিয়া, মিক্শ্চার প্রভৃতি নানাকারের বিশুদ্ধ কুইনিন্ অজস্র পরিমাণে বিতরণ করিতেছেন। পূর্ব্বতন ক্যাম্বেলপাশ ডাক্তারটি ইঁহার কম্পাউণ্ডারীতে লাগিয়া গিয়াছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছিল, গ্রামের মধ্যে পাকা রাস্তা ও দুইটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করায়। বর্ষাকালে এ দেশে পথ চলা একটা দুর্দ্দৈবেরই সামিল হইয়া পড়িয়াছিল। কাঁচা রাস্তা পায়ে পায়ে যেন কাদা—ঘোল হইয়া যায়, জল-নিকাশের ব্যবস্থা নাই, বর্ষার জল অবিরল ধারায় পথের উপর দিয়াই চলিতে থাকে, ফলে কোনখানের কাদা ধুইয়া প্রকাণ্ড গর্ত্ত বাহির হইয়া পড়ে, কোথাও পিছিল—পথিককে আছাড় খাইতে খাইতে চলিতে হয়। ইহার উপর গরুর গাড়ীর কৃপায় সে রাস্তায় আরও কি দুর্দ্দশা না হয়, তাহা বলা যায় না। এই সমস্ত রাস্তাটি খোয়া দিয়া পিটাইয়া, রোলার দিয়া ঘষিয়া যখন পাকা করা হইল, তখন দেশের লোক মোহান্তকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া তাহার বেশীর ভাগটাই খরচ করিয়া বসিল—তাঁহার শিষ্যাটিবট উপরে। কে জানে,কেমন করিয়াই তাহাদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস গাঁড়াইয়াছিল যে, এই যে সমস্ত সদনুষ্ঠান আজকাল মোহান্তজীর দ্বারা সংঘটিত হইতেছে, মোহান্তজীর নির্লিপ্ত উদাস চিত্তটিকে সংগঠিত করার মূলে কিন্তু আর একখানি কোমল তরুণ চিত্ত কার্য্য করিতেছে। সে আর কেহ নহে—ভবেশ।

দুই এক জন এ সম্বন্ধে প্রথমটায় ঈষৎ সংশয় প্রকাশ করিতে গেলে, সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছিল. "যে তাই যদি না হবে ত এত দিন এ সব হয় নি কেন?"

অপরপক্ষ ইহাতেও হটিয়া যায় নাই, উহারা বলিয়াছিল, "হয় ত ঠিক সময়েই তাঁহার মনটা এই দিকে চ'লে এসেছিল। ও না এলেও—হয় ত এ সব হতো।"

প্রতিবাদকরা হাসিল, "কাকতালীয় ন্যায়! কাকটা বসলো আর তালটাও পড়লো, কাকে ফেল্লে না আপনি পড়লো! না মশাই! যেটা প্রত্যক্ষ, সেইটেই বিশ্বাস করতে রাজী আছি, এত সূক্ষ্ম ভেবে 'ধর্ম্ম ত'কে বিশ্বাসের আসনে বসাতে পারছি নে।"

তবে এক বিষয়ে দেশের লোক অনেকটা একমত। ভবেশ লোকটি যে বিনয়ী গর্ব্বিত,—এ সম্বন্ধে কাহারও ভিতর মতদ্বৈধ ছিল না।

সাধন-ভজন, আর পঠন-পাঠন ত অনেকেই করে, তাহা বলিয়া এতটাই প্রচার সবাই করে না, মোহান্তের ঘর সেবা যাহা এত দিন তাঁহার চাকরবাই করিত, অথবা তাহারাও ঠিক করিত না, এবং তিনিও তাহা লইতে চাহিতেন না, সে সমস্তই এখন প্রায় ভবেশ একচেটে করিয়া লইয়াছে। কেহ দেখা করিতে আসিলে, নিবন্ধন করিয়া পাঠাইলে উত্তর দেয়, "এখন আমার অমুক কাজটা করিতে বাকি, এখন আমি অমুক কায করিব।" কেন রে বাপু, এতটা খোসামোদ না হয় না-ই করিতিস্! ওগুলা যাহাদের হাতে ছিল, তাহাদেরই ফিরাইয়া দিয়া একটু লোকালয়ে মুখ বাহির কর্ না কেন? তাহা ত মন্দলাব নহে, ও একটা ছুতা, আসল কথা তিনি নিজের রূপের, বয়সের এবং বিদ্যার গৌরবে কাহাকেও নিজের যোগ্য মনে করেন না, তা' মিশিবেন কাহার সঙ্গে? অথচ লোকটির মধ্যে এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, হাজার সে তুচ্ছ করুক, তথাপি একবার তাহাকে যে চোখে দেখিয়াছে, তাহাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মধ্যে মধ্যে পাঁচ সাত দিন পরে পরেও একবার অন্ততঃ শুধু চোখের দেখা দেখিতেও আসিতে হইবে! তা কথা যদি বা সে না-ও কহে।

মোহান্তর মধ্যে বাস্তবিকই একটা বড় রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল! তাঁহার মনে হইত, তাঁহার জীবনের এই যেন সকালবেলা। পূর্ব্বদিকটাকে এই সবেমাত্র কাঁচা সোনায় রঞ্জিত এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া তরুণ অরুণ স্মিত-প্রফুল্লমুখে দেখা দিয়াছেন। রাত্রির অন্ধকার-তমোরাশি সেই সমুজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে যেন নিজের হীনতার অভিমানে একবারে নিঃশেষে মরিয়া গিয়া সেই দারুণ লজ্জাকে ঢাকিতে পারিতেছে না,—সম্মুখে নবরবিকিরণোজ্জ্বল দিন।

সেই যে দিনটা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা বাস্তবিকই দিনের বা গোধূলির রক্তরাগোজ্জ্বল অভিনব শ্রী—সেইটুকুই শুধু এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধ অকালবৃদ্ধের চোখে ধরা পড়ে নাই।

তবে একবারেই যে পড়ে নাই, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। অনাস্বাদিত আনন্দে পরিপূর্ণ পাত্র হইতে সুধাস্বাদ করিতে করিতে কখন বা চকিতে মনে হইয়াছে—না জানি, সহসা কোন্ সময় তাঁহার এই চির-বঞ্চিত জীবন দুই দিনের সুখটুকুকে হারাইয়া ফেলিবে! মৃত্যুর কথা মনে আসিলে আজকাল তাঁহার শুষ্কনেত্রে জল ভরিয়া উঠে। ভবেশকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, মনে পড়িলেই মরণকে যেন দুই হাতে ঠেলিয়া রাখিতে মন চাহে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভিক্ষুক যেমন অন্নসত্রের দ্বাররোধের আশঙ্কায় অস্থির হইতে থাকে, চিরবৈরাগী মহেশানন্দেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

কিন্তু এত করিয়াও মহেশানন্দ ভবেশের প্রকৃত স্বরূপকে যেন ভাল করিয়া খুঁজিয়া পাইলেন না। সে যেন এত কাছাকাছি থাকিয়াও দূরে—বহু দূরেই থাকিয়া গেল। সে যে কে, কেন এই তরুণ বয়সে এত রূপ-গুণের সঞ্চয় লইয়া এমন করিয়া বিবাগী—ঘরছাড়া হইয়া বেড়াইতেছে, এইটুকু জানিবার জন্য আর সকলের মতই তাঁহারও মনের মধ্যে বড় কম কৌতূহল জাগ্রত ছিল না, কিন্তু সে যেটুকু বলে, তাহাতে ঠিক যেন মন ভরে না। সে শুধু এই বলে যে, তাহার বাপ-মা যারা গিয়াছেন, ভাই, বোন্, আত্মবন্ধু কেহ কোথাও বর্ত্তমান নাই, তাই সে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া শূন্য ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহার বেশী পরিচয় তাহার নাই।

কিন্তু ইহার অপেক্ষা ঢের বেশী পরিচয় যে তাহার আছে, এই কথাটা মহেশানন্দের অনুভূতি তাঁহাকে জোর করিয়াই শুধু একবারমাত্র নয়, বার বারই বলিয়াছে। এই যে কয়টি কথার ক্ষুদ্র পরিচয়, এই একটুখানি জিনিষ—সীমার ভিতরকার জিনিষ, ইহাকে ত সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং সানন্দেই মানিয়া লওয়া চলে, বড় জোর ইহার উত্তরে মনের মধ্যে মনের ভাবটাকে চাপা দিয়া মুখে বলা যায়—"আহা!" ইহার বেশী ত ইহার মধ্যে কিছুই করিবার নাই। কিন্তু যেটা সীমার বাহিরের বস্তু, সেটাকে সীমা দিয়া মাপিতে গেলে তাহার ফাঁকিটা ধরা পড়িতে সময় লাগে না। ভবেশ ছেলেটির ঐ শান্ত, মৌন, সেবা-শুভ্র, জ্ঞান-পিপাসিত বুকের মধ্যে কিছু একটা লুকোনো আছে, সেটা তাহার অনাথ জীবনের বেদনার অপেক্ষা আরও একটু কিছু বেশী, এটুকু মহেশানন্দ তাঁহার বোধের মধ্য দিয়া বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু সে যে কি, সেইটুকুই জানা গেল না এবং এই জানা এবং না-জানার মাঝপথটায় দাঁড়াইয়া মহেশানন্দের চুরি করিয়া পাওয়ার সমস্ত আনন্দটুকুই যেন কেমন একটা আশঙ্কার ছায়ায় বিবর্ণ হইয়া রহিল। অথচ আনন্দেরও যেন

শেষ নাই, সেই আনন্দেই চিরদিনের নিশ্চেষ্ট জড়ীভূত জীবনটাকে স্রোতের টানে ভাসাইয়া লইয়াছিল।

৪

সারা মধ্যাহ্নটা বিবেকচূড়ামণির আনন্দময় কোষ লইয়া শিষ্যকে ছাত্রে কোথা দিয়া যে কাটাইয়া ফেলিয়াছেন, দুই জনেরই সেটুকু খোঁজ-খবর ছিল না। বেলাটা যে আর শেষ হইতে বাকি পড়িয়া নাই, সেইটুকু হুঁজনকারই একসঙ্গে হঠাৎ হুঁস্ হইল। পশ্চিমের দিক্ হইতে সামনের প্রকাণ্ড বারান্দাটা পার হইয়া আসিয়া, ঘরের মধ্যে মুখোমুখী উভয়ের মুখের উপর সুপ্রসন্ন স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্র হাসিমুখে চাহিয়া দেখামাত্র ভবেশ ঈষৎ কুণ্ঠিত মুখেই তাড়াতাড়ি আলোচনার মাঝখানে আলোচ্য-বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া গেল, কিন্তু মহেশানন্দ তখনও পূর্ব্বালোচিত বিষয়েরই অনুসরণে কহিতে লাগিলেন :—

"এই যে শ্লোকটি, এটি অতি চমৎকার প্রয়োগ হয়েছে,—'কন্তাং গয়ানন্দময়ীমুপৈতি'।"

বই বন্ধ করিয়া ভবেশ বলিল, "আজ অনেকক্ষণ ধ'রে পড়া হয়ে গেছে। পাঁচটা বাজে, চলুন, এখন আমরা একটুখানি বাইরে যাই—"

মহেশানন্দ একবার চকিতনয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বেলা পড়িয়া গিয়াছে বটে, সূর্য্যের আলো আছে, তাহাতে তেজ নাই। সে আলো শুধুই স্নিগ্ধ-শুভ্র-নির্ম্মলতায় ভরা, দহন-বিহীন অগ্নির মত। পুনশ্চ দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া ভবেশের দিকে চাহিলেন,—

"কিন্তু শোন ভবেশ! যদিও—"

উঠিয়া পড়িয়া ভবেশ কহিল, "আজ আর নয়, একে আপনার শরীরটা তেমন সুস্থ নেই, তার পর প্রায় তিন ঘণ্টা এই সব নিয়ে বকতে হয়েছে, আবার! আসুন, আমরা বাগানে একটু বেড়াই গে।"

উদ্যানে যেখানে ভবেশের উদ্যোগে একটি মর্ম্মর-বেদিকায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দুই জনে ধীরপদে পরিক্রমণ করিতে করিতে সেই দিকে গিয়া পড়িলেন। অদূরে শতরূপার নীরব নির্জ্জন তটভূমি, শ্যামল শষ্পাস্তীর্ণ তীররেখার প্রান্তে তাহার স্বচ্ছ নীলাভ জলরেখা দেখা যাইতেছে।

শঙ্করমূর্ত্তির পাদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া ক্লান্তস্বরে মহেশানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "বাতের বেদনাটা একটু বেড়েছে দেখছি, ভবেশ! চল্‌বার ফির্‌বার আর বেশী ক্ষমতা নেই, বাবা!"

"তবে এইখানেই বসা যাক্, আসুন। আচ্ছা, তার চেয়ে যদি নদীতে একটু বোটখানা নিয়ে বেড়িয়ে আসা যায়, তা হ'লে কি রকম হয় বলুন দেখি? যাবেন?"

সূর্য্যের আলো আরও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, মঠোদ্যানের গাছপালারা হাওয়ার তালে সেই সোনার আলোয় ক্রমাগতই ঝিল-মিল করিয়া উঠিতেছিল। পাখীর গানে মঠের সীমানার শেষে পলাশ ও পাকুড়-বন ও আম-বাগান ঘন-মুখরিত। সন্ধ্যা-সমাগম-পূর্ব্বের একটি শান্তি-স্নিগ্ধ পবিত্রতায় সমস্ত প্রকৃতি যেন বিনম্রাবনত।

মনের মধ্যে যে ভাগটা নির্জ্জীব, সে দিক হইতে একটুখানি আপত্তির সুর উঠিলেও তাহার যে বড় অংশটা এই সুদর্শন এবং অনন্ত-সেবাপরায়ণ যুবকটি নিজের জোরে টানিয়া লইয়াছিল, তাহার দিক্‌কার নিরুপদ্রব বাধ্যতার আবেশই পালন করিতে বাধ্য করিল। বলিলেন, "এস, তাই যাই, কিন্তু ভবেশ! তোমার বেহালাখানা নিয়ে যাবে ত?"

ভবেশ তাহার কণ্ঠস্বরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই এই যন্ত্রলাপটাও এত ভাল করিত যে, অন্তত মহেশানন্দের মনে হইত, তাহার গানের মত তাহার বাজনা শুনিয়াও বুঝি পুরাকালের সেই শ্যামের বাঁশীর সুরে যমুনার মতই এই শতরূপাও উল্টা দিকে উজান বহিবে!

এক দৌড়ে বেহালাখানা টানিয়া ভবেশ লঘু-ক্ষিপ্রচরণে পুনশ্চ বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিল। মহেশানন্দ নির্নিমেষ-নেত্রে তাহার সেই ক্রীড়া-চঞ্চল হরিণ-শিশুর মতই চারুলাময় লীলাগতি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হাল্কা বাতাসে যে ছন্দের যে তালে তালে আমলকীগাছের পাতাগুলি সির্‌সির্ করিয়া কাঁপাইতেছিল, জীবন্ত রক্ত-প্রতিম ভবেশের স্কন্ধচুম্বিত গভীর কালো ও ঘন কুঞ্চিত কেশের স্তরগুলি তাহার দ্রুত ধাবনের সঙ্গে-সঙ্গে তেমনই করিয়া নাচিয়া নাচিয়া দুলিতেছিল। সূর্য্যের এই শেষ আলোর মতই তাহার সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আশ্চর্য্য বর্ণচ্ছটা। ঐ প্রস্থিত মূর্ত্তিটি গভীরতর স্নেহের সহিত নিরীক্ষণ করিতে

করিতে মহেশানন্দের সহসা গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়া উঠিল; তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, এ যেন মানুষ নয়, এই অস্তাচলগমনোন্মুখ সূর্য্যেরই একটা রশ্মিরেখা! মাথায় তাহার —নিবিড় বিপুল ঘন মেঘের স্তর, হাতে পায়ে গায়ে সূর্য্যরশ্মির সমুদয় বর্ণচ্ছটা ক্ষণে-ক্ষণে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। এক দিন এই সূর্য্যাস্তের মাঝখানেই সে তাঁহা হইতে এইখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, আবার হয় ত—হয় ত আবার—সহসা কোন দিন এই পথহারা বাঁধন ছেঁড়া সূর্য্যের আলোটুকু তাহার আধারের সঙ্গে এই এমনই এক সূর্য্যাকরোজ্জ্বল গোধূলির মধ্যেই মিলিয়া যাইবে!

এ কথা মনে হইতেই এই নিঃসম্বল বৃদ্ধের বুকের ভিতর থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—ওঃ, তবে সেই দিনই তাঁহারও শেষ সূর্য্যাস্ত! ওঃ ভবেশ! না না, তোমায় যেন আমি হারাই না।

৫

নদীধারের সবুজ ক্ষেতে শেষবেলাকার যে রৌদ্র এতক্ষণ ঝল্‌মল্ করিতেছিল, তাহার স্থানাধিকার করিয়া বেশ একটি শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার জাল পড়িয়া গিয়াছে। আকাশে খণ্ড লঘু শরতের মেঘ শিথিলিত অলস তনু স্বচ্ছ সুনীল মহাকাশে এলাইয়া দিয়া ইচ্ছাসুখে ভাসিয়া যাইতেছিল, আর নীচে নিস্তরঙ্গ নদীজলে ঠিক তেমনই ইচ্ছাসুখে ভাসিতেছিল মহেশানন্দের ক্ষুদ্র তরণী। বকগুচ্ছ ছোট তরীটি ভেলার মতই হাল্কা, স্তব্ধ নদীর বিশ্রামসুখে কিছুমাত্র সে ব্যাঘাতের কলরব তুলে নাই। দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে সে লোকাবাসের সীমানা ছাড়াইয়া একবারে জনহীন প্রান্তরের মধ্যে আপনাকে ভাসাইয়া লইয়া আসিল। এইখানে আসিয়া দাঁড় টানা বন্ধ করিয়া দিয়া ভবেশ তাহার বেহালাখানা তুলিয়া লইল।

নদীর এক পাশে মুক্ত প্রান্তরের শেষ সীমা সুদূরাবস্থিত দিক্‌চক্রের গায়ে গিয়া মিশিয়া গিয়াছে, আর এক দিকে বনস্পতির সারি জোনাকীপুঞ্জের আলো হাতে লইয়া রাত্রিচর প্রহরীর মতই স্তব্ধ, স্থির, দাঁড়াইয়া আছে। ওপারের মাঠে সবুজ হইয়া আমন ধান ফলিয়া রহিয়াছিল; তীরে একবারে জলের ধারের উপর সেই ঘন জমীর সবুজ শাড়ীর কলহংসেরই মত সু-উচ্চ সাদা পাড়খানির মতই কাশের ফুল অজস্র ফুটিয়া আছে। বাতাস যেন হঠাৎ পড়িয়া আসিল; আকাশের সেই খণ্ড মেঘগুলা পরস্পর যেন গায় গায় জড়াজড়ি, গলায় গলায় গলাগলি করিল। চাঁদ যে উঠিয়াছিল, এখন আর তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। একখানা কালো মেঘ সুন্দরী বধূর মুখের নীলাম্বরী-অবগুণ্ঠনের মতই তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। আকাশের সেই নির্ম্মল নীলাভা একটা অস্বচ্ছ আবরণে যেন বাঁধা পড়িল। অন্ধকার যদিও সেই শুক্লা রাত্রিকে একবারেই গ্রাস করিতে পারিল না, তথাপি কেমন যেন একটা কোয়াসার ঝাপসার মত কিছুক্ষণের জন্য তাহার সেই সমুজ্জ্বল শ্রীটুকুকে আড়াল করিয়া রহিল। মহেশানন্দ প্রকৃতির এই সহসা নিরানন্দ পরিবর্ত্তনে মনের মধ্যে কি যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু ভবেশ এ সবের কিছুই লক্ষ্য করে নাই। সে নিজের মনের ভিতরকার সমস্ত উপচিত আনন্দের রসে সরস করিয়া তুলিয়া নিজের অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠের সহিত তেমনই শিক্ষিত হস্তের বেহালার ঝঙ্কার তুলিয়া চলিয়াছিল। বাগ্‌বাদিনীর বীণার তার হইতে বাহির হওয়া গানের মতই তাহা যেন সমস্ত আকাশকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। বোধ করি, যেন এই সুরের হাওয়ায় অভিভূত হইয়াই এই নির্জ্জন নদীতীর ও নদী-নীর, ওই বাধাভরা মুক্ত আকাশ—সকলেই বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল! নদীনীর তাহার স্বাভাবিক আনন্দমধুর কলতান তুলিয়া স্তম্ভিত—নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িয়া আছে। অথচ এই সুরের আলোর কত দিনই যে এখানকার বিশ্ব-প্রকৃতি আপনাকে আলোকিত পুলকিত করিয়া তুলিয়া এই গায়ককে অভিনন্দিত করিয়া লইয়াছে, এমন করিয়া রুদ্ধশ্বাস হইতে ত কোন দিনই দেখা যায় নাই!

ভবেশ আত্মহারা হইয়াই গাহিতেছিল,—

"সময় যেন হয় গো এবার, ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে নেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে, অমর হয়ে রব মরি।"

মহেশানন্দের গায়ের ভিতরে এই বায়ুহীন রাত্রি যেন একটা শীতের শিহরণ জাগাইয়া দিয়া গেল। "চুকিয়ে নেবার?"—"চুকিয়ে নেবার?" না না, চুকিবে কি? এ কি কখন চোকান যায়? এ কি গান! এ ভাল না। প্রাণটা তাঁহার কি যেন একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভবেশ গাহিতে লাগিল—

"যে গান কানে যায় না শোনা, সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
আমার, প্রাণের বীণা লয়ে যাব, সেই অতলের সভার মাঝে ;
চিরদিনের সুরটি সেথে, শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব তিনি তাঁহার পায়ে, নীরব বীণা দিব ধরি।"

এ সব কি ভাল কথা ! "অতলের সভায়" যাবার কথা এই বর্ষায় ভরা নদীবক্ষে বসিয়া কেন ও গাহিল ? মহেশানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, ডাকিলেন—

"ভবেশ !"

"আজ্ঞে।"

"চল, বাড়ী ফিরি।"

"এর মধ্যে ?"

"না, রাত অনেক হয়ে গেছে বই কি, তা ছাড়া আকাশটায় কেমন মেঘ মেঘ করছে, দেখছো না ?"

বাস্তবিকই ভবেশ তাহা দেখে নাই। চোখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে বলিল, "ও কিছু না," বলিয়াই পুনশ্চ গানের দিকেই মন ফিরাইল,—

"ঘাটে ঘাটে ঘুরবো না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণতরী,
রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ-রতন আশা করি।"

"ভবেশ।"

"আজ্ঞে।"

"আমার আর এখানে ভাল লাগছে না, ভবেশ ! বাড়ী ফিরি, এস।"

"আচ্ছা"—বলিয়া বেহালা নামাইয়া রাখিয়া ভবেশ এবার দাঁড় তুলিয়া লইল। সেই স্তব্ধ, নিঃশব্দ, নিস্তরঙ্গ নদীজলে ছপাৎ করিয়া দাঁড়পড়ার শব্দে মহেশানন্দ হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে চমকাইয়া উঠিলেন—

"ভবেশ।"

"আজ্ঞে।"

"ওঃ, না, কিছু না।"—একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মহেশানন্দের নাসাপথে বাহির হইয়া গেল। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া একবার আকাশ ও একবার নদীবক্ষে চাহিয়া দেখিলেন। আকাশের জমা মেঘ খণ্ডিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে অতি গভীর নীল আকাশে নূতন-কাটা হীরার মতই সমুজ্জ্বলতর নক্ষত্রসমূহ দেখা যাইতেছে। কোন সময়ে চাঁদের উপরকার চাদ্‌নাখানাও হঠাৎ খসিয়া পড়িতেছিল। বর্ষার পরিপূর্ণ স্ফীতবক্ষ নদীর জলকে যেন জলের অপেক্ষা আর কিছু মনে হইতেছিল,—যেন তেলের নদী। নদীর ধারের সেই অশ্বত্থ, বট, পাকুড় ও নিমগাছের সারি এখনও তেমনই স্তব্ধ। মনে হইতেছিল, যেন উহারা কাহারও মৃত্যু-গৃহের দ্বারের কাছে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছে।

"ভবেশ ! আজ যেন কিছু ভাল লাগল না, কেবলই মনে হচ্ছে যেন",—মহেশানন্দ নীরব হইলেন।—ঠিক যে কি তাঁহার মনে হইতেছিল—তাহা প্রকাশ করিয়া বলাও দুঃসাধ্য ! যেহেতু, তেমন সুস্পষ্ট করিয়া কিছুই ত মনেও হয় নাই। এ যে একটা ভিত্তিহীন কারণ-নির্দ্দেশশূন্য অতি অস্পষ্ট ভয় ! ইহার ত কোথাও কোন মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ! অতি অল্প শিশু যে ভয়ে অন্ধকার সহিতে পারে না, এই বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ বৃদ্ধেরও এ যে সেই একই প্রকারের অসহিষ্ণুতা।

ক্ষণকাল নীরবে গুরুর বাক্যস্ফূর্তি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়া শেষে তাঁহাকে একবারেই বাক্য-বিমুখ দেখিয়া অবশেষে তরণী বাহিতে বাহিতে ভবেশ মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি মনে হচ্ছে বল্‌ছিলেন ?"

মেঘ তখন প্রায় কাটিয়া আসিয়াছে। নূতন মাজা-সোনার থালার মত চাঁদকে অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আবার দেখা গিয়াছে। চন্দ্রকরে নদীর সেই তৈলাক্ত-মলিনীকৃত কুশ্রীতা ঘুচিয়া আসিয়া এখন আবার তাহার স্বাভাবিক শ্রীটি প্রকাশ পাইয়াছে। ঘনতমর জ্যোৎস্নার ভারে আবার সমস্ত ঘুমন্ত প্রকৃতি ধীরে ধীরে বাঁধা পড়িতেছেন।

সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া গুরু কহিলেন, "মনে হচ্ছে, আজ যেন কি একটা ঘটবে। কি যেন গভীর রহস্যময়, কোন কিছু !"

তাহার পর একটুখানি থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "কিন্তু ও ভাবটা এখন যেন ক'মে আসছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের কি নিবিড় যোগ দেখ দেখি ! এতক্ষণ কেবলই মনে হচ্ছিল, আজ রাত্রিতে কি যেন আমার একটা খোয়া যাবে।"

পুনশ্চ হাসিয়া কহিলেন, "অথচ আমার আছেই বা কি ?"

ভবেশ চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া উৎফুল্ল শিশুবাতে তাহার দ্বিতীয় চাঁদের মতই সুন্দর মুখখানাকে উদ্ভাসিত

করিয়া তুলিয়া হাসিয়া কহিল, "আপনার এই অমূলানিধিই বুঝি ত হারায়েন, মনে হচ্ছিল!"

"ভবেশ! ভবেশ! ও:—"এমনই একটা মর্ম্মান্তিক কাতরকণ্ঠে হঠাৎ মহেশানন্দ এই আর্ত্তরব করিয়া উঠিলেন; বোধ হইল, যেন ভবেশ কোন তীক্ষ্ণধার তীক্ষ্ণ শর তাঁহার বুকের উপরেই ছুড়িয়া মারিয়াছে। ভবেশের স্মিতমুখ এই শব্দে আশঙ্কাপীড়িত হইয়া উঠিল, সে ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে গেল, "কি হ'ল! বাথা ধরল কি? না বিছে-টিছে কামড়াল"—

কিন্তু এইটুকু বলিতে বলিতে সে যে একটানা স্রোতের বিপরীতে পাড় টানা ছাড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা ভুলিয়া যেমন ত্রস্তভাবে মহেশানন্দের দিকে অগ্রসর হইতে গেল, অমনই সহসা পাক খাইয়া-ঘুরিয়া-পড়া নৌকার দাঁড়াইয়া সে টাল সামলাইতে পারিল না। নৌকাখানাও এক পাশের ভারে হেলিয়া পড়ায় সে-ও সেই সঙ্গে ঝুপ করিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বুক-ফাটিয়া-পড়া আর্ত্তনাদের সহিত বৃদ্ধ, অসুস্থ মহেশানন্দ হাহাকার শব্দে সেই নৈশ-নীরবতায় ভরা প্রকৃতির সুপ্তবক্ষকে চিরিয়া দিয়া নিজেও নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

৬

ভবেশকে পাওয়া গেল। সাঁতার না জানিলেও তাহার হাল্কা লঘুদেহ জলে পড়িয়া তলাইয়া যায় নাই এবং সন্তরণ-বিদ্যায় অসাধারণ শিক্ষিত মহেশানন্দের সাহায্য এত শীঘ্র পাইয়া, সে কোনমতে নিজেকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু যেমনই তিনি তাহাকে "ভবেশ!" বলিয়া টানিয়া লইলেন, অমনই গভীর ভ্রান্তি ও আসন্ন মরণের অনিবার্য্য নিষ্ঠুর আতঙ্ক তাহার শেষ চৈতন্যটুকুকে সম্পূর্ণরূপেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে মহেশানন্দের পিঠের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জল সেখানে বেশী ছিল না। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য অন্য সময়ে নদীর এ ধারটা হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। বৃদ্ধ অনক্ত মহেশানন্দের শরীরে সে দিন কি আনুষ্ঠিক শক্তির, অথবা দৈববলের সমাবেশ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে সাঁতার দিয়া অতি কষ্টে অবশেষে তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। পিঠের উপর ভবেশের মূর্চ্ছিত দেহ।

যতক্ষণ জলের মধ্যে ছিলেন, যদিও কষ্টকর হইলেও ভবেশকে বহন করা মহেশানন্দের পক্ষে অসাধ্য ছিল না, কিন্তু এইবার তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিজের এই শ্রম-ক্লান্ত আর্দ্র দেহটাকে টানিয়া তুলা তার মনে হইতেছে, তাহার উপর এই মূর্চ্ছাবসন্ন নবীনকে এই পঞ্চাশোর্দ্ধ প্রবীণ বহন করিয়া তীর তাকিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে, সে একবারেই অসম্ভব! কোনমতে তাহাকে নদীতীরের উপর কাশবনের তলায় শোয়াইয়া দিয়া, নিজেও তিনি শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

প্রথমতঃ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মহেশানন্দ ভবেশের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পান নাই। বর্ষার নদীতে টানও বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার তখনকার সেই মনের অবস্থা সর্ব্বান্তর্যামী ভিন্ন অপর কেহই বুঝিতে পারিবে না। সে হয় ত সময়ের পরিমাপের হিসাবে বড় বেশী সময় নহে, কিন্তু সেই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মহেশানন্দের ভীত অন্তরাত্মা যে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করিল, তাহা অবর্ণনীয়। ভগবান্! এই জন্যই কি—প্রথম জীবনে যাহা হারাইয়া সুখহীন শান্তিহীন নিরানন্দচিত্তে সর্ব্বত্যাগী হইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার সেই অনাস্বাদিত অতৃপ্ত সংসার-সুখের সকল আনন্দটুকুর একটি কণা ফিরাইয়া দিতে ইহাকে তাঁহার কাছে আনিয়া দিয়াছিলে? উঃ, এই সমস্ত জীবন ধরিয়া যে আগুনে দগ্ধ হইয়া হইয়া সহসা এত দিনে প্রায়শ্চিত্ত-শেষের শান্তিজলের মতই যাহাকে পাইয়া একটুখানি শীতল হইয়াছিলেন, সেই তাহার সহস্র গুণ জ্বালা বাড়াইবার জন্য?

ও ভবেশ!—ও ভবেশ!—এই করিতে তুমি আসিয়াছিলে?

এই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত কয়টির মধ্যে মহেশানন্দের সাত বৎসরের আয়ুক্ষয় হইয়া গেল। অবশেষে বহু চেষ্টায় ভবেশকে পাওয়া গেল। ধন্য ভগবান্! তাঁহাকে তাহা হইলে তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমের মৃত্যুর কারণ হইতে হয় নাই।

তীরে আসিয়া চেতন এবং অচেতন উভয়েই প্রায় সমাবস্থাপন্ন হইয়া পড়িল। আর ত শরীরে এতটুকু সামর্থ্য নাই, যাহার দ্বারা এই সবল সুস্থ তরুণের অচৈতন্য দেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। কাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্যও হাতে পায়ে কিছু বল থাকা চাই, তাহাও আর

নাই। অগত্যা কিছুক্ষণের জন্য মহেশানন্দ সর্ব্বপ্রকার শরীর-মনের চেষ্টারহিত হইয়া পড়িলেন।

মনে হয়, সে-ও যেন একটা যুগ। কোন কিছু করিবার সামর্থ্যমাত্র নাই, অথচ সহসা মনে হইল, ভবেশ হয় ত এতক্ষণ আর বাঁচিয়া নাই! অমনই কোথা হইতে সেই অবসন্ন অসমর্থ শরীরে প্রবল শক্তি ফিরিয়া আসিল। অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া কোনমতে তিনি তাহাকে নদীর উপরেই মঠের বাসানে তুলিয়া আনিলেন। তখন রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। চরাচর সুপ্তি-মগ্ন, কেবল মনিবের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় ঘাট-দেউড়ীর চৌকিদারটা ফটকের পাশের কুঠরীতে চারপাইয়ের উপর শুইয়া শুইয়া তুলসীদাস আবৃত্তি করিতেছিল,—

"সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর রঘুরাঈ
রসনা রস নাম লেত, সন্তানকো বরদ দেত,—
ঈষৎ মুখচন্দ্র মন্দ সুন্দর সুখদায়ী"—

অর্দ্ধস্ফুট স্খলিত বাক্যে অদূর হইতে কে যেন ডাকিল, "মিশির!"

স্বর অনেকটা মহারাজ-জীর মত, তবে সম্পূর্ণ নহে। এত রাত্রিতে উঁহারা ভিন্ন আর কেই বা এখন ডাকিতে আসিবে? বিশেষ মহারাজ তো তাহাকে ডাকেন না, ফটক বন্ধ করিয়া আলো দেখাইবার জন্য ভবেশই তাহাকে আহ্বান করে, সে বলে, "মিশিরজী।"

কাযেই মিশ্র ঠাকুর তাহার ভজনগানেই মজিয়া রহিল, উত্তর দিল না;

"মতিমন্তকে কণ্ঠমাল, তারাগণ অতি বিশাল,
হরষে নিরখ তুলসীদাস, চরণ-রজ-পাবী।"

"মিশির—!"

নাঃ! আজ নিশ্চয়ই কিছু উল্টা রকম ঘটিয়াছে! এ কণ্ঠ তাহার মনিবেরই বটে। ভবেশের অসাড় অস্পন্দ দেহ মিশিরের সাহায্যে ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া, মিশিরকে খানিকটা আগুন করিতে আদেশ দিয়া, মহেশানন্দ প্রথমেই ভবেশের ভিজা কাপড় জামা ছাড়াইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ঘরের পাশেই ভবেশের শয়নাগার। নিজেই তথা হইতে উহার একটা গেরুয়া আলখেল্লা লইয়া আসিয়া পরিহিতটাকে খুলিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে দেখিলেন, ভবেশের এতক্ষণকার নিস্পন্দ শরীরে এইবার স্পন্দন ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার শীত-জীর্ণ ঠোঁট দু'খানি বাতাস-লাগা ফুলের পাপড়ীর মত মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে, সে যেন সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল। একটা গভীর আনন্দের উচ্ছ্বাস-লহরী মহেশানন্দের ভারার্ত্ত চিত্ত-প্রাণকে একবারে প্লাবিত করিয়া দিয়া বহিয়া গেল। তিনি গভীর স্নেহে উন্মত্তের মতই সেই অর্দ্ধচেতন নরদেহ নিজের বুক দিয়া সবলে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, বিপুল সুখে তাঁহার মুখ দিয়া বহির্গত হইল,—

"ভবেশ! ভবেশ! আমার ভবেশানন্দ! আমার পুত্র! আমার শিষ্য! আমার সর্ব্বস্ব ধন!"

ভবেশের লুপ্তচৈতন্য প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। শীতে সে কাঁপিতেছিল। তাড়াতাড়ি আত্ম-সংবৃত হইয়া মহেশানন্দ তাহার গায়ের ভিজা কাপড়টা টানিয়া খুলিয়া দিলেন। শুষ্ক বস্ত্র প্রথমে সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া লইয়া তাহার পর সেটা ভাল করিয়া পরাইয়া দিতে গিয়া সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন,—"মহাদেব!"—

অত্যন্ত আহত না হইলে মানুষের কণ্ঠে কখন এরূপ স্বর বাহির হয় না।

ক্ষণকাল বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত থাকিয়া, অতি কষ্টে নিজেকে মৃত্তিকার গ্রাস হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া, মহেশানন্দ প্রশস্ত ঘরটার শেষ পর্য্যন্ত একবার পরিক্রমণ করিয়া পুনশ্চ পূর্ব্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। "না, তাঁহার ভুল হয় নাই! তিনি পাগল হন নাই! ইহা স্বপ্নও নহে! এই সেই ভবেশ! তাঁহার ভবিষ্যৎ আশার ভবেশানন্দ! তাঁহার চক্ষুর সমক্ষেই এই-ই আজ জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। তিনিই ইহাকে নিজের প্রাণ-সংশয় করিয়া জলমধ্য হইতে টানিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এ কি?"

আবার তাঁহার কণ্ঠ চিরিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ের একটি ঝলক রক্তের মতই বাহির হইয়া আসিল,—

"মহাদেব!"

এ কি হইল? তাঁহার সকল আশাই চূর্ণ হইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া গেল! তাঁহার জীবনের সুখস্বপ্ন মন্ত্রের মতই টুটিয়া গেল? তাঁহার নূতন-গড়া এই ভাঙ্গা প্রাণকে পুনশ্চ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া তাঁহার অন্তরের অ-নির্ব্বাণ আগুনের স্ফূর্ত্তিকে শুধু উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিল। এ কে

এ ?—এ যে এ ? কেন সে তাঁহার সঙ্গে অনর্থক এত বড় শত্রুতা করিতে আসিল ?

মহেশানন্দ অবশের মতই সেই প্রতিক্ষণে ফিরিয়া আসা নূতন জীবনের স্পন্দনে চঞ্চল, তাঁহারই প্রিয়—প্রিয়তর, প্রিয়তমের দেহের পাশেই বাণ-বিদ্ধ কুরঙ্গের মত লুটাইয়া পড়িলেন।

তাঁহার সেই বহু পুরাতন ভগ্ন মন্দিরের চূর্ণ করা দেবতার বিকৃত প্রতিমায় আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে কে আজ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিল ? এ কায কেন করিল ? ওরে, কেন করিল রে ! এ যে বড় জ্বালার অসহ্য স্মৃতি ! অনেক করিয়া ইহাকে একটুখানি মাত্র চাপা দেওয়া গিয়াছিল, আবার সেই নির্ব্বাপিতপ্রায় আগুনের কুণ্ডে ঘৃতাহুতি কেন দিল ?

আবার অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়া মহেশানন্দ সম্মোহন-মন্ত্রবশীভূতের মতই সেই একদা পবিত্রতম প্রেমাস্পদতমের এবং পরে তাহারই অপবিত্রতম এবং ধিক্কারের সহিত পরিত্যক্তের সহিত ঠিক একই প্রকার মূর্ত্তি ধরিয়া যে আজ তাঁহারই শয্যাতলে লীন রহিয়াছে,—তাহারই দিকে আকৃষ্ট চোখে চাহিয়া রহিলেন। ওঃ, ওঃ—সেই সব ! সেই সব ! এত বড় দীর্ঘকালটা কি এর কাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই ?

ভবেশের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমেই স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছিল, এইবার সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাশ ফিরিয়া শুইতে গেলে মহেশানন্দের বিস্ফারিত আর্ত্ত দৃষ্টির সহিত তাহার উৎসুক দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। ইহাতে প্রথমটা ভবেশের ক্লান্তবিবর্ণ মুখ-চোখ একটা গূঢ় আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখস্থ দৃষ্টির সহিত পুনর্ম্মিলিতদৃষ্টি হইয়াই তাহার সেই—সেই সুখস্মিতমুখ একটা উৎকট সঙ্কোচে শুষ্ক ও ম্লান হইয়া পড়িল, তাহার লজ্জিত দৃষ্টি স্বতঃই আনত হইয়া আসিল। সে তখন কোনমতে নিজের গায়ের উপর কাপড় টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সেই মুহূর্ত্তেই সে-ও বুঝিয়াছিল যে,তাহার সব ফুরাইয়াছে ! এই যে পাথরের মত কঠিন চোখ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে, ইহার পর আর কি কখন এই চোখে সে তাহার সেই পূর্ব্বকার মত স্নেহ-গলানো, মমতা-মাখানো গভীর বাৎসল্যের রসে ভরা কোমল মধুর দৃষ্টি দেখিতে পাইবে ! দুঃখে, লজ্জায়, অভিমানে বুক তাহার বিদীর্ণ হইয়া গেল। ওঃ, আজ যদি সে আর—সেই তাহার সলিল-সমাধি হইতে না উঠিত !

মহেশানন্দ গভীর বলে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়া বসিয়া ধীর কণ্ঠে কহিলেন,—

"ভিজে কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল, মিশির আগুন আনছে, হাত-পাগুলো গরম ক'রে নাও।—কিছু খাবে কি ?"

ভবেশ শুধু মাথা নাড়িয়া তাহার আহারে অনিচ্ছার কথাটা জানাইয়া দিল। ইহারই মধ্যে মহেশানন্দের কণ্ঠে কি নির্লিপ্ত স্নেহহীনতার পরিচয় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল ! তাহার দুইটি চোখ ঠেলিয়া জলের উৎস উৎসারিত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

মহেশানন্দ ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন—প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ঠাকুরবাড়ীর পেটা ঘড়ীতে এবং দরবার-ঘরের বড় ঘড়ীতে যখন রাত সাড়ে-চারটার ঘোষণা চলিতেছিল, তখন মহেশানন্দ এ ঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, মিশির অগ্নিকুণ্ড লইয়া চলিয়া গিয়াছে, ভবেশ তাহার দুই বৎসরের পরিচিত মূর্ত্তি লইয়াই তাঁহার বিছানার নীচের খালি জমীতে নতমুখে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। ল্যাম্পের আলোয় তাহার সেই অস্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ মুখে, অংসবিলম্বী কুঞ্চিত অলকে, রক্তহীন অধরোষ্ঠে, দুঃখার্ত্ত সলজ্জদৃষ্টিতে তাহার সেই করুণীয় রূপ যেন শতগুণে বর্দ্ধিত ও চিত্তহারী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মহেশানন্দের বুকের ভিতরটা সবেগে দুলিয়া উঠিল, বহু বাঁধা হৃদয় একবারে গভীর বেগে বিচলিত হইয়া উঠিল।

উহার সম্মুখ হইতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া, আপনাকে কিছু কঠিন করিয়া লইয়া, তিনি একটুখানি পরে কথা কহিলেন। বলিলেন,—

"তুমি কিরণের মেয়ে, না ?"

ভবেশ মুখ তুলিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া তাহার বিচারকের মুখের দিকে চাহিল,—

"আপনি আমায় কি ক'রে চিনলেন ?"

মহেশানন্দ এ কথার আর উত্তর দিলেন না, তবে তাঁহার গলার কাছে কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিল মাত্র। তাহার পর আবার একটুখানি সময় গত হইলে পুনশ্চ কথা কহিলেন,—

"এমন ক'রে আসার মানে ?"

"এমন ক'রে না এলে কি আসতে দিতেন ? অথচ না এলেও আমার ত আর দ্বিতীয় আশ্রয় ছিল না।"

মহেশানন্দ বলিলেন, "কেন,—তোমার মা ?"

মেয়েটি তাহার লজ্জাভরা দৃষ্টি আরও বেশী করিয়া নামাইয়া মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল,—

"মা ত বেঁচে নেই।"

"আঃ !"—বলিয়া মহেশানন্দ এমনই একটা তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন, যাহাতে ঐ তরুণী অপরাধিনীটি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

"কবে গেলেন ?"

"তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেই আমি এখানে চ'লে এসেছিলেম।"

"ওঃ ! আমার পরিচয় পেলে কোথায় ? কেমন ক'রে জানলে, আমি তোমার—আমি তোমার—"

মহেশানন্দ কথাটা শেষ না করিয়া থামিয়া গেলেও ঐ মেয়েটি তাঁহার ঐ অসমাপ্ত পদটির পূরণ সাগ্রহেই করিয়া দিল—"আমার বাবা ? মা-ই আমায় এ কথা বলেছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেও কতবার আমাদের মধ্যে এ কথা হয়ে গেছলো। আমি আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই এখানে চ'লে আসতে চেয়েছি। মা'র শুধু ভরসা হয় নি, বলেছিলেন,আমি এলে আপনি আমাকে ঢুকতে দেবেন না। তাই ভয়ে আসিনি। কিন্তু যখন আমার সবই গেল, আমার কোলের ছেলে কেড়ে নিয়ে আমার স্বামী জন্মের মতই আমায় বিদায় দিলেন, সেই শোক সইতে না পেরে মাও এক মাসের মধ্যে মারা গেলেন। আমার তিন মাসের শিশু মা-ছাড়া হয়ে দুরন্ত লিবারে ভুগে মারা গেল। সে খবর শুনে আমি আর থাকতে পারলুম না। জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লেম। শুধু তার মধ্যে এইটুকু হুঁষ আমার ছিল যে, আমি যা, তা আমার প্রকাশ করবার পথ নেই। তাই এই ছদ্মবেশ ! এ কি একেবারেই আপনার ক্ষমার অযোগ্য ?"

মহেশানন্দের কঠিন দৃষ্টি কখন্ কোন্ সময় কেমন করিয়া শীতল হইয়া আসিয়াছিল, অথচ তখনও সবটুকু উত্তাপ তাঁহার মন হইতে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। তিনি ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কিন্তু তুমি ত সেই বিশ্বাসঘাতিনী কিরণেরই মেয়ে—যাকে আমি নিজের বুকের রক্তের চেয়েও বেশী ভালবাসতেম, আর যে আমার সেই বুকের রক্তকে তার তীব্র গরল দিয়ে বিষাক্ত ক'রে দিয়েছিল ! আমার প্রথম জীবনের সুখস্বপ্নকে নির্দয় আঘাতে চূর্ণ ক'রে দিয়ে আমায় যে ঘরছাড়া সর্ব্বহারা পথের ভিখারী করেছিল, তারই গর্ভে তোমার জন্ম, সে কি আমায় ভুলে যাবার ?"

এইবার এই স্থিরকণ্ঠা মেয়েটি একবারে মুষড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"তার জন্য কি আমি দায়ী ? যেমন তাঁর, তেমনই আপনারও ত মেয়ে আমি। আমায় আপনারা দুজনেই ফেলে গেলেন, পাঁচ জনের দয়ার ঘড় হয়ে রূপের জোরে সওদাগরের বাড়ীর বউ হয়েছিলুম, সেখানেও এই বাপের কলঙ্ক আমায় আপনার মতই ঘরছাড়া সর্ব্বহারা ক'রে ঠেলে পথে বার ক'রে দিলে। মা মধ্যে মধ্যে খোঁজখবর নিতেন, খেতে না পেয়ে যাতে ম'রে না যাই, সেটাও দেখতেন, ভাল হোক মন্দ হোক, তবু ত সে মা,—সে-ও গেল ! যদিও কোন দিনই তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারিনি, ভালও বড় বাসিনি, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য, দেখা হ'লে অভিশাপই দিয়েছি, তবুও তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি বই কি ! কিন্তু আপনি আমায় কি অপরাধে ত্যাগ করেছিলেন ? আর আজও করতে চান ? আমার মা'র পাপে কি আমি পাপী ? আর তা হ'লে এখানেই বা আমি আসবো কেন ? বলতে চান, আপনার উপর আমার কোন দাবী নেই ? আমি আপনার কেউ না ?"

মেয়েটি সহসা মহেশানন্দের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিছুতেই তাহার সে কান্না যেন শেষ হয় না।—"স্বামী না হয় পর, আমার দুঃখ তিনি বুঝলেন না, কিন্তু আপনি ত আমার বাপ—আমার সব চেয়ে এ পৃথিবীতে বেশী ভরসা আপনার ! আপনিই বলুন, আমি এখন কোথায় যাব ? আমার এই ত রূপ, এই ছাব্বিশ বৎসর বয়স,—কে আমায় দেখবে ?"

মহেশানন্দের চোখের দৃষ্টি বিপর্য্যস্ত এবং ক্রমে অস্পষ্ট ও ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছিল, এইবার তাহা হইতে বড় বড় দুইটি অশ্রুবিন্দু তাঁহার শুষ্ক গণ্ড দিয়া গড়াইয়া পড়িল,—"তোমার নামটা কি ছিল ?—অর্চ্চনা না ?"

"হাঁ—"

"অর্চ্চনা !"

"বাবা !"—বলিয়া অর্চ্চনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

মহেশানন্দ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

"তা হ'লে চল, আমরা দুজনে কাশী কি হরিদ্বার, না হয় ত হৃষীকেশের কোন একটা একান্ত স্থানে, না হয় আরও নির্জ্জনে গিয়ে বাস করি গে। তোমায় নিয়ে এখানে থাকা ত আর যায় না।"

অর্চ্চনা নীরব রহিল। তাহার চোখের জল তখন ধারা-শেষে বিদূরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

মহেশানন্দের হয় ত তখনও ভবেশানন্দের শোক মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়া যাইতে পারে নাই। তিনি আবার আর একটা তেমনই দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন, তাহার পর ক্ষণকাল নীরব থাকার পর বলিলেন,—"কালই মহেশ্বরানন্দের অভিষেকের ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে। কিন্তু ভবেশ। না, অর্চ্চনা ! না, না, ভবেশই ! তুমি আজ থেকে চিরদিন আমার ভবেশ হয়েই থাকবে ! কিরণের মেয়েকে আমি ভুলেই গেছি ! অনেক কষ্ট পেয়ে শেষকালে সে সব আমার প্রায় চাপা প'ড়ে গেছে। আর কেন সে সব টেনে তোলা ? ভবেশ ! তোমায় আমি ভুলতে পারবো না ! তুমি আমার এই পোড়া বুকে একমাত্র শান্তির প্রলেপ। উঠে এস, মা। না, না, না, বাবা ! তুমি আর অমন ক'রে থেকো না, এস, উঠে আমার কাছে এস ! আজ থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তুমিই আমার ভবেশ। তোমার হাতে আমি নিজেকে স'পে দিলুম।"

কেন

কি কার্য্যসাধন তরে পাঠাইলে এ সংসারে
মোরে ভগবান্,
যদি ব্যথিতের দুঃখে ব্যথা না বাজিল বুকে
কেন দিলে প্রাণ ?
যদি শোকার্ত্তে সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর নাহি হ'ল
কেন দিলে মন ?
যদি সুধামাখা হরিনাম দিবানিশি না শুনিল
কেন এ শ্রবণ ?
যদি কর্ত্তব্যে অলস হই কেন তবে বহি নিত্য
অকারণ বল,
যদি পরের সৌভাগ্য হেরি ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া মরি
নয়ন (?) বিফল।
'সত্য' 'ধর্ম্ম' 'আত্মত্যাগ' বুঝিতে নারিনু যদি
জ্ঞানে প্রয়োজন ?
স্বার্থের মন্দিরে যদি আত্মবলিদান করি
বৃথা এ জীবন
আমার আমার করি দিবানিশি ঘুরে মরি
আমি কে আমার,
ভাবিনে তা একবার (ও) দাও প্রভু দাও আরও
বলি বার বার ;

বাকি কি রেখেছ তুমি না চাহিতে অন্তর্য্যামী
দিয়েছ ত সব ;
যতই দিতেছ তত বাড়িতেছে অবিরত
'দেহি' 'দেহি' রব।

বাসনার শেষ নাই এক পাই আর চাই
আশার অবধি কোথা আছে,
দাও সুখ শান্তিধন দাও প্রিয় পরিজন
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ দিও পাছে।

অতীতে দিয়েছ শত বর্ত্তমানে দিতেছ ত
ভবিষ্যৎ তরে চেয়ে রাখি,
কিন্তু তবু প্রাণারাম তোমার মধুর নাম
স্বার্থ ত্যজি ভুলেও না ডাকি।

ভিখারীর স্বভাবই ত তাই
যত পাই আরও তত চাই
এত যদি দিলে দান দয়াময় ভগবান্
আরও কিছু দাও ;
পরার্থে না পারি যদি আত্মবিসর্জ্জন দিতে
প্রাণ কিরে নাও।

৺ইন্দিরা দেবী।

প্রদীপের আলো

১

পঞ্জাব মেল ঝড়ের বেগে উড়িয়া চলিয়াছে। চারিদিকে রজনীর ঘোর অন্ধকার, প্রকৃতি নীরব নিথর, কেবল এঞ্জিনের হুস হুস আর গাড়ীর গুরুগম্ভীর গুম গুম শব্দ নৈশ প্রকৃতির নীরবতা ভেদ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

প্রথম শ্রেণীর একখানি কামরার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রাণী আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল। উপরে বৈদ্যুতিক আলোকাধার রঙীন আবরণে আচ্ছাদিত ছিল, তাই তাহা হইতে স্নিগ্ধ মৃদু আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছিল।

একখানা মালগাড়ী বিকট ঘর্ঘর রবে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। বোধ হয়, তাহারই আওয়াজে নিদ্রিতদের মধ্যে অল্পতমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে কিছুক্ষণ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সম্মুখের বার্থে নিদ্রিত মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ সেই বার্থের উপরিস্থ বাঙ্কের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল।

প্রথমে সে দুই হস্তে ভাল করিয়া দুইটি চক্ষু রগড়াইয়া লইল, তাহার পর আবার বাঙ্কের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি এবার কেবল বিস্ময় প্রকাশ করিল না, ভয় ও ক্রোধ যেন তাহার সহিত মিশিয়াছিল, সে যেন দৃষ্টিকে প্রত্যয় করিতে পারিতেছিল না।

সে মৃদুস্বরে ডাকিল, 'রাধি, রাধি!'

কেহ সাড়া দিল না, অপর বার্থে নিদ্রিত অবাতরে ঘুমাইতেছিল। তখন অগত্যা সে উঠিয়া অতি সন্তর্পণে নিদ্রিত মূর্ত্তির নিকটস্থ হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া ডাকিল, "রাধি, ও রাধি! বরণ! ম'রে ঘুমুচ্ছিস্ না কি?"

নিদ্রিত মূর্ত্তিও তাহার মত ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া তাহাকে একরূপ জড়াইয়া ধরিয়া ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "এঁ্যা! কি কি? কি হয়েছে, লীলু?"

'লীলু' নামে সম্বোধিতা নারী বলিল, "তোর ওপরে, ঐ বাঙ্কে কে শুয়েছে দেখছিস্!"

'রাধির' তখনও ভয় ভাঙ্গে নাই, তাহার চক্ষুও অন্ধকারেই, সে অস্ফুট আতঙ্ক-জড়িত স্বরে বলিল, "কে? কোথায়?"

'লীলু' ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "কে? তোর যম—ঐ দেখ!"

'উপরে দৃষ্টিপাত করিয়াই 'রাধি' আতঙ্কে 'লীলুকে' আরও নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অস্ফুট ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "মা গো!"

"নে, এখন নেকামি রাখ! আয়, আমরা ওদিকের বেঞ্চিটায় বসি গে যাই। ফিরিঙ্গীটার কি সাহস, মেয়ে-গাড়ীতে এসে উঠেছে!"

"কি হবে লীলু?"

"হবে আবার কি? দেখ না, ওর মেয়ে-গাড়ীতে ওঠা বার করছি! চেনটা টানলেই গাড়ী থামবে।"

কথাটা বলিয়া 'লীলু' শিকল টানিতে হাত বাড়াইল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে যাহাকে লইয়া এই কাণ্ড হইতেছিল, সেই 'ফিরিঙ্গীটা' বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল এবং নিম্নের অপর পার্শ্বস্থ বেঞ্চে দুইটি এ দেশীয় তরুণীকে দেখিয়া এক বারে স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টে তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া 'লীলুর' উদ্যত হস্তও 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় শূন্যপথে উত্থিত হইয়া রহিল। ফিরিঙ্গী-টাও মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মাথার নাইট-ক্যাপটা খুলিয়া ফেলিয়া এক লম্ফে মেঝের উপর অবতীর্ণ হইল। সে কোট-প্যাণ্ট, জুতা-টুপী পরিয়াই বেডিংটা মাথায় দিয়াছিল, তাহার সুটকেশ ও অন্যান্য আসবাবপত্র মেঝের উপর বিস্তৃত ছিল।

তাহাকে নামিতে দেখিয়া 'লীলু' নামে সম্বোধিতা যুবতী বিস্ময়ে বিচলিত না হইয়া বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল, "আপনি ভদ্রলোক—কেমন ক'রে মেডিস্‌দের কামরায় উঠ-লেন, বলতে পারেন?"

ফিরিঙ্গী মুহূর্ত্তকাল তাহার দিকে বিস্ময়বিমূঢ় নয়নে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "লেডিস্? সত্যি আমি জানতুম না। অন্ধকারে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। আপনাদের কোনওরূপ অসুবিধা করি নি বোধ হয়?"

'লীলু' বাঙ্গের স্বরে বলিল, "করেছেন কি না, নিজেই বুঝতে পারছেন। আর যদি তা না বুঝে থাকেন, আপনাকে বোঝাবার যথেষ্ট উপায় রয়েছে জানবেন। নিশ্চয়ই জানেন, লেডিসদের কামরায় উঠলে পুরুষের শাস্তি হয়?"

ফিরিঙ্গী তখনও যে বিশেষ ভয় পাইয়াছিল, এমন বোধ হইল না, সে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল,—তাহার সে হাসিতে যেন অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের ভাব মিশ্রিত ছিল। কিন্তু কথায় সে সেই ভাব কণামাত্র জানিতে দিল না। সে বলিল, "দোহাই আপনার, শিকল টানবেন না, আমি পরের ষ্টেশনেই নেমে যাব। আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন, তা হ'লে শুনুন, আপনাদের দুজনকে আমি মুড়ি দিয়ে শুতে দেখে পুরুষ মনে ক'রে গাড়ীতে উঠে পড়েছিলুম।"

'লীলুর' চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, সে তেজের সহিত বলিল, "দেখুন, বাজে কথা ব'লে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। গাড়ীতে উঠে চারদিকে লেডিসদের ব্যবহারের জিনিষ দেখেও কি বুঝতে পারেন নি এটা লেডিসদের কামরা? ঐ লেডিস ওভার কোটটা? ঐ স্যুট কেশটা—যাতে লেডির নাম পর্য্যন্ত লেখা রয়েছে? ওটা ত চোখের সামনেই প'ড়ে রয়েছে। বেশী কি—"

বাধা দিয়া ফিরিঙ্গীটা আবার আপনার পক্ষসমর্থন করিতে যাইতেছিল, 'লীলু' অধীর হইয়া পরুষকণ্ঠে বলিল, "বেশী কথা কাটাকাটির ইচ্ছে নেই। পরের ষ্টেশনেই নেমে যাবেন।" তাহার পর হাতের রিষ্টওয়াচটার দিকে তাকাইয়া বলিল, "রাত দুটো বেজে গিয়েছে, মধুপুর ছাড়িয়ে এসেছি। এর পর ত আসানসোলে ষ্টপেজ।" লীলু আপন মনে বলিয়া যাইতেছিল, ফিরিঙ্গীকে জবাব দিবার অবসর না দিয়া 'রাধির' দিকে চাহিয়া এইবার বাঙ্গালায় বলিল, "বুনো চাষা! দেখছিস, দোষ ঢাকবার জন্যে মিথ্যের ওপর মিথ্যে ব'লে যাচ্ছে। ছোট জাত কি না—না এদিক, না ওদিক। আসুক আসানসোলে, ভাল ক'রে শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি জানোয়ারটাকে!"

আশ্চর্য্য! 'লীলুর' কথা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিঙ্গীটা পরিষ্কার বাঙ্গালায় বলিল,—"আমার ওপর অবিচার করছেন। দোহাই বলছি—"

তরুণী দুইটি এমনই বিস্ময়সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল যে, বক্তা মধ্যপথেই কথা সাঙ্গ করিয়া তাহাদিগের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টিতে বিস্ময় অপেক্ষা যে আনন্দ উপভোগের ভাবটা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল, তাহা তাহার মৃদুহাস্যস্ফুরিত অধর দেখিলেই সহজে অনুমান করা যায়।

২

বস্তুতঃ যদি সেই মুহূর্ত্তে গাড়ী হঠাৎ লাইনচ্যুত হইত অথবা গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষ হইত, তাহা হইলেও বোধ হয়, লীলা ও রাধারাণী এত চমকিত হইত না। কি আশ্চর্য্য! ফিরিঙ্গী এত সুন্দর বাঙ্গালা বলিতে পারে?

ফিরিঙ্গী যেন আনন্দে গদগদ হইয়া বলিতে লাগিল, "সত্যই বলছি, আমি চাষাও নই, জানোয়ারও নই, ছোট জাতও নই, আমি আপনাদের মতই বাঙ্গালী, এই দেখুন না, আমার স্যুটকেশেই আমার নাম লেখা রয়েছে।"

লীলা তাহার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে নির্দ্দিষ্ট স্যুটকেশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্য সত্যই তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, দিব্যেন্দু বসু। লীলা দৃষ্টি উন্নত করিতেই দেখিল, সেই লোকটা তাহারই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। দারুণ ক্রোধ ও ঘৃণায় তাহার সারা অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। লোকটা কি ধৃষ্ট, কি অসভ্য! একে ত মেয়ে-গাড়ীতে উঠিয়া অন্যায় করিয়াছে, তাহার উপর যেন তাহাদিগকেই অপরাধী বানাইয়া তাহাদিগের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছে! দুই চারিটা স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিবার নিমিত্ত তাহার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইল, সে স্পষ্ট কথা বলিতে কোথাও কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই, তাহার শিক্ষাদীক্ষা আবহাওয়া তাহাকে তেমন ধাতুতে গঠিত করে নাই।

কিন্তু ধৃষ্ট অসভ্য লোকটা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া তাহাকে কোনও কথা কহিবার অবসর না দিয়াই সহাস্যে বলিল, "দেখলেন ত আমি বাঙ্গালী, আমার নাম দিব্যেন্দু, অনেক রাত্রিতে মধুপুরে নেমবার মেরে গাড়ীটি ছাড়ো ছাড়ো সময়ে ছুটে এসে গাড়ী ধরেছি, কাযেই তাড়াতাড়ি অন্ধকারে

লেডিস কামরা কি না দেখিনি। অবশ্য, এর জন্যে আপনারা আমায় দণ্ড দেওয়াতে পারেন। কিন্তু তাতে কেবল রেল-কোম্পানীর পেট ভরবে মাত্র, আপনাদের বিশেষ লাভ নেই। তার চেয়ে আসানসোলে নেমে গেলেই যখন আপনাদের আর জানোয়ারের সঙ্গে ভ্রমণ করবার দরকার থাকবে না, তখন মিথ্যে আর কষ্ট ক'রে সাজা দেওয়াবার ঝামেলা পোয়াবেন কেন ?"

লীলা এমন লোক কখনও দেখে নাই। সে সুন্দরী শিক্ষিতা যুবতী—এ যাবৎ পুরুষমাত্রেরই নিকটে—বিশেষতঃ শিক্ষিত তরুণ-সমাজে—সে তাহার রূপ-গুণের যোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধাই প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। তাহার কথার ঝাঁজে বহু পরিচিত যুবক ঝলসিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কেহ সে জন্য তাহার সেই ঝাঁঝ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বা ঝাঁঝের উত্তরে ঝাঁঝ দেখাইতে সাহসী হয় নাই। না, এই 'চাষা'কে শিক্ষা দিতেই হইবে !

লীলা তাই ব্যঙ্গের স্বরে তাহার বাক্যোক্তির জবাব দিল,—"না, সে কষ্ট স্বীকার ক'রে ফলও নেই, কেন না, যে পুরুষ নারীর মর্য্যাদা রেখে কথা কইতে জানে না, তাকে সাজা দেওয়ালে সে সেই সাজার উদ্দেশ্য অনুভবই করতে পারবে না।"

লীলার এই কশাঘাতে দিব্যেন্দু বিচলিত হইল কি না, তাহার মুখচক্ষুর ভাবে কিছুই বুঝা গেল না, কিন্তু রাধারাণী যে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিল, তাহা তাহার কাতর করুণ দৃষ্টিই ব্যক্ত করিয়া দিল। তাহার দৃষ্টি যেন তাহাকে ধরাইয়া দিয়া বলিল, সে-ই যেন এই কথার জন্য অপরাধিনী। দিব্যেন্দু মুহূর্ত্তমাত্র তাহার আনত দৃষ্টির দিকে চাহিবার পর হাসিমুখে পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "এ যা বললেন, এটা একবারে ঠিক—রাতদিন রেলে থেকে থেকে আমাদের কাছে আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য অপ্রাপ্য কি, তা আজও ঠিক করতে পারি নি—"

লীলা বলিল, "আপনি বুঝি রেলে কাষ করেন ? বসুন না ঐ বেঞ্চে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?"

দিব্যেন্দু তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল ; বলিল, "হাঁ, রেলে রেলেই দিন কাটছে বটে—এমন অনেক দিনই কেটেছে।"

লীলা তাহার কথাটা শুনিয়াও যেন শুনিল না, এইরূপ ভাব দেখাইয়া সঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "কি লো, তুই যে একবারে কোণে মুখ গুঁজেই ব'সে রইলি ! চক্ষু দেখে আর বাঁচি নি !" তাহার পর ঈষৎ উচ্চ স্বরে বলিল, "টাইম-টেবলখানা বার কর দিকি— ঐ সুট-কেশটার মধ্যে আছে। আর দেখ্, লেডিস ম্যাগাজিনখানাও ঐখেনে পাবি'খন—ওখানাও আনিস্।" কথাটা বলিয়া সে চাবীর গোছাটা ছুড়িয়া দিল। লীলা যে তাহার আচরণে দারুণ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছে, স্পষ্ট বলিতে বলিলেও সে বলে নাই, এ জন্য তাহার কথায় কান না দিয়া সঙ্গিনীর সহিত অন্যান্য আলাপ করিতেছে, এ কথাটা বুঝিয়া লইতে দিব্যেন্দুর বিলম্ব হইল না।

রাধারাণী লজ্জাবরুণবদনে মেঝের উপর দৃষ্টি রাখিয়া 'কোণ' হইতে বাহির হইল, কম্পিত চরণে সুটকেসের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল এবং সেটিকে বাঙ্ক হইতে পাড়িতে হস্ত প্রসারণ করিল।

দিব্যেন্দু এতক্ষণ দ্বারপ্রান্তে দাড়াইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল—তাহার কোন কিছুতে একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। কিন্তু রাধারাণীকে ভারী জিনিষটা নামাইতে দেখিয়া সে দ্রুতপদসঞ্চারে বাঙ্কের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া ক্ষিপ্রগতি সুটকেশটা নামাইয়া দিল। রাধারাণী নতমুখে সুটকেশের চাবী খুলিতে বসিল।

লীলার মুখচক্ষু আগুনের মত হইয়া উঠিল। ইহা কি তাহাকেই সরাসরি অপমান করা হইল না ! লোকটা এত বড় জানোয়ার যে, সে তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেও শুনিয়াও শুনিল না, পদে পদে প্রতি কথায় তাহাকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করিয়া আসিয়াছে, অথচ তাহাকে দেখাইয়া রাধারাণীর প্রতি সৌজন্য দেখাইল। সে যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক জানাইল যে, সে নারীজাতির প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে জানে, কেবল তাহাকেই জানায় নাই—তাহাকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করিয়াছে।

রাগে লীলার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু প্রতিশোধ লইবার উপায় নাই, কাযেই তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বেচারা রাধারাণীর উপর। রাগের আরও একটা কারণ ছিল, কেন না, লীলা অপরূপ সুন্দরী, আর রাধারাণী সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরের 'পাঁচপাঁচি' মেয়ে। উহাকে সম্মান দেখাইয়া জানোয়ারটা কি সৌন্দর্য্যেরও অপমান করিল না !

পঞ্চমকণ্ঠে চীৎকার করিয়া লীলা বলিল, "তোকে

কতবার বলেছি, জিনিষগুলো অমন ক'রে ঘাঁটিস্ নি। একটা কায করতে গেল ত এ যুগ আর আর যুগ! নে, সর্!"

রাধারাণী থতমত খাইয়া ম্লানমুখে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল, লীলা সুটকেশটা টানিয়া লইয়া জিনিষ বাহির করিতে লাগিল।

দিবোন্দু বিস্মিত হইল। উভয়েই দেখিতে প্রায় বয়সে সমান বলিয়াই মনে হয়, অথচ এক জন আজ্ঞা করিতেছে, অপরা ভয়ে ভয়ে আজ্ঞাপালন করিতেছে,—উভয়ের কি সম্বন্ধ?

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, লীলা সুটকেশের চাবী বন্ধ করিয়া বই দুখানা লইয়া স্বস্থানে উপবেশন করিল। তাহার পর রাধারাণীকে আলোকের আবরণ অপসারণ করিতে হুকুম দিল এবং রিষ্টওয়াচে টাইম দেখিয়া ও টাইম-টেবল খুলিয়া বলিল, "ওঃ, তিনটে বাজে—তা হ'লে মিহি-জামটায় ছাড়িয়ে এইছি, আসানসোল এল ব'লে।"

দিবোন্দু এই সময়ে বলিল, "এখনও রাত আছে, আপনারা আর একটু শুন্ না, আমি দরজার পাশেই দাঁড়াচ্ছি, আসানসোল এলেই নেমে যাব।"

লীলার তখন মনে কি হইতেছিল, তাহা সে-ই জানে! হঠাৎ তাহার মুখের অপ্রসন্নতার ভাব মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল, সে হাসি-হাসি মুখে বলিল, "আসানসোলে দাদা একবার নিশ্চয় খোঁজ নিতে আসবেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে যাবেন না? পাশের গাড়ীতেই তিনি আছেন।"

এ কথাটার বিদ্রূপের কথা লুক্কায়িত ছিল কি না, তাহা দিবোন্দু বুঝিল কি না, জানিতে দিল না। সে কেবল লক্ষ্য করিল, রাধারাণীর মৃদু ভৎর্সনার দৃষ্টি লীলার উপর ন্যস্ত হইয়াই চকিতে বিলাইয়া গেল। কিন্তু আর কথার অবসর হইল না, গাড়ী অল্পপরেই আসানসোলে আসিয়া পৌঁছিল।

মুহূর্ত্ত পরেই আলষ্টার-আঁটা চশমাধারী একটি বাঙ্গালী যুবক গাড়ীর দরজার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক জন য়ুরোপীয় যাত্রী সেকেণ্ড কম্পার্টমেণ্ট হইতে নামিতেছে; কুলীরা তাহার মালপত্র উঠাইতেছে। সে বিস্মিত-নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। লীলা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "দাদা, উনি ভুলে মধুপুরে উঠে পড়েছিলেন। বলছি তোর হয়ে এল, আর গাড়ী বদলাতে হবে না, গাড়ীতে ও আমরা ছাড়া আর কোন লেডী নেই, একসঙ্গেই হাওড়ায় চলুন। তা উনি শুনলেন না।"

সুরেশচন্দ্রের বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। এই য়ুরোপীয় যাত্রীকে তাহার গাড়ীতে থাকিবার জন্য লীলা অনুরোধ করিতেছে কেন, ইহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ইতোমধ্যে 'সাহেব' মাথার ক্যাপটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি বাঙ্গালী, মশাই। চলুন আপনার কামরায় যাওয়া যাক, ঐখেনেই কথা হবে'খন।" উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই সে পার্শ্বের কামরার দিকে চলিয়া গেল। সুরেশচন্দ্র তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া রহিল।

৩

"এখানা ঐ তাকে রাখ্। তোর কি কোন বুদ্ধি নেই? মেঘদূতখানা রেখেছে বক্তিনের গ্রন্থাবলীর পাশে। যেন খুকীটি! বাঙ্গালা আর সংস্কৃত বই কি এক আলমারীতে রাখ্তে হয়?"

রাধারাণী মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "আমি অত শত জানি নি ভাই। রোক্কুরে দিতে বলেছিলে, দিয়েছি, কোথায় কি রাখ্তে হয়, জানি নি।"

লীলা বলিল, "জানবি কি ক'রে—পাড়াগেঁয়ে ভূত! নে, ঐ বই ক'খানা পাশাপাশি সাজিয়ে রাখ। আবার এখনই গা ধুয়ে সাজতে গুছতে হবে!"

রাধারাণী অবনতমুখে ভয়ে ভয়ে বলিল, "আজ কোথায় যাবে লীলু? দাদা বলেছিলেন, 'চন্দ্রশেখর' দেখতে যাবেন।"

লীলা হো হো হাসিয়া বলিল, "নাও কথা! সে বুঝি আজকে—সে যে শনিবার! তাও জানিস নি? বিয়ে হ'লে ঘর করবি কি ক'রে? আজ যে দিবোন্দু বাবু আমাদের 'ওয়ে ডাউন ইট' দেখতে নিয়ে যাবেন।"

রাধারাণী বিশেষ ব্যস্ততার সহিত বইগুলি ঝাড়িয়া আলমারীতে তুলিতে লাগিল। লীলা বলিয়া যাইতে লাগিল, "করেন ত রেলের চাকরী—না হয় বড় জোর দেড়শ'দু'শ টাকা মাইনেই হবে, কিন্তু ধোতো নবাবীটা দেখিছিস ওর? চালায় কি ক'রে, তাই ভাবি।"

রাধারাণী একখানি কেতাব ঝাড়িতে ঝাড়িতে মৃদুস্বরে বলিল, "পশ্চিম থেকে আসবার পর অনেক দিন হয়ে গেল, ওর ছুটী ফুরোয় নি?"

লীলা তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "কে জানে! বিশ মেই

তার কুলোশানা চক্কোর। জানিস রাধি, বাবুর ছেলের চাকর, তবু আকাশের চাঁদ ধরতেও সাধ আছে দেখি। এ সব লোকের ভাল ক'রেই শিক্ষা হওয়া উচিত।"

রাধারাণীর বুক গুরু গুরু করিয়া উঠিল, সে কাতর করুণ দৃষ্টিতে লীলার দিকে একবার চাহিয়া দৃষ্টি অবনত করিয়া লইল। ক্ষণপরে মৃদুস্বরে বলিল, "দয়া ক'রে ওঁকে ক্ষমা কর না ভাই। দু'দিন বাদেই যখন চ'লে যাবেন—"

লীলা গর্ব্বিতা হংসীর মত গ্রীবা উন্নত করিয়া সক্রোধে বলিল, "ক্ষমা করব? কাকে? যে আমাকে রেলগাড়ীতে অপমান করেছে? আমাকে তুই জানিস নি, রাধি!"

লীলা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রাধারাণী যদিও মাত্র দুই বৎসর পিতৃ-মাতৃহারা হইয়া তাহার নিভৃত পল্লীর অসহায় সাদাসিধা জীবনযাত্রা ছাড়িয়া কলিকাতায় তাহার মাতৃস্বসার বালিগঞ্জের প্রাসাদোপম গৃহে আসিয়া বসবাস করিতেছে, তথাপি এই দুই বৎসরে সে তাহার মাতৃস্বসার দুহিতা লীলাকে জানিবার যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর পাইয়াছে। লীলা বিধবা জননীর কনিষ্ঠ সন্তান, শৈশবে পিতৃহারা হইয়া অত্যধিক আদরে-যত্নে প্রতিপালিতা হইয়াছে। জীবনে তাহার কোনও সাধ অপূর্ণ থাকে নাই। অর্থে ও লোকবলে এ জগতে যাহা সম্ভব, সে তাহা পাইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার মাতার পরলোকগমনের পর তাহার ভ্রাতা ব্যারিষ্টার হইয়া আসা অবধি তাহাকে যে ভাবে শিক্ষিতা, দীক্ষিতা করিয়াছে, তাহাতে সুদূর পল্লীর অশিক্ষিতা অনার্জ্জিতা রাধারাণীর সহিত তাহার প্রভেদ যে অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা রাধারাণী কলিকাতায় আসিবার দুই চারি দিন পরই বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিল। সুরেশচন্দ্র বাটীতে মেম শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া ভগিনীকে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা এবং নৃত্য-গীত ইত্যাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন। লীলা বেথুন কলেজ হইতে একটা পাশও করিয়াছিল।

তাই যখন লীলা গর্ব্বোন্নত মাথা তুলিয়া ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে বলিল, "আমাকে তুই জানিস নে, রাধি," তখন রাধারাণীর দুই বৎসরের অতীত ঘটনাগুলির কথা একে একে মানসদর্পণে চিত্রের মত ফুটিয়া উঠিল। সেই দুই বৎসরে লীলার হৃদয়ের সে কি পরিচয় পাইয়াছে! লীলার ভালবাসা ও অনুগ্রহপ্রার্থী কত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবক তাহার জিহ্বার কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছে। রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা,—বিধাতার এ সকল দান লীলার উপর অকুণ্ঠিতভাবে বর্ষিত হইয়াছিল। আধুনিক যুগে সমাজের উচ্চ স্তরের কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবক যাহা জীবন-সঙ্গিনীতে অনুসন্ধান করে, তাহার কোন কিছুরই ত্রুটি লীলাতে পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু তবু! তবু কি জানি কেন রাধারাণী তাহার সঙ্গিনীর মধ্যে কি একটা জিনিসের অভাব অনুভব করিত। সে যে কি, তাহা রাধারাণী ঠিক বুঝিতে পারিত না।

কলিকাতার বাসায় অনুক্ষণ লীলার অনুগামিনী হইতে হইয়া রাধারাণীকে তাহার পাড়াগাঁয়ের খোলস কতকটা বদল করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই বৎসরেও সে ঠিক 'লীলা' হইয়া উঠিতে পারে নাই। সে বিষয়ে তাহার অন্তরায়ও ছিল অনেকগুলি। প্রথম তাহার সৌন্দর্য্যের অভাব, দ্বিতীয় তাহার স্বভাবসুলভ বিনয় লজ্জা, তৃতীয় তাহার শিক্ষার অভাব, চতুর্থ তাহার ভয়, পঞ্চম তাহার পুরুষকে আপনা হইতে বড় বলিয়া জ্ঞান করার জন্মার্জ্জিত সংস্কার। তাই সে যখন দেখিত, লীলা তাহার অনুগ্রহ-ভিখারী শিক্ষিত যুবককে নিষ্ঠুর উপেক্ষাভরে জিহ্বার কশা দ্বারা আঘাত করিতেছে, তখন তাহার স্বভাবকোমল নারীসুলভ মনটা ব্যথিত হইত, নয়ন-পল্লব অশ্রুভারাক্রান্ত হইত, সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না যে, লীলা ঠিক পুরুষের সহিত সমান আসন রাখিয়া পুরুষেরই মত কঠিন হইয়া কেমন করিয়া কথার গরল ঢালিতে পারে, কেমন করিয়া আঘাতের পর আঘাত দিয়া পুরুষকে দলিত-পিষ্ট করিতে পারে।

তাই যখন লীলা দিব্যেন্দুকে ক্ষমা করিবে না বলিয়া সদম্ভ উক্তি করিল, তখন অনিশ্চিত একটা ভয়ের ও অমঙ্গলের আশঙ্কায় রাধারাণীর মনটা ভরিয়া উঠিল। সে দিব্যেন্দুর ভবিষ্যৎ শাস্তির কথা ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, মিনতির সুরে বলিল, "উনি ত জেনে-শুনে আমাদের গাড়ীতে ওঠেন নি।"

লীলা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "জেনে-শুনে গাড়ীতে ওঠেন নি, তার কথা ত হচ্ছে না। উঠলে বা না উঠলে, আমাদের তাতে কিছু এসে যেতো না। আমি পুরুষমানুষকে একটা মস্ত জীব ব'লে মনে করি নি; যে বিধাতা পুরুষকে সৃষ্টি করেছে, সেই বিধাতাই আমাদেরও সৃষ্টি করেছে; তখন আমাদের গাড়ীতে একটা পুরুষ উঠলেই যে পৃথিবীটা

উল্‌টে যেত, তা নয়। তবে ঐ লোকটা আমায় বার বার অপমান করেছিল—তাই ওকে শিক্ষা দিতে চাই।"

লীলার চক্ষু অসম্ভব দীপ্তিতে ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহার মুখ হইতে যেন বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ইজি-চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া জানালার বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া আবার বলিল, "বেরাল ইঁদুর নিয়ে খেলা করে দেখিছিস্, রাধি? আমি তেমনই ক'রে ওকে নিয়ে একটু খেলা করছি, বুঝলি?"

রাধারাণী বাধিতস্বরে পুনরায় বলিল, "উনি ত শীগ্‌-গিরই চ'লে যাবেন—"

লীলা ক্রোধে একরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "দেখিস্! উস্ বেরে যে জল ক'রে পড়লো! ও তোর কে? কথা কচ্ছিস্ এমনই, যেন মনে হয়, তুই ওকে ভালবাসিস্। সত্যি না কি রে?"

রাধারাণীর মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি কেতাবের রাশির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বলিল, "কি যে বল ছাই!"

লীলা এইবার হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "তা বাপু, দাদার আমার অন্যায়। পাড়াগাঁয়ে যে বয়েসে মেয়েদের বিয়ে হয়, আমার বোন্‌টির তা হ'লে এত দিন ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করতে হ'তো। তা নয় এবার দাদাকে ব'লবো—"

"দাদাকে কি বলবি রে লীলি?" বলিতে বলিতে সুরেশচন্দ্র দিব্যেন্দুকে লইয়া একবারে সেই ঘরে হাজির। লীলা ও রাধারাণী বিস্মিত হইল—এমন অসময়ে তাঁহারা কেন?

লীলা বলিল, "আজ কোর্টে যাও নি? আসুন দিব্য বাবু, বসুন। বায়স্কোপ ত সন্ধ্যে ৬টায়।"

সুরেশচন্দ্র পার্শ্বের কক্ষে কোর্টের বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিল, "আজ জষ্টিস রেমণ্ড মারা গিয়েছেন ব'লে বেলা ১টার পর কোর্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভাব-লুম, একা বাড়ী ব'সে কি করবো, তাই দিব্যেন্দুকে পাকড়ে নিয়ে এলুম। দু'চার হাত ব্রিজ খেলে, চা'টা খেয়ে বায়-স্কোপে যাওয়া যাবে'খন। কি হে দিব্যেন্দু, বোবার মত ব'সে রইলে যে?"

বলা বাহুল্য, সেই রেসে দেখার পর উভয়পক্ষের আলাপ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। দিব্যেন্দু কালীঘাটের দিকে থাকিত, প্রায়ই সুরেশচন্দ্রের গৃহে বেড়াইতে আসিত। দিব্যেন্দু বলিল, "বই দেখছিলুম। আপনার কালেকশান ত খুব বেশী—আলমারীর ভেতর গোছান থাকত ব'লে বুঝতে পারা যেত না।"

লীলা বলিল, "ওর ভেতর এক এক তাকে তিন সার ক'রে সাজান থাকে কি না। রাধি, মাঝের তাকের সাম্‌নের সারের দু'চারখানা বই পাড় ত।"

দিব্যেন্দু উঠিয়া আলমারীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "থাক্, থাক, আমিই পেড়ে নিচ্ছি।"

কিন্তু পাড়িবার কালে একটু গোলযোগ হইয়া গেল, দিব্যেন্দুর হাতের সহিত রাধারাণীর হাতের স্পর্শ হইল। রাধারাণী একবারে মুখ-চোখ রাঙ্গা করিয়া এক পার্শ্বে গিয়া অধোমুখে সরিয়া দাঁড়াইল। লীলা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, দিব্যেন্দু অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিল, "দেখুন, আমি বোধ হয় আর দু'চার দিনের মধ্যে পশ্চিমে যাচ্ছি। হয় ত দু'চার দিন আপনাদের সঙ্গে দেখা না-ও হ'তে পারে, এমন কি, হয় ত হঠাৎ এক দিন কারুর সঙ্গে দেখা না করেই চ'লে যেতে হবে। এই জন্যে আগে থেকেই আপনাদের কাছে ছুটী নিয়ে রাখছি।"

লীলা বিস্ময়োদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "সে কি? এ কথা ত এক দিনও বলেন নি আগে? হঠাৎ এত তাড়া এল কেন? আপনি ত বলেছিলেন, হয় ত এক বছর আর রেলে যাওয়া হবে না—ছুটী কি এক বছর নেন নি?"

দিব্যেন্দু কথাটার জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঐ সময়ে সুরেশচন্দ্র বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিল, "তুই ত ভারি বোকা, লীলি! রেলের ছুটী কখনও এক বছর হয়? ও হয় ত মজা করবার জন্যে ও কথা বলেছিল। কেমন, না দিব্যেন্দু?" কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া সুরেশচন্দ্র একটা বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া চেয়ারে বসিয়া সেই দিনের ইংরাজী কাগজখানা উঠাইয়া লইল।

লীলা ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিল, "মজাটা এর মধ্যে কি হ'ল? মিথ্যে কথা ব'লে মজা করাটা কোন্ ভদ্রতার শাস্ত্র অনুমোদন করেছে?"

দিব্যেন্দু কোন কথার জবাব না দিয়া রাধারাণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কিছু বলবেন না? এখন গোছান

থাক, আসুন, সবলে ব'সে গল্প করা যাক্। আর দু'দিন বই ত নয়।"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "হাঁ, তাই চলুক! তবে একঘেয়েটা চা একবার হয়ে গেলে ভাল হতো না?"

রাধারাণীর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, সে যেন কত অপরাধিনীর মত নিঃশব্দে আসিয়া সুরেশচন্দ্রের পার্শ্বে একখানি চৌকী টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু লীলার মুখখানি একবারে আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল। এ বাসৎ তাহাদের বাড়ীতে তাহার দাদার যত বন্ধু বা পরিচিত ভদ্রলোক আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ ত কখনও পূর্ব্বে তাহার কথার জবাব না দিয়া ইতরের মত রাধারাণীকে ডাকে নাই। রাধারাণী তাহাদের বাড়ীতে নগণ্য—তাহার না আছে রূপ, না আছে ঐশ্বর্য্য, না আছে বিদ্যা,—সে ত মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে। তবে? তবে এই ইতরটা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার কথায় সাড়া না দিয়া, রাধারাণীকে সম্মান করিল, ইহার পশ্চাতে তাহার কি দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত নাই? ক্রোধকম্পিত স্বরে সে বলিল, "যা না, চেয়ারে এসে থুব হয়ে বস্‌লি কেন? চা-টার যোগাড় করতে হবে না?"

রাধারাণী তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইল।

দিব্যেন্দু লীলার ক্রোধের মাত্রা অনুভব করিয়াছিল কি না, জানিতে দিল না। যেন কিছু হয় নাই, এই ভাবে সে পুনরপি রাধারাণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কৈ, আপনি ত কিছু বল্‌লেন না?"

রাধারাণী যাইতে যাইতে নতমুখে বলিল, "আমি আর কি বল্‌বো?" বলিয়াই সে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

হঠাৎ সুরেশচন্দ্র কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বিস্ময়সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল, "এঁা! বরেন মারা গেল? আহাহা, পুষোর ফেলো!"

লীলাও কম চমকিত হইল না—সে তীরের মত চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "দেখি, দেখি, কাগজখানা—"

সুরেশচন্দ্র কাগজখানা ভগিনীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "গেল বছরও এমনই সময়ে আমার এখানে কত আমোদ ক'রে গেছে। আহা! বেচারা বাপের সঙ্গে মনান্তর করেই বেঘোরে প্রাণটা হারাল।"

কোন একটা কিছু বলিতে হয়, তাই দিব্যেন্দু বলিল, "কে বরেন?"

"তুমি তাকে জানবে না হে। বড় ভাল ছোকরা ছিল সে! দু'জনে একসঙ্গেই বিলেত থেকে এসেছিলুম, সে ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিল।"

দিব্যেন্দু সামান্যমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, এত কম বয়সে মারা গেল কিসে?"

"আরে, সেটাইটই ত হুঃখ, ছাটের শক লেগেই মারা গেল। আহা, বেচারা যখন বিলেত যায়, তখনই তাতে তার বাপের আপত্তি ছিল—কত ভয় দেখিয়েছিল, তাজ্যপুত্তুর করবে; কিন্তু বরেন দমে নি একটুও, বলেছিল, লেখাপড়া শিখতে যেখানে খুশী গেলে জাত যায় না।"

দিব্যেন্দু কেবল বলিল, "এখনও এমন লোক আছে না কি, যারা কালাপানি পার হ'লে জাত যায় বলে?"

লীলা এতক্ষণে কথা কহিল; হাসিয়া বলিল, "অনেক, আপনাদের পাড়াগেঁয়ে জমীদার—"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "হাঁ, বরেনের বাপও পলাশডাঙ্গার জমীদার—"

দিব্যেন্দু চেয়ার নড়িয়া বসিল, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার?"

"পলাশডাঙ্গার হে—হুগলী জেলার। লোকটা এ সংসারে অর্থোদয়—তেলক-টিকিওয়ালা। তবে ছেলে যখন বিলেতে ছিল, খরচ জুগিয়েছিল—এক ছেলে কি না। কিন্তু দেশে ফিরে আসতেই ছেলেকে ঘরে নিতে চাইলে না, গোঁ ধরলে, গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে। সে আজ ও বৎসরের কথা।"

লীলা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সুরে বলিল, "কেমন 'জানি!' নয় কি দিব্যেন্দু বাবু?"

দিব্যেন্দু বলিল, "হুঁ, 'জানি' বই কি! তার পর?"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "ছেলেও বাপের ওপরে যায়, সে গোঁ ধরলে, গোবর খাবে না। তখন লীলার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হচ্ছিল। দেশে ফিরে সে ত বাড়ী ওঠেনি, আমার এখানেই ছিল, আমিই জোর ক'রে ধ'রে এনেছিলুম।"

দিব্যেন্দু একবার চকিতে লীলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "দেখি কাগজখানা একবার।"

লীলা কাগজখানা টেবলের উপর রাখিয়া দিল

চা আসিল। সুরেশচন্দ্র চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। লীলাও এক কাপ লইল, কিন্তু দিবোন্দু চা ছুঁইল না, কাগজপাঠে মন দিল। লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি খেলেন না?"

দিবোন্দু বলিল, "না, বায়স্কোপ যাবার সময় একবারে খাব। ইস্! এ এক রকম আত্মহত্যা বললেও বলা যায়।"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "হাঁ, আত্মহত্যাই বটে; কাগজে যা পড়লে, তার চেয়ে আরও অনেক বেশী কথা আছে। এক বছর বাপ-বেটার মধ্যে মিলনের চেষ্টা করেছিলুম, কিছুতেই কিছু হ'ল না। বুড়ো শেষে সত্যি সত্যি উইল ক'রে তার যথাসর্ব্বস্ব এক জাতির ছেলেকে দিয়ে গেল—এত বড় জেদ তার! তাও যদি সেই জাতির ছেলেটা মানুষের মত হ'ত। সেও শুনেছি একটা ভবঘুরে।

দিবোন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "যাক, তার পর ছেলে কি করলে?"

"বয়েস বাপের ত্যাজ্য পুত্তুর হয়ে যখন বিষয় হ'তে বঞ্চিত হ'ল, তখন আর এক মুহূর্ত্ত আমার বাড়ীতে থাকতে চাইলে না, কোথায় যে চ'লে গেল, কেউ জানতে পারলে না। শুনছি মধ্যপ্রদেশে এক মেড়ো রাজার ষ্টেটে ডাক্তারী চাকুরী নিয়ে চ'লে গিয়েছিল।"

দিবোন্দু বলিল, "কাগজে লিখছে যে ভাবে, তাতে বোধ হচ্ছে, তার আত্মহত্যার কারণ কেবল বাপের সঙ্গে মনান্তর না, প্রণয়ের প্রত্যাখ্যানও বড় রকমের কারণ। সে না কি এ কথা ষ্টেটের আরও দু'জন বড় বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীর নিকট নেশার ঝোঁকে অনেকবার বলেছিল।"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "হাঁ, সে বলেছিল, লীলার সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথা পেড়েছিলুম, তখন সেটা বুঝি পাকাপাকিই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাপ যখন তাকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে বিষয় থেকে বঞ্চিত করলে, তখন ত আর তার সঙ্গে লীলার বিবাহ হ'তে পারে না। আমি বিবাহ দিলেই বা লীলা তাতে রাজী হবে কেন—ওদের দু'জনের মধ্যে ত একটা বাধাবাধি মনের মিলের মত কিছু হয় নি।"

দিবোন্দুর ওষ্ঠের কোণে ঈষৎ হাসি দেখা দিল, সে বলিল, "তা ত ঠিক, কোথায় জমীদারের ছেলে, আর কোথায় পরের বাইনে করা ডাক্তার!"

লীলা কথাটার মধ্যে তীব্র শ্লেষোক্তি অনুভব করিল না, সে তখন অতীতের কথাই ভাবিতেছিল। সে বলিল, "ডাক্তারী চাকুরী নিয়ে যাবার আগে আমায় সেই জঙ্গলে গিয়ে তার ঘরের গৃহিণী হ'তে বলেছিল—এমনই স্বার্থপর লোকটা!"

দিবোন্দু বলিল, "শুনে আপনি কি বলেছিলেন, মুখের মতন জবাব দিয়েছিলেন ত?"

লীলা জবাব দিবার পূর্ব্বেই সুরেশচন্দ্র বলিল, "এ তার অন্যায় আবদার। লীলা যে রকম অবস্থার মধ্যে ব্রট আপ হয়েছে, তাতে—"

দিবোন্দু কথাটা শেষ করিয়া দিল,—"তাতে জঙ্গলী ডাক্তারের পক্ষে তার অভাগ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সে জঙ্গলের মধ্যে সম্ভব হ'ত না। তা, লোকটা মদ খেয়েই মরল?"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "তাই ত কাগজে লিখেছে। যাক, একটা আন-প্লেসেণ্ট সাবজেক্ট নিয়ে—"

"খাবার হয়েছে, আনব কি, দাদা?" রাধারাণী দ্বারদেশে দেখা দিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিল। দিবোন্দুর অপ্রসন্ন মুখখানা কি জানি কেন হঠাৎ একটা অজানা আনন্দ-আলোকে হাসিয়া উঠিল। সুরেশচন্দ্র একরাশি চুরুটের ধূম উদ্গিরণ করিয়া বলিল, "এইখেনেই দিবি? তা দে, কিন্তু দেরী করিস নি, সাড়ে পাঁচটাও হয়ে এল।"

আহারের পর সকলে যখন বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল, তখন দিবোন্দু একাকী বসিয়া কাগজখানা নাড়া-চাড়া করিতে করিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিল, "হতভাগা নিজেও মরল, বাপকেও মারলে! বাপও কিন্তু ভুজারতে এমন নেই বলতে হবে।"

এই সময়ে রাধারাণী কি একটা কাযে বাহিরের ঘরে আসিয়া পড়িল; কিন্তু দিবোন্দুকে একাকী থাকিতে দেখিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল। দিবোন্দু তাকে সে অবসর না দিয়া যেন আরও অধিক অপ্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে দুষ্টামী করিয়া বলিল, "এবার কি বনবাস খাটতে এলেন? আলোবাতি জ্বালতে, না গাড়ী তৈরী করতে বলতে?"

রাধারাণী কেবল "যান, আপনি ভারী দুষ্টু" বলিয়া দ্রুত-পদে অন্দরে প্রবেশ করিল। কি একটা অব্যক্ত প্রসাদে দিবোন্দুর অন্তরটা ভরিয়া উঠিল।

৪

ইহার পর আরও পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। দিবোন্দু এখন নিত্য লীলাদের বাড়ীর যাত্রী। এখন লীলা ও রাধারাণীর সহিত তাহার আলাপ 'তুমিতে' উঠিয়াছে। রাধারাণী দিবোন্দুর এরূপ কর্ত্তব্যহীন জীবনযাপনে অত্যধিক বিস্ময় অনুভব করিত, বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিত না, কিরূপে এই রেলের কর্ম্মচারী এত দীর্ঘকাল রেলের চাকুরী ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দে কলিকাতায় ভাবনাহীন জীবন অতিবাহিত করিতেছে। লীলার এ সকল চিন্তার অবকাশ ত ছিলই না, প্রয়োজনও ছিল না। সে একবারমাত্র দাদার নিকট শুনিয়াছিল যে, দিবোন্দু কালীঘাটে এক ধনী আত্মীয়ের গৃহে বাস করে, তাহার রেলের চাকুরীর কি হইয়াছে, কাহাকেও বলে না; তবে কিছু দিন পূর্ব্বে সে তাহাকে বলিয়াছে যে, তাহার কোনও জ্ঞাতির মৃত্যুতে সে কিছু সম্পত্তির মালিক হইয়াছে, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের বা ভবিষ্যৎ সংসারযাত্রার কোনও চিন্তার কারণ নাই।

সুরেশচন্দ্র তাহার ভগিনীর প্রকৃতি অবগত ছিল, এ জন্য সে দিবোন্দুর মত যুবককে তাহাদের সহিত মিলামিশা করিতে দিত। সে জানিত, লীলার রূপগর্ব্ব ও শিক্ষার গর্ব্ব তাহার দুর্ভেদ্য রক্ষাকবচ—তাহা ভেদ করিয়া দারিদ্র্যের আক্রমণ কখনও বিজয়দাফল্যে মণ্ডিত হইতে সমর্থ হইবে না। দিবোন্দু অপেক্ষা বহুগুণে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধনিসন্তানও সেই কবচদুর্গের ভীমকবাটে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ব্যর্থাহতমস্তকে পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়াছে। আর রাধারাণী? সে ত গণনার মধ্যেই ধর্ত্তব্য নহে। সেই রূপহীনা অশিক্ষিতার জন্য চিন্তার কোনও কারণ ছিল না। তাহার ভগিনী লীলার মধ্যাহ্নদীপ্তির নিকটে এই পল্লীর অমার্জ্জিতা খদ্যোতিকার মৃদু আলোকরশ্মি সর্ব্বদা নিষ্প্রভ হইয়া থাকিত; তাহার দিকে কচিৎ কখনও কাহারও দৃষ্টি নিপতিত হইত কি না সন্দেহ। সুতরাং সে দিকে আশঙ্কার কারণ বিদ্যমান ছিল না। তবে সে শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবকে আপনার অবসর-বিনোদনের জন্য স্বগৃহে আনয়ন করিবে না কেন—আপনার জনের সহিত পরিচিত করিয়া দিবে না কেন? তাহার অর্থের অভাব ছিল না—তাহার শিক্ষাদীক্ষাও প্রাচীনপন্থীর সীমাবদ্ধ কূপসংস্কারের গভীরমধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তবে কি জন্য সে শিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি আধুনিক সম্প্রদায়ের উপভোগ্য রসাস্বাদনে আপনাকে ও আপনার জনকে বঞ্চিত রাখিবে?

প্রথম আলাপেই সুরেশচন্দ্র দিবোন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আসানসোলে দিবোন্দু যে মুহূর্ত্তে লেডিস্ কামরা হইতে তাহার কামরায় আসিয়া স্থান সংগ্রহ করিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সে তাহার কমনীয় কান্তিতে ও সরল নির্ভীক স্পষ্ট আলাপ-পরিচয়ে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল. পরে হাওড়া পর্য্যন্ত একত্র ভ্রমণের পর সে তাহার কথাবার্ত্তায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে. তাহাকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ না করিয়া পারিল না। পরিচয়ের মধ্যে সে কেবল জানিতে পারিয়াছিল যে, দিবোন্দু তাহারই মত কায়স্থকুলোদ্ভব এবং পল্লীবাসী, সম্প্রতি রেলেই কালাতিপাত করিতেছে।

এই আলাপ ক্রমশঃ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র বুঝিয়াছিল, দিবোন্দু সরলপ্রকৃতি ও সত্যবাদী, সে তাহার ও তাহার ভগিনীর বন্ধুত্বে আনন্দ লাভ করে বলিয়া তাহার গৃহে প্রায় আতিথ্য স্বীকার করে। তাহার ও তাহার ভগিনীর আরও পাঁচ জন পরিচিত ও বন্ধুর মধ্যে দিবোন্দুও এক জন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ইদানীং লীলা তাহার আকর্ষণের জাল যতই বিস্তৃত করিতেছিল, ততই দিবোন্দুরূপ মৎস্য তাহার মধ্যে ধরা দিতেছিল। রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা এবং শিক্ষা-দীক্ষার অস্ত্রাগারে যত অস্ত্র ছিল, তাহার কোনটারই প্রয়োগে সে সুযোগ ও অবসর ত্যাগ করিতেছিল না। যাহার সামান্য একটু হাসির জন্য কত কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত যুবক লালায়িত হয়, যাহার ক্ষুদ্র এক কণা কৃপার ভিখারী হইয়া বহু যুবক অহরহ তাহার আশেপাশে অগ্নিমুখপ্রবিষ্ট পতঙ্গের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্তি বা বিরক্তি অনুভব করে না, তাহার একটু সলাজ হাসির দৃষ্টিতে—একটু কোমল কম্পিত প্রিয় সম্ভাষণে দিবোন্দুর মত যুবক যে বিচলিত হইবে না, ইহা হইতেই পারে না। দিবোন্দু ধীরে ধীরে সেই বেষ্টনজালের মধ্যে আকৃষ্ট হইতেছিল, আর লীলাও অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে সেই জাল গুটাইয়া তটভূমির দিকে টানিয়া তুলিতেছিল।

এই গোপনে দুইটি প্রাণের লুকোচুরি খেলার কথা কেহ জানিতে পারে নাই, কেবল এক জন বুঝিয়াছিল, বুঝিয়া অন্তরে দারুণ ব্যথা অনুভব করিয়াছিল। তাহার কোমল নারীসুলভ মন জানিত, এ খেলায় এক জন আমোদ উপভোগ

করিতেছে বটে, কিন্তু এ খেলায় অন্ধ জন মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছে। এ মৃত্যু দেহ হইতে আত্মার বিচ্যুতি নহে, এ মৃত্যু তাহা হইতেও ভীষণ—এ জীবন্মৃত্যু। রাধারাণী জানিত, সামান্য নগণ্য দরিদ্র দিবেন্দুর জন্য লীলার মনের অতি সঙ্কীর্ণ কোণেও এতটুকু সামান্য স্থান নাই—দিবেন্দু বৃথা মরীচিকার আশায় মুগ্ধ মৃগের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিতেছে; কিন্তু উপায় নাই। লীলা যাহা সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেই, জগতে এমন কোনও শক্তি নাই যে, তাহাকে উহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। এক উপায়:—পলায়ন; কিন্তু কে অন্ধ দিবেন্দুকে পথ দেখাইয়া দিবে? দিলেই বা সে সত্য পথ বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবে কেন? রাধারাণী যখন ভাবিয়া কূল পাইত না, তখন হিন্দুর মেয়ের যাহা সান্ত্বনা, তাহাই দিয়া মনকে বুঝাইত,—বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে, সে কে যে সেই বিধানে বাধা দিবে?

ইদানীং কখনও কখনও দিবেন্দু দ্বিপ্রহরে সুরেন্দ্রচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে ও লীলার সহিত সঙ্গীতের আলাপ করিতে তাহাদের গৃহে আগমন করিত। রাধারাণী দেখিয়াছিল, এই অন্ধপ্রায় এ যাবৎ কোন বন্ধু বা পরিচিতের ভাগ্যে ঘটে নাই। সে ত নগণ্য, তাহাকে ত উহারা 'গ্রাহ্যের' মধ্যেই আনিত না, কিন্তু তাহাদের দাদা? তাঁহার মতামত লইয়া তাঁহাকে জানাইয়া ত এই মিলামিশা করা সঙ্গত ছিল! কিন্তু—কিন্তু—সে কথা কহিবার সে কে? যে পরের অন্নের ভিখারী, তাহার এ সমস্ত অনধিকারচর্চ্চার কি প্রয়োজন? রাধারাণী মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিত। সে কত দিন দিবেন্দুর প্রতি লীলার সহাস্য কটাক্ষনিক্ষেপ লক্ষ্য করিয়াছে, কত দিন দিবেন্দুকে লীলার নবকিশলয়তুল্য চম্পকাঙ্গুলী ধারণ করিয়া পিয়ানোর চাবীতে নূতন সুর তুলিতে শিক্ষা দিতে দেখিয়াছে, কত দিন উভয়ের মধ্যে মধুর কটাক্ষ-বিনিময় হইতে দেখিয়াছে; কিন্তু সে কি করিবে, সে নিরুপায়, সে পরের পোষ্য! এক দিন লীলা ক্ষণেকের জন্য বাটীর মধ্যে গেলে সে আর থাকিতে না পারিয়া মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিয়াছিল, "দিবেন্দু বাবু, আপনি রেলের চাকুরীতে যাবেন না?" দিবেন্দু তাহার উত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিল, "কেন বৌ, রাণি! আমায় তাড়াতে পারলেই কি যাচ্ছ?" রাধারাণী গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, "না, তা না! তবে গান শেখাতে আসেন, যা যা করেন, তা দাদাকে জানিয়ে করেন না কেন?" দিবেন্দু ক্ষণেক বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিল, "এতটা লক্ষ্য করেছ, রাণি? আমি ভাবতুম, তুমি এ মাটীর নও। যাক্, তোমায় ভাবনা নেই, দাদাকে জানিয়ে শীগ্‌গিরই আমার পাওনা আদায় ক'রে নেব।" আর কথা হয় নাই, লীলা আসিয়া পড়িয়াছিল।

সে দিন লীলা ও দিবেন্দু পিয়ানো ও এস্‌রাজের ঝঙ্কার অভ্যাস করিতেছিল। রাধারাণী অসুস্থ, ভিতরে শয়ন করিয়াছিল। দিবেন্দু পিয়ানোর চাবীতে লীলার অঙ্গুলী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে গিয়া হঠাৎ পুষ্পধন্বার পুষ্পধনুর পুষ্পতুলা সুন্দর অঙ্গুলীগুলি মুহূর্ত্তের জন্য চাপিয়া ধরিয়া একাগ্রচিত্ত লীলার আরক্ত আননের দিকে চাহিয়া রহিল। লীলার নীলোৎপলদল তুলা আয়ত নয়নের উপর দিয়া তখন কি একটা বৈদ্যুতিক স্ফূর্ত্তি চকিতে দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল, লীলা চক্ষু অবনত না করিয়াই দিবেন্দুর কোমল স্পর্শের প্রতিদান দিল। দিবেন্দুর নয়নে তখন কি ভাব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে, লীলা সে ভাবসাগরে ডুব দিয়া তাহার অন্ত পাইল না। দিবেন্দু এক হস্তে লীলার কোমল হাতখানি আবদ্ধ রাখিয়া অন্য হস্ত তাহার অংসোপরি স্থাপন করিয়া ভাবকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "লীলা, একটা কথা কিছু দিন থেকে বলব বলব মনে করছি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু বলি বলি করেও সাহসে কুলায় না। কি জানি হাতের পাশা ফেলে দিয়ে যদি সর্ব্বস্বান্ত হই!"

"তবে ফেলতে চাইছ কেন?"

"ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাই—শীগ্‌গির চ'লে যাচ্ছি কি না।"

"যে পুরুষের সাহস নেই, সে কেমন পুরুষ?"

"আমিও তাই ভাবি। তবে একটা দিক পরিষ্কার ক'রে রেখেছি আগে থেকে, সুরেশদাকে বলেছি আমার কথা, কেবল তোমার মুখের জবাবের ওপর এখন সব নির্ভর করছে।"

যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এমন ভাব দেখাইয়া, লীলা বিস্মিতভাবে বলিল,—"আমার জবাব? সে কি?"

"হাঁ লীলা, তোমার জবাব—সে জবাবের উপর আমার ভবিষ্যৎ, আমার সুখ-দুঃখ, আমার জীবন-মরণ সব নির্ভর করছে।" ভাবের আবেগে দিবোন্দুর হাতখানা থর্ থর্ কাঁপিতেছিল, লীলা নিজ হস্ত দ্বারা তাহা স্পষ্টই অনুভব করিতেছিল। কিন্তু তাহার কোনও ভাবান্তর লক্ষিত হইল না, কেবল দিবোন্দু বুঝিল, একটা নিশ্চিত বিজয়গর্ব্বের উজ্জ্বল রেখা তাহার বিদ্যাদ্ভাবদীপ্ত নীলোৎপল নয়ন-তারকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে কেবল ঈষৎ হাস্য-স্ফুরিত অধরে জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদাকে বলেছিলে তোমার কথা? দাদা কি বললে?"

"আমার প্রস্তাব তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছেন।"

"সবই করেছ, কেবল আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখ নি?"

"তাই ত আজ সেই ভিক্ষা চাইতে এসেছি, লীলা!"

হঠাৎ লীলার মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল, সে দিবোন্দুর বন্ধন হইতে আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া স্থির অকম্পিত দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তমাত্র তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর পরুষকণ্ঠে বলিল, "আসলেই ভুল ক'রে ফেল্লে, দিবোন্দু বাবু? যার সম্মতি সকলের আগে দরকার, তার কাছেই শেষে এসেছ ভিক্ষে চাইতে? তোমার এ বুদ্ধির আমি প্রশংসা করতে পারলুম না।"

দিবোন্দু বিশেষ বিচলিত হইবার ভাব দেখাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "যার অনুমতি সকলের আগে দরকার, তার কাছে অবশেষে যাব বটে, তবে তার আগে তোমার অনুমতি নেওয়াটা আরও দরকার ব'লে মনে করি।"

"কি বল্‌ছেন দিবোন্দু বাবু?" বিস্মিত লীলার মুখে এই প্রশ্ন উচ্চারিত হইল।

"ঠিকই বল্‌ছি, শেষ ত রাণীর কাছে যাবই—"

চমকিত হইয়া বাধা দিয়া লীলা বলিল, "রাণীর কাছে?"

"হাঁ, রাণীর কাছেই শেষ যেতে হবে বৈ কি!"

লীলা বিরক্তির সুরে বলিল, "তার কাছে অনুমতি নেবার সঙ্গে আমাদের দু'জনের বোঝাপড়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে, বুঝতে পারছি না।" কথাটা বলিয়াই লীলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "শুনুন দিবোন্দু বাবু! আপনার স্পর্দ্ধার দৌড় আরও কত দূর, কিছু দিন আগে যদি করেছিলুম, আরও কিছু দিন পরীক্ষা ক'রে তা দেখবো। কিন্তু আপনিই যখন সে সুযোগের আর অবসর দিলেন না, তখন কথাটা খোলসা করেই আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হ'ল। আপনার মত অবস্থার লোক যত-টুকু আশা করতে পারে, আপনি তার অনেক উঁচুতে হাত বাড়িয়েছিলেন, এ কথাটা কি তলিয়ে বোঝবার মত শক্তিও আপনার নেই? আপনার সঙ্গে হাসি, খেলি, দাঁড়াই বলেই কি বুঝতে হবে, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বেশী আরও কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মাথা কাড়া দিয়ে উঠেছে? পুরুষে পুরুষে যে বন্ধুত্ব হয়, শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সে বন্ধুত্ব হ'তে পারে, এখনকার দিনে সে সম্ভাবনার যুগ উপস্থিত হলেও আপনার শিক্ষার দৈন্য কি তা আপনাকে বুঝতে দেয় নি? যে গণ্ডীর মধ্যে আপনার শিক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে, আপ-নার উচিত, সেই গণ্ডীর মধ্য থেকে আপনার যোগ্য জীবন-সঙ্গিনীর যোগাড় ক'রে নেওয়া। সে গণ্ডীর মধ্যে আপনি খুঁজলে হয় ত রাধারাণীর মত অনেক পাত্রী পেতে পারেন, কিন্তু ব্যারিষ্টার সুরেশচন্দ্রের ভগিনী লীলাকে পেতে পারেন না।" কথাটা বলিবার সময় লীলার মুখে চোখে যে দর্প ও দম্ভের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দিবোন্দু তাহারই সমবয়স্কা তরুণীর মুখাকৃতিতে কখনও দেখে নাই।

কিন্তু লীলা যদি মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল যে, এই উত্তরে দিবোন্দু একবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে সে নিতান্ত ভুল করিয়াছিল। বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাকুক, দিবোন্দু পূর্ণ সপ্রতিভভাবেই সহাস্যে জবাব দিল, "বাঃ! তুমি আমার মনের কথাটা টেনে বার করেছ দেখছি যে! আমি ত রাণীর মত পাত্রীর কথাই বলছিলাম তোমাকে। তা কি এতক্ষণ বুঝতে পার নি? হাঃ হাঃ হাঃ!"

লীলার গর্ব্বদীপ্ত কঠোর শ্রী মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার মুখে তখন বিস্ময় কি ক্রোধের মাত্রা অধিক আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছিল না! শুষ্ক মুখে সে বলিল, "রাণীর মত পাত্রী?—রাধারাণীর মত? সে কি? আপনি তবে এতক্ষণ আমার কাছে কাকে ভিক্ষা করছিলেন?"

দিবোন্দু উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "ও হরি! তাও বুঝতে পার নি এতক্ষণ, লীলা? সুরেশদার কাছে আমি রাণীকে চেয়েছি, এখন তোমার কাছেও চাইছি, তোমরা এর অভিভাবক,

তোমাদের সম্মতি না পেলে ত আর তার কাছে কথা পাড়তে পারি না। আশা করি, এ ভিক্ষায় বঞ্চিত হব না।"

লীলা পড়িয়া যাইতেছিল, চেয়ারের হাতলটা ধরিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মুখে অন্য কথা সরিল না, সে কেবল অস্ফুট স্বরে ভয়কণ্ঠে বলিল, "রাণী? রাধারাণী?"

"হাঁ লীলা, রাণী, তোমাদের রাধারাণী। তাকে আমার হাতে দিতে সুরেশদার কোনও আপত্তি নেই। সবটা শুনলে তোমারও আপত্তি থাকবে না বোধ হয়। আমি নেহাৎ ভবঘুরে নই। পলাশডাঙ্গার দত্তদের আমিও এক জন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হলেও দত্তদের ছোট তরফের জমীদার। এত দিন কেবল দেশবিদেশ ঘুরেই কাটিয়েছি, রেলে রেলেই আমার অনেক সময় কেটেছে। যে বছর দত্তের হঠাৎ মৃত্যুর কথা সে দিন কাগজে পড়ছিলেন, তার বাপ আমারই জ্যেঠতাত, তাঁর বিষয় আশয় ত আমাকে দিয়ে গিয়েছেন শুনছিলুম। কাজেই আমার হাতে রাণীকে দিতে আপনারও কোন আপত্তি হবে না, এ আশা করতে পারি! কি বলেন?"

ব্যর্থ ক্রোধে লীলার বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না। সে কোনও জবাব না দিয়াই কক্ষ ত্যাগ করিল। কেবল যাইবার সময় বলিয়া গেল, "ওঃ, তা হ'লে আপনার রেলের চাকুরী-টাকুরী করার কথা সব জুজ্ঞু।"

দিব্যেন্দু একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল এবং রুমাল দিয়া ললাটের স্বেদাক্ত মুছিয়া ফেলিল। সে ভাবিতেছিল, ভাল করিলাম, কি মন্দ করিলাম। এ আঘাত দিয়া সে কি সুখানুভব করিয়াছিল? নারীর প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে সে কাহারও ন্যূন নহে।

কতক্ষণ সে এই ভাবনায় তন্ময় হইয়া ছিল, জানে না, হঠাৎ কাহার প্রশ্নে চমকিত হইয়া সে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল।

"লীলার কি হয়েছে দিব্যেন্দু বাবু? সে এ ঘর থেকে গিয়ে মাথা ধরেছে ব'লে, ঘরে ঘোর বন্ধ ক'রে দিলে। তার চোখে জল কেন?"

দিব্যেন্দুর আঁধার-কক্ষ আকাশের মত মুখের মাঝে যেন তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতালোকের মত আনন্দ ও হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাধারাণীর পথ আগুলিয়া বলিল, "তা ত জানি না, রাণি! তবে তার কাছে একটা বড় রকমের ভিক্ষে চেয়েছিলুম, তাতে যদি সে আমায় বামনের চাঁদ ধরার আশা দেখে বিরক্ত হয়ে থাকে, তা সম্ভব হ'তে পারে।"

রাধারাণীর বক্ষঃস্থল দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল—সে যাহা আশঙ্কা করিতেছিল, তাহাই হইয়াছে। ইঙ্গিতে সে দুই একবার দিব্যেন্দু বাবুকে সাবধান করিয়া দিয়াছে, কিন্তু—কিন্তু—আগুনে ঝাঁপ দিলে দেহ দগ্ধ হয় জানিয়াও পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিতে ত দ্বিধাবোধ করে না। সমবেদনায় তাহার কোমল অন্তর ভরিয়া উঠিল। সে অশ্রু-সজল দৃষ্টিতে প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে ত আমি আগে আপনার চাকুরীতে চ'লে যেতে বলেছিলুম।"

দিব্যেন্দু অগ্রসর হইয়া গভীর প্রেমস্বরে রাধারাণীর হাত দুইখানি দুই হাতে ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "চাকুরীতেই ভর্ত্তি হচ্ছি রাণি—তবে রেলে নয়, আমার রাণীর রাজত্বে! কেবল তোমার অনুমতির অপেক্ষায় আছি।"

রাধারাণী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া, তাহার হস্ত মুক্ত করিয়া লইল এবং ভিতরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইল, অস্ফুট স্বরে বলিল, "পথ ছাড়ুন।"

দিব্যেন্দুর কণ্ঠস্বর আরও গাঢ় হইল, সে বলিল, "কেন, বিশ্বাস হ'ল না? সত্যিই রাণি, আমি তোমায় লীলার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছিলুম, সুরেশদা এর আগেই সে ভিক্ষা মঞ্জুর করেছেন। বল রাণি, তুমি আমার রাণি, হবে কি না?"

রাধারাণীর মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, সে মহা ফাঁপরে পড়িয়া বলিল, "দয়া ক'রে পথ ছেড়ে দিন, কি যে বলছেন—"

দিব্যেন্দু বলিল, "পথ ত ছাড়বার নয়, যে পথেই যাও, আমাদের দু'জনকেই যে সেই পথ ইহজন্মে বেছে নিতে হবে।"

* * * * *

বিবাহের পর যখন দিব্যেন্দু পত্নীকে লইয়া পলাশডাঙ্গায় গিয়াছিল, তখন এক দিন রাধারাণী বলিয়াছিল, "কি যে তোমার পছন্দ! বিদ্যুতের কাছে জোনাকী!" উত্তরে দিব্যেন্দু তাহার মুখখানি বুকে তুলিয়া লইয়া বলিয়াছিল, "বিদ্যুতের আলোয় আমার চোখ ঝল্‌সে যায়, আমার নিশীথের আলোতেই ঘর আলো হবে।"

শ্রীসরযূবালা বসু

বৃদ্ধের লালসা

১

কার্টার কোম্পানীর আফিসে আজ শোকের প্রবাহ ছুটিয়াছে। আফিসের বড় বাবু শ্রীল শ্রীযুক্ত অনাদিমোহন ঘোষের স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে। এ দুর্জ্জয় দুঃখের দিনে কেরাণী, মুহুরী, চাপরাশী সকলেই চোখে কাপড় দিয়া ছুটিবার নয়নবারি নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোন কোন বাবু রুমালে বা চাদরে অশ্রুপ্রবাহ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বাহিরে উঠিয়া যাইতেছেন এবং দুই এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিতেছেন। শোকের বেগ এতই প্রবল যে, যখন বাবুরা আফিস-ঘরে ফিরিতেছেন, তখন তাঁহাদের কথা কহিবার শক্তি থাকিতেছে না—মুখগহ্বর তাম্বুল-দোক্তায় পূর্ণ। তাঁহারা যখন দেখিতেছেন, বড় বাবু তাঁহাদের দিকে নয়ন ফিরাইতেছেন, তখন তাঁহারা রসনপ্রান্ত উঠাইয়া চক্ষু মুছিতেছেন। কেহ বা রুমাল চোখের কাছে ধরিয়াই রাখিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে—অর্থাৎ বড় বাবুর দৃষ্টিপাত হইবার উপক্রম হইলে—চক্ষু মুছিতেছেন। কেহ নাক ঝাড়িতেছেন, কেহ চক্ষু মুছিতেছেন, কেহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। আফিস-ঘর আজ শোকপ্রবাহে প্লাবিত, শোকের ধ্বনিতে মুখরিত। বড় বাবু দেখিলেন, তাঁহার পাষাণীবীরা শোকে এতই আচ্ছন্ন যে, তাহারা কায করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তিনি সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "কায কর হে, কেঁদে আর কি হবে?"

অনুগত কালীনাথ কহিল, "কান্না যে আপনা হ'তে আসছে—আহা মা লক্ষ্মী—" বাকিটা শোনা গেল না—শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

অনাদি কহিলেন, "কাঁদলে যদি তাঁকে পাওয়া যেত, তা হ'লে—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অমৃত কেরাণী কহিল, "তা হ'লে আমরা সাঁড়াশি ঘড়ির বান চোখে ডাকাতাম।"

তারাপদ বড় বেশী কথা জানিত না; শুধু কহিল, "হুঁ।"

বড় বাবু। ফিরে যখন তাঁকে পাওয়া যাবে না—

অমৃত। আজ্ঞে না—

বড় বাবু। তখন—

অমৃত। তখন নূতন ক'রে সংসার করাই ভাল।

বড় বাবু। তুমি এ কি বলছ অমৃত? আমার আটটা ছেলে-মেয়ে, তেরটা নাতি-নাতনী, আমি আবার বিয়ে করব?

অমৃত। আজ্ঞে, তারা ত আপনাকে রোগে, শোকে কেউ দেখবে না—নিজের ছেলে-মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত।

বড় বাবু। না, ছোট বউমা আমার খুব সেবা করে।

অমৃত। সে আর ক'দিন? যে ক'দিন না তাঁর ছেলে-মেয়ে হয়। কিন্তু আপনার যদি ব্যামো-স্যামো হয়—যা কালীর ইচ্ছেয় না হোক—কিন্তু যদি হয়—এই হাঁপানি-বহুমূত্র, অর্শ রোগে যে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন—

বড় বাবু। তা' ঠিক—

অমৃত। আপনার সেবা করবার এক জন ত চাই।

বড় বাবু। তা ঠিক; কিন্তু এই বুড়ো বয়েসে বিয়ে করা—

অমৃত। বয়েস আর আপনার কি এমন হয়েছে—

বড় বাবু। তা ঢের হয়েছে বৈ কি।

অমৃত। এই বছর খুড়ো ত সাড়ে তিন কুড়ি বয়েসে বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনলে, তার আবার বছর বছর ছেলে—

বড় বাবু। খুড়ো আমার চেয়ে ঢের বড়।

অমৃত। আমিও ত তাই বলছি, আপনার আর কি বয়েস হয়েছে। একটি বড় দেখে মেয়ে নিলে সব মানিয়ে যাবে।

বড় বাবু। ছিঃ, বিয়ের কথা আজ তোলে! পরশু রাতে এই সর্ব্বনাশ ঘটেছে।

অমৃত। আজ না তুলি, কাল ত তুলতে হবে—আপনি কষ্ট পাবেন, একটু জল চেয়ে পাঁচ মিনিট ব'সে থাকবেন, এ আমি চোখে দেখতে পারব না!

বড় বাবু। তোমার মত হিতৈষী বন্ধু আমার কমই আছে অমৃত; তা তুমি যা ভাল বিবেচনা কর—বুঝলে কি না—এখন ত আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই—

অমৃত। ক'নে আমি ঠিক ক'রে ফেলিছি।

বড় বাবু। বল কি?

অমৃত। এই তারাপদর বেশ একটি ডাগর মেয়ে আছে—চমৎকার সুন্দরী—আপনার সঙ্গে বেশ মানাবে।

কালীনাথ এ কথাটা আগে বলিতে পারিল না বলিয়া বড়ই মনস্তাপ পাইল। অমৃতটা সব বলিয়া ফেলিয়াছে, বাকি কিছু রাখে নাই। সুতরাং অমৃতকে সমর্থন করা ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। কহিল, "চমৎকার মেয়ে, আপনার যুক্তি ঘটে।"

অমৃত। তা যদি বল কালীদা, তা হ'লে আমাকে সত্যি কথা বলতে হবে,—বড় বাবুর যুগ্যি মেয়ে কলকাতা সহরে নেই।

বড় বাবু। তা থাকবে না কেন—তা তারাপদর মেয়েটির বয়েস কত?

অমৃত। পনর ষোল বছর হবে।

বড় বাবু। এত দিন বিয়ে হয় নি কেন?

অমৃত। টাকা কোথায় যে বিয়ে দেবে? মাইনে পায় ত মোটে চল্লিশটি টাকা; তা খাবেই বা কি, আর জমাবেই বা কি?

বড় বাবু। আহা, বেচারির বড় কষ্ট ত! তুমি ভেবো না তারাপদ, আমি সায়েবকে ব'লে তোমার দশটি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব।

তারাপদ। আপনিই ত মনিব,—সায়েব আবার কে?

বড় বাবু তারাপদকে কোন কালেই পছন্দ করিতেন না; আজ সহসা তাহাকে পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। যাহার গৃহে চমৎকারিণী ষোড়শী, তাহাকে অপছন্দ করা যায় না।

পাঁচটা বাজিয়া গেল। বড় বাবু তাঁহার বিপুল দেহ কোন রকমে টানিয়া তুলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। কথা এই স্থির হইল, তিনি এক দিন সদলে মেয়েটিকে দেখিয়া আসিবেন। তারাপদ কোন কথা কহিল না—তাহার মতামত লইবার যে কোন প্রয়োজন আছে, তাহা কেহ মনে করিল না।

২

জমীদার দেবেন্দ্রনাথ বসুর বিশাল অট্টালিকা বাগবাজার রোডের উপর। তাঁহার জমীদারী গয়া জিলাতেই বেশী, কিছু কিছু বারাসতের কাছে আছে। তাহা ছাড়া কলিকাতাতে তাঁহার কয়েকখানা বাড়ী ভাড়া খাটিতেছে। দেবেন বাবুর অর্থ প্রচুর, কিন্তু তাহা ভোগ করিবার লোক খুব কম। স্ত্রী ও পুত্র ছাড়া তাঁহার আপন বলিতে কেহ নাই। বিশাল অট্টালিকায় দুই চারিটি প্রাণী থাকিলে বড়ই ফাঁকা ফাঁকা লাগে, তাই কতকগুলি পোষ্য ও কুপোষ্য আনিয়া গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন।

পুত্র হেমেন্দ্রনাথ তিনটা পাশ দিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছেন। নিতান্ত বেকার থাকা ভাল দেখায় না বলিয়া তিনি বাড়ীতে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছেন এবং বই দেখিয়া হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করেন। মাঝে মাঝে গয়া, বারাসত, হুগলী ঘুরিয়া আসেন এবং কিছু টাকাও লইয়া আসেন। কর্ত্তা সে টাকা গ্রহণ করেন না।

জননী সরোজকুমারীর ইচ্ছা, একটি চাঁদপানা বউ আনিয়া তাঁহার ঘর উজ্জ্বল করে। কর্ত্তারও তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু হেম বিবাহ করিতে সম্মত নহে। জননী জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিয়াছেন, হেম কোন এক দরিদ্র-কন্যাকে ভালবাসিয়াছে। যদি তাহাকে পায়, তাহা হইলে সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে। সরোজকুমারী একদা সন্ধ্যায় স্বামীকে কহিলেন, "তা হেম কাকে বিয়ে করতে চায়, তারই সঙ্গে বিয়ে দেও না কেন?"

"তা কি হয়?—সে যে গরীবের মেয়ে।"

"হোক গরীব, আমরা ত আর গয়না টাকা চাইছি নে।"

"গরীবমাত্রেই ছোট লোক, ছোট লোকের মেয়ে আমার ঘরের বউ হ'তে পারে না।"

"তুমি মেয়েটিকে দেখ শোন, কি রকম ঘর—"

"সে সব দেখতে হবে না; যখন গরীব, তখন সবই বোঝা গেছে।"

"এ যে তোমার ভারি অন্যায়। মেয়েটিকে দেখলে না, কোন পরিচয় নিলে না—"

"দেখব আর কি, বুঝতেই পারছি, মেয়েটি ভাগর, খুব চতুর, গোল গোল চোখ, বেঁড়ে নাক, মোটরের হুডের মত দরাজ কপাল—ও সব মেয়ে আমার ঘরে ঢুকতে পাবে না।"

এমন সময় ছেলে আসিয়া কহিল, "মা, আমি থিয়েটারে যাচ্ছি।"

মা। খেয়ে যা।

ছেলে। এসে খাব—বেশীক্ষণ সেখানে থাকব না।

বাপ। তবে পয়সা খরচ ক'রে যাবার দরকার কি?

ছেলে। আজ সাহায্য-রজনী—

বাপ। কার সাহায্য? যাঁরা কণ্ড খুলেছেন, তাঁদের, না—

ছেলে। উড়িষ্যা যে ভেসে গেছে বাবা, কত লোক নিরাশ্রয়, উপবাসী,—গাছের উপর জলের উপর ব'সে রয়েছে—

বাপ। তবে যাও—সব চেয়ে বেশী দামের টিকিট নিও।

পুত্র প্রস্থান করিল। একটু পরে নীচে গোলমাল শুনা গেল। কর্ত্তা উঠিয়া দেখিলেন, বহু লোক তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া 'মার' 'মার' শব্দে চীৎকার করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ ত্রস্তপদে নীচে নামিয়া আসিলেন। বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, দুই ব্যক্তি তাঁহার সহিস-কোচম্যানকে প্রহার করিতেছে, আর কয়েক ব্যক্তি মারিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। দেবেন্দ্র বাবু চকিত উভয় দলের মধ্যে পড়িয়া অনুজ্ঞাদৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "স'রে দাঁড়াও।"

আক্রমণকারীরা নিরস্ত হইল। দেবেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

জনৈক আক্রমণকারী।—এরা মুসলমান—মুসলমান দেখলেই আমরা মারব।

দেবেন্দ্র।—এরা আমার সন্তান—সাধ্য থাকে, এগিয়ে এস।

বলিয়া সহিস-কোচম্যানকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের দিকে টানিলেন। এক ব্যক্তি কহিল, "আপনি হিন্দুর শত্রুকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন?"

"মুসলমানমাত্রেই হিন্দুর শত্রু নয়, যারা অজ্ঞ, বুদ্ধিহীন, তারাই শত্রুতা করে—তোমরা যাও, আর কখন এ দিকে এসো না।"

জনতা প্রস্থান করিল।

দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণীর নিকটে কয়েকখানি খোলার ঘর। তাহারই একটিতে তারাপদ সপরিবারে বাস করে। তাহার অর্থ নাই, কিন্তু সন্তান-সন্ততি প্রচুর। সকলের চেয়ে বেটি বড়, সেটি কন্যা—নাম কমলা—বয়স পনর বৎসর। তাহার রূপ অতুলনীয়। যাঁহারা বৈকুণ্ঠের কমলাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সেই দেবীর সহিত তারাপদদুহিতা কমলার তুলনা করিয়া থাকেন। আমাদের ভাগ্যে দেবীদর্শন ঘটে নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে পারি না।

সপার্ষদ অনাদি বাবু আজ সন্ধ্যার পর কমলাকে দেখিতে আসিবেন, এইরূপ কথা আছে। তারাপদ-গৃহিণী উহার ইচ্ছা নহে, বুড়ার সহিত কমলার বিবাহ হয়। তারাপদরও তেমন ইচ্ছা নাই। কিন্তু কি করেন? বিবাহ না দিলে হয় ত তাঁহার চাকরী যাইবে। সম্প্রতি দশটি টাকা বেতন-বৃদ্ধির আশা পাইয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও বাড়িবার সম্ভাবনা। এক দিকে আর্থিক উন্নতি, অন্য দিকে কন্যার স্নিগ্ধ বদন। দুর্ব্বলচিত্ত তারাপদ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া গৃহিণীর শরণাপন্ন হইলেন। গৃহিণী কহিলেন, "পিতা হয়ে সন্তানকে ভাসিয়ে দিও না।" ছুটিয়া গিয়া তারাপদ আফিস-বন্ধু অমৃতলালকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন "সকলের আগে অর্থ, নইলে খাবে কি?" তারাপদ আবার গৃহিণীর শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপ করিতে করিতে এক দিন অনাদি বাবুর শুভাগমনের দিন স্থির হইল।

কিন্তু যাহার বিবাহ, তাহাকে কোন কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। কেনই বা করিবে? ছাগশিশুকে যূপকাষ্ঠের নিকটে আনিয়া, সে প্রাণ দিতে সম্মত আছে কি না, কেহ তাহা জিজ্ঞাসা করে না। মরিতে আপত্তি করিলেও কে তাহা শুনে না—তাহাকে মরিতেই হয়। তবে বলি আনীত পশু একবার কণ্ঠ ছাড়িয়া চীৎকার করে, মুক্তি পাইবার একটু চেষ্টা করে। কিন্তু বাঙ্গালার দরিদ্র পিতার সন্তা

আত্মরক্ষার্থে একবার একটু চীৎকার করিবার অবসর পায় না—তাহাকে অবসর দেওয়া হয় না।

কমলা হৃদয়ে বসাইয়াছিল রূপ-গুণে বাসবতুল্য হেমেন্দ্রনাথকে, তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইতেছিল এক কন্যাকার হৃদয়হীন বৃদ্ধের সঙ্গে। খড়্গকে হননোদ্যত দেখিয়া ছাগশিশু যেটুকু চীৎকার করে, কমলা সেটুকু চীৎকার করিল না—নীরবে সজ্জিত হইয়া খড়্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

খড়্গ আসিল সন্ধ্যার পর। গৃহে স্নান অন্ন, দাওয়ার বসিবার স্থান হইয়াছিল। অম্বুজল দীপ এক পাশে জ্বলিতেছিল; কিন্তু কমলা যখন ধীরপদে আসিয়া সভায় হইল, তখন সভাতল হাসিয়া উঠিল। সকলে বিস্মিত হইয়া সেই অপরূপ সৌন্দর্যোপানে চাহিয়া রহিল। অমৃত কহিল, "এ মেয়ে আর দেখতে হবে না, কি বলেন বড় বাবু?"

বড়বাবু যে কে,তাহা মেয়েমহলে বুঝিতে বাকি রহিল না। সপারিষদ অনাদি বাবু প্রস্তাব করিলে উষা কহিল, "আমি এ বুড়ো মোষের হাতে কিছুতেই এ প্রতিমাকে দেব না।" ও দিকে বড় বাবু কহিলেন, "কমলাকে না পেলে আমি ম'রে যাব। তোমার একশ' টাকা মাইনে ক'রে দেব তারাপদ, আমি ঘর থেকে মাইনে দেব, তোমার যেনা-পাওনা কিছু থাকে, তা-ও আমি মিটিয়ে দেব, কিন্তু কমলাকে আমার চাই-ই চাই—এমন কুল গুনিবার আছে, তা আমি জানতাম না। অমৃত আমাকে সন্ধান দিলে; অমৃত বড় কাযের লোক। তোমার কত দিন মাইনে বাড়ে নি অমৃত? আচ্ছা, আচ্ছা, এইবার কিছু বাড়বে।"

৪

হেমেন্দ্র বলিলেন, "হেম, শুনছি, তুমি না কি এক গরীবের মেয়েকে খুব সুন্দর দেখেছ?"

হেমেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ।

মে। তাকে না কি বিয়ে করবার ইচ্ছে করেছ?

হে। ইচ্ছা ছিল বটে।

মে। এখন কি তোমার ইচ্ছা নাই?

হে। আপনার অনুমতি না পেলে আমি কোন ইচ্ছাই পোষণ করতে পারি না।

পিতা প্রীত হইলেন; কহিলেন, "গরীবরা দেখতে যেমন কুৎসিত, তাদের মনের ভাবও তেমনই কুৎসিত। সুন্দর দৃশ্য না দেখলে সুন্দর ভাব মনে আসতে পারে না। এখানে হাঁড়ি-কুড়ি, আবর্জনা, ওখানে ছেঁড়া কাপড়, ময়লা বিছানা, এ সকলের মধ্যে থাকলে মনের ভাব সঙ্কুচিত হয়ে আসে। অভ্যাসের মধ্যে মনের উদারতা বা প্রশস্ততা আসতে পারে না। এই দেখ, হরে চাকরটাকে যদি আমার বিছানায় শুইয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে সে সমস্ত রাত ঘুমুতে পারবে না।"

হে। সেটা অভ্যাসের দোষ নয় কি?

মে। অভ্যাসই মনকে গড়ে।

গৃহিণী সরোজকুমারী আসিয়া কহিলেন, "তোমাদের কি কথা হচ্ছে?"

হেমেন্দ্র। এই হেমকে বলছিলাম, গরীবের মেয়েকে আমি ঘরে আনতে পারব না।

সরোজ। কেন, আনলে কি তার গায়ের গন্ধ ছাড়বে?

হেমেন্দ্র। তাই ছাড়বে। কুমারি! বড় ঘরের মেয়ে যেমন গরীবের ঘরে অশোভন, গরীবের মেয়ে তেমনই বড় ঘরে মানায় না। তুমি যে বুদ্ধি ও শক্তি নিয়ে সংসারে কর্তৃত্ব করবে, সে বুদ্ধি ও শক্তি দরিদ্র-কন্যার থাকতে পারে না। যে ভিখিরীর মেয়েকে তোমরা বউ ক'রে ঘরে আন্‌তে ইচ্ছা করেছ—

সরোজ। সে ভিখিরীর মেয়ে কেন হ'তে যাবে? তোমার যেমন কথা।

হেমেন্দ্র। ওই হ'ল—যে পরমুখাপেক্ষী, সেই ভিখিরী। (পুত্র প্রতি)—তা হ'লে হেম, তুমি সে ভিখিরীর মেয়েকে বিয়ে করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছ?

হে। আপনি যেরূপ আদেশ করবেন, আমি সেইরূপ করব।

মে। আমার অভিপ্রায় তুমি ত শুনেছ—

হে। শুনিছি, আপনার ইচ্ছানুযায়ী কায করব।

মে। বেশ। তা হ'লে অন্যস্থানে তোমার বিয়ের চেষ্টা দেখি?

হে। এখন থাক্।

মে। ইচ্ছা না হয়, পীড়াপীড়ি করব না; তবে তোমার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা, একটি টুকটুকে বউ ঘরে আনেন। তা তোমরা বোঝাপড়া কর—আমি এখন নীচে যাই।

কর্ত্তা প্রস্থান করিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে সরোজ-কুমারী চুপি চুপি পুত্রকে কহিলেন, "আমি এক মতলব এঁটেছি।"

"কি মা?"

"আচ্ছা, সে গরীবের মেয়েটি কি খুব সুন্দর?"

"খুব সুন্দর।"

"আমার বোন্‌ঝি নিভার চেয়ে সুন্দর?"

হেম একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "দুইয়ের মধ্যে তুলনাই হয় না!"

"এত সুন্দর! তবে ও মেয়েকে ঘরে আন্‌তেই হবে।"

"ও কথা আর তুলো না, মা।"

"আমার মতলবটা আগে শোন না—"

"কি বল?"

"মেয়েটিকে একবার চুপি চুপি বাড়ীতে নিয়ে আস্‌ব, আমার গয়না-কাপড় দিয়ে সাজাব; তার পর কর্ত্তার সাম্‌নে গিয়ে বল্‌ব যে, এ খুব বড় ঘরের মেয়ে। তিনি সুন্দর মেয়ে দেখলে পছন্দ ক'রে বস্‌বেন।"

"তা হয় না, মা।"

"কেন বাবা?"

"বাবার সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পার্‌ব না।"

"প্রতারণা করা আবার কোথা হ'ল?"

"গরীবের মেয়েকে বড় ঘরের মেয়ে ব'লে পরিচয় দেওয়াটাই প্রতারণা।"

"তা হ'লে কি হবে?"

"কি আর হবে মা, আমি এমনই থাকব।"

"তবে কি বউ দেখা আমার কপালে নেই?"

"তোমাকে সুখী কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব, কিন্তু এখন ত পার্‌ছি না মা।"

জননীর নয়ন অশ্রুবর্ষণ করিল; পুত্রের হৃদয় রক্তবর্ষণ করিল।

৫

বড় বাবুর প্রলোভন সত্ত্বেও উষা এ বিবাহে সম্মত হইল না। স্বামী কহিলেন, "বিয়ে না দিলে চাকরী যাবে।"

"তা যায় যাবু।"

"তখন খাব কি?"

"ভগবান্ খাওয়াবেন।"

"সেটা ত গীতার কথা—কাযের কথা নয়।"

"তাই ব'লে কি মেয়েকে বলি দিতে হবে?"

"একটাকে বলি দিলে যদি আর পাঁচটা খেতে পায়, তা হ'লে সে যুক্তিটা কি শ্রেয়ঃ নয়?"

"তোমার স্বার্থপর যুক্তি রেখে দেও—আমি ঐ ঘাটের মড়ার সঙ্গে কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দেব না।"

তারাপদ কোন উত্তর না করিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। বুলাইতে বুলাইতে মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল; কহিলেন, "বিয়ে ত এক যায়গায় দিতেই হবে—"

"কে বল্‌ছে হবে না? যখনই বিয়ের ফুল ফুটবে, তখনই বিয়ে হবে।"

"তোমার মত আমি ত বেলাস্তবাদী নই—আমাকে ত একটু চেষ্টা কর্‌তে হবে।"

"তোমাকে ত আমি মাথার দিব্যি দিয়ে চেষ্টা কর্‌তে বারণ করি নি।"

"কিন্তু যার সঙ্গতি নাই—"

"যার সঙ্গতি নাই, তাকে কি ঘাটের মড়ার হাতে মেয়ে দিতে হবে?"

বাহিরে কে ডাকিল। তারাপদ উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, দ্বারে হেমেন্দ্রনাথ। প্রতিপত্তিশালী জমীদার-পুত্রকে তাঁহার গৃহদ্বারে দেখিয়া তারাপদ বিস্মিত হইলেন; ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।"

"ভিতরে আর যাব না, একটা কথা ব'লে যাব।"

"আজ্ঞা করুন।"

"আপনি অপরাধ নেবেন না—এই—এই আপনার যদি টাকার দরকার হয়, তা হ'লে দয়া ক'রে আমাকে জানাবেন।"

"আমার টাকার দরকার নিয়তই ত লেগে রয়েছে, হেমেন্দ্র বাবু।"

"না, সে রকম দরকার নয়—বড় গোছের দরকার—এই ধরুন, মেয়ের বিয়ে—যা দেবার দরকার পড়লে।"

"সে ত চাজ্জিখানি টাকার কায নয়।"

"আপনাকে ত আমি বলি নি দু'চার শ' টাকার বেশী আমি দেব না।"

"বেশী টাকা দিলে আমি শোধ দেব কোথা হ'তে?

আমার ঘর-দোর চাল-চুলো কিছুই নেই—তবলা চাকরীটুকু।"

"লোধ নাই দিলেন। আপনার মেয়ের বিয়ের ভার দয়া ক'রে আমাকে নিতে দিন—তবে পাত্রটি ভাল হওয়া চাই—টাকার জন্যে একটুও ভাববেন না।"

বলিয়া হেম দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। ঘরের ভিতর থাকিয়া উষা ও কমলা সকল কথা শুনিল।

দণ্ড দুই পরে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখন হেমেন্দ্রনাথ তাহাদের বাড়ীর পিছনে পুষ্করিণী-তীরে একটি আমগাছের তলায় বসিয়া অন্ধকার পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। কমলা নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আসিয়া অদূরে দাঁড়াইল। হেম উঠিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইতে যাইতেছিল; বাহু প্রসারিত হইয়াছিল, আচম্বিতে বাহুদ্বয় ফিরিয়া আসিয়া বক্ষের উপর আশ্রয় লইল—বুকি বক্ষের চাপিয়া ধরিয়া শান্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। হেম ধীরে ধীরে কহিল, "বাবা কিছুতেই আমাদের বিয়েতে সম্মত হলেন না, কমলা।"

"তা আমি বুঝেছি।"

"কি ক'রে বুঝলে?"

"একটু আগে আপনি বাবাকে যা বলছিলেন, তা আমি শুনিছি—"

"তা হ'লে কমলা—"

"এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।"

হেমের বুকের মধ্যে যে ঝড় বহিতেছিল, তাহা সশব্দে নাসিকাপথে প্রবাহিত হইল। কমলা কহিল, "দুঃখ করবেন না, আমার মত কত শত দাসী আপনার চরণসেবা করতে ছুটে আসবে।"

"অতটা নিষ্ঠুর হয়ো না, কমলা।"

"আমার একটি নিবেদন, একটি প্রার্থনা আছে।"

"বল কমলা।"

"আপনি বিয়ে করবেন।"

"আমি যে মনকে বশে আনতে পারছি না, কমলা। বংশলোপ হবে, তা বুঝেছি; মা বাপের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে মহাপাপ করছি, তা-ও বুঝেছি, কিন্তু তোমার স্থানে আর কাউকে বসাতে মন কিছুতেই চাইছে না।"

"সময়ে নিশ্চয়ই আমাকে ভুলবেন, আমিও ভুলব। যে দিন আমি পরের ঘরে যাব, সে দিন আপনার চিন্তা মন হ'তে একেবারে বিসর্জ্জন দেব। আপনিও কেন আমার মত এ ছেলেখেলা ভুলে যান না?"

"আমার ত এ ছেলে-খেলা নয় কমলা—আমার ইহকাল নিয়ে খেলা; তা নইলে বাপ-মায়ের অনুরোধ উপেক্ষিত হয়? তোমার স্মৃতি—"

"আমি কিন্তু পিছন ফিরে দেখবার একটুও অবসর পাব না—নূতন সংসার আমার ইহকাল হবে।"

"তোমাকে যে বিয়ে করতেই হবে, কমলা।"

"আপনিও কেন আমার উপর রাগ ক'রে বিয়ে ক'রে ফেলুন না?"

"পারব না কমলা—ক্ষমা কর। বিয়ে করবার হ'লে মা-বাপের কথায় করতাম—তাঁদের চেয়ে তুমি বড় নও।"

কমলা নিরুত্তর রহিল। ক্ষণপরে কহিল, "হাঁ, আর একটা কথা,—আপনি বাবাকে টাকা দেবেন না।"

"কেন?"

"আমি এই বড় বাবুকেই বিয়ে করব।"

"সে কি! এই বাট বছরের বুড়োকে তোমার পছন্দ হ'ল?"

"হাঁ।"

"কেন? চুপ ক'রে রইলে কেন?—তোমাকে বলতেই হবে।"

"আপনি বুঝে দেখুন না—"

"ওঃ, বুঝেছি। তুমি তোমার মা-বাপের দুঃখ দূর করতে চাও।"

"যতটা পারি। ভাই-বোনরা ত দুটো খেতে পাবে।"

"কিন্তু তোমার সুখ—?"

"তাঁরা সুখে থাকবেন, এই চিন্তাতেই আমি সুখ পাব। ওই মা ডাকছেন—ব'লে এসেছি, আমি পুকুরে হাত-মুখ ধুতে যাচ্ছি—আরও যেন কত কথা বলবার ছিল—আমার জন্য একটুও ভাববেন না—আমি বেশ সুখে থাকব—চললুম—বিদায়—"

হেমের পদধূলি লইয়া কমলা ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল।

৬

লাথি খাইয়া ফুটবল যেমন একবার এ-দিক আর একবার ও-দিক ছুটাছুটি করিয়া থাকে, তেমনই তারাপদকে দুই

দিক হইতে ঘা খাইয়া ছুটাছুটি করিতে হইল। উষা কহিলেন, "আমি ও বুড়ো হাবাতীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না—তুমি অন্য যায়গায় চেষ্টা দেখ। এখন ত টাকা নেই বললে চলবে না।"

তারাপদ ছুটিয়া অমৃতের কাছে গেলেন। অমৃত কহিল, "বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে, নইলে তোমার চাকরী যাবে।"

তারাপদ ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "ওগো, চাকরী যাবে বলছে যে।"

স্ত্রী উত্তর করিল, "তা যায় যাক্; হেমবাবুর কৃপায় অমন অনেক চাকরী জুটবে।"

তারাপদ ফিরিয়া আসিয়া অমৃতের কাছে কহিল, "তা কি করব ভাই, কিছুতেই গিন্নীর মত করতে পারছি না।"

অমৃত কহিল, "এখন তোমার পেছুলে চলবে না—পাকা দেখা হয়ে গেছে।"

"সে আবার কবে হ'ল?

"আমরা সকলে গিয়ে মেয়ে দেখে এলুম্ না? পাকা দেখা আবার কা'কে বলে?"

"বর-ক'নে আশীর্ব্বাদ হয় নি ত—"

"লোক-দেখানো কিছু হয় নি বটে, কিন্তু মনে মনে কি আমরা ক'নেকে চিরায়ুষ্মতী হও ব'লে আশীর্ব্বাদ করি নি? না, তুমি জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর নি? দেখ ত একবার কথায় ছিরি!"

"আমার স্ত্রী—"

"রেখে দেও তোমার স্ত্রী; স্ত্রী কি আর কারুর হয় না? কথা যখন দিয়েছ—"

"আমি কোন কথাই ত এতাবৎ দিই নি।"

"মেয়ে যখন সাজিয়ে এনে দেখিয়েছ, তখনই ত কথা দেওয়া হয়েছে। কথা দেওয়া আবার কা'কে ব'লে? দেখছি তুমি একটা পাড় মুখ্খু—আইনজ্ঞান একটুও নাই।"

"তোমরা মেয়ে দেখতে চাইলে, তাই—"

"যাও, যাও—ব'ক না; এখন তোমাকে বিয়ে দিতেই হবে। পরশু বিয়ে, আজ বলেন কি না বিয়ে দেব না। মগের মুলুক আর কি?"

বঙ্গদেশ যে মগের মুলুক নহে, তাহা দেখাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিবসে সন্ধ্যাকালে অমৃতলাল বরকর্ত্তা হইয়া বর ও দল লইয়া আসিলেন। ভীত ও শঙ্কিত তারাপদ বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "আজ্ঞে, বিয়ে দেব না, আমি ত ব'লে এসেছি।"

অমৃত।—(সরোষে) "বিয়ে দেব না বলছ কি?—আলবৎ দিতে হবে।

তারাপদ।—বলেছি ত অমৃত বাবু, আমার স্ত্রী এ বিয়েতে সম্মত নয়।

কালীনাথ।—এমন সুপাত্র—রাজ-ঐশ্বর্য্য—আমার মেয়ে থাকলে—

অমৃত।—সে যা হয় হ'ত। এখন এ আহাম্মুকটা বলে কি?

তারাপদ।—আমার যা বলবার তা' বলেছি।

বর।—ওহে অমৃত, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করছ কেন?—চল ভেতরে যাই।

দলবল হড়মুড় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। যাঁহার বাড়ী, তিনি পড়িলেন সকলের পিছনে; নাপিত ও পুরোহিতও তাঁহাকে কনুয়ের গুঁতা মারিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তিনি আর প্রবেশ-পথ পাইলেন না। ছোট উঠান, সঙ্কীর্ণ পথ, বরযাত্রীতে ভরিয়া গিয়াছে। কাযেই তাঁহাকে বাহিরে থাকিয়া চীৎকার করিয়া পুত্রকে ডাকিতে হইল। পুত্র রাস্তার দিকের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে কহিলেন, "তোমরা দোর বন্ধ ক'রে থাক—ওদের কথায় ভুলো না।"

(নেপথ্যে) অমৃত।—আমরা দোর ভেঙ্গে মেয়েকে নিয়ে আসব—পুরুত মশায় কৈ?

(নেপথ্যে) বর।—আহা, জোরজবরদস্তি করছ কেন অমৃত? মেয়ের মাকে—আমার পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বুঝিয়ে বল না, তিনি ত আর তারাপদর মত পাষণ্ড ন'ন।

তখন অমৃত উঠান ছাড়িয়া দাওয়ায় উঠিল এবং অমৃত শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইল।

৭

এ দিকে তারাপদকে রাস্তা হইতে কে ডাকিল। তিনি দ্বার হইতে সরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পথে হেমেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তারাপদ অকূলে কূল পাইলেন। হেম কহিল, "আপনি বাবার কাছে ছুটে যান।"

"দেখুন দেখি কি বিপদ্। আমি মেরে দেব না, ওরা জোর ক'রে—"

"আপনি আর সময় নষ্ট করবেন না—বাবার পায়ের উপর আছড়ে প'ড়ে কান্নাকাটি করবেন—যান—ছুটে যান।"

তারাপদ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একবস্ত্রেই ছুটিল। দেবেন্দ্রনাথ তখন বন্ধুগণসহ 'ট্রে' (তিন তাস) খেলিতেছিলেন। তারাপদ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কর্ত্তার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল ; কহিল, "আমাকে রক্ষে করুন।"

কর্ত্তা চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

"আপনার প্রজা—তারাপদ মিত্র।"

"আমার প্রজা ? বারাসতে—"

"আমি পিছনে খোলার ঘরে থাকি।"

"ও তারপর ! তোমার কি হয়েছে ?

"এক দল লোক জোর ক'রে আমার বাড়ীতে ঢুকে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলছে—আমাকে রক্ষে করুন।"

"বটে ? মজার মুলুক পেয়েছে আর কি !—এটা বৃটিশ রাজ্য—"

প্রতিবেশী নছু খুড়ো ঘটনাটি বুঝাইয়া বলিলেন এবং তারাপদর পরিচয় দিয়া কহিলেন, "এই লোকটি অতি সজ্জন, আর যিনি বর সেজে এসেছেন, তিনি নরাকারে পশু।"

তারাপদ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "এতক্ষণ কি হয়েছে, জানি না—আপনি কাঙ্গালের বন্ধু, এ নিরাশ্রয় বিপন্নকে রক্ষা করুন।"

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না,—দেবেন্দ্র বাবু হুঙ্কার ছাড়িয়া ডাকিলেন, "দরওয়ান !"

"মহারাজ !"

"তোম্ লোক লাঠি লে কর চলা আও—তেওয়ারি, মিশির, পাঁড়ে, দোবে, সব আও ! (ভৃত্যের প্রতি)—দীপন্, ছোট বাবুকে ডাক্।"

"ছোট বাবু বেরিয়ে গেছেন।"

"আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি—সহিস-কোচম্যানকে ডাক্—ঘোড়ার চাবুকটা নিয়ে আয়।"

দেবেন্দ্র বাবু উঠিলেন। বন্ধুরা 'ক্যাদায়ে' যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন। এ দিকে দেবেন্দ্র বাবু ত্বরিতপদে তারাপদর গৃহদ্বারে সদলে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, ছোট বাবু হেমেন্দ্রনাথ দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পিতা কহিলেন, "আমি তোমাকে খুঁজছিলাম হেম। এই সব লোক বাড়ী চড়াও করেছে, আর তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ ?"

"আপনার হুকুম না পেলে—"

"হুকুম নিতে ত যেতে হয়।"

"তারাপদ বাবুকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

দেবেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হইলেন ; তারাপদর পানে ফিরিয়া কহিলেন, "চল, ভেতরে যাই ; দেখি কার মরবার পালক উঠেছে।"

"আজ্ঞে, ভেতরে যাবার পথ নেই।"

কর্ত্তা উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সত্যই তাই। তখন দরওয়ানদের আদেশ করিলেন, "বিলকুল আদমী বাহার কর্ দেও।"

ছয় জন দ্বারবান্ অগ্রসর হইল এবং এক এক বরযাত্রীকে ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে লাগিল। যখন পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইল, তখন দেবেন্দ্র বাবু সদলে অগ্রসর হইলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলেন, বর একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়াছে, আর ক'নে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কনেরা না কি দ্বার খুলিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়াছিল। কর্ত্তা সেই বৃদ্ধ বিপুলদেহ বরকে পিঁড়িতে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং চাবুক তুলিয়া সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিলেন। এরূপ অভ্যর্থনার জন্য বর একটুও প্রস্তুত ছিলেন না ; তিনি জালিকার কোমল করস্পর্শ আশা করিয়াছিলেন, তৎপরিবর্ত্তে ঘোড়ার চাবুক বড়ই অপ্রীতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া তাঁহার মনে হইল। বেত্রাঘাত পুনঃ পুনঃ তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িলে তিনি পলায়ন-তৎপর হইলেন, কিন্তু বিনা সাহায্যে উঠিবার শক্তি তাঁহার নাই। তিনি কাতরস্বরে ডাকিলেন, "অমৃত, আমাকে তুলে নেও না।" অমৃত তখন বাহিরে হেমেন্দ্রনাথের করস্পর্শসুখ অনুভব করিতেছিল এবং অনেক ভৃত্য প্রভুর ইঙ্গিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে গোময় ও অন্যপুরীষ লেপন করিতেছিল।

এ দিকে বর পুরোহিতের সাহায্যে কোন রকমে উঠিয়া পড়িয়া বাহিরে আসিলেন এবং ভৃত্যহস্তে অমৃতের লাঞ্ছনা দেখিয়া সকাতরে কহিলেন, "বাবা সকল, এ কায আর কখন আমি করব না—এই বেটা অমৃত যত নষ্টের

গোড়া—ওটাকে খুব গোবর দেও—আমাকে ছেড়ে দেও বাবা—বুড়ো মানুষ—"

ভিতরে দেবেন্দ্রনাথ তারাপদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মেয়ে কৈ তারাপদ? এই ক'লে? তোমার ঘরে এই মেয়ে?"

কমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। দেবেন্দ্র কহিলেন, "বটে! এই তোমার মেয়ে। এত দিন বিয়ে দেও নি-কেন?"

"আজ্ঞে, টাকা নেই—"

"তা আমাকে বলনি কেন?—তুমি ত বড় বোকা! (ভৃত্যের প্রতি)—ওরে হরে, ছুটো আলো নিয়ে আয়।"

ভৃত্য সত্বর দুইটা বাতি আনিল। কর্ত্তা দ্বারবান্ প্রভৃতিকে বিদায় দিলেন, শুধু হরে রহিল। বিদায় দিয়া তিনি কমলাকে সম্মুখে দাঁড় করাইলেন এবং স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি মা?"

"কমলা।"

"কমলা? বাঃ! আমি যে কমলা খুঁজে বেড়াচ্ছি। (তারাপদর প্রতি) তোমার নাম কি বললে? তারাপদ মিত্র? বেশ। আমরা বোস। (ভৃত্যের প্রতি) ওরে হরে, হেমকে ডাক ত।"

হেম আসিল। কমলা একটু জড়সড় হইয়া পড়িয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল। কিন্তু কর্ত্তা তাহাকে সরিতে দিলেন না; পুত্র-প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আমার ও তোমার গর্ভধারিণীর বহুকাল হ'তে ইচ্ছে, একটি লক্ষ্মী-প্রতিমা ঘরে আনি। তা তুমি কিছুতেই রাজী নও। কোথায় কোন্ ভিখিরীর মেয়েকে দেখে ক্ষেপে গেছ—যাক সে সব কথা—বলছি কি, তুমি আর আমাদের অবাধ্য হয়ো না—যা বলি, তাই কর, দেখ দেখি কি সুন্দর মেয়ে—মা লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবার আমার লোভ পড়েছে—তুমি আর বাধা দিও না।"

"আপনার আদেশ ত আমি কখন লঙ্ঘন করি না।"

"তা জানি—এমন ছেলে—সে সব কথা থাক। তা হ'লে কমলাকে বিয়ে করতে তুমি সম্মত আছ?"

নতবদনে পুত্র উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

বলিয়াই সে অন্তরালে প্রস্থান করিল। তাহার এত হাসি আসিয়াছিল যে, সে আর তাহা লুকাইতে পারিতেছিল না। কমলারও সেই দশা; সে চঞ্চলপদে ঘরের ভিতর গিয়া মায়ের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কর্ত্তা এ দিকে মহানন্দে গৃহে গিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "ছোঁড়াদের কি পছন্দ আছে?—আমি এমন সুন্দর বউ বেছে বেছে ঠিক করেছি যে, ছেলে দেখেই ভুলে গেল।"

শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বংশী-ধ্বনি

মনের মাঝে বাঁশী বাজে শোন লো ওলো সই!
চল ত্বরা লুটিয়ে আঁচল, (তারে) দেখবি যদি ওই!
তানে লয়ে সমে সুরে
ঘড়ঋতু ঘরে ঘুরে
(আবার) ধূলায় বাহন চ'ড়ে পবন ছোটে ভুবনজই।

কেমন করে বাঁশী ধরা,
কেমন লো তার বাদন-ধারা—
কোন্ ফাঁকে সে সাজায় ধরা কোন্ সমে মন সই!

আমরা নারী শিখতে নারি এমনি নাকি ছাই,
চল আড়াল থেকে নেব দেখে (তার) গুপ্ত গানের বই।
নূপুর-ধ্বনি আসছে কানে,
নাচছে পাগল আপন মনে,
নাগর-ধরা ফাঁদটি মোরা ভুলেছি কি ওই?
মনের মাঝে বাঁশী বাজে শোন লো ওলো সই!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী-

কর্ম্ম-মীমাংসা ও বেদ

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে কর্ম্ম-মীমাংসা বা পূর্ব্ব-মীমাংসা প্রচার ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে, ইহা ভাল নহে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ বেদ ও স্মৃতি, এই বেদ ও স্মৃতির তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে হইলে কর্ম্ম-মীমাংসা একান্ত অপেক্ষণীয়। দেশে সংস্কৃত পরীক্ষার নানা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, ঐ সকল কেন্দ্রে যে সকল ছাত্র পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে ব্যাকরণ ও সাহিত্যের ছাত্রসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রের পরীক্ষার্থী ছাত্র অল্পবিস্তর থাকিলেও ন্যায় ও স্মৃতির ছাত্রসংখ্যা নিতান্তই অল্প; পূর্ব্বমীমাংসার ছাত্র একবারে নাই বলিলেই চলে। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশে পূর্ব্বমীমাংসার প্রচার একপ্রকার উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইলেও এখনও ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের সম্মানবুদ্ধি যে কমে নাই, তাহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্ব-মীমাংসার প্রতি বাঙ্গালার অধ্যাপক ও ছাত্রদের আদর বা গৌরববুদ্ধি যে নিতান্তই অল্প, এমন কি, নাই বলিলেও চলে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ইহা কিন্তু সংস্কৃত-শাস্ত্রের পক্ষে নিতান্তই অনিষ্টকর, ইহা আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। হিন্দুর ধর্ম্ম কি, বর্ত্তমান সময়ে সেই ধর্ম্মের কাল, দেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে কি না এবং সেই পরিবর্ত্তন হিন্দু-শাস্ত্রকার ঋষিগণের অভিপ্রেত কি না, তাহা নির্ণয় করিবার সর্ব্বপ্রধান সহায় হইতেছে—পূর্ব্ব-মীমাংসা শাস্ত্র বা জৈমিনীয় দর্শন। সুতরাং ইহা স্থির যে, যদি আমরা জৈমিনীয় দর্শনকে উপেক্ষা করি, তাহার সিদ্ধান্ত ও যুক্তিরাশির প্রতি অনাস্থাসম্পন্ন হই, এক কথায় বলিতে গেলে যে ভাবে প্রাচীন ভারতে জৈমিনীয় দর্শনের জ্ঞান আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ছিল, তাহা হইতে আমরা যদি বঞ্চিত হই, তবে আমরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইব না। ধর্ম্মের স্বরূপ না বুঝিলে তাহার অনুষ্ঠানও সম্ভবপর নহে, সুতরাং মীমাংসাশাস্ত্র-লোপের সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-লোপের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ধর্ম্মলোপ হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, মীমাংসাশাস্ত্রের অনুশীলন যে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

মীমাংসা-দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদিগের এই উক্তির সার্থকতা অনায়াসে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাই আজ তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মীমাংসা-দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর এই যে, বেদের অর্থ কি, তাহা বুঝিবার জন্য যে দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহাই মীমাংসা-দর্শন। এই বেদের অর্থ বলিলে বেদের কোন একটি পদের অর্থবোধ হয় না, কারণ, বেদে যে সমুদয় পদ আছে, তাহার অর্থ জানিবার উপায় হইতেছে—বৈদিক ব্যাকরণ এবং যাস্ক-প্রণীত নিরুক্ত প্রভৃতি বৈদিক শব্দের অভিধান গ্রন্থ। পৃথক্ ভাবে বৈদিক ব্যাকরণ বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত না থাকিলেও মহামুনি পাণিনি-প্রণীত ব্যাকরণ-সূত্রের বৈদিক প্রক্রিয়াংশ এবং তাহার উপর পতঞ্জলি-প্রণীত ভাষ্য, টীকাকার কৈয়ট প্রভৃতির গ্রন্থের সাহায্যে বৈদিক পদ ও তাহার স্বরসমূহের স্বরূপ ও অর্থ আমরা বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকি; সুতরাং বেদের পদসমূহের অর্থ বুঝিবার জন্য মীমাংসা-দর্শনের আবশ্যকতা নাই। বাকি রহিল বেদের বাক্যসমূহ, ইহাদিগের আপাত অর্থ জানিতে হইলে, লৌকিক বাক্যসমূহের অর্থ বোধ করিবার যে সকল উপায় লোকপ্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল উপায়ের দ্বারাই বেদবাক্য-সমূহেরও প্রাথমিক অর্থবোধ হইয়া থাকে, ইহা স্থির; সুতরাং বৈদিক ব্যাকরণ ও অভিধানসমূহের সাহায্যে যাঁহারা বেদের পদসমূহের অর্থ বুঝিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের পক্ষে বৈদিক বাক্যসমূহের মোটা-মুটি অর্থজ্ঞান মীমাংসাশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে লৌকিক নিয়মানুসারেই হইতে পারে বলিয়া, সে বিষয়ে মীমাংসাদর্শনের আবশ্যকতা নাই বলিলেও চলে। তবে মীমাংসাদর্শন বেদের অর্থ বুঝাইয়া থাকে, এই প্রকার যে মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত, তাহার প্রকৃতস্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে হইবে, সুতরাং এক্ষণে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

বেদবাক্যের আপাত অর্থবোধ হইবার পর যথার্থ তাৎপর্য্যের বোধ না হওয়া নিবন্ধন মনে যে সমুদয় সংশয়

উদিত হইতে পারে, তাহার নিরাকরণ করিয়া সকল প্রকার অসামঞ্জস্যের পরিহার করাই মীমাংসাদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। মীমাংসকগণের মতে বেদ স্বতঃপ্রমাণ। কারণ, বেদ অপৌরুষেয়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে হয় ত শুনিয়াই হাসিয়া উঠিবেন যে, বাক্য অপৌরুষেয় কি প্রকারে হইতে পারে? এখনই যে লোক বাক্যের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসপরায়ণ নহে—তাহা নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে সেরূপ বাক্যসমূহের অপৌরুষেয়ত্বের বিষয়ে সংশয় চলিয়া আসিতেছে। যত দিন মানুষ থাকিবে, তত দিন এ সংশয়ও যে থাকিবে, তাহা স্থির; কিন্তু এইরূপ সংশয় যতক্ষণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত বেদের উপর বিশ্বাস কিছুতেই উৎপন্ন হইবে না, অথচ প্রাচীন ভারতে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী আস্তিক পুরুষগণ বেদের উপর দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়াই বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং তাহা দ্বারা আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বলিয়াও বিবেচনা করিতেন, ইতিহাস এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। সেই সকল আস্তিক পুরুষের বেদের প্রতি এতাদৃশ দৃঢ় বিশ্বাস যে সকল প্রমাণ ও যুক্তির উপর নির্ভর করিত, সেই সকল যুক্তি ও প্রমাণ পূর্ব্বমীমাংসায় অতিবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া পরে বেদের অর্থ করিবার যে উপায় মীমাংসাদর্শনে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ প্রদর্শন করিব।

বেদ বলিলে আমরা যে গ্রন্থসমূহকে বুঝিয়া থাকি, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম—মন্ত্র, দ্বিতীয়—ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের আর একটি নাম সংহিতা। পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে এই সংহিতার ভাগই প্রাচীন,—ব্রাহ্মণভাগ অপেক্ষাকৃত নবীন। সংহিতাভাগের মধ্যে ঋক্-সংহিতাকে তাঁহারা প্রাচীনতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ঋক্-সংহিতা কতকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় এ পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতই যে করিতে পারেন নাই, তাহা স্থির। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে এক হাজার বৎসর হইতে দুই হাজার বৎসরের মধ্যেই ঋক্‌সংহিতা বিরচিত হইয়াছিল; আবার কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, আরও এক হাজার বৎসর পূর্ব্বেও উহা রচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কিছুতেই ইহার রচনা সম্ভবপর নহে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় কিন্তু অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ হাজার বৎসরের মধ্যে যে ঋক্‌বেদ প্রণীত হয় নাই, ইহা স্থির। তাহারও পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু কত পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল, তাহা কেহই নিশ্চয় সহকারে বলিতে পারে না। যাহাই হউক, ইহা স্থির যে, বর্ত্তমান সময়ে মানবসমাজের মধ্যে যে সমস্ত লিখিত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, ঋগ্বেদসংহিতা যে সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম, তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে কোন পণ্ডিতেরই মতদ্বৈধ হইতে পারে না। এই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ যে ঋগ্বেদ, তাহা কোন মনুষ্যের দ্বারা রচিত কি না, এইরূপ সংশয়স্থলে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, ইহা কোন পুরুষের দ্বারা রচিত নহে, কিন্তু ইহা অনাদিসিদ্ধ। অর্থাৎ আমরা গবেষণার সাহায্যে লব্ধ ঐতিহাসিক দৃষ্টির দ্বারা এমন একটি সময়কে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না, যে সময়ে এই বেদ বা বেদানুমোদিত সম্প্রদায় এই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল না, মীমাংসকগণের এই প্রকার সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই সিদ্ধ করিতে পারে নাই।

এখন যদি বল যে, এই ভাবে বেদের অতিপ্রাচীনত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যে কোন মনুষ্যের দ্বারা বিরচিত হয় নাই, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না প্রত্যুত বেদ যখন বাক্যসমূহরূপই হয়, বাক্য মানুষের দ্বারাই রচিত হইয়া থাকে, সুতরাং বেদবাক্যও যে মানুষের দ্বারাই রচিত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা দ্বারা বেদের প্রাচীনত্ব সিদ্ধ হইলেও অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে না।

ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, বেদ যদি লৌকিক বাক্যের ন্যায় কোনও পুরুষপ্রণীত হইত, তাহা হইলে বেদরচয়িতৃরূপে সেই পুরুষের নাম আমাদিগের স্মৃতিপথে বেদের ন্যায় উদিত থাকিত। এই সংসারে যে গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে, সেই গ্রন্থের সহিত তাহার রচয়িতার নামও লোকের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে। এ নিয়মের ব্যভিচার আমরা কোন লৌকিক গ্রন্থেই দেখিতে পাই না। রামায়ণ বা মহাভারত

রচিত হইবার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে। সেই রামায়ণ ও মহাভারতের রচয়িতা বাল্মীকি ও বেদব্যাসের নামও আমরা বরাবর মনে করিয়া রাখিতেছি। শুধু ভারতেই এ অবস্থা নহে, চীন ও য়ুরোপ প্রভৃতি দেশেও যে সকল প্রাচীনতম গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাদিগের রচয়িতার নাম এখনও লোক ভুলিয়া যায় নাই। কিন্তু বেদের রচয়িতার নাম আমরা কেমনে ভুলিতে পারি? বাস্তবই যদি কেহ ইহার প্রথম রচয়িতা থাকিত, তাহা হইলে বেদের সম্প্রদায় যখন অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে, তখন সেই রচয়িতার নামও আমাদিগের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ থাকিত, অকস্মাৎ তাহাকে ভুলিয়া যাইবার কারণ কি, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাই স্থির হইতেছে যে, বেদ কোন পুরুষবিরচিত নহে। মানবের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বেদ আপনিই প্রকাশিত হইয়াছে, কোন লৌকিক রচয়িতা ইহাকে রচনা করেন নাই। অর্থাৎ মানবসমাজ যেমন ধারাবাহিকরূপে অনাদি, বেদও সেইরূপ ধারাবাহিকরূপে অনাদি। মীমাংসকগণের বেদের অপৌরুষেয়ত্বের সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তির উপন্যাস করিতে যাইয়া তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন—

শব্দ ও শব্দার্থ সম্বন্ধ নিত্য, অর্থাৎ আমরা নিজের মনের ভাব অপরকে বুঝাইবার জন্য শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা যাহা উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা দ্বারাই অর্থ-বোধ হইবার সম্ভাবনা নাই;—কেন তাহা বলি, আমাদিগের মুখের দ্বারা যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহার নাম—"ধ্বনি"; সেই ধ্বনিগুলি যেমন যেমন উচ্চারিত হয়, তেমনই তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়, কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির অভিঘাত হইতে ঐ সকল ধ্বনি উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই জানে। ক, এই ধ্বনিটিকে উৎপন্ন করিতে হইলে যে প্রযত্নবিশেষের আবশ্যকতা হয়, সেই প্রযত্ন হইতেই 'খ' প্রভৃতি অন্য ধ্বনির উৎপত্তি হয় না, তাহাদিগের প্রত্যেকের উৎপত্তির জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রযত্নের আবশ্যকতা আছে। ঐ সকল প্রযত্ন একই ক্ষণে একই পুরুষে সম্ভবপর নহে বলিয়া, উহাদিগের মধ্যে একটা ক্রম অর্থাৎ পূর্ব্বাপরভাব হইয়া থাকে। ইহা আমাদিগের সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। এক্ষণে দেখ, যে সকল প্রযত্ন হইতে ধ্বনিগুলি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের ক্রম থাকা নিবন্ধন তাহাদিগের কার্য্যরূপে যে সকল ধ্বনি হয়, তাহাদিগের মধ্যেও ক্রম বা পূর্ব্বাপরভাব থাকিবেই। একই ক্ষণে একই পুরুষের দ্বারা কতকগুলি ধ্বনি উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা স্থির। মনে কর, আমরা অপরকে একটা বাড়ী বুঝাইবার জন্য 'ভবন' এই শব্দ করিয়া থাকি, কিন্তু 'ভবন' এই শব্দটি একটি ধ্বনি নহে; ইহার মধ্যে ভ অ ব অ ন অ এই ছয়টি ধ্বনি আছে; এই ছয়টি ধ্বনি একক্ষণে উৎপন্ন হইতে পারে না; আমাদিগের কর্ণে যে ক্ষণে 'ভ' এই ধ্বনিটির উপলব্ধি হয়, সেই ক্ষণে তাহার পরবর্ত্তী 'অ' এই ধ্বনিটির উপলব্ধি হয় না; আবার 'অ' এই ধ্বনিটির উপলব্ধি যখন হয়, সেক্ষণে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'ভ' এই ধ্বনিটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই ভাবে শেষের 'অ' এই ধ্বনিটি যখন আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয়, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচটি ধ্বনির বিলোপ হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ছয়টি ধ্বনির মধ্যে কোন্ ধ্বনিটি আমাদিগের মনে 'বাড়ী'রূপ অর্থকে স্মরণ করাইয়া দেয়? প্রত্যেক ধ্বনিটি যদি স্মরণ করায়, তাহা হইলে অতগুলি অর্থাৎ ছয়টি ধ্বনি করিবার কোনও আবশ্যকতা থাকে না। যদি বল, ছয়টি ধ্বনি মিলিত হইয়া আমাদিগের মনে ঐ বাড়ীর স্মৃতি জন্মাইয়া দেয়, তাহাও সম্ভবপর নহে, কারণ, ঐ ছয়টি ধ্বনি বিভিন্ন ক্ষণে উৎপন্ন হয়, এবং উৎপন্ন হইয়াই বিলুপ্ত হয় বলিয়া, কোন ক্ষণেই তাহাদের মিলন সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রত্যেক ধ্বনিটি আমাদিগের অর্থ-স্মৃতির কারণ হয় না, মিলিত হইয়াও তাহারা অর্থ-স্মৃতির কারণ হইতে পারে না, এরূপ অবস্থায় কোন্ শব্দের দ্বারা আমাদিগের ঐ বাড়ীরূপ অর্থের স্মৃতি হইয়া থাকে, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে এইরূপ কল্পনাই করিতে হয় যে, ঐ সকল বর্ণ হইতে যখন অর্থের স্মৃতি হইয়া উঠিতেছে না, তখন বাধ্য হইয়া ঐ ছয়টি ধ্বনি হইতে পৃথক্ 'ভবন' বলিয়া একটি নিত্য শব্দ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহারই সাহায্যে আমরা ঐ বাড়ীরূপ অর্থটিকে স্মরণ করিতে সমর্থ হই। এই ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত যে 'ভবন'রূপ একটি শব্দ, তাহার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত ঐরূপ শব্দের উৎপত্তি ও বিকাশ কল্পনা করিতে গেলে অনন্ত শব্দের কল্পনারূপ গৌরবের আপত্তি হয়। এই কারণে ঐ 'ভবন'রূপ শব্দের নিত্যতা সিদ্ধ থাকে। শব্দ এই ভাবে যদি নিত্য বলিয়াই সিদ্ধ হইল, তবে তাহার সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাকেও নিত্য বলিয়াই অঙ্গীকার

করা উচিত। সেই শব্দ ও তাহার সম্বন্ধ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধীয় যে অর্থ, তাহাকেও নিত্য বলিয়াই অঙ্গীকার করিতেই হইবে। যদি বল, শব্দের দ্বারা এই ভাবে যে সকল অর্থ আমাদিগের স্মৃতির গোচরীভূত, তাহারাও নিত্য হইতে পারে না, কারণ, 'ভবন' শব্দের দ্বারা যে গৃহরূপ অর্থ প্রতীত হয়, তাহাও নিত্য নহে। ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, গৃহ, ঘট, পট প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আমাদিগের যে অর্থের বোধ হয়, তাহা অনিত্য বস্তু হইতে পারে না। মনে কর, ঘট শব্দের দ্বারা যে আমাদিগের ঘটরূপ ব্যক্তির বোধ হয় বলিয়া ঘট শব্দের ঘটব্যক্তিই যে অর্থ হইবে, তাহা নহে। শব্দের দ্বারা অর্থবোধ হইলে যে অর্থের বোধ ঐ শব্দের দ্বারা হইবে, সেই অর্থের সহিত ঐ শব্দের বাচ্যবাচকভাবরূপ যে সম্বন্ধ, তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই বাচ্যবাচকভাবরূপ যে সম্বন্ধ তাহা কোন একটি ব্যক্তির সহিত শব্দের হইতে পারে না; যে ব্যক্তির সহিত ঐ সম্বন্ধ গৃহীত হয়, সেই ব্যক্তিকেই ঐ শব্দ বোধ করাইবে,এইরূপ নিয়ম যদি অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তিতে আমার ঘটশব্দের সম্বন্ধ বা সঙ্কেত পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিটি ছাড়া অন্য ঘটব্যক্তির বোধ সেই শব্দের দ্বারা হইতে পারে না। যদি বল, যত ঘটব্যক্তি আছে, সকল ব্যক্তির সহিতই ঘটশব্দের সম্বন্ধ যাহার জানা আছে, তাহার ঘটশব্দের দ্বারা সকল ঘটব্যক্তিবোধ হইবে—এইরূপ মানিলেই ত চলে।

এরূপ কল্পনাও ঠিক নহে, কারণ, ঘটব্যক্তি অসংখ্য। এ পর্য্যন্ত জগতে কত ঘট উৎপন্ন হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, কত ঘট ভবিষ্যতে হইবে এবং বর্ত্তমান সময়ে কত ঘট জগতে বিদ্যমান আছে, তাহার সংখ্যা কেহই করিতে পারে না। অতীত,অনাগত ও বর্ত্তমানকালে যত ঘটব্যক্তি আছে, প্রত্যেক সেই ঘটব্যক্তির সঙ্গে ঘটশব্দের সম্বন্ধ বোধ করা কোনও মানুষেরই পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রত্যেক ঘটব্যক্তিতে ঘটশব্দের সঙ্কেতরূপ সম্বন্ধ জানিয়া যদি ঘটশব্দ দ্বারা প্রত্যেক ঘটকে জানিতে হয়, তাহা হইলে কোনও মানবের পক্ষেই ঘটশব্দের দ্বারা ঘটরূপ অর্থের প্রতীতি হওয়া গগনকুসুমের ন্যায় অলীক হইয়া পড়ে। সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঘটশব্দের সহিত প্রত্যেক ঘটব্যক্তির সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সকল ঘটের উপর বর্ত্তমান ঘটত্বরূপ যে নিত্য জাতি আছে, তাহারই সহিত ঘটশব্দের বাচ্যবাচকভাবরূপ যে সম্বন্ধ আছে, তাহার জ্ঞান থাকিলেই আমাদের ঘটশব্দের দ্বারা প্রথমতঃ তাহার অর্থ যে ঘটত্বরূপ জাতি, তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে। এখন যদি বল,ঘটশব্দের অর্থ যদি ঘটত্ব জাতি হয়, তবে ঘটশব্দ শুনিবার পর আমাদিগের ঘটব্যক্তি বোধ হয় কিরূপে? কারণ, ব্যক্তির সহিত ত শব্দের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ আমাদের কাহারই জ্ঞাত নহে। ইহার উত্তর এই যে, জাতির স্বভাব অনুসারে ব্যক্তির বোধ আপনা হইতেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ জাতির স্বভাব হইতেছে যে, যখনই ইহার বোধ হইবে, তখনই ইহা নিজের আশ্রয়স্বরূপ কোনও একটি ব্যক্তির সহিতই আমাদিগের বুদ্ধির বিষয় হয়। ঘটত্বজ্ঞান হইতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রয়স্বরূপ কোনও একটি ঘটব্যক্তির হইয়াই থাকে, ইহাই হইল জাতির স্বভাব। ঘটব্যক্তিকে না বুঝিয়া ঘটত্ব জাতির জ্ঞান কখনও কাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া ঘটত্বের সহিত শব্দের সম্বন্ধজ্ঞান হইলে সেই সম্বন্ধজ্ঞানের ফলে ঘটত্ববোধ যখনই আমাদিগের হয়, তখনই সেই বোধের সঙ্গে কোনও না কোন একটি বা ততোধিক ঘটব্যক্তির বোধ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। এই কারণে ঘটশব্দের প্রত্যেক ঘটব্যক্তিতে সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া, যদি কেবল ঘটত্বের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান হয়, তাহা হইলে অবাধিত ঘটব্যক্তির জ্ঞান স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আপনা-আপনি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক ঘটব্যক্তির সহিত ঘটশব্দের সম্বন্ধ স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই।

ইহাই হইল মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে শব্দ, তাহার অর্থ এবং উভয়ের মধ্যে বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ, এই ত্রিবিধ বস্তুই নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হইল। তাহাই যদি হইল, তবে অনিত্যত্ব নিবন্ধন বৈদিক শব্দের পৌরুষেয়ত্বরূপ যে সিদ্ধান্ত, তাহা টিকিল না। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার মীমাংসাদর্শনে করা হইয়াছে। এ স্থলে তাহার আর আলোচনা না করিয়া, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে মীমাংসকগণ আরও অন্য প্রকার যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহারই কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মীমাংসকগণ বলেন, এই পৃথিবীর সৃষ্টি কত কাল হইয়াছে, কত কাল হইতে এ পৃথিবীতে মনুষ্য বাস করিতে

আরম্ভ করিয়াছে, ইহার নির্ণয় করিতে যাওয়া মানুষের পক্ষে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

তাঁহারা বলেন, "ন কদাচিদনীদৃশম্" অর্থাৎ মানুষ কল্পনার সাহায্যে যত দূর দেখিতে পায়, তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, আমরা যে ভাবে জগৎকে দেখিতেছি, কোন কালেই ইহা এই প্রকারের ছিল না, ইহা সম্ভবপর নহে। কেমন করিয়া মানুষ এ সংসারে প্রথম জন্মিয়াছে, কোন পণ্ডিতই কোনও প্রমাণের সাহায্যে ইহা বুঝাইতে পারেন না, বুঝিবার উপায়ও কিছুই নাই। বৈজ্ঞানিক কল্পনা করিয়া হয় ত বলিবেন, প্রতপ্ত সূর্য্যপিণ্ড হইতে তাহার কতকটা অংশ তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া অনন্ত আকাশের একদেশে হঠাৎ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই বিক্ষিপ্ত অংশ মাধ্যাকর্ষণের বলে প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ তাহাতে উত্তাপের মাত্রা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই গতির বলে বায়ুর জন্ম হইয়াছে, সেই বায়ুর সাহায্যেই তাহা হইতে বাষ্পরাশি মেঘরূপে পরিণত হইয়া বৃষ্টির আকারে জলরূপে পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে। সেই জলের কোন অংশ সমুদ্র বা নদীরূপে পরিণত হইয়াছে। এই ভাবে জল-স্থল-সৃষ্টি হইলে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অগ্রে উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই উদ্ভিদ হইতে ক্রমে জীবদেহের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সেই সকল জীবদেহই ধীরে ধীরে মানবদেহরূপে পরিণত হইয়াছে। আবার সেই সকল মানব প্রথম অবস্থায় বন্যপশুর ন্যায় বিচরণ করিত, তাহারা ধীরে ধীরে কাঠ ঘষিয়া আগুন করিতে শিখিয়াছে; বহু সহস্র বর্ষব্যাপী ভূয়োদর্শনের ফলে কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। আগে তাহারা বানর প্রভৃতি পশুর ন্যায় অব্যক্ত শব্দ করিয়াই মনের ভাব পরস্পরকে বুঝাইত, ক্রমক্রমে তাহাদের ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে। এ ভাষার সৃষ্টিও যেমন, তাহাদের কার্য্য তেমনই, ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট প্রত্যেক শব্দের সহিত তাহার প্রতিপাদ্য অর্থের সম্বন্ধকল্পনাও তাহারই কার্য্য, ইহা যখন আমরা বৈজ্ঞানিক কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে পারিতেছি, তখন কি করিয়া স্বীকার করিব যে, মানবের ভাষার অবয়বস্বরূপ শব্দগুলি নিত্য, তাহাদিগের অর্থগুলিও নিত্য এবং শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকরূপ যে সম্বন্ধ, তাহাও নিত্য?

এই প্রকার শঙ্কার উত্তরে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর বা মানবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, বিচার করিয়া দেখিলে তাহার মূলে কোনও প্রবল প্রমাণের সত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত হাজার হাজার বৎসরের ভূয়োদর্শনের ফলে আমাদিগের যে ব্যাপ্তি স্থির হইয়াছে, সেই ব্যাপ্তি দ্বারা যে অনুমান হইয়া থাকে, সেই অনুমানের সহিত বৈজ্ঞানিকগণের এইরূপ কল্পনা বিরুদ্ধই হইয়া থাকে। আমরা দেখিতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দেখিয়াছেন যে, মানব হইতেই মানবের সৃষ্টি হইয়া থাকে, স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে যে গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহাই যথাকালে প্রসূত হইয়া শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞ মানবরূপে পরিণত হইয়া থাকে, এই যে নিয়ম, এই নিয়মের ব্যভিচার এ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে কেহই দেখে নাই বা দেখিবার সম্ভাবনাও আমাদিগের মনে উদিত হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ যে ভাবের সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে প্রথম মানবের সৃষ্টি কি প্রকারে হয়, তাহা আমরা কল্পনার সাহায্যে কিছুতেই বুঝিতে পারি না।

মানব না হইলে মানবের সৃষ্টি হইতে পারে, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই। অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে যাইলে আমাদিগের প্রত্যক্ষমূলক যে 'মানবমাত্রেই মানব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে' এইরূপ অনুমান সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ও সকল কালেই অঙ্গীকৃত হইয়া আসিতেছে, তাহার সহিত বিরোধ হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের প্রথম মানব-সৃষ্টি বিষয়ে যে কল্পনা, তাহা কোনও প্রামাণিক ব্যক্তির গ্রহণের হইতে পারে না। এই জন্যই মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, সর্ব্বসাধারণের প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে প্রত্যক্ষ অনুমান, তাহার বিরুদ্ধ কল্পনা নিতান্ত দুর্ব্বল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কেহই যথার্থ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে না। সুতরাং মানব-সৃষ্টি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত কিছুতেই আদরণীয় হইতে পারে না। এই কথাই—"ন কদাচিদনীদৃশম্" এইরূপ বাক্যের দ্বারা মীমাংসকগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বেদের আলোচনা এক্ষণে যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা বেদের নিত্যতাবিষয়ে যে সকল বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, সেই সকল যুক্তি ও তর্কের অবতারণা তাঁহারাই যে নূতনভাবে করিতেছেন, তাহা নহে, জৈমিনি প্রভৃতি মীমাংসক আচার্য্যগণ ঐ সকল যুক্তি ও তর্কের স্বরূপ অতিবিস্তৃতভাবে

আলোচনা করিয়া বহুবিধ সুযুক্তি-সমূহের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। সেই সকল যুক্তি ও তর্কের আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই অশ্রদ্ধেয় বলিয়া হয় ত উড়াইয়া দিবেন। বাস্তবিক পক্ষে সেই সকল যুক্তি ও প্রমাণের আলোচনা আমাদিগের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। জৈমিনি কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া মীমাংসাশাস্ত্র রচনা করেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন নিশ্চয়ই প্রত্নতাত্ত্বিকগণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বকালে জৈমিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, জৈমিনি প্রণীত মীমাংসা সূত্রের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের কোন প্রকার উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না। জৈমিনী যে মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, জৈমিনির জন্মিবার বহু পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বহু মীমাংসক আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ে বেদের ও তন্মূলক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচার প্রচুরভাবে বিদ্যমান ছিল। সেই বেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্ব বিষয়ে তাঁহাদিগের সকলেরই ঐকমত্য ছিল। সকল মীমাংসক আচার্য্যই অতি প্রাচীনতম কাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে, এই ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক দৃষ্টির সাহায্যে এমন কোন সময়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যে সময় এ দেশে বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রচলন ছিল না, সেই বেদকে পৌরুষেয় বলিবার অধিকার কাহারও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদিগের ভূয়োদর্শন, আমাদিগের প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান বেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্বই প্রমাণিত করিয়া থাকে, তাহার পৌরুষেয়ত্বদিদ্ধির অনুকূল কোন প্রমাণই ঐ সকল প্রমাণ হইতে প্রবল হইতে পারে না, সুতরাং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মীমাংসকগণের যাহা সিদ্ধান্ত, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা আর খণ্ডন করিতে সমর্থ হন নাই, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। আমাদিগের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূল প্রমাণ হইতেছে—বেদ। ধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহা বেদই প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষাদিমূলক মানবের জ্ঞান ধর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে কখনই প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না। কারণ, ধর্ম্মের স্বরূপ রাগ-দ্বেষ-কলুষিত মানবের অন্তঃকরণে উদিত হইতে পারে না। মানব চিরদিনই অদর্শন ও রাগদ্বেষাদির দোষে কলুষিতচিত্ত হইয়া থাকে। তাহাদিগের প্রত্যেকেরই বুদ্ধির বিভিন্নরূপতা আছে, সেই বিভিন্নরূপ বুদ্ধির সাহায্যে কল্পিত ধর্ম্ম সকল মানবের দৃষ্টিতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের সাধন বলিয়া পরিগৃহীত হওয়াও সম্ভবপর নহে। এই কারণে অপৌরুষেয় বেদবাক্য ব্যতীত ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের অন্য কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। ইহাই হইল সনাতন ধর্ম্মের মূল বেদ বিষয়ে মীমাংসক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত যাঁহারা অঙ্গীকার করেন না, তাঁহাদের দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কোন প্রকার সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাই হইল সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে যুক্তির সাহায্যে আরও দৃঢ়তর করিতে হইলে মীমাংসাশাস্ত্রের বহুল আলোচনা দেশে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত, হিন্দু সমাজের হিতৈষী ও নেতৃগণ এই মীমাংসার আলোচনা বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার নিরপেক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে নিতান্তই আশঙ্কাজনক।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

বাপের ব্যাটা

৮

বেল্লা মালিকের স্ত্রী বিধবা হইয়া নাবালক ছেলে-মেয়ে দুইটির ভরণ-পোষণের কোন উপায়ই যখন দেখিতে পাইল না, তখন অগত্যা সে হীরু মাঝিকে সাঙ্গা করিয়া তাহার ঘাড়ে নিজের ছেলে মেয়ের ভার চাপাইবার সঙ্কল্প করিল। এমন সময় বেল্লা মালিকের স্ত্রী সখী বিধবা হইলে হীরু তাহার নিকট উমেদার হইয়া পড়িল। তাহার উমেদারীতে ফল ফলিল; সখীও অনন্যোপায় হইয়া তাহার প্রার্থনায় সম্মতি দান করিল।

মেয়েটা খুব ছোট। ছেলে 'খেলার' আট নয় বৎসর বয়স হইয়াছিল, সুতরাং তাহার জ্ঞানও একটু জন্মিয়াছিল। মা পুনরায় সাঙ্গা করিবে শুনিয়া সে যেন অন্তরে অন্তরে একটা লজ্জা অনুভব করিয়াছে। ইহার উপর পাড়ার দুই একটা ছেলে যখন তাহাকে উপহাস করিয়া বলিল, "হাঁ রে খেলা, তোর মায়ের না কি আবার বিয়ে হবে?" খেলা তখন লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া মায়ের কাছে আসিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, "তুই কক্ষনো সাঙ্গা কত্তে পাবি না, মা।"

সখী দুঃখের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আমি কি সাধে সাঙ্গা কচ্ছি খেলা, না করলে তোদের মানুষ করবো কি ক'রে?"

খেলা মাথা নাড়িয়া অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন, ওই যে গোবরার মা ধান ভেনে, গোবর কুড়িয়ে গোবরাকে মানুষ কচ্ছে।"

সখী বলিল, "ধান ভেনে, গোবর কুড়িয়ে দু'টো ছেলেকে মানুষ করা সহজ কথা নয়, বাছা। গোবরার বাপ মাছের ব্যবসা ক'রে বেচা থেকে ছোক্ দু'খানা গয়না, পাঁচখানা পেতল-কাঁসা রেখে গিয়েছে। তার ওপর মাসী চক্ষু মেহনত ক'রে ছেলেটাকে মানুষ কচ্ছে। কিন্তু তোর বাপ যে জলখাবার ঘটীটুকুও রেখে যায় নি।"

দৃপ্তকণ্ঠে খেলা বলিল, "না-ই রেখে যাক্। আমার পেটের ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। কায়েতদের ঘরে থেকে গরু চরালে আমার পেট চ'লে যাবে। তুই আর খুকীটাকে মানুষ কত্তে পারবি না?"

একটু ভাবিয়া সখী বলিল, "পারি তা, কিন্তু শুধু ত পেটের ভাবনা নয়। সুখ-অসুখ আছে, জমার জমীর ওপর ঘর, তার খাজনা কড়ায় গণ্ডায় দিতে হবে। কুঁড়েটুকু না রাখলে এই বর্ষাতেই প'ড়ে যাবে। তার পর পাঁচ দিন যদি বিছানায় প'ড়ে থাকি, তখন তোদের মুখেট বা দেব কি, নিজেই বা কি খাব?"

মাতার আশঙ্কা খণ্ডন করিবার মত উত্তর খেলার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যোগাইল না। সুতরাং সে খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া অভিমানগম্ভীর মুখে বলিল, "কিন্তু ছেলেগুলো বলছিল যে, হীরু মাঝি তোর বাবার মাথা কাটিয়ে দিয়েছিল, সেই হীরু তোর বাবা হবে রে।"

মনে মনে ছেলেগুলার মুণ্ডপাত করিয়া প্রকাশ্যে সখী বলিল, "তা বলুক্ গে বাছা, মারামারি কত্তে গেলেই মার খেতে হয়। আর ওই যে নিতু মালিকের মেয়ে কাদী সাঙ্গা করেছে, বিশে মাঝির বোন সৌরাশী নিয়ে ঘর করে না ব'লে ফকির মালিককে নিয়ে ঘর কচ্ছে। আমাদের জাতে যখন রয়েছে, তখন এতে দোষ কি?"

খেলা আর বেশী কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু বেশ প্রসন্নমনে মাতার কার্য্যের অনুমোদনও করিতে পারিল না।

সখীর প্রমুখাৎ খেলার মনোভাব অবগত হইয়া হীরু মিষ্ট কথায় খেলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল এবং তাহাকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে একখানা কাপড় কিনিয়া আনিয়া

দিল। কাপড় পাইয়া খেলা কিন্তু একটুও আনন্দ প্রকাশ করিল না, কাপড়খানাকে ভাঁজ করিয়া সেতের পেটরায় তুলিয়া রাখিল। সখী তাহাকে নূতন কাপড় পরিতে বলিলে খেলা উপহাস সহকারে উত্তর করিল, "ছেঁড়া কাপড়খানা যদ্দিন চলে চলুক না; তার পর ওখানা পরলেই হবে।"

ইহার পর হীরু যে দিন জাতীয় প্রথানুযায়ী সখীকে সাঙ্গা করিল, সখীর সীঁথায় সিন্দুর ও হাতে নূতন কাচের চুড়ী পরাইয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল, খেলা সে দিন মায়ের সঙ্গে গেল না। সখী সে দিন তাহার দেখাই পাইল না। পাড়ার ছেলেরা বলিল, "সে কায়েতপাড়ার দিকে গিয়েছে, কারও ঘরে থাক্‌বার ঠেরা কত্তে।"

পরদিন সখী খুঁজিয়া খুঁজিয়া খেলাকে কায়েতপাড়া হইতে ধরিয়া আনিল এবং অনেক বুঝাইয়া তাহাকে শান্ত করিল।

মাতার প্রবোধবাক্যে খেলা কতকটা শান্ত হইল বটে, কিন্তু হীরুর ঘরে তাহার মন যেন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না। হীরু যে তাহার সহিত একটুও কঠোর ব্যবহার করিত, তাহা নহে, বরং মিষ্ট কথায় তাহাকে বশীভূত করিতে প্রয়াসী হইত। হীরু তাহাকে ভাল জুলজুড়ে কাপড় কিনিয়া দিল, ছিটের হাতকাটা জামা কিনিয়া আনিল এবং আগামী রথের মেলায় এক জোড়া জুতা আনিয়া দিবে বলিয়া আশ্বাস দিল। এত আদর যত্নেও খেলার মন কিন্তু প্রসন্ন হইল না; হীরুর প্রতি তীব্র বিদ্বেষে তাহার অন্তরটা যেন ভরিয়া রহিল। হীরুর ইচ্ছা খুকীর মত খেলাও তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকে। খেলা কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা পূরণ করিল না। পিতার সৌম্য-শান্ত মুখমণ্ডলের সহিত হীরুর দীর্ঘ শুষ্কশোভিত মুখের তুলনা করিয়া সে কিছুতেই হীরুকে পিতৃসম্বোধন করিতে পারিল না। হীরুর দম্ভাবৎ বিকট মূর্ত্তির দিকে চাহিলেই তাহার শিশুহৃদয় যেন কি এক অব্যক্ত ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া উঠিত।

ছেলে কিছুতেই বশে আসিল না দেখিয়া মা এক এক সময় প্রহার পর্য্যন্ত দিত। হীরু কিন্তু খেলার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিত, "থাক্ থাক্, নেহাৎ ছেলেমানুষ, জ্ঞান-বুদ্ধি হ'লে আর ও রকম করবে না।"

খেলা মাতার প্রহারে তেমন বিচলিত হইত না, কিন্তু হীরুর এই সদয় উক্তি তাহার অন্তরে যেন ছুরিকা বিদ্ধ করিতে থাকিত।

খেলা প্রায়ই ঘরে আসিত না; সমস্ত দিনটা পাড়ায় পাড়ায় খেলিয়া বেড়াইত। হীরু যদি কোন কায করিতে বলিত, তাহা হইলে খেলা তাহার মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিত, "আমি পারবো না।" তাহার এই জবাবে হীরু মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে কিন্তু তাহা প্রকাশ করিত না। সে কিছু না বলিলেও সখী কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। হতভাগা ছেলে,—যে মুখে রক্ত তুলিয়া খাওয়া পরা যোগাইতেছে, তাহার একটা কথাও শুনিবে না? লোকটা ইহাতে মনে করিবে কি? সে মানা না করিলেও সখীকে যে এ জন্য লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। কাযেই সখী খেলার এই স্পষ্ট জবাবে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিত, গালি দিত, মারিতে যাইত। হীরু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিত, "ছেড়ে দে সখী, ছেলে মানুষের কথা নিয়ে এত কাণ্ড করে না।"

সখী রাগে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিত, "ন'বছরের ছেলে, কিসের ছেলেমানুষ গো! ওর বয়সী কত ছেলে পরের ঘরে খেটে খাচ্ছে।"

হীরু বলিত, "তা খাচ্ছে বৈ কি। তবে সব ছেলেই কি সমান হয়? কি জানিস্ সখী, ওকে মারধর করলে পাঁচ জনে আমাকে দোষ দেবে। বলবে, হীরু বাব্বি সখীকে সাঙ্গা ক'রে এনে তার ছেলেটাকে দিনরাত ঠেঙাচ্ছে। তা ছাড়া খেলাও মনে মনে ঘৃণা করবে, আমার বাপ থাকলে এত মার খেতে হ'তো না।"

হাত দুইটা জোরে নাড়িয়া কুঞ্চিতমুখে সখী বলিল, "আরে আমার ঘৃণ্য রে! বাপের মরাই-বাঁধা ধান ছিল। সে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতো ওকে।"

হীরু বলিত, "সে যা খুসী তাই কত্তো, তাতে কোন কথা হ'তো না। কেন না, খেলা তার নিজের ছেলে। কিন্তু আমি যদি মারধর করি, লোক বলবে, পরের ছেলে ব'লে এমনটা কচ্ছে।"

মুখ বাঁকাইয়া সখী বলিল, "জানি গো জানি, পরের ছেলে ব'লেই আস্কারা দিয়ে ওকে জাহান্নমে দিচ্ছো। নিজের ছেলে হ'লে কক্ষনো এত সইতে না, মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দিতে।"

সখীর কথা শুনিয়া হীরু মনে মনে হাসিত। সে বেশ জানিত, সখী মুখে যাহাই বলুক, হীরু তাহার ছেলের গায়ে

হাত তুলিলে সখী তাহাতে কখনই সন্তুষ্ট হইবে না। মেয়েরা নিজে ছেলেকে মারিয়া আধ-মরা করে, কিন্তু অপরে একটা বড় কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে যায়। হীরু ইহা জানিত বলিয়াই খেলার অত্যাচার চুপ করিয়া সহিয়া যাইত; সখীর অসন্তোষের ভয়ে তাহাকে কিছু বলিতে চাহিত না।

২

এক দিন কিন্তু হীরু না বলিয়া থাকিতে পারিল না। সে দিন খেলা সকালে উঠিয়াই হীরুর সম্মুখ দিয়া খেলিতে বাহির হইতেছিল, হীরু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছিস্ রে খেলা?"

খেলা না দাঁড়াইয়াই, হীরুর দিকে না ফিরিয়াই, যেন নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত উত্তর দিল, "কোথায় যাব আবার?"

হীরু বলিল, "কোথাও যাবি না ত যাচ্ছিস্ যে?"

খেলা উত্তর না দিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। হীরু বলিল, "যাস্ না, শোন্।"

খেলা তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। হীরু বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলি যে? শুনে যা।"

খেলা বলিল, "কি বল্‌বে, বল না।"

হীরু বলিল, "কাছে স'রে আয় না।"

মুখ বাঁকাইয়া খেলা বলিল, "কাছে না গেলে বলা হয় না বুঝি?"

খেলার এই স্পর্দ্ধাসূচক উত্তরে হীরু ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী করিল; বলিল, "মাঠে খুব ঘাস হয়েছে। গাইটাকে নিয়ে আমার সাথে চল্।"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া খেলা বলিল, "এখন যেতে পারবো না আমি।"

"কেন যেতে পারবি না?"

"পারবো না বল্‌ছি, তার আবার কেন কি?"

বলিয়া খেলা প্রস্থানোদ্যত হইল। হীরুর আর সহ্য হইল না। সে তামাক খাইতেছিল; হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া গিয়া খেলাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহার কানে একটা পাক দিয়া বলিল, "কৈ, যা দেখি আজ খেলা করতে।"

খেলা রাগে মুখখানাকে লাল করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "যাব না ত তোমাকে ভয় করবো না কি?"

খেলার স্পর্দ্ধা হীরুকে ক্রমেই অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল। সে খেলার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিয়া বলিল, "ভয় করতে হয় কি না হয়, আজ দেখিয়ে দিচ্ছি তোকে।"

পুনরায় এক চড়। মার খাইয়া খেলা কাঁদিল না; তাহার চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে ঘাড় উঁচু করিয়া জ্বলন্তদৃষ্টিতে হীরুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মারলে যে বড়?"

গর্জ্জন করিয়া হীরু বলিল, "মার এখন কি হয়েছে? আজ মেরে তোর একগুঁয়েমি ছাড়িয়ে দেব।"

বলিয়া হীরু পুনরায় এক প্রচণ্ড চড় তুলিল। কিন্তু সে চড় গালে পড়িবার আগেই খেলা লাফ দিয়া একটু দূরে গিয়া পড়িল এবং একটা ইটের টুক্‌রা কুড়াইয়া লইয়া হীরুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া দিল। ইটটা কিন্তু হীরুর মাথায় পড়িল না, বুকে আসিয়া লাগিল। ইট ছুড়িয়া দিয়াই খেলা বেগে দৌড়াইয়া পলাইল। হীরু খানিক তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, কিন্তু তাহাকে তখন ধরা অসাধ্য জ্ঞানে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে ফিরিল।

ঘরে আসিয়া সে সখীকে বলিল, "খেলার আস্পর্দ্ধা বড্ডই বেড়ে উঠেছে সখী, তাকে এবার রীতিমত শাসন না করলেই নয়।"

সখী বলিল, "সে কথা তোমাকে অনেক দিন ধরেই ত ব'লে আস্‌ছি, মাঝি।"

হীরু বলিল, "কিন্তু ওকে শুধু হাতে মেরে কিছু হবে না, তাতে মাস্তে হবে। আজ যদি তুই ওকে খেতে দিস্, তবে তোর—"

সখীর পিতাকে উদ্দেশ করিয়া হীরু একটা কটু দিবা প্রয়োগ করিল। শুনিয়া সখী চমকিয়া উঠিল; বলিল, "একেবারে এত বড় দিব্যেটা দিয়ে ফেল্‌লে, মাঝি।"

হীরু রাগে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "হাঁ, দিলুম। এতেও যদি তুই ওকে ভাত দিস্, তবে বুঝবো, তুই কিন্তু চাড়ালের মেয়েই ন'স্।"

বলিয়া হীরু কোদালটা কাঁধে লইয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল। সখী গালে হাত দিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

৩

হীরু মাঠ হইতে ফিরিবার আগেই খেলা ঘরে আসিয়া মায়ের কাছে গিয়া বলিল, "ক্ষিদে পেয়েছে মা, শীগ্‌গির ভাত দে।"

মরম-গীতিকা

ভাস্কর—শ্রীকিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

সখী বলিল, "যার ভাত, সে না বললে আমি ভাত দিতে পারব না।"

"পারবি না ?"

"না।"

"সে যদি ভাত দিতে না চায় ?"

"না খেয়ে থাকতে হবে তোকে।"

খেলা কিয়ৎক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মাতার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এই বুঝি তুই সাজা করেছিস্ ?"

খেলার উক্তির মর্ম্ম সখী বুঝিতে পারিল। বলিল, "তোদের মানুষ করবার জন্যেই সাজা করেছি, কিন্তু তুই ত কথা শুনলি না।"

রোষ-বিকৃতমুখে খেলা বলিল, "কি কথা শুনতে হবে তোর ? হীরু মাঝিকে বাপ বলতে হবে, তার হুকুম শুনতে হবে, এই ত ?"

সখী বলিল, "যার খেতে হয়, তার হুকুমও শুনতে হয়।"

খেলা বলিল, "শুনতে হয়, তার হুকুম তুই শুনবি। আমি বেন্দা মালিকের ব্যাটা, আমি শুনবো না।"

সখী বলিল, "না শুনলে খেতেও পাবি না।"

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া খেলা বলিল, "খেতে না পাই, শুকিয়ে মরি, তবু হীরু মাঝির হুকুম শুনবো না আমি।"

সখী চুপ করিয়া রহিল। খেলা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাত দিবি না তুই তা হ'লে ?"

"না।"

"দিবি না ?"

"না।"

"আচ্ছা, আর যদি তোর কাছে ভাত চাইতে আসি, তবে আমি বেন্দা মালিকের ব্যাটাই নই।"

কথা শেষ করিয়াই খেলা দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। সখী নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে হীরু ঘাট হইতে ফিরিয়া স্নান-আহার করিয়া তামাক টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিল, "খেলা খেতে আসে নি, সখী ?"

একটু ভারী গলায় সখী উত্তর দিল, "এসেছিল।"

"ভাত খেয়ে গিয়েছে তা হ'লে ?"

"কে তাকে ভাত দিলে যে খাবে ?"

মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা একটু সরাইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সখীর দিকে চাহিয়া হীরু যেন একটু আশ্চর্য্য সহকারে বলিল, "ভাত দিলি না তুই তাকে ?"

সখী বলিল, "তুই শক্ত কিরে দিয়ে গেলি, আমি কি ক'রে ভাত দেব ? আমি কি বাপের বেটী নই ?"

সত্যই ত, হীরু তাহাকে কটু দিবা দিয়া ভাত দিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছে। হীরু পুনরায় হুঁকাটাকে মুখের কাছে আনিয়া নীরবে তাহাতে টান দিতে লাগিল।

৪

হঠাৎ মুখ তুলিয়া হীরু বলিল, "ছেলেটাকে দেখবো না কি ?"

ভারী মুখে ঝঙ্কার দিয়া সখী বলিল, "না, না, দেখে কি হবে ?"

হীরু বলিল, "দেখবো না, খাবে না কিছু সে ?"

উগ্রকণ্ঠে সখী বলিল, "কি খাবে সে শুনি ?"

হীরুর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তাহার উপর রাগেই সখী ছেলেটাকে ডাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। তা সখীর রাগিবারই কথা। হঠাৎ রাগের মাথায় সখীকে কটু দিবা দিয়া হীরু যে অন্যায় কায করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আপনার অন্যায় বুঝিতে পারিয়া হীরু একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, "রাগের মাথায় এমন শক্ত কিরে দেওয়া আমার ভাল হয় নি, সখী। এই জন্যেই লোকে বলে, রাগ না চণ্ডাল। তা চাঁড়ালের রাগ কি না, রাগ হ'লে জ্ঞানগম্যি সব লোপ পেয়ে যায়।"

অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে সখী বলিল, "কিরে দিয়ে এমন মন্দ কাযই বা করেছ কি ? সে যেমন হারামজাদা, তেমনই সাজা হয়েছে তার। খিদের সময় ভাত খেতে এসে ভাত এক মুঠো পেলে না।"

পুত্রের ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখখানা মনে পড়িতেই সখীর চোখে জল আসিল। হীরু হাতের হুঁকাটা পাশে রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, তোকে আর ছুঁয়া করতে হবে না। আমিই কিরে দিয়েছি, আমিই আবার তাকে খুঁজে এনে খাওয়াচ্ছি।"

হীরু পাড়ার ছেলেদের কাছে সন্ধান লইয়া জানিতে

পারিল যে, খেলা তাহাদের পাশের ঘরের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

খেলার পৈতৃক ঘরের চাল বৈশাখের ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছিল। কেবল পশ্চিমের চালটা উড়ে নাই, কতকটা হুমড়ি খাইয়া কাত্ হইয়াছিল। বর্ষার জলে আর তিন দিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চালের আবরণ থাকায় পশ্চিমের দেওয়ালটা তখনও খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খেলা এই দেওয়ালের পাশে কতকটা মাটী পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। যখনই তাহার খুব রাগ বা দুঃখ হইত, তখনই সে এই স্থানটিতে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। এখানে আসিয়া তাহার দুঃখের ভার যেন অনেকটা লঘু হইয়া আসিত, প্রাণের মধ্যে কতকটা স্বস্তি বোধ করিত।

হীরু আসিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল, খেলা সেই ভাঙ্গা ঘরের ভিতর ভাঙ্গা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া হীরু ডাকিল, "খেলা!"

খেলা চমকিতভাবে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। হীরু বলিল, "তুই এখানে ব'সে আছিস্, আমি সারা পাড়াটা তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া রুষ্টস্বরে খেলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খুঁজছো আমাকে?"

হীরু বলিল, "এখনও খাওয়া হয় নি তোর, খুঁজবো না? মাগীর যেমন আক্কেল! ছেলে খেতে গিয়েছে, তাকে ভাত না দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। তুই আমার সঙ্গে আয়!"

মুখ খিঁচাইয়া খেলা উত্তর করিল, "আমি যাব না।"

হীরু তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে ঘরের ভিতর পা দিবার আগেই খেলা তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ঘাড় উঁচু করিয়া সক্রোধ আদেশের স্বরে বলিল, "খবরদার, এ ঘরে পা দিও না তুমি।"

বালকের সেই কঠোর আদেশে হীরু থমকিয়া দাঁড়াইল, খেলা তখন ঘরের অপর পাশ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, এবং হীরু তাহার নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

ইহার পর চারি পাঁচ দিন খেলার আর দেখা পাওয়া গেল না। হীরু সারা গ্রামখানা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহাকে বাহির করিতে পারিল না।

৫

পাঁচ দিন পরে হঠাৎ বেলা দ্বিপ্রহরে সোবরা আসিয়া বলিল, "ও খেলার মা, তোদের খেলা এয়েছে যে।"

সখী লাভিশয় ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এয়েছে? কোথায় রে?"

সোবরা বলিল, "তোদের ভাঙ্গা ঘরে। খুব জ্বর হয়েছে তার, সেখানে গিয়ে বেহুঁস প'ড়ে রয়েছে।"

সখী বুঁধিতেছিল, উনান হইতে হাঁড়িটা নামাইয়া রাখিয়া খেলাকে দেখিতে ছুটিল। সেখানে গিয়া দেখিল, সেই ভাঙ্গা ঘরের এক পাশে কাদার উপর খেলা চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিয়াছে। সখী তাহার মুখের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাকিল, "খেলা,—খেলা!"

দুই তিন ডাকের পর খেলা চোখ মেলিয়া চাহিল। সখী জিজ্ঞাসা করিল, "এদ্দিন কোথায় ছিলি, খেলা?"

আরক্ত চোখ দুইটা দিয়া যেন অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া খেলা বলিল, "বনের ঘরে ছিলুম। যব কিছু নিলে না, এই ঠাঁইটার জন্যে পাঠিয়ে দিলে।"

"বালাই, ষাট!" বলিয়া সখী খেলার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "ও কি অলক্ষুণে কথা কইছিস্, খেলা? তোর হয়েছে কি? কেন তুই আজ ক'দিন পালিয়েছিলি?"

গর্জ্জন করিয়া খেলা বলিল, "কেন? আমি যেন্দা মালিকের ব্যাটা; হীরু মাঝি আমাকে মারলে, তুই ভাত না দিয়ে তাড়িয়ে দিলি। আমার বাবা নেই, তাই আমাকে এত সইতে হ'লো। তাই পাখীগুলোর মত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে গাছের ফল-পাতা খেয়ে গাছে ব'সে দিন কাটিয়েছি।"

সখীর চোখে জল আসিল। খেলা বলিল, "তুই এখানে এসেছিস্, হীরু মাঝি তোকে বকবে না?"

সখী বলিল, "সে এই ক'দিন তোকে কত খুঁজে বেড়িয়েছে। এখন উঠে ঘরে চল্।"

খেলা বলিল, "ঘরেই ত আমি আছি। আর ঘর কোথায়?"

সখী বলিল, "তোর জ্বর হয়েছে। এই জল-কাদায় ভাঙ্গা ঘরে প'ড়ে থাকবি?"

চীৎকার করিয়া খেলা বলিল, "হ্যাঁ থাকবো। এটা আমার বাবার ঘর। তুই হীরু মাঝির ঘরে যা।"

সখী কিছুতেই খেলাকে হীরু মাঝির ঘরে লইয়া যাইতে পারিল না। হীরুও আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু খেলা গেল না। সে এমন কড়া কড়া কথা বলিল যে, তাহা শুনিয়া হীরু সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সখী কিন্তু গেল না; সে ছেলের কাছে বসিয়া রহিল। রাত্রিকালে খেলার জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিল। জ্বরের ঘোরে সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাব না গো যাব না; বাবার ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে সখী বলিল, "তোকে যেতে হবে না খেলা, আমিও আর সেখানে যাব না। গোড়ায় তোর কথা না শুনে বজ্জাতী করেছি আমি। তখন ত জান্‌তুম না, তোর কথা না শুনলে তোকে হারাতে হবে।"

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে খেলার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল, জ্ঞান লোপ পাইল, গলার ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে লাগিল। হীরু একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিলেন, রোগ যতদূর বাড়িবার বাড়িয়া উঠিয়াছে, এখন চেষ্টা বৃথা।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই খেলা তাহার বাপের ঘরের কাদা মাটীর উপর পড়িয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। হীরু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, "একগুঁয়েমী ক'রে ছেলেটা মারা গেল।"

প্রতিবেশীরা বলিল, "একগুঁয়ে হোক, কিন্তু বাপের ব্যাটা বটে!"

ঘাটের বেলা

(বাউলের সুর)

আয় লো আয় মিতিন, বকুল, বকুল, বেলা—
নাইক বেলা রোদ পড়েছে।
জেগে ঘুম ঘুমল কত, আলস এত
(ঐ যে) কলসী পুচু, ভরতে আছে॥

খেমে গেছে পাখীর গীতি,
নিঝুম ক্রমে সজন বীথি,
(ঐ) সামনে আসে আঁধার রাতি—
ঝিল্লী-বাণীর বান্ ডেকেছে॥

আঁধারে ঢাকলো ধরা, আয় লো ত্বরা,
সন্ধ্যা-তারা দেখা যেছে।
দুয়ারে টেনে আগল, আয় রে পাগল—
ঘূর্ণাজলে কূল ছেপেছে॥

শ্রীশিরীন্দ্রমোহিনী

কবি লেখে কেমন ?

১

কবি তার কাব্য লেখে—
বিটপী ফুল ফুটায় যেমন,
ডুবারী সাগর-জলে
মুক্তা তোলে মুঠায় যেমন।

জ্যোতির্বিদ যেমন ধারা
হেরে হায় নূতন তারা,
ধীবর জালের টানে
পুলকে জাল গুটায় যেমন।

২

বরষা যেমন ভাবে
জবার তাহার মেঘের বেলা,
দীঘি তার কমল হেরে
যেমন ধারা হয় উতলা।

প্রিয় তার পাখা বাঁকে
বিলাসী যেমন ভাকে
তৃষিত চকোর কেঁদে
চাঁদকে তাহার উঠায় যেমন।

৩

মৃত্তিকা জিয়ায় যেমন
উপকথার সোনার কাঠী
লোহারে পরশ-পাথর
কনক করে যেমন খাঁটি।

রেশমের কীটগুলি হায়
যেমন তাই তুঁত-পাতা খায়
আপনার পরাণ দিয়ে
সোনার সুতা ফুটায় যেমন।

৪

ফাল্গুনী বাঁধলে যেমন
পরের জালে নীল পারাবার
বাঁধে সে সুরের সেতু
কাল সাগরের এ-পার ও-পার।

পথে শিব আসেন ধীরে
তথে হর বিভূতিরে
সাধক তার আরাধেরি
চরণতলে লুটায় যেমন।

শ্রীযুক্ত [illegible]

ভারতীয় চিত্রকলা

বর্ত্তমানে আমাদের বাঙ্গালা সাময়িক পত্রসমূহে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর-শিল্প এবং আধুনিক ভারতীয় চিত্রকর-দিগের সম্বন্ধে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, কাল-ক্রমী প্রাচীন পদ্ধার ভারতীয় চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে এ যাবৎ কোনও প্রবন্ধই এই সকল সাময়িক পত্রের অঙ্কে স্থানলাভ করে নাই। ইহার কারণ এই যে, প্রধানতঃ আমরা ভাস্কর-শিল্পের দিক্ হইতে মূর্ত্তি অথবা গৃহাদির নির্ম্মাণ ও ক্ষোদিত করিবার বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করি বটে এবং আমরা সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রশিল্পের দিকে আকৃষ্ট হই বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আমাদের প্রাচীন চিত্রশিল্পের বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পের বিষয়ে জ্ঞানলাভে আমাদের উৎসাহ ও আগ্রহের একান্ত অভাব, উহার মর্ম্মও আমরা বুঝি না বা বুঝিবার চেষ্টা করি না। আমাদের লেখকদিগের মধ্যে অনেকে চীনদেশের চিত্রশিল্পের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা দেশের এই প্রাচীন শিল্পের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নহেন। তাই গত পঞ্চশত বৎসরের মধ্যে ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার যে কয়টি প্রধান স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে।

নর্ত্তকী [শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের চিত্র সংগ্রহ]

এই চিত্রে ঠিক যেন এনামেলের মত বর্ণ-বিন্যাস করা রহিয়াছে। নর্ত্তকী চিত্রের রেখাঙ্কনে এবং নৃত্যের হাবভাব ও লাস্যলীলার ভঙ্গীতে শিল্পবৈশিষ্ট্যের অতি চমৎকার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজপুত চিত্রশিল্পের মধ্যে ইহা একখানি অমূল্য সম্পদ।

প্রথমেই সংক্ষেপে ভারতীয় চিত্রবিদ্যার প্রারম্ভ আলোচনা করা যাউক। অতি প্রাচীন কালে ভারতে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শ্রেষ্ঠ শিল্প বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থে চিত্র ও চিত্রশালার বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায়,

সেই প্রাচীন যুগেও ভারতবাসী চিত্রবিদ্যায় কিরূপ অনুরাগী ছিল। পর্ব্বতগাত্রে এবং গুহামধ্যে এক শ্রেণীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; উহা বস্তুতঃই চিত্রবিদ্যার প্রথমাবস্থার যুগে অঙ্কিত। তৎপরে বৌদ্ধ-যুগের অজন্তা গুহা-মন্দিরের পাষাণপ্রাচীরাঙ্কিত বিখ্যাত চিত্রসমূহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ঐ সকল চিত্র খৃষ্টজন্মের প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে অঙ্কিত বলিয়া কথিত আছে। তবে ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, উহার মধ্যে কতকগুলি উক্ত যুগের পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়াছে। এই সকল চিত্রের সুন্দর রেখাপাত এবং মনোহর বর্ণসমাবেশ ইহাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

অজন্তার পরেই বাগ গুহার পাষাণপ্রাচীরাঙ্কিত চিত্রসমূহ উল্লেখযোগ্য। ইহার অঙ্কনের ধারা ও পদ্ধতি অজন্তারই অনুরূপ। মাদ্রাজ বিভাগের পুডুকোটাই নামক স্থানের সান্নিধ্যে সিত্তনবশাল গুহার পাষাণাঙ্কিত চিত্রসমূহের অঙ্কনের ধারা ও ধর্ম্ম কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন; উহা জৈন, বৌদ্ধ নহে। ইলোরার গুহা মন্দিরের পাষাণপ্রাচীরাঙ্কিত চিত্রসমূহ হিন্দু দেবদেবীর, উহার অঙ্কনের ধারা গ্রাম্য শিল্পের (folk art) অনুযায়ী, উহা অজন্তার মহান্ ভাবধারা হইতে বিভিন্ন, তবে উহার মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় অজন্তার চিত্রাঙ্কনের ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হইয়াছে।

গুহাচিত্রের যুগের পর হস্তলিখিত পুথিতে অঙ্কিত আলোচিত বিষয়ের ব্যাখ্যা চিত্রের যুগ। প্রথমেই বঙ্গদেশের বৌদ্ধ পুথিচিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশেরও এক দিন চিত্রাঙ্কনের সৌরবময় যুগ গিয়াছে। তাহার পর নেপালের তালপত্রে লিখিত পুথিচিত্রের কথা উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল পুথিতে বৌদ্ধ দেবদেবীর অতি ক্ষুদ্রাকৃতি অথচ অতীব সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে। বঙ্গের পুথিচিত্র পাল সম্রাট্-দিগের আমলের। বৌদ্ধ পুথিচিত্রের পর জৈন পুথি-চিত্রেরও খ্যাতি আছে, উহার অঙ্কনপ্রণালী বৌদ্ধপুথির অঙ্কনপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে যেগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বলিয়া মনে হয়, তাহাদের অঙ্কন-ক্ষেত্রের বর্ণ-বিন্যাস গভীর রক্তরাগ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, আর পরবর্ত্তী যুগের অঙ্কন-ক্ষেত্রের বর্ণ-বিন্যাস পীত অথবা নীলবর্ণ দ্বারা সম্পাদিত। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের আলেখ্যে অর্পিত নরনারীর মুখ ও পরিচ্ছদাদি কোনও বর্ণ দ্বারা অঙ্কিত নহে, ঐগুলি সোণালী রঙ্গে অঙ্কিত। দীর্ঘ আকর্ণবিস্তৃত নয়ন এই সকল অঙ্কনের বৈশিষ্ট্য। চিত্রে নয়নগুলি এরূপ দীর্ঘ ভাবে অঙ্কিত যে, দেখিলে মনে হয় যেন মূর্ত্তিগুলি চাহুকর চশমা পরিধান করিয়া রহিয়াছে। আমার চিত্রশালায় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কল্পসূত্র ও কালকাচার্য্য-কথার পুথিচিত্র এবং অন্যান্য জৈন পুথিচিত্র সংগৃহীত আছে। এগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; কিন্তু শিল্পকলার দিক্ দিয়া সমালোচনা করিলে বলিতে হয়, জৈনচিত্র বৌদ্ধচিত্রের ন্যায় চিত্তাকর্ষক নহে।

এই সকল জৈন-ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রকরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য চিত্রশিল্পেরও গঠন হইতেছিল। এই শ্রেণীর চিত্রের মধ্যে ঐহিক বিষয় সংক্রান্ত পটচিত্র ও অন্যান্য প্রকার চিত্রাবলী ও পুথির চিত্র উল্লেখযোগ্য। এই গ্রাম্য চিত্রশিল্প হইতেই রাজপুত চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ। রাজপুতানার রাজন্যগণের বদান্যতায় এবং উৎসাহের ফলে এই শিল্পের জন্ম ও পুষ্টি হইয়াছিল। বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে রাজপুত রাজন্যরা মোগল দরবারের সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। তাহার প্রভাব রাজপুত চিত্রশিল্পের উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে; কেন না, রাজপুত চিত্রশিল্পের উপর মোগল চিত্রশিল্পের প্রভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে মোগল চিত্রশিল্পের স্বরূপ বর্ণনা করা যাউক। মোগলরা যখন এ দেশে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের সহিত কয় জন চিত্রশিল্পীকেও আনয়ন

করিয়াছিলেন। বাবর তাঁহার আত্মজীবনকথায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি চিত্রাঙ্কন করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে চিত্রের প্রতি এই পক্ষপাতিতা সংক্রামিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে আকবরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিত্রপ্রিয় ছিলেন। তিনি চিত্রকরদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন ও সাহায্য করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রাজত্বকালেই মোগল চিত্রশিল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার চিত্রকরগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, তবে কয়েকজন সুদক্ষ মুসলমান চিত্রশিল্পীও যে ছিলেন না—এমন নহে। মুসলমান চিত্রকরগণ পারস্য, বক্ষোলিয়া ও তাতার দেশ হইতে আনীত। হিন্দুদিগকে মোগল-চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুরাও অতি চতুর শিক্ষানবীশ ছিলেন। ফলে পরিণাম অতি চমকপ্রদই হইয়াছিল! শীঘ্রই হিন্দুরা মোগল-চিত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া ভারত হইতে বিদেশী—বিশেষতঃ পারসীক চিত্রবিদ্যার প্রণালী বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ভারতীয় ও মোগল চিত্রাঙ্কনের প্রণালীর সংমিশ্রণে এক অভিনব বিশিষ্ট প্রণালীর আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন। মোগল চিত্রশিল্প বস্তুতন্ত্রোপাসক, সুতরাং ইহাতে মানুষ ও জিনিষের প্রকৃত স্বরূপ অঙ্কনের প্রথাই গৃহীত হইয়াছিল।

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোগল চিত্রশিল্পের বস্তুতন্ত্রতা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বাদশাহ শাজাহানের আমলেও নিপুণ শিল্পীরা যদিও ইহার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি পরবর্ত্তী মোগল আমলে মোগল চিত্রশিল্পের অবনতি ঘটিতে আরম্ভ হইল। যাহা হউক, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল চিত্রশিল্পের প্রণালীর অনুযায়ী বহু চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদেশী চিত্রশিল্পী ও চিত্র এত অধিক সংখ্যায় ভারতে আমদানী হইতে আরম্ভ হইল যে, মোগল চিত্রশিল্পের অনাদর হইতে লাগিল।

এই সময়ে রাজপুত চিত্রশিল্পের—বিশেষতঃ কাংড়া ও গাড়োয়ালের চিত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্য তখন ধ্বংসোন্মুখ। এইরূপে নানা কারণে প্রাচীন চিত্রশিল্প ধ্বংসের পথে ধাবিত হইল। দিল্লীর মোগল দরবারের এই মোগল চিত্রশিল্প 'দিল্লী কলম' নামে পরিচিত। ইহার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা ও মুরশিদাবাদে ইহা হইতে নিকৃষ্ট প্রাদেশিক চিত্রশিল্প খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে হায়দরাবাদের চিত্রশিল্পই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের চিত্রশিল্পজাত চিত্রের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; পরন্তু লক্ষ্ণৌয়ের চিত্রশিল্প সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়া ছিল। কিন্তু এ সমস্ত চিত্রশিল্প মোগল চিত্রশিল্পের শিল্পসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমোক্ত শিল্পের এই সকল প্রাদেশিক চিত্রশিল্পের অঙ্কন-পদ্ধতি নিকৃষ্ট এবং বর্ণবিন্যাসদূষিত ও উজ্জ্বল বর্ণের অসামঞ্জস্য তাহাতে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মোগল দরবারের বাঁধাধরা কঠিন ব্যবহারিক আদবকায়দার অনুযায়ী করিয়া মোগল চিত্রশিল্পীকে নরনারীর চিত্র অঙ্কিত করিতে হইত। কিন্তু রাজপুত চিত্রশিল্পী কল্পনার সাহায্যে সুন্দর কাব্যের জীবন-চিত্র অঙ্কিত করিত—সে চিত্রগুলি যেন সজীব গীতিকাব্যেরই মত অনুভবযোগ্য। উহাতে ভাবের সুন্দর অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিত। প্রধানতঃ পুরাণে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের পবিত্র প্রেমলীলা হইতে প্রেরণা লইয়া চিত্রগুলি অঙ্কিত। এতদ্ব্যতীত উভয় শিল্পের মধ্যে স্বভাবগত পরিভাষার পার্থক্য ছিল, সেই পার্থক্য বিশেষজ্ঞ ব্যতীত কাহারও লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য নাই। রাজপুত চিত্রশিল্পের নামে অনেক চিত্রশিল্প কাটিয়া যায়, কিন্তু সেগুলি প্রকৃত রাজপুত চিত্রশিল্প

গানের শেষ [শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের চিত্র-সংগ্রহ

"গানের শেষ" বাড়ো চিত্র শিল্পের আর একখানি নমুনা। এই চিত্রের ক্ষেত্রভূমি অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্তাভ আভায় আলোকিত। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যেন গানও আপনি শেষ হইয়া আসিতেছে, গায়ক মৃদু করতালির সহিত গানের শেষ মূর্চ্ছনার কম্পনে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। সমস্ত চিত্রখানির মধ্য দিয়া যেন সুরের আচ্ছন্নতা ও সান্দ্রতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চিত্রের মধ্য দিয়া এই শোভন ভাব ফুটাইয়া তুলার মূল্য নাই বলিলেই হয়।

পরীক্ষিতের ভাগবত-কথা শ্রবণ [শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের চিত্র-সংগ্রহ

"পরীক্ষিতের ভাগবত-কথা শ্রবণ" চিত্রে মোগল চিত্রশিল্পের বিশিষ্ট পারিভাষিক উৎকর্ষ অনুসৃত হইয়াছে। এই চিত্র খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ভাগবতের পুথির অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন করিতেছে। অন্যান্য ভাগবত পুথির চিত্রে বিষয়-নির্ব্বাচনে ও সম্পাদনে রাজপুত-প্রথা অনুসৃত হইয়াছে। এই চিত্রখানির বর্ণবিন্যাস অসাধারণ উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত;

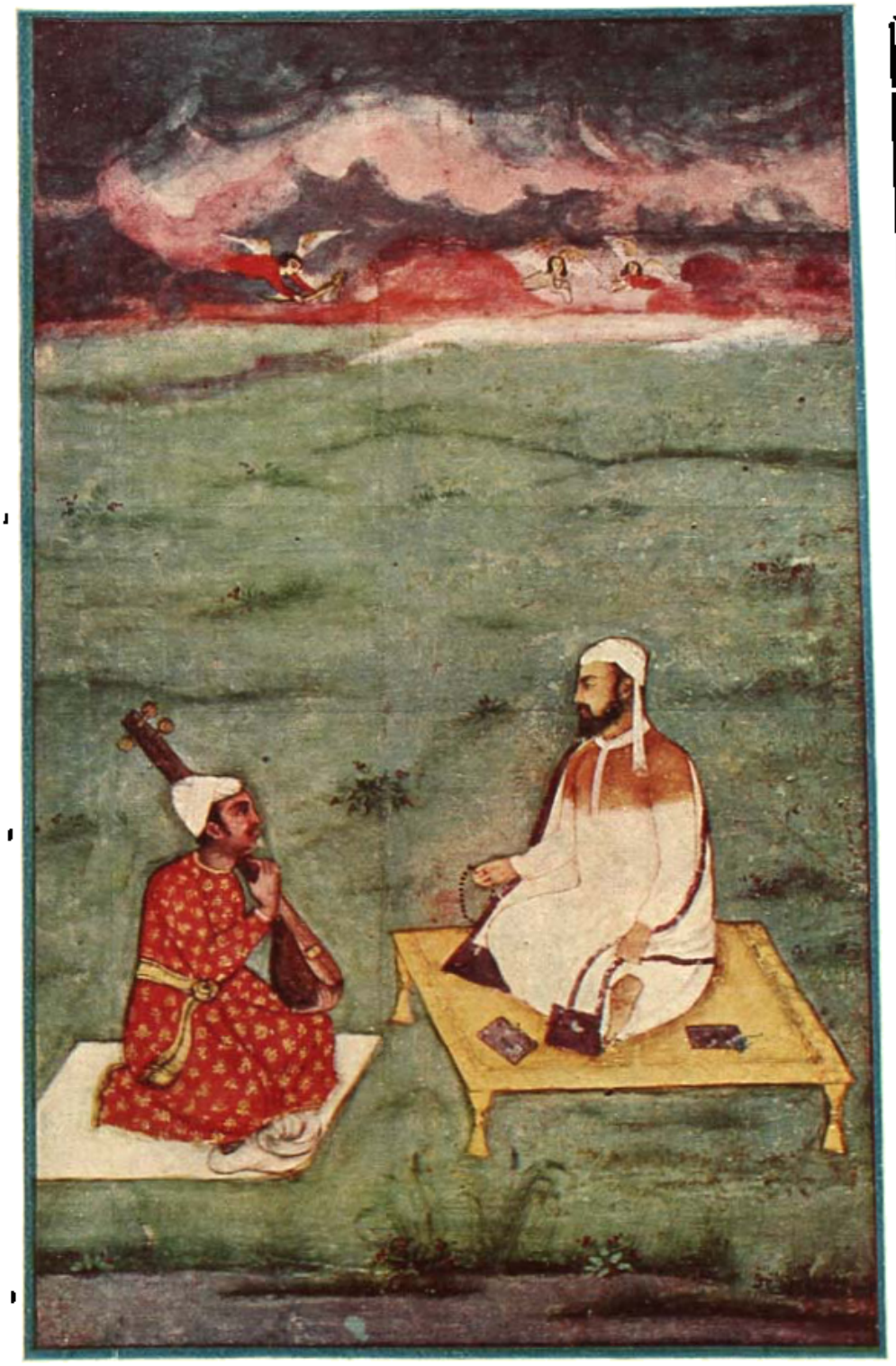

গায়ক তানসেন ও তাঁহার গুরু

[শ্রীযুত অজিত ঘোষের চিত্র-সংগ্রহ]

"গায়ক তানসেন ও তাঁহার গুরু সালামৎ খাঁ" মোগল চিত্রশিল্পের একখানি শ্রেষ্ঠ নমুনা। ইহাতে ভাবের অভিব্যক্তি সুন্দররূপে সূচিত হইয়াছে। এই চিত্রে যে কল্পনা ও মানুষিকতা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সচরাচর মোগল চিত্রে পরিদৃষ্ট হয় না, বরং রাজপুত চিত্রে উহা বহুলাংশে পরিলক্ষিত হয়। চিত্রে তানসেনকে এমন সুন্দররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন তানসেন গান গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন; দেবদূতরা পর্য্যন্ত যেন তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন; আর যে ভগবৎ প্রেরণা তাঁহার অন্তরে গানের অনুভূতি জাগাইয়া দিয়াছে, তাহারই পবিত্র আলোকে তাঁহার মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সালামতের কঠিন গুরুমন্ত্রণা গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে তাঁহার ছাত্রের জন্য গর্ব্বানুভবের ভাব মুখমণ্ডল আলোকিত করিয়াছে।

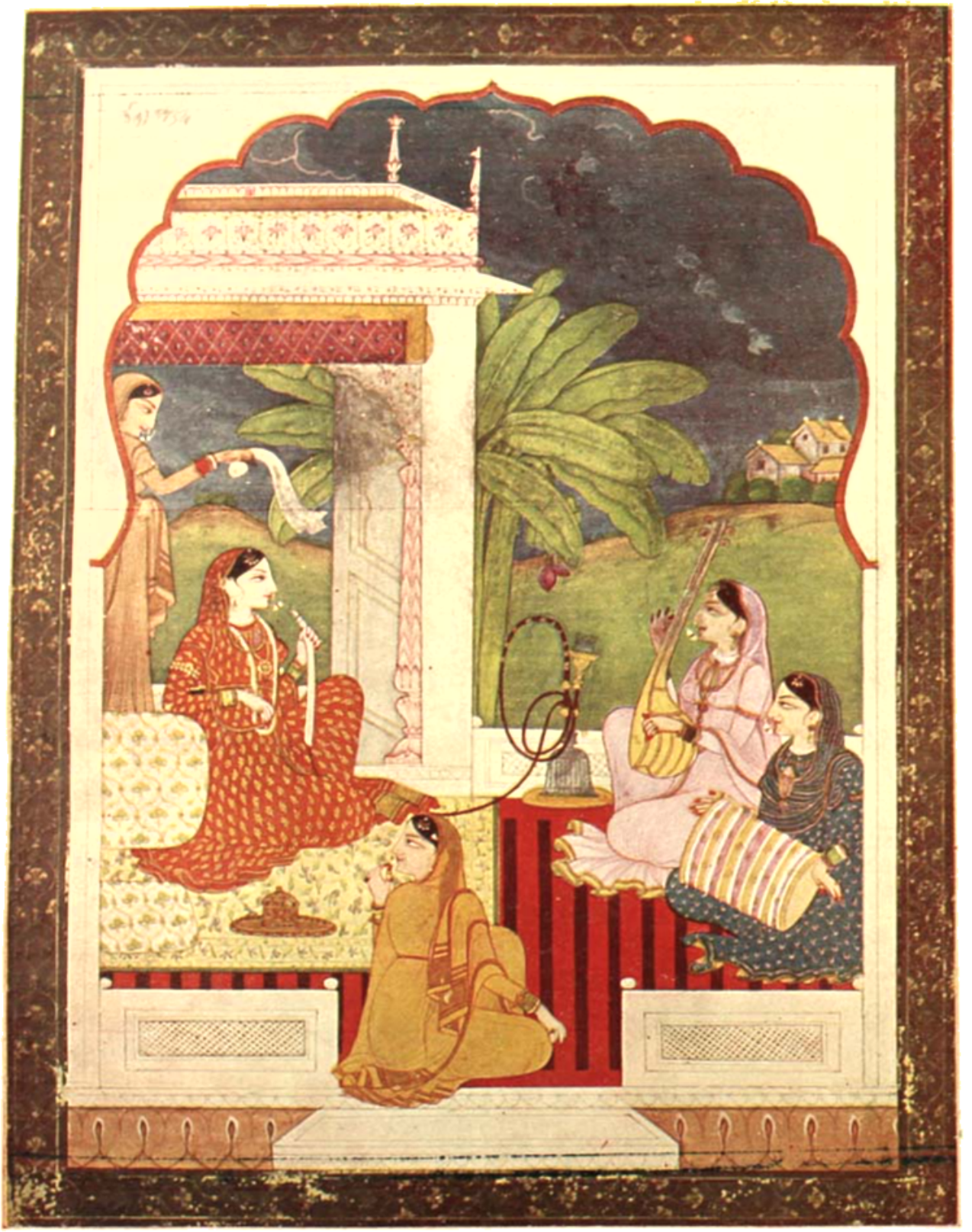

গুলারের মহারাণী মণ্ডলিয়া [শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের চিত্র-সংগ্রহ]

কাংড়া চিত্রশিল্পের একখানি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার পশ্চাদ্ভাগে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, উহার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা সামান্য নহে। এই চিত্র যে গুলারের রাণী মণ্ডলিয়ার প্রকৃত প্রতিকৃতি, ইহা ঐ লিপি হইতে জানা যায়। গুলার রাজ্যে কাংড়া চিত্রশিল্পের প্রথায় বহু উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কাংড়ার রাজারা চিরকাল চিত্রশিল্পীর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নানারূপে উহাদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেন। বর্ষণোন্মুখ মেঘ ও উড্ডীয়মান হংসশ্রেণি এই চিত্তাকর্ষক চিত্রকে কবিত্ব ও গানের ঝঙ্কারে মুখরিত

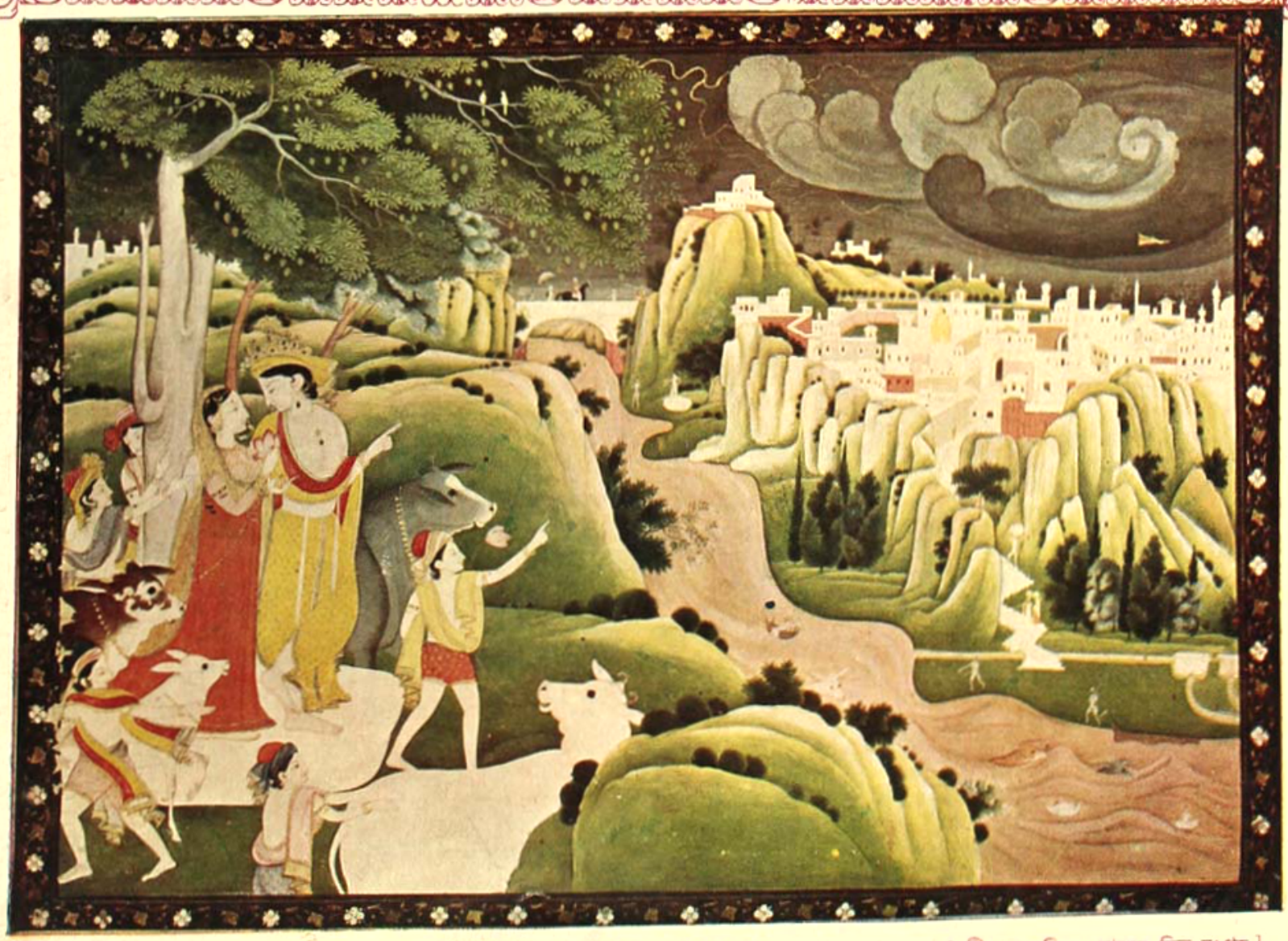

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা—পার্ব্বত্য চিত্র [শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের চিত্র-সংগ্রহ]

পার্ব্বত্য চিত্রশিল্প সম্পূর্ণরূপে প্রণালীবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যখন উহা পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে এই "বর্ষণোন্মুখ মেঘ" অঙ্কিত হইয়াছিল ; পার্ব্বত্য চিত্রশিল্পের চরমোৎকর্ষের ইহা প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যাঁহারা হিমালয়ের এই সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর চিত্রের স্থানীয় সুন্দর বর্ণবিন্যাস-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ ও রাখালবালকগণের অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলিতে উপন্যাসের চমৎকারিতা—সজীবতা বিদ্যমান।

রসমঞ্জরীর চিত্র—বাশোলী-চিত্র নিদর্শন [শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের চিত্র-সংগ্রহ]

বাশোলী চিত্রশিল্পের যে নমুনা এই স্থানে প্রদত্ত হইল, উহা প্রাচীন বাশোলী চিত্রশিল্পের একখানি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কেবল চিত্রের নায়কের মস্তকে যে শিরস্ত্রাণ প্রদত্ত হইয়াছে, উহাতে বৈদেশিক চিত্রশিল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রের নারীমূর্তিগুলি বাঁধাধরা নিয়মের অনুযায়ী করিয়া চিত্রিত হইলেও দেখিতে চিত্তাকর্ষক, বিশেষতঃ নারীর কেশদাম এবং সূক্ষ্ম পরিধেয়গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। এই স্থানে যে বাশোলী চিত্রখানি প্রদত্ত হইল, ঐখানি সম্ভবতঃ ভানুদত্তের "রসমঞ্জরী"র রচনা বুঝাইবার জন্য অঙ্কিত হইয়াছিল।

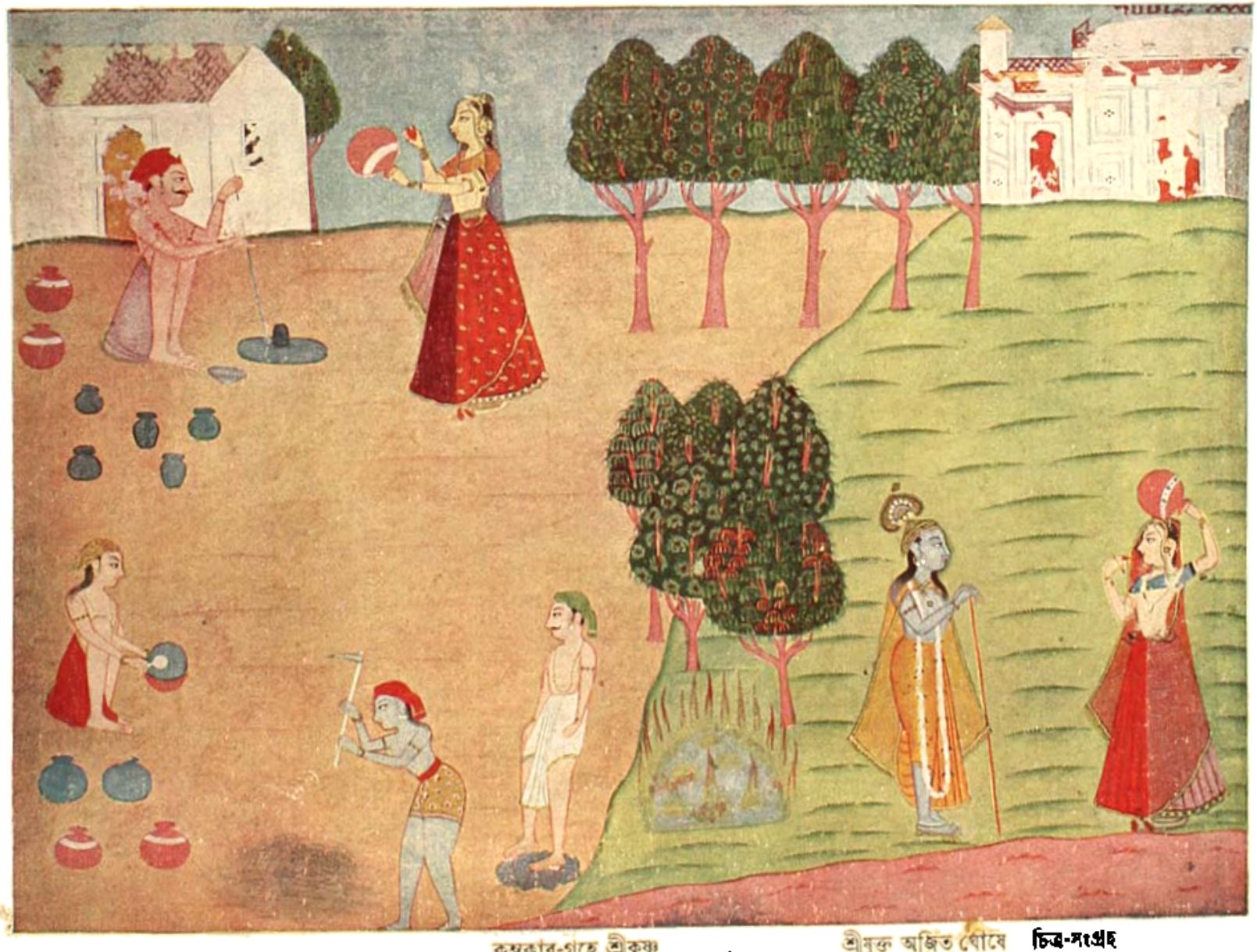

কুম্ভকার-গৃহে শ্রীকৃষ্ণ — শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের চিত্র-সংগ্রহ

প্রাচীন রাজপুত কলাবিদ্যার আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শিল্পী ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলার একাংশ এমন কৌশলে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, ঐগুলি পর পর আলোচনা করিলে একটি পূর্ণাবয়ব গল্প পাওয়া যায়। ইহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর রাজপুত চিত্রশিল্পের অতি চমৎকার নিদর্শন।

নহে। ইহাদের মধ্যে পার্ব্বত্য চিত্রশিল্পের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্ব্বত্য বা হিমালয়ক চিত্রশিল্প তিনটি পরস্পর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,—(১) কাংড়া, (২) বাশোলী এবং (৩) গাড়োয়াল। আবার চাম্বার বেঙ্গিত-রাজ্যের চিত্রশিল্প এইগুলি হইতে পৃথক্, ইহা পাঞ্জাবের শিখ চিত্রশিল্পেরই অনুরূপ। মহারাজা রণজিৎ সিংহের আমলে লাহোর ও অমৃতসর সহরে শিখশিল্প চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এখনও কাংড়া উপত্যকার "কাংড়া কি কলম" নামে চিত্রশিল্পের নাম প্রচলিত আছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রাচীন "কাংড়া কি কলম" আধুনিক নহে। ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দের কাংড়া ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে যে, থর্ণটন কিপলিং লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সময়েও উক্ত নামে প্রচলিত শিল্প কাংড়ায় বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু উহা প্রকৃত প্রাচীন 'কাংড়া কি কলম' নহে, উহার ছায়া মাত্র। সুতরাং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাংড়ায় 'কাংড়া কি কলম' চিত্রশিল্প প্রচলিত ছিল, এ কথা সত্য নহে। ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বেই কাংড়ার শিল্পীদিগের চিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। অবশ্য তখনও দুই এক জন চিত্রকর কাংড়ায় বিদ্যমান ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রাচীন 'কাংড়া কি কলমের' চিত্রকরগণের অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

বর্ত্তমান কালে উচ্চাঙ্গের চিত্রশিল্পীরাও পরস্পর বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা গোপন করিয়া থাকেন; কেহ কেহ নিজ অহঙ্কারে স্বয়ং স্ফীত করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীনকালের চিত্রশিল্পের সেই গৌরবময় যুগে চিত্রশিল্পীরা শত শত ক্রোশের ব্যবধানে বসবাস করিলেও একই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইতেন। সে প্রেরণা বর্ত্তমানের মত বহুদূরস্থ জাপান, ফ্রান্স বা ইংলণ্ড হইতে আসিত না, এই ভারতেরই সজীব সতেজ আত্মা হইতে আসিত। ভারতের গভীর ধর্ম্মগত জীবন, ভারতের বেদপুরাণের সুন্দর মনোহর গল্পেতিহাস এবং ভারতের অমর কাব্যসমূহ সেই প্রেরণার উৎস ছিল। প্রাচীন চিত্রশিল্পীরা সমসাময়িক জীবনযাত্রা ও চিন্তার ধারা দ্বারা প্রভাবিত হইতেন, পরন্তু নিজের কল্পনা ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্যও চিত্রের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতেন।

সে দিন এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বর্ত্তমানে ভারতে চারি শ্রেণীর চিত্রশিল্প বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে মোগল ও রাজপুত চিত্রশিল্প অন্যতম। ইহা কখনই সত্য কথা নহে। সমগ্র রাজপুতানা ও পাঞ্জাবে ভ্রমণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রাচীন মোগল বা রাজপুত চিত্রশিল্প জীবিত নাই। বর্ত্তমানে ঐ দুই প্রদেশে যে চিত্রশিল্প বিদ্যমান, উহা 'পাচ-নিশালী' অথবা প্রাসাদশিল্পের শেষ স্মৃতিমাত্র, কিন্তু উহা মোগল ও রাজপুত শিল্প হইতে বহুলাংশে বিভিন্ন।

শ্রী অজিত ঘোষ।

তিনটি দৃশ্য

১

কর্ণবেধের নিমন্ত্রণ! সহরতে ভৈরবীর আলাপ শুনিতে শুনিতে দালানে উঠিলাম; উঠিয়া দেখিলাম, মেঝেতে কলা-তলায় বসাইয়া এক জন রমণী তাহার কাণ বিঁধিতেছেন; অন্য সকলে তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উৎসবের দিনে এরূপ চুপচাপে কার্য্য সম্পন্ন কিছু নূতন বলিয়া ঠেকিল। মেয়েটি অষ্ট বৎসরের হইবে। তাহার ক্ষুদ্র মুখে প্রকাণ্ড গাম্ভীর্য্য। কাণ বিঁধান হইয়া গেলে রমণী যখন মাকড়ী দুইটা কাণের এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও মেয়ে টুঁ শব্দ করিল না। কন্যার মাতা এতক্ষণ একটু আড়ালে ছিলেন, নাপিত আসিয়া রমণীর পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া মাকড়ীর আঁকড়া দুইটা আটকাইয়া দিবার পর তিনি আসিয়া মমতাপূর্ণ চিত্তে মেয়ের কাণে জল দিতে লাগিলেন। মেয়ের চোখ দিয়া তখনও এক ফোঁটা জল পড়িল না। সে বীর-নারীর ন্যায় ধীর, মৌনভাবে সময়োচিত গুরুত্ব রক্ষা করিল। ইহার পর হুলুধ্বনি বাদ্যধ্বনির মধ্যে মাতা তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া মাথায় মুকুট পরাইয়া বরণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার কচি মুখে যে প্রফুল্লভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহার মধ্যেও কিন্তু মেঘ-ঢাকা রক্তের মত প্রচ্ছন্ন আত্মসম্মানের মস্ত একটা আভাস পাওয়া যাইতেছিল। দেখিয়া মনে হইল, মুকুট ধারণের দিন কুইন্ ভিক্টোরিয়াও বুঝি এ হেন তেজোদৃপ্ত ভাব ধারণ করিতে পারেন নাই।

আমার মনে পড়িয়া গেল, বন্ধুবর মিত্র মহাশয়ের কথা। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তাজ্জব কি, তিনি অসঙ্কোচে বলিয়া উঠেন, "বাঙ্গালীর মেয়ে। এই দেখ না, এক জন কুলবধূ—সাত চড়ে যার মুখে রা বাহির হয় না, আধ হাত ঘোমটা টানিয়া ষ্টেশনের পথে চলিতে চলিতে যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে পথ হারাইয়া বসেন, স্বামী বিলাত হইতে ফিরিতে না ফিরিতে তাঁহার পূর্ব্বের এত লজ্জা-সরম চলিয়া গেল কোথায়? তিনি এখন পরিপূর্ণ মেমসাহেব। স্বামীকে পাশে বসাইয়া নিজে টমটম্ হাঁকাইয়া চলেন; ইংরাজী বোলচালে ডিক্রীধারী পুরুষকেও হারাইয়া দেন।

"কেবল বালিকা বধূ কেন, সে দিন দেখিলাম, পঞ্চাশ বছরের এক বর্ষীয়সী, শিবপূজা না করিয়া যিনি জল গ্রহণ করিতেন না, মেম দেখিলে অস্পৃশ্য বস্তু বিবেচনায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আট হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন, আজ তিনি অসঙ্কোচে স্বামীর সহিত বিলাতযাত্রা করিলেন। পূজা ছাড়িলেন, গাউন ধরিলেন, টেবলে বসিয়া খানা খাইতে সুরু করিয়া দিলেন। ইহাকে তাজ্জব ব্যাপার বলিব না ত কি?"

মিত্র মহাশয়ের সেই কথা আজ আমার নেহাৎ বেঠিক বলিয়া মনে হইল না। এমন ছোট মুখে এত বড় গুরু-গম্ভীর ভাব অন্য কোনও দেশে কেহ দেখিয়াছে কি?

* * *

মেয়েটির নাম ধনিষ্ঠা। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, গণৎকার তাহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। মাতা ও দিদিমা'র ইহাতে গর্ব্বের সীমা রহিল না। দিদিমা ভাবিলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছেন। মাতা কল্পনার মানসপটে রাজপুত্র জামাতার ছবি আঁকিতে লাগিলেন। কন্যা দুগ্ধ পান করিতে করিতে যখন তখন অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে 'দেয়ালা' করিয়া হাসিয়া উঠে,

আবার পরক্ষণেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে, মাতা ইহাতে ভীত হইয়া স্বামীকে এই কথা জানাইলেন। স্বামী স্বল্পবেতনের কেরাণী। বাড়ীর মধ্যে কেবল তাঁহারই কন্যা-লাভের আনন্দে মস্তিষ্ক বিকল হয় নাই। বরঞ্চ বিপরীত। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কন্যা পার করিবার চিন্তা-তেই বিব্রত—এমন কি, সৈকত টিটাখানির দিকে চাহিয়া যখন তখন তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। হায় রে! সবে ধন নীলমণি এই সম্পত্তিটুকু কন্যাদায়ে কোন্ দিন না বাঁধা পড়িয়া যায়। স্ত্রীর কথায় বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া দ্রুত-পদে তিনি আফিসে চলিয়া গেলেন। আমি সখীর মর্ম্মবেদনা শুনিয়া পাশের ঠাকুরকে ডাকাইয়া স্বস্ত্যয়নের পরামর্শ দিলাম। সুফল ফলিল—মাতার কল্পনা সফল হইল। ১২ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে বংশীপুরের রাজবংশীয় জমীদারপুত্রের সহিত ধনিষ্ঠার সম্বন্ধ হইল। পিতা অগাধ ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাঁহারা টাকা চাহেন না, কুল করিবার অভি-প্রায়ে বিনা পণে শুধু মেয়েটি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

ইনি রাজপুত্র না হইলেও রাজভ্রাতার পুত্র—তাঁহার নিজ বাড়ীতে চাকররা তাঁহাকে 'কুমার' বলিয়াই ডাকে; সুতরাং শ্বশুরবাড়ীর লোকরা যে গর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে রাজা জামাই বলিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

আমরা থাকি বাঁকীপুরে। আমার স্বামী তথাকার প্রোফেসর। কর্ণবেধের ৩ বৎসর পরে আমার ধনিষ্ঠার বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইলাম। স্বামী আসিতে পারিলেন না; আমি আহারাদি শেষ করিয়া ছেলে-মেয়ে সঙ্গে লইয়া ট্রেণে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ও মা, গাড়ীতে উঠিবার সময় শুনি, আমার আদরে গোপালী বসুন্ধরী দাসীটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সে এই দেশেরই লোক, দেশ শুদ্ধ তাহার দাদাশ্বশুর সাম্রাজ্ঞী; বুঝিলাম, তাহাদের নিকট বিদায় লইতে গিয়া চোখের জলের আঁধারে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে আমার পেয়ারের দাসী। তাহাকে ছাড়িয়া এক পা চলিতে আমি নারাজ; সুতরাং পোটলা-পুটলী গাড়ীতে উঠাইবার পর "তোজিয়া কাঁহা রে, তোজিয়া কাঁহা" এইরূপ একটা হৈ-চৈ রব পড়িয়া গেল। ইহার প্রায় আড়াই ১৫ মিনিট পরে আদরে গরবে হেলিতে দুলিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তোজিয়া আসিয়া দেখা দিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীতে উঠিয়া আমার পদতলে বসিল। আমি তখন এতক্ষণকার জমা রাগের ঝাল তাহার উপর বর্ষণ করিতে লাগিলাম, সে কিন্তু কথাটি না কহিয়া মৌনভাবে আমার পা টিপিতে লাগিল। বকুনীতে কখনও সে কথা কহে না, এই গুণেই আমি তাহার বশ।

দ্রুতবেগে ধাবমান গাড়ী চালাইয়াও যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারিল না, ফলে ট্রেণ মিস করিলাম। সুতরাং আমার ভাগ্যে বিবাহ দেখা আর ঘটিল না। পরদিন রওনা হইয়া বাসিবিবাহের দিন বিবাহ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

২

"এমন জাঁকজমক কখন দেখি নাই—কখনও দেখিব না! কি সে দুই ধারে বাঁধা রোশনাই—কিবা যন্ত্রসঙ্গীত উপর নাচ-গান—কি সে শোভাযাত্রা—কত বা প্রাণ-মাতান গন্ধের বাহার। বরসজ্জাই বা কি অপরূপ! চতুর্দ্দোলার উপর রাজপোষাক-পরা মণিমাণিক্যে মোড়া বর—দেখিলে যদি যদি চোখ আর ফিরান যায় না! "দিদিমণির কি জোর বরাত গা!" দেউড়ীতে ঢুকিতে না ঢুকিতে এইরূপ বর্ণনা আমার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতে লাগিল—আর আপশোষে আমার প্রাণ যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়—হায়! এমন ঘটার বিবাহ কি না আমি দেখিতে পাইলাম না। মনে মনে তোজিয়াকে অভিসম্পাত করিতে করিতে উপরে উঠিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া কিন্তু বর-দর্শনে এই আপশোষের জ্বালা ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। বরের বর্ণ যদিও একটু মলিন, কিন্তু মুখশ্রী প্রিয়দর্শন এবং রাজপুত্রের মত পোষাকে, হীরা-মুক্তার আভরণে সাজিয়া তাহাকে রূপকথার রাজপুত্রের মতই দেখাইতেছিল। বর-কন্যাকে মসলন্দের আসনে বসাইয়া মেয়েরা তখন তাহাদিগকে তাড় খেলাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে রসিক-তার ফোয়ারা ছুটিতেছিল। এক জন রসিকা গান করিতেছিলেন:—

"রসিক জামাই বটে দিদি রসিক জামাই বটে।
বাণ মদনেই মুক্ত করেন
হার মেনে যায় নটে।
হায় রে, হায় মেনে যায় নটে।

শুনলে তাহার রসের কথা,
বুকে বাজে শেলের ব্যথা,
গানের তানে কুত্তা কাঁদে শিয়াল বনে ছোটে ॥
গাধার বাচ্ছা খোস মেজাজে,
লাফিয়ে ওঠে পথের মাঝে,
ব্রজক ওঁপোর দেহ কুঁপো কাদার উপর লোটে।
দাবাস জামাই বলিহারি রঙমহালে রটে ॥"

আমি পাশে দাঁড়াইয়া আনন্দিতচিত্তে এই সকল দেখিতেছিলাম, এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া বলিল, "ওগো, রাজবাড়ী থেকে কুমার বাহাদুর ও বৌরাণী এসেছেন, দিদিমণিকে নিতে।" ইহা শুনিয়া ধনিষ্ঠার মাতার সহিত আমিও দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলাম। ধনিষ্ঠার পিতা তখন কুমার বাহাদুরকে গাড়ী হইতে নামাইয়া উপরে লইয়া গেলেন, আর লাল ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কীখানি অন্দরের উঠানে আসিয়া নামিল। সঙ্গের আশাসোটাধারী পেয়াদা দুই জন দাসীকে পাল্কীর নিকটে রাখিয়া সরিয়া গেল। আমরা বৌরাণীকে সসম্ভ্রমে হাত ধরিয়া উপরে লইয়া আসিলাম। দাসী দুই জনের মধ্যে এক জনের হাতে জরীর কালাবুক পাখা ও সোনার পানের বাটা। অন্য জনের হাতে দুইটা হাতীর দাঁতের বাক্স। বৌরাণী ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বর রেহাই পাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আমরা ক'নেকে ঘিরিয়া বসিয়া তাহার আভরণ-সজ্জা দেখিতে লাগিলাম। বাক্সের মধ্যে ডালার ভিতর ডালা; ক্রমশঃ ডালা নামাইয়া বৌরাণী গহনা বাহির করিতে লাগিলেন। হীরা-জহরতের আভায় ঘর যেন ঝকমকিয়া উঠিল। মুকুট, কাপটা, কাণ, কর্ণফুল, তাবিজ, বাজুবন্ধ, খাড়ু, কণ্ঠী, চিক্, বালা, চূড়, রত্নচক্র, চরণচক্র, আরও কত যে কি, বলিতে লজ্জা করে—সে সবের নামও জানি না। সাত রাজার ধন মণিমাণিক্য যেন এই দুইটা বাক্সের ভিতর বন্দী হইয়া আসিয়াছে! এইরূপ আভরণ-সজ্জিতা ধনিষ্ঠাকে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, আজ সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-দর্শন হইল! মাতা আনন্দে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। কিন্তু দিদিমা সেকেলে মানুষ, তিনি এত আনন্দ নীরবে সহিতে পারিলেন না। নিজের পেট চাপড়াইয়া মেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওরে বিরাজ, মোর কোঁক আর তোর কোঁক, তোর কোঁক আর মোর কোঁক।"

এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে আমার মন সহসা যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। বরাভরণ-সজ্জিতা ধনিষ্ঠাকে দেখিয়া রূপকথার সেই প্রবাদটি মনে পড়িয়া গেল —"পর পর মা, গয়না পর।" কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভাবটা মন হইতে দূর হইয়া গেল—নহবতের তান শুনিতে শুনিতে ছেলে-মেয়ে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এখানে আমরা ননদের বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। আসিবামাত্র মেয়েটি যে মন্তব্য প্রকাশ করিল, তাহাতে আমার পূর্ব্বচিন্তার একটা ধারা দেখিতে পাইয়া মনটা আবার একটু যেন দমিয়া গেল।

ঠাকুরঝি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে খুলি, কেমন বর দেখ্‌লি? তোর মনে ধরেছে ত?"

খুলি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া উঠিল, "পিসীমা, আমি কখ্‌খনো বিয়ে করবো না।"

ঠাকুরঝি হাসিয়া বলিলেন, "কেন রে, কি হয়েছে?"

মেয়ে বলিল, "বাপ রে, আমি অত গয়না পরতে পারব না। কি বিশ্রী!"

আমি মনে মনে বলিলাম, এরই মধ্যে মেয়ের এ কালের হাওয়া লাগিল যে। আমার ছেলেটি পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে গম্ভীর মুখে বলিল, "ইস্! গয়না পরবে না! পেলে ত! তোমার ত আর রাজপুত্তুর বর আস্‌ছে না?" বলিয়া সে মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেল। খুলি কাঁদিয়া বলিল, "মা, দাদা কেবল আমার সঙ্গে ঝগড়া করে।" ঠাকুরঝি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তোর দাদাকে খুব ব'কে দেব এখন, তুই কাঁদিস্ নি। তোকে আর ভারী গয়না পরতে হবে না, এবার তোর জন্মদিনে খুব সরু দুগাছি চুড়ি গড়িয়ে দেব, কেমন রে?" বলিয়া তিনি তাহাকে একটা খেলনার বাক্স দিলেন। সে পৌঁ হইয়া বসিয়া ছবির গল্প বানাইতে বসিল।

৩

কাল-স্রোত দ্রুত চলে বা স্মৃতি-স্রোত,—তাহা বৈজ্ঞানিকরাই বলিতে পারেন; কারণ, কাল বহে সমানে সটানে; স্মৃতি বহে পিছনে উজানে। বিপরীত অন্ধ ধারাপাতের নিয়মে এতদুভয়ের সঠিক মাপবৈচিত্র্য নির্ণয় করা আমার মত আনাড়ীর কর্ম্ম নহে। আমরা তাই মনগড়া চালে চলিয়া স্মৃতিকেই প্রাধান্য দিয়া থাকি।

পূর্ব্বঘটনার পর প্রায় ১০ বৎসরকাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে—সে ত সে দিনের কথা।

প্রথম কিছু দিন ধনিষ্ঠাদের খবর মাঝে মাঝে পাইয়াছিলাম, কিন্তু বিরাজ চিঠিপত্র লিখিতে বড়ই অপটু; আমি দশখানা চিঠি লিখিলে হয় ত বা একখানা চিঠি পাইতাম, তাহাও হিজিবিজি অক্ষরে ও নিতান্ত সংক্ষেপে, যথা—

"প্রাণের সই,

অনেক দিন তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি, কিছু মনে করিও না। কি আর লিখব। তুমি ত জান, লিখতে গেলে আমার কথা জোগায় না। কবে আসিবে? দেখা হ'লে সুখ-দুখ্ খুব সব কথা বলব। আমরা ভাল আছি। আমি লিখতে পারি না পারি, তোমরা কেমন থাক, তাহা লিখতে ভুলো না। ইতি

তোমার ভালবাসার সই
বিরাজ।"

কিন্তু এক তরফা অনুরাগ যদি বা চলে, তাহার প্রকাশ থামিয়া যায়। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের চিঠি লেখালিখি বন্ধ হইয়া গেল; কিন্তু তাই বলিয়া আমি যে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা নহে; সর্ব্বদাই তাহাদের কথা মনে পড়িত। কালের পরিবর্ত্তনে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, যেমনটি দেখিয়া গিয়াছিলাম, তেমনটি না-ও দেখিতে পারি, এ কথা কিন্তু আমার মনে হইত না। তাহাদের মনে পড়িলেই সেই বিবাহের আনন্দ-দৃশ্যই আমার মনে ভাসিয়া উঠিত। ইতোমধ্যে আমরা বর একবৎসরের জন্য বিলাত গিয়াছিলাম। কলিকাতায় ফিরিয়া সখীর বাটী যাইয়া সহসা নিরানন্দ শোকসূত্রের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম; দেখিলাম, সখীর বৈধব্য-বেশ। কিছুক্ষণ আমরা দুই জনে দুই জনের হাত ধরিয়া কতই না কাঁদিলাম। তাহার পর আমি আগেই বলিলাম, "দিদি, এমন হয়েছে, তা ত জানাও নি?"

তিনি বলিলেন, "কি আর জানাব; আর তোমরাও ত এখানে ছিলে না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাকে দেখছি না যে?"

"তিনি কি আর আছেন, দিদি? আমাকে একলা ফেলে তাঁরা সবাই চ'লে গেছেন।" বলিয়া তিনি আবার অশ্রুধারা মুছিতে লাগিলেন।

আমি একটু পরে বলিলাম, "মেয়ের খবর জান ত? আজ ত পূজার ষষ্ঠী; ভেবেছিলাম, তাকে এখানে দেখব, মেয়েকে যে আন নি!"

তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দুঃখের কথা কি বলব ভাই! রাজবাড়ীর নিয়ম নেই বউ পাঠানর। সেই পর্য্যন্ত মেয়ে আর এ বাড়ী ঢোকেনি।"

আমি বলিলাম, "কি নিষ্ঠুর গো তারা!"

তিনি বলিলেন, "সাধের সময় এক দিন এনে যে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত খাওয়াব, তা-ও হ'ল না। বাড়ী বয়ে সাধ পাঠিয়ে দিলুম।"

আমি বলিলাম, "না পাঠালেই ত চলত।"

"তা ঠিক; কিন্তু মা'র প্রাণ তা ত বোঝে না। প্রসব হবার সময় মান অপমান ভুলে সেখানে গিয়ে দু'দিন কাটিয়ে এলুম।"

আমি সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম, "তা মেয়ে ত পরের ঘরে যাবার জন্যই জন্মায়। সে ত সুখে আছে ভাই?"

তিনি বলিলেন, "সেই মনে করেই ত এত দিন প্রাণ ধ'রে ছিলুম, কিন্তু যেদিন যাবার পর কু-সঙ্গীর ফাঁদে প'ড়ে জামাই একেবারে গোল্লায় গেছে। এক বাইজীর মন যোগাতে দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। শুনলুম, বাঁদরের বিয়ে দিতে সে দিন নাকি লক্ষ টাকা খরচ করেছে।"

আমি অবাক্ হইয়া সখীর দুঃখের কাহিনী শুনিতেছি, এমন সময় নীচে পাল্কীর শব্দ পাওয়া গেল। এক জন দাসী দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "ও মা, দিদিমণি এসেছেন গো।"

"দিদিমণি! হঠাৎ এত দিন পরে? ব্যাপার কি?"

আমরা ছুটিয়া নামিয়া গিয়া দেখিলাম, সত্যই ধনিষ্ঠা পাল্কী হইতে বাহির হইতেছে। সে নামিয়া আমাদিগকে প্রণাম করিল।

মাতা তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন। আমি তাহার গাল টিপিয়া বলিলাম, "ও মা, ধনী বুড়ী, তুই এত বড় হয়েছিস!"

সে একটু হাসিল। সে হাসিটুকু কি সুমধুর!

ইত্যবসরে তাহার সঙ্গের দরোয়ান পাল্কী হইতে দুইটা

গহনার বাক্স বাহির করিয়া বলিল, "মাইজী, বাক্স দু'টো সাবধানে তুলিয়া রাখুন।"

বিরাজের আদেশে দাসী বাক্স দুইটা হাতে লইয়া আমাদের সহিত উপরে আসিল, উপরে শয়নকক্ষের পালঙ্কের উপর বাক্স দুইটা রাখিল। বিরাজ তাহার উপর বালিস দু'টা চাপাইয়া দিলেন, তাহার পর কন্যাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মা, খবর সব ভাল ত?"

কন্যা একটু থামিয়া থামিয়া বলিল, "হাঁ, এক রকম সব ভালই। সকলে ভাল আছেন।"

মাতা বলিলেন, "আজ কি ক'রে এলে মা! জামাই কি এত দিন পরে রাজী হলেন?"

সে বলিল, "না মা, তিনি কিছু জানেন না; বৌরাণী তাঁর এক জন দরোয়ান সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

আমি বলিলাম, "বৌরাণীর খুব দয়ার শরীর ত! পূজোর দিন নিজের মাথার সব কিরি দিয়ে মেয়েকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

"হাঁ, তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। এই গহনার বাক্স দু'টো শ্বশুর মশায় তাঁর কাছেই রেখেছিলেন। এখন এই বাক্স ফিরিয়ে নেবার জন্য উনি বৌরাণীকে খুব বিরক্ত করছেন। কিন্তু গহনাগুলো হাতে পেয়ে পাছে দু'দিনে সব নষ্ট ক'রে ফেলে, এই ভয়ে তোমার কাছে বাক্স দু'টো রাখবার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "মাসীমা, আপনার যে দেখা পাব, এটা ভাবিনি। কত যে খুসী হলুম, তা বলতে পারিনে।"

আমি এতক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলাম। তাহার যৌবনোজ্জ্বল রূপতরঙ্গ বর্ষার ভরা নদীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে যেন উথলিয়া উঠিতেছিল। হৃদয়ের বিষাদরেখাপাতে সেই কমনীয় কান্তি আরও যেন মহিমান্বিত ভাব ধারণ করিয়াছিল। হায় রে! সে জন কি হতভাগ্য—যাহার নিকট এ অতুল রূপের কোন মর্য্যাদা নাই!

ধনিষ্ঠার কথার উত্তর দিতে যাইতেছি, হঠাৎ ফটকে সশব্দ গাড়ী থামার আওয়াজে নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িলাম। কিছু যে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিবে, তাহা যেন স্বতঃই মনে হইল। বিরাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এমন সময় কার গাড়ী—কে এল?"

ধনিষ্ঠা ধীরভাবে বলিল, "বোধ হয়, উনি এলেন।"

বিরাজ ভীত হইয়া ত্রস্তে বলিয়া উঠিল, "তবে বুঝি জানতে পেরেই তোমাকে নিতে এসেছেন?"

আমি বলিলাম, "তাই ত! একটা কোন বিভ্রাট না ঘটে।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই জামাতা বাবাজী সশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখে মদের গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করিতেছে, নয়ন দুটি রক্তবর্ণ। আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উগ্রভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, "লুকিয়ে চ'লে আসা হয়েছে বড়!"

স্ত্রী উত্তর করিল, "লুকিয়ে আসিনি, বৌরাণী আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"বৌরাণী তোমাকে পাঠাবার কে? আমার অনুমতি নিয়েছিলে?"

"তুমি থাক কোথায়? আর বাপের বাড়ী আসব, তার আবার অনুমতি কি, আমি ত আর এখনও ছোট বউটি নেই?

জামাতা বলিল, "আগে বাড়ী চল, তার পর এ কথার বোঝাপড়া হবে।"

ধনিষ্ঠা বলিল, "বাড়ী? আমার বাড়ী কোথায়? বাড়ীতে ত অন্য লোককে বসিয়েছ। আমি ত রাজ-বাড়ীর এক কোণে প'ড়ে রয়েছি।"

জামাতার এত দূর অধঃপতন হইয়াছে, মাতা তাহা জানিতেন না। তিনি যেন হতচেতন হইয়া ক্ষণেক মূক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

জামাতা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "বড় যে কথা ফুটেছে দেখছি। গহনার বাক্স কোথায়, দিয়ে এস এখনই।"

ধনিষ্ঠা অকুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "গহনা আমি দেব না। ঐগুলিই আমার মেয়ের একমাত্র সম্বল।"

জামাতার স্বর আরও চড়িয়া উঠিল, "দেবে না! এখনই নিয়ে এস বলছি, নইলে ভাল হবে না। চোর তুমি।"

ধনিষ্ঠা বলিল, "আমার ধন আমি এনেছি, আমি চোর আর তুমি তা কেড়ে নিতে এসেছ—তুমি সাধু!"

জামাতা তীব্র স্বরে বলিল, "বটে! তোমার ধন! তোমার বাবাকেলে ধন!"

আমি থাকিতে না পারিয়া বলিলাম, "বাপের ধন নাই হ'ল; ওর স্ত্রীধন; তাতে ত তোমার কোন অধিকার নেই, বাছা!"

জামাতা এ কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্ত্রীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "দেবে না? চোর! ছোট লোকের মেয়ে! এখনই দাও বল্‌ছি।"

ধনিষ্ঠা দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "দেখ, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, কিন্তু বাপ-মায়ের অপমান সহ্য করব না। এমন ক'রে যদি বল—"

তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে স্বামী বলিল, "কি, তোমার কথায় আমি ভয় পাব না কি? একবার কেন—একশোবার বল্‌ব, ছোট লোক জুয়াচোরের মেয়ে। গহনা চুরি ক'রে এনেছিল, ফিরিয়ে নিয়ে যায়।"

ধনিষ্ঠা ক্ষণকাল পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বালিসের নিম্ন হইতে বাক্স দুইটা বাহির করিয়া কন্যাং করিয়া স্বামীর পদপ্রান্তে ফেলিয়া দিল। বাক্সের ডালা ভাঙ্গিয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ মণিমাণিক্যরাশি ঝকমকিয়া উঠিল। সেই হীরাজহরতের জ্যোতিকে ম্লান করিয়া দিয়া ধনিষ্ঠার দেহকান্তি হইতে দেবী সদৃশ তেজস্বিনী আভা বিনির্গত হইল। স্বয়ং সূর্য্যদেব জানালাপথে গৃহমধ্যে রশ্মি প্রেরণ করিয়া তাহার শিরে আলোকমুকুট রচনা করিয়া দিলেন। পত্নীর তেজস্বিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া জামাতা স্তম্ভিত হইয়া গেল, সেই তেজঃকটাক্ষে তাহার মোহ-ভ্রান্তি সহসা অপসৃত হইল, মস্তক নত হইয়া পড়িল। ধনিষ্ঠার পদতলে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "বুঝেছি, আমি বুঝেছি, কি পাষণ্ড—কি নরাধম আমি, বুঝেছি! তবুও তুমি ক্ষমা কর, দেবি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো না, পায়ে রাখ, আশ্রয় দাও। আমাকে পাপপঙ্ক হতে উদ্ধার কর।"

ধনিষ্ঠা তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল। আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ঘরে বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। পাশের বাড়ীর একটি বালক হারমোনিয়ম বাজাইয়া গাহিল:—

"চিনিনি তোমারে গো যখন ছিলে কাছে, গৃহপুরে।
তোমায় জানিলাম, বুঝিলাম,
যখন অনাদরে গেলে ঘুরে॥
আমার—অন্ধনয়ন গেল খুলে,
ভুলিনু সকল ভুলে,
আজি তব লাগি সর্ব্বস্ব তেয়াগি
আমি উদাসীন ভবপুরে।
ওগো দেবি মোর জীবন-অরুণা,
কর গো কর করুণা
বাজিয়ে দাও মোর একতারাটি তোমার প্রেম-সুরে॥"

শ্রীসুকুমারী দেবী

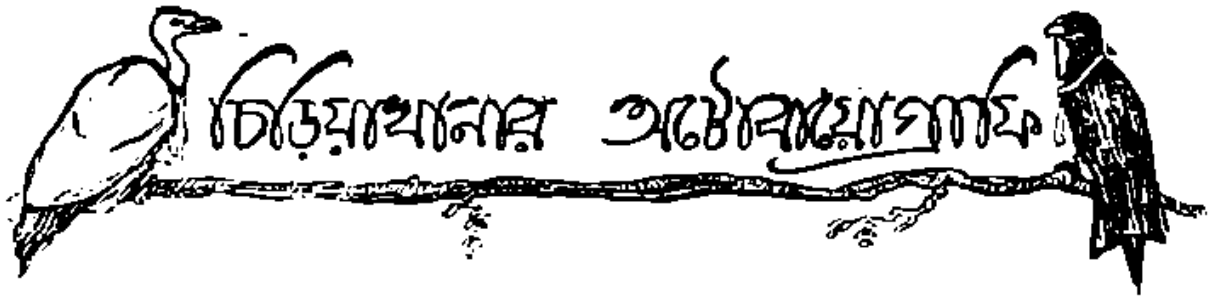

নম্বর ১—ফিঙে

আমি একটি ফিঙে পাখী,
গাছের ডগায়, চালের মাথায়,
(আর) তারের টানায় ব'সে থাকি,
অর্থাৎ উঁচু দেখেই আসন রাখি।

লোকে ভাবে "আমি বেকার,—
শুধুই করি এ-ধার ও-ধার,"
ধারে কিন্তু "রজব্ বেকার",
ক'য়ে যাক্ না কেউ চালাকি!

দেখে ভাবো—"ক্ষ্যাংলাপানা";
বুদ্ধিমানের চেহারাখানা—
ঐরূপ-ই হয়;—নাইক জানা?
তা হোক্, তাতে লজ্জা কি!

রটো আমায় খাঁটি স্কটিক;
অবাক্ হচ্ছ? বলছি ঠিক,
জানে যারা সব দার্শনিক;
জানবে কি আর চোখ ঢাকি!

ভেতরের রং বেরিয়ে পুঁড়ে—
দেখা যেছে অঙ্গ জুড়ে;
শাল-দোশালায় রেখে মুড়ে—
দিই না ত কারেও ফাঁকি।

কাক শালিক চিল তোলে রোল,
টিয়ে ময়না শোনায় বোল,
আমি তাদের খাওয়াই ঘোল,
(তখন) চিচিটুকু রয় বাকি।

আমি যখন পিছু পড়ি,
সবার নাকেই দম করি,
বড়-বড়রা পালান ভরি',—
বুক ঠুকে তা কই হাঁকি।
আমি একটি ফিঙে পাখী।

নম্বর ২—ঘুঘু

আমি একটি ঘুঘু পক্ষী
ঘুর্ণা আমার পুঁজি শুধু ডিটে পুঁজি,
না খেলেই তা বানাই,
ঠকঠকক কি সানাই,—
সইতে নারি বকি।

উড়ে—ফট্ ফট্ ফট্,—
উড়িয়ে দি সব চট্,
আমার কাজের সট্—
স'রে পড়েন লক্ষী!

সোনার দোয়াত নাতী,
তোষাখানায় বাতি,
হাতীখানায় হাতী,
ফড়িঙের মত ভক্তি।

যা কিছু রয় বাকি,
ঘু-ঘু-ঘু ডাকি,—ডাকি,—
দু'দিনে দিই ফাঁকি—
বড় বড় সব ধনি!

অশথ গজায় ডালে,
ঘরগুলো নেয় শ্যালে,
কুকুরে ঘোর ঠ্যালে,
পাঁচাই থাকেন রক্ষী।

চিলের ছাতে বসি,
কভু উঠোন্ চষি,
খাদ্-কাবরার পশি,
তখন আমার রোক্ কি!

ধরি, নানা বর্ণ,
ডিলে, হড়েল, স্বর্ণ,
সবাই দাতাকর্ণ!
দু দু দু আর ফক্কি।
আমি একটি ঘুঘু পক্ষী।

নম্বর ৩—কাঠঠোকরা

আমি একটি কাঠঠোকরা,
বড় গাছেই করি ঠোকর,
শক্ত গাছেই করি কোঁকর,
(যেন) "টাই"-বাঁধা সব ছোক্‌রা!

তোমরা আমার জাত পাখী।
(একবার) ঠোকর খেয়ে দেখবে না কি?
"গেলুম রে বাপ" বোল্‌বে হাঁকি;
(মোদের) দেখে পলান খোগরা।

চেহারাখানা দেখছো না ত,—
হাইল্যাণ্ডার ঘোরার মত,
বাড় কখন হয় না নত,
(তা তুমি) হোম্‌রাই হও কি চোম্‌রা!

দেখেছ ত আমার ঠোঁটন,—
কটার আছে আমার মতন?
নকল ছাঁটছে নাপ্‌তে যখন,
(আর) মাথাটা দিচ্ছো তোমরা।

ঠোঁটে আমার এমন ধার,
প্রাণটা টেনে করি বার,
শেলের মত মর্ম্ম মাঝার—
ক'রে দি একদম কোঁপরা।

(যখন) আশে-পাশে ঘাড় বাঁকাই,
ত্রাসে কাঁপেন সব সিঞ্চাই,
পাছে আমি ঠোকর লাগাই,—
তাই জড়-সড় ভদ্রলোকরা।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ রব-পটে,—
যখন আমার ঠোঁট রটে,
শরণ-ভয়া আসায় চোটে
ও'লে মরে আহাম্মোকরা,
আমি একটি কাঠঠোক্‌রা।

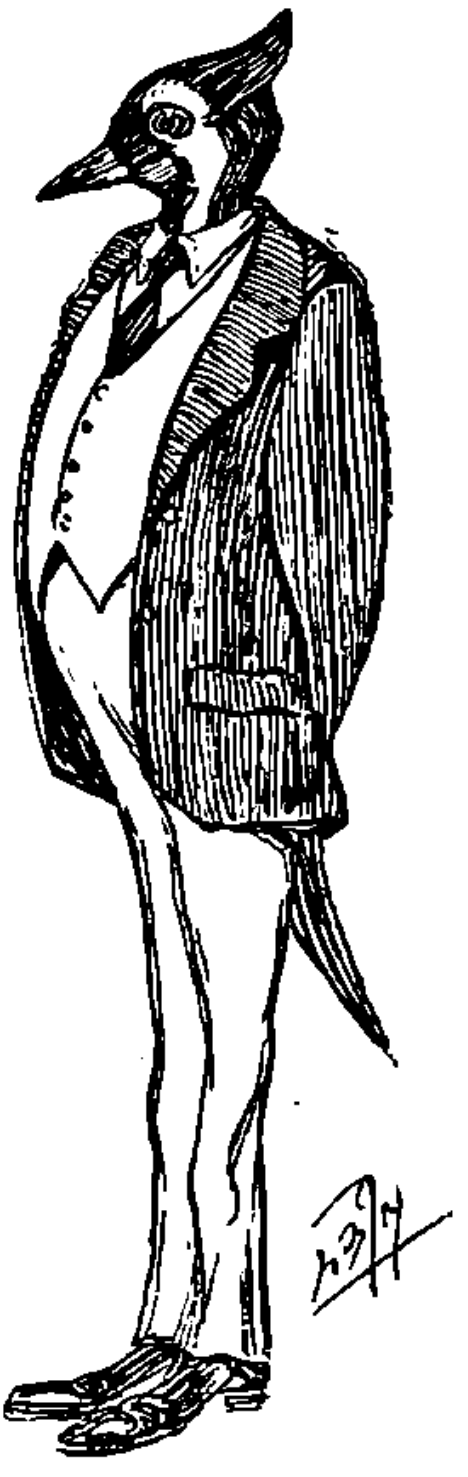

নম্বর ৪—বক

আমি একটি বক,
ধীরে চলি, অল্প বলি,
মতলবটায় নজর খালি
বকাবকি নাই অনর্থক।

ধবধবে সাদা—
পোষাকটা আমার, দাদা,
লাগে মিষ্টি স্নিগ্ধ দৃষ্টি,
সৃষ্টি দেখুক(গে) আহাম্মক।

নম্রতা কভু না ভুলি,
কদাচিৎ ঘাড়টা তুলি,
অতি শান্ত, বিষয়-ভ্রান্ত—
যেন ধর্ম্মপ্রচারক।

এমনভাবে ব'সে থাকি,
জানবার তা জো-টা কি!
ভ্যাস্ত কি মরা বড় মুস্কিল ধরা,
যদি (সে) নিজে না হয় ঠগ।

শিকার এলে কাছে,
আর কি বাঁচোয়া আছে?
কাপুরুষের মত নাইক' ইতস্ততঃ,
গেলাই আমার সখ।

রাখি না চিহ্ন তার,—
ঘামাল পাওয়া ভার,
বেমালুম সাফ এমন করি গাপ,
ছিট রাক্ষসেই মারাত্মক।

চালচলন আর পোষাকে,—
সকল গলদ ঢেকে রাখে,
ধার্ম্মিকটি সেজে বেরে অপরের বোঝে—
চট্ ছবে পড়ি ধরা;
আমি একটি বক।

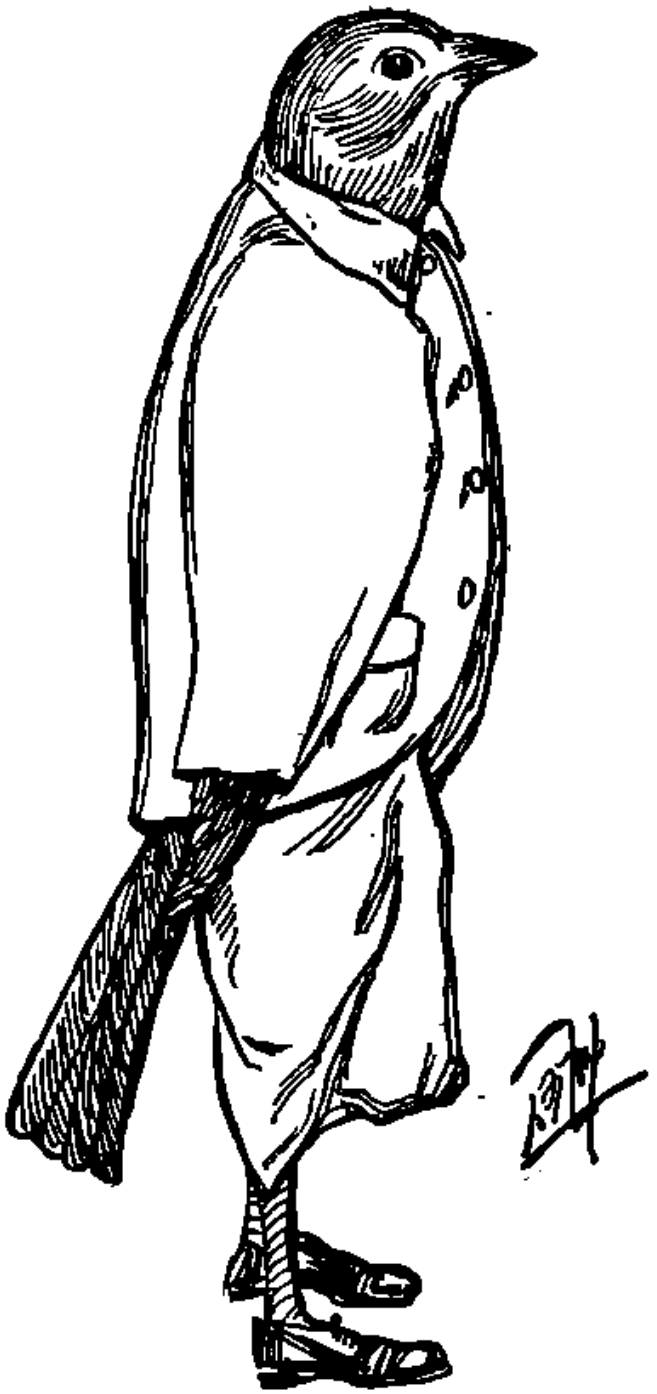

নম্বর ৫—ছাতারে

আমি একটি ছাতারে ;
বেজায় বক্তার, উকীল মোক্তার
এগোর কাছে, সাধ্যটা কার,—
(যখন) বুক ফুলিয়ে দাঁড়াই সভার মাঝারে।

যাই অনর্গল বকি,
সাধ্য কি যে ঠেকি !
মাঝে মাঝে লাফাই, কখন ঘাড় বাঁকাই,
হাঁ ক'রে সব শুনতে থাকে আমারে।

সব বিষয়েই বলি,
অক্লেশ আমার থলি,
ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, কে জানে কি সাহিত্য,
পলিটিক্স কি বিজ্ঞান, ভেসে ওঠে হুংকারে।

বক্তৃতা নি এমন প্রবল,
বোঝেই না কেউ, ধরবে কি ছল !
আমি-ই কি বুঝি ? এত আমার পুঁজি।
করতালি পেলেই বুঝি মানুষেই সব শ্রোতারে।

বাগানে কি পথে ঘাটে,
উঠোনে কি হাটে মাঠে,
নব্য-বঙ্গের আদাড়ে, প্রত্ন-বঙ্গের পাদাড়ে—
গলায় আমার নাইক বিরাম,

মক্কেতে কি বাজারে।

বাকোই আছি শুধু,
কাযের বেলা চুটু,
যার ইচ্ছে সে করো, আমায় কেন ধরো,
বক্তেই বুঝি করতে হবে ? বাহা রে !

দেশ শুদ্ধ সবাই,—
করছ কাযের বড়াই,
দিইনি ত তার বাধা কয় না গিয়ে দাদা,
আমি দু'টো কথা কয়ে চল্লুম এখন আহারে,
আমি একটি ছাতারে।

নম্বর ৬—কবুতর

আমি একটি কবুতর, বর্ণ মোদের বহুতর।
গোলা, লক্কা, লোটন্, সিরাজ্, কেউ পদ্মপদ্,
মুখ্‌খী, ফট্‌কা, ঢিলে, গেরোবাজ কেউ চিলে,—
এক একটি স্বতন্তর।

পোষাক মোদের নানা রকম,
প্রধান কাষটা বক্‌ম্ বক্‌ম্,
জোড় আমাদের চাই-ই চাই, বড় ঘরের ঘরজামাই।
সদাই থাকি ফিট্‌ফাট্, পোষাকের কাটছাট—
নিয়ে থাকি আট-পহর।

দুনিয়ার মধ্যে চিনি "পম্-সু"—
"চেষ্টার-ফিল্ড" আর "ওয়াটারলু",—
সোনার চশমা, টাই আঁটা, হাল্ ফ্যাসানের গোঁফ ছাঁটা,
এসেন্সটা চাই সর্ব্বদা, সোনার ব্যাণ্ডে ওয়াচ বাঁধা,
গবাক্ষেই থাকে নজর।

বোঝে যারা বেড়ায় নোট—
বোঝে না মোদের—ধাঁড়ি কি ঠোট;
এমন ভাবে হাসি কি কাসি,—শিখতে পারে যখন আপি,
এমন চঙে পথে চলি, এমন সুরে কথা বলি—
লাজ পেয়ে যান নটবর।

বো-লো ক'রে উঠে ঠেলে,—
কেঁদে কবিয়ে দিয়ে এল্-এ
শ্বশুরবাড়ীর টাকা মেরে,—তাঁর ভিটেতেই আসন পেড়ে,
সাজি-গুজি, চুল ফেরাই—মোটর চোড়ে হাওয়া খাই,
থাকি উচ্চ হর্ম্ম্যোপর।

দেশের দশের ধার না ধারি,
নভেল পড়ি টপ্পা মারি,
বৈকালে দিয়ে বাহার—হোটেলে করি আহার—
নিয়ে—এক থালেরই অনুচর।

থিয়েটর আর বায়স্কোপ
আমাদের সব সখের খোপ;
ব্রিজ্ খেলি, পিয়ানো বাজাই, রেসের জুয়ায় টাকা খোয়াই,
স্ত্রী-ভাগ্যটাই ভয়ঙ্কর।

দুনিয়া কেন যাক্ না ডুবে,
ধ্রুব-তারা উঠুক্ পুবে,
আমার যেন সুখের কিছু, মাত্রা না হয় ছটাক্ নীচু;
বেশ আছি সব ভিটেছর।

দার্জ্জিলিং, ওয়াল্টেয়ার, পুরী—
মাঝে মাঝে আসি ঘুরি;
অভাব-টভাব বুঝি-না-জানি, সিগারেট আর হুইস্কী টানি,
সবই দেখি সুখকর। আমি একটি কবুতর।

নম্বর ৭—শিক্‌রে বাজ

আমরা দু' ভাই শিক্‌রে আর বাজ,
ঘাড় ভাঙাটাই মোদের কায।
উড়ি সুর-সূক্ষ্মে, মা-বাপের পুণ্যে—
খুবই বিখ্যাত মোরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জন্যে;
সেখান থেকেই শিকার মোরা ক'রে নি আয়ত্ত।

তীরের মত এসে পড়ি,
নখে মুখে শিকার ধরি,
সাধ্য কি তার পালায়, হয়ে আয় আমার—
রক্ষা তবে পায়ে ধরে, ভুলে গিয়ে লাজ।

কামড়াকামড়ির সাধ্য তারি—
পাখী হয়ে—পাখীই মারি,
নিজের জাতের রক্ত খাই—তখন করেও সুখটা পাই,
কাল্‌কে তারে মারবই ঠিক—বেঁচে যদি যায় আজ।

দেখ্‌তে নারি কারুর বাড়,
যা ক'রে হোক্ ভাঙি ঘাড়,
কোথাও তারে দিই না শান্তি—এ সব কাযে নাইক ক্লান্তি,
মোদের লক্ষ্যের কাছে কি আর লাগে তীরন্দাজ!

কোপ দৃষ্টি করি যারে,
উৎপাত করি তারে;
শ্রীমানদের খাইয়ে ঘোল, ক্রোক্ করি সব বাজিয়ে ঢোল,
বুক ফুলিয়ে গোঁফে 'তা' দি; মোরাই ধর্ত্তোর দেবরাজ।

কেউ যদি হয় মানুষের মত,
করি তারে বজ্রাহত,—
ছলে, বলে কি কৌশলে, ফেলে তারে অগাধ জলে,
দিয়ে তারে জলাঞ্জলি, ঠাণ্ডা তবে হয় মেজাজ।
আমরা দু' ভাই শিক্‌রে বাজ।

নম্বর ৮—প্যাঁচা

সবাই আমায় প্যাঁচা বলে,—
(কারণ) থাকি না আমি তাদের দলে।
ডিগ্‌ডিগে ত' নই—হৃষ্টপুষ্ট হই,
বিধাতাও দেখেন নি কভু হেসে কথা কই।
অন্ধকারেই কেবল আমার চোখ দুটি জ্বলে।

যেমন জমীদার নেশাখোর,—
দিনে খোলে না'ক ঘোর,
আমিও দিনের রৌদ্রে ঘুমুই কোটরের মধ্যে,
শ্রীমুখ আমি দেখাই শুধু হয়ে গেলে সন্ধ্যে ;
রাতের মধ্যেই যোকগার আমার তাতেই বেশ চলে।

কথাবার্ত্তার ভক্তা নাই,
বড় জোর একটা তুলি হাই,
গম্ভীর চাল রাখি বিজ্ঞতায় সব ঢাকি,—
বেশী কথার নিন্দুকেরা ধরতে পারে ফাঁকি ;
একটা শুধু "হুম্" করলেই সবার আসন টলে।

মত ত কভু দিই-ই না,
দিই ত—"সুবিধা দেখি-ই না" !
নাকটা ক'রে উঁচু জ্বটা কিঞ্চিৎ নীচু—
বলি—"উঁহু উঁহু—মতলব আছে কিছু,—
জানি না ত ঘোড়ার খবর—জানবে বয়েস হ'লে।"

মুখটা ক'রে তোলো হাঁড়ি,
চক্ষু বুজে যখন ছাড়ি—
কদাচিৎ একটা শব্দ, সেও শুষ্ক রুক্ষ !
কোনমতে করতে কিছু না দেওয়া আরম্ভ,—
বেলায় যখন এই বোঝে,—কোথলে কি ফলে।

(পরে) চট ক'রে কোটরে ঢুকি
(পাছে) চাঁদার খাতা মারে উঁকি !
হাজার ডাকে দিই না সাড়া,—চোঁচয়ে আধ ঘণ্টা তাড়া
'কেরে' বলতে বলতে তারা—
"বেটা (কি) ছোট লোক বেয়াড়া,—
উপুড় হস্তে প্রস্তাবেতে ও বেটা কি গলে,—
চাঁদার ভরে বিল্ল মেকে—ভাংচি দেয় তলে তলে।"
সবাই কেবল "প্যাঁচাই" বলে ;—
প্যাঁচ থেকে যে প্যাঁচা বোঝা—বোঝে না তা সকলে।

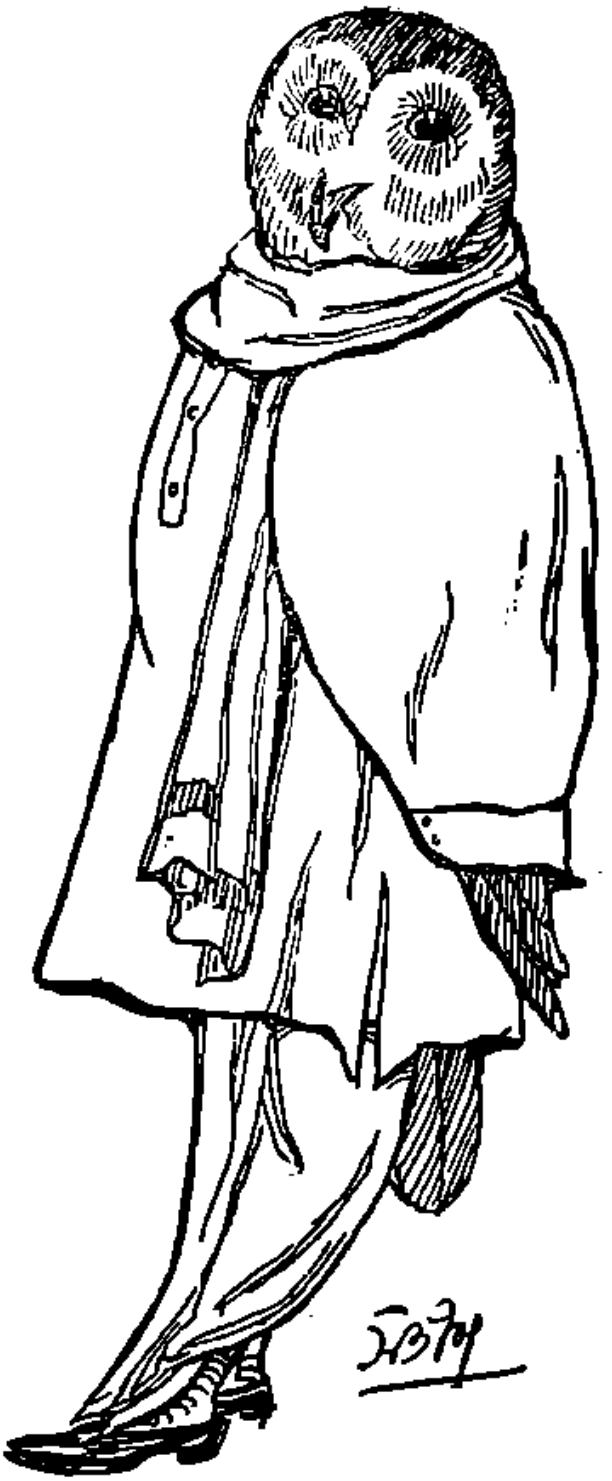

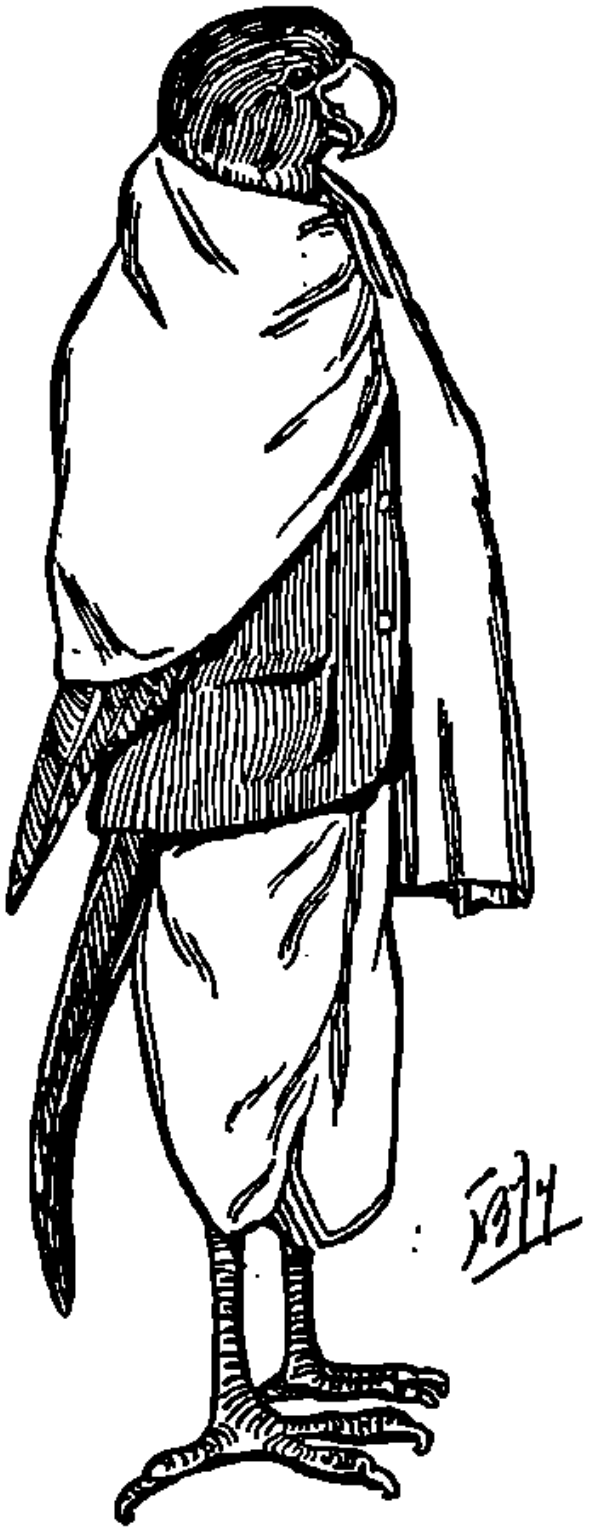

নম্বর ৯—টিয়ে

আমি একটি টিয়ে,
আমার হয়ে গেছে বিয়ে ;
শুক আর শারী—নাম রাখলেন প্যারী,
খাপরেতে ছিলুম আমি রাধাকৃষ্ণ নিয়ে।

খেয়ে ননী মাখন রম্ভা,
আমার ল্যাজটা হোলো লম্বা ;
"রাধাকৃষ্ণ" বলি,—(শুনি) আনন্দেতে গলি,—
ললিতা বিশাখা,—ন্যাজে দিত হাত বুলিয়ে।

এখন—দুঃখ কেবল এই,
(তেমন) সমঝদার আর নেই ;—
তবু, বুদ্ধির জোরে—ঘোল্‌সা ক'রে
বেড়াই আমি, বড় বড়য় চোখে ধুলো দিয়ে।

বেচে,—লম্বা লম্বা বুলি,—
ঠেলে, ও'রে রেখেছি ঝুলি,
ফসো ভল্‌টেয়ার্ বার্ক—হোয়ার্,—
বেদ বাইবেল্ জেন্দাবেস্তা, গীতাটী ছাকিয়ে।

আছে সব বড় বড় মুখ্‌খু,
দেশে তার হয়নি আজো গুরু,
তারা, হয় শুনে অবাক্, বাড়িয়ে দেয় তাক,—
সম্ভ্রমে মাথা নোয়ায় কত এম্-এ বি-এ।

বড় দেখেই রাখি বেঁধে,
মান-সম্ভ্রমে চলে বেশ,
মাঝে মাঝে হাতড়ে বুলি, শোনাই যখন ছাঁকা বুলি,
ধন্য হয় সব পুণ্যবানে চোকে চোকে পিয়ে !

যে পোষে, তার দিকেই ঢলি,
যে-টি বলায় সেইটি বলি,
বড়রা তায় থাকে খুশী, আমি শুধু রুখির শুখি,
মতলব হাসিল্ নিয়ে কথা, দু'পয়সা হাতিয়ে।

আছে, এক একটা বাট্‌পাড়্—
তারা, টিপে ধরলে ঘাড়,—
ভুলে যাই বুলি, কপালে চোখ তুলি,—
বলি,—"ক্যা ক্যা ক্যা, চি চি চি, ছিঁ ছিঁ ছিঁ-এ।"

দেখে, বড় ঘরের মামা যি,
আর, ঘর-রক্ষক, তেওয়ারী-জী,—
পিঞ্জরে কি রাখে, ছোলা দেয় তাঁরে,
(তবে) গত জীবন কথি স্মরণ, ছলছল-আঁখি মুদিয়ে !
তবে আমি একটি টিয়ে !

[শকুনি—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

নম্বর ১০—শকুনি

আমি একটি শকুনি,
ঘুরে বেড়াই আকাশে অনাবিল বাতাসে,
ভাগাড়েতে পড়লে কিছু টনক্ নড়ে তখুনি।

ছোট-খাট পাখী নই,
থাকি নাক' উঁচু বই,
ইচ্ছা হ'লে পাহাড়ে যাই, যখন চাই সাগরে নাই,
ছোট-খাটর সঙ্গে আমি ভালবাসি না বকুনি।

আশ্রয় ক'রে আমায়,
তবে যত ছারপোকায়,
আমারি সব রক্ত শুষি বেড়ায় তারা হয়ে খুসী,
ছাড়ে নাকে' সঙ্গ তারা, ভাগাড়ে এলে চুলুনি।

আমার যা আহার্য্য পেয়,
নিন্দুকেরা বলে—"হেয়,"
প্রবৃত্তিটা বড়ই "ছু" শুনলে সবাই করে "থু"
বড়র এমন ছোট স্বভাব, কাণে আঙ্গুল দেয় শুনি।

টাকার জোরে থাকি খাড়া,
হ'তে হয় না সমাজ-ছাড়া,
বরং পেতে প্রসাদ আমায়, কাক-চিলেরা হয় উমেদার,
পাছু পাছু ফেরে তারা, দাঁওটা আসে যখুনি।

শুনতে ভাল আমরা বড়,
উঁচু দিকে উড়তে দড়,
চরিত্রটা শুনলে পরে "রাম" ব'লে সব যাবে স'রে,
ঘাড় গুঁজে চোখ বুজি ব'লে ঠাউরো না আমায় "মুনি।"
আমি একটি শকুনি।

• • • •

(এই)—দশটি পাখী মিলে আমরা করছি দেশে রাজ্য,
আগেই আমরা ব'লে দিছি—মোদের কি কি কার্য্য।
শালিককে দিয়েছি বাদ,—চালাকী তার "ষোল আনা",
"রায় মশায়" তা বলেই গেছেন, তাঁর মত কার ছিল জানা।
কাকটাকেও দিয়েছি ছেড়ে, সেটা "অতি-বুদ্ধি" ধরে,—
লাকালাকি ক'রে খেবে—নিকৃষ্ট যা খেয়ে মরে।
তা' হলেই হলুম মোরা—পুরোপুরি এক তুজন,—
বাকি সব টুনটুনি চড়াই কড়িং চাতক গোবর্দ্ধন! •

শ্রী [illegible]

• উত্তর গোলা।

এভোরা

যে দিন গোয়ার সরকারী লাইব্রেরীতে এভোরার পুস্তকালয়ের পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত তালিকা পাঠ করি, সেই দিন হইতেই এভোরায় একবার যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু টাকা না থাকিলে কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না, আমার এই ইচ্ছা যে কোন দিন পূর্ণ হইবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তার পর যখন আশাতীতভাবে দানবীর রাসবিহারী ঘোষের প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডার হইতে একটি বৃত্তি পাইয়া পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবনে পৌঁছিলাম, তখন মনে হইল যে, এত দিনের ইচ্ছাটী হয় ত পূর্ণ হইতেও পারে। হয়, আমাদের মত পর্ত্তুগালের লোকরাও সময় সম্বন্ধে একটু বে-হুঁসিয়ার। সুতরাং ৭-১৫ মিনিটের সময় তিনি না আসাতে আমি বেশী বিশ্মিত হই নাই। বাড়ী হইতে ষ্টেশন মিনিট দশেকের পথ—পৌনে ৮টার রওনা হইলেও বেশ চলিবে। কিন্তু ৭৷৷০টার সময়ও যখন তিনি আসিলেন না, তখন আমি একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। বাড়ীর লোকরা তখনও নিদ্রিত। আমি ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলিয়া আমার সুটকেশটি হাতে করিয়া রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইলাম। তার পর আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া

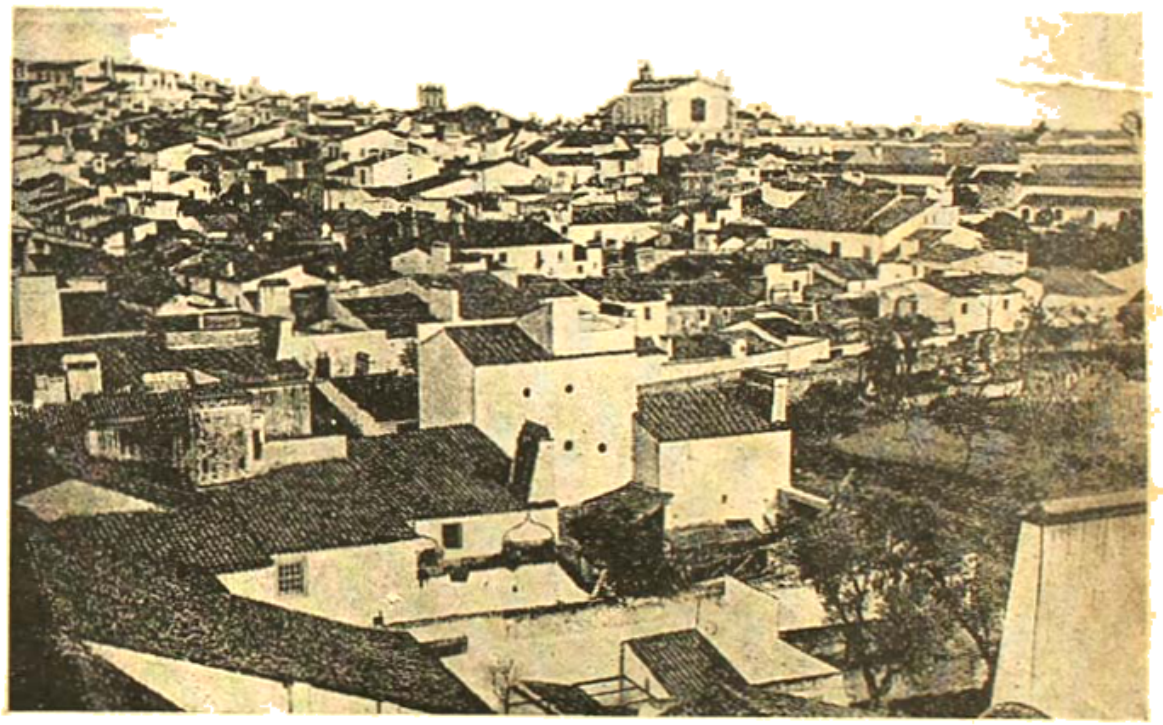

এভোরা সহরের সাধারণ দৃশ্য—দক্ষিণ

লিসবন হইতে এভোরায় রওনা হইতে হয় ভোর ৮টায়। কিন্তু খবরের কাগজের সকল অংশে সতর্কভাবে দৃষ্টি না দেওয়ায় সে দিন সকালে আমাকে বেশ নাকাল হইতে হইয়াছিল। আমার পর্ত্তুগীজ শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে কথা ছিল যে, ভোর ৭টায় সময় তিনি ট্যাক্সি লইয়া আমার বাড়ীতে আসিবেন, তার পর উভয়ে একত্র হইয়া ষ্টেশনে যাইব। আমার ঘড়ি অনুসারে যখন ৭৷৷০টা, তখনও তাঁহার দেখা নাই। গরম দেশের লোক বলিয়াই বোধ একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম। ষ্টেশনের ঘড়ির দিকে চাহিয়াই ত আমার চক্ষু স্থির। তখন মাত্র ৭টা বাজিয়াছে। য়ুরোপের অনেক দেশেই গ্রীষ্মকালে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের খরচ কমাইবার জন্য দিনের আলো থাকিতে থাকিতেই সকল কাজ শেষ করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাই গ্রীষ্মকালে তাহারা ঘড়ির কাঁটা ঠিক এক ঘণ্টা আগাইয়া দেন, আবার শীতকালে দিন ছোট হইতে আরম্ভ করিলে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছাইয়া

এস্তোরা সহরের সাধারণ দৃশ্য—উত্তর

দেন। আগের দিন খবরের কাগজে নোটীশ দেওয়া হইয়াছিল যে, ২রা অক্টোবর হইতে শীতের কালের হিসাবে ঘড়ি চলিবে। তাহা আমার জানা ছিল না। এ দিকে সময়মত মাষ্টার মশায়ও ট্যাক্সি লইয়া হাজির। দুইখানি গাড়ীর ভাড়া দিয়া অজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। তবে সুবিধার কথা এই যে, পর্ত্তুগাল গরীব দেশ। ওখানে গাড়ীভাড়াও ইংলণ্ডের মত অধিক নহে।

এস্তোরায় গাড়ী ধরিতে তেজো (Tagus) নদী পার হইয়া যাইতে হয়। য়ুরোপের নামজাদা নদীগুলি দেখিয়া প্রথম প্রথম বড়ই অশ্রদ্ধা হয়। বিলাতের টেমসও কোন

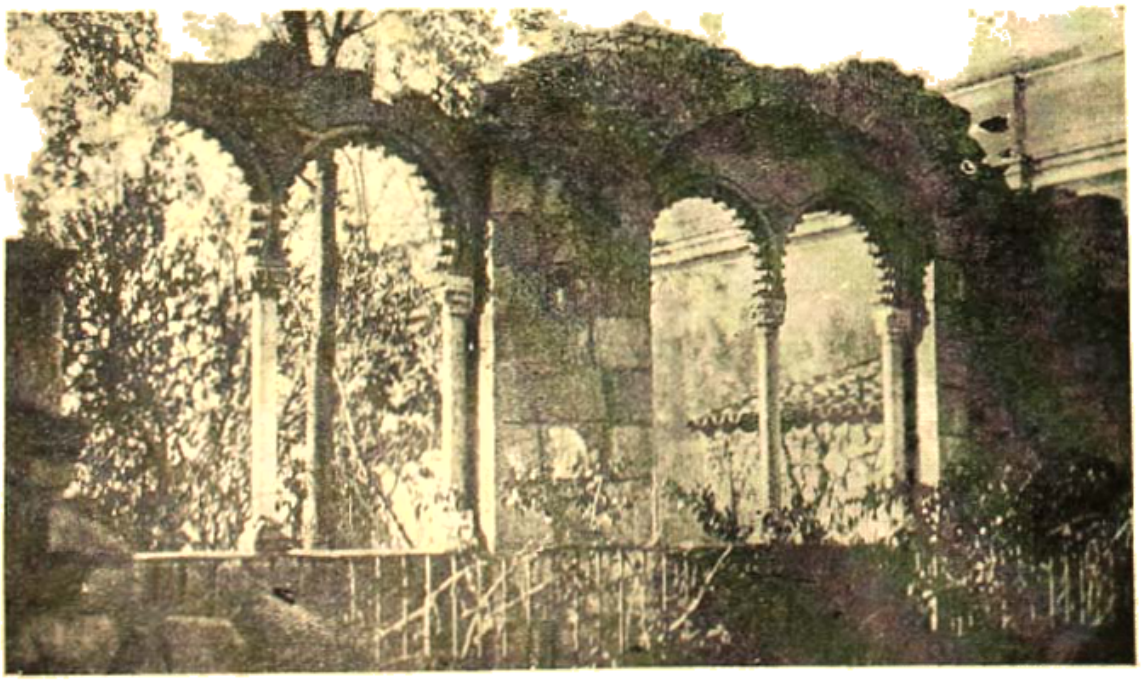

সাধারণ উদ্যানস্থ নকল ধ্বংসাবশেষ

কোন ব্যাপার আমাদের দেশের এক একটা গ্রামের মত। এভোরার পরিসর বা গভীরতা খুব বেশী বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু লিসবনের কাছে তেমন বেশ প্রশস্ত। রেল-কোম্পানীর ফেরি ষ্টীমারে পার হইতে প্রায় ১ ঘণ্টা লাগে। পর্ত্তুগালের রাস্তা-ঘাটগুলির অবস্থা যেমন মন্দ, গাড়ীও চলে তেমনই অত্যন্ত ধীরে ধীরে। সময় সম্বন্ধে ইংরাজের মত তাহাদের মোটেই তাড়াহুড়া নাই। সুতরাং ওপারের ষ্টেশনে গিয়া ঠিক এক ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হইল। সকাল-বেলায় খাওয়া হয় নাই। ১০টার আগে এভোরায় পৌঁছিতে পারিব না; সুতরাং ষ্টেশনের দোকান হইতে কতকগুলি বিস্কুট ও সময় কাটাইবার জন্য একখানা খবরের কাগজ কিনিয়া লইলাম।

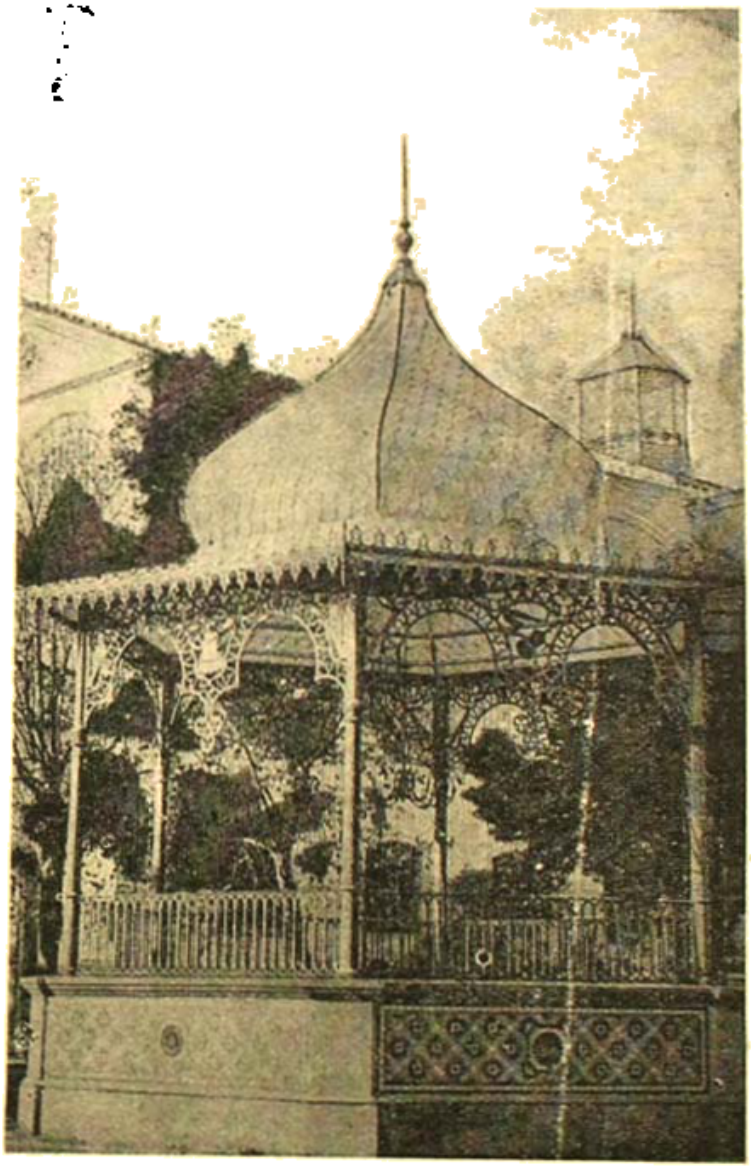

সাধারণ উদ্যানের ধাঙ্গাগার

পথে দেখিবার মত কিছুই নাই। রেল-লাইনের কাছের বাড়ী-ঘরগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, ইংরাজ ও ফরাসীর তুলনায় পর্ত্তুগীজরা কত দরিদ্র। সাধারণ খোলার চালের বাড়ী। কাদার লেপে পাথর জুড়িয়া দেওয়ালগুলি উঠানো হইয়াছে। সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের পায়ে জুতা নাই। পরনের কাপড়-চোপড়েও দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিস্ফুট।

এভোরা ষ্টেশনে পৌঁছিতে প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। আমার সঙ্গে মাত্র একটা সুটকেশ ও ছোট একটা এটাচেকেশ। অধ্যাপক ডেভিড লোপেস বলিয়াছিলেন যে, কোন একটা কুলীকে বলিলেই হোটেল এবরেসেসে পৌঁছাইয়া দিবে। অতএব একটা কুলী ডাকিয়া ছোট পথে হোটেলের সন্ধানে চলিলাম। হোটেল এবরেসেসই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হোটেল। ছোট সহর। হোটেলটিও নির্জ্জন এবং বোধ হয় একটু প্রাচীন। যাত্রীর ভিড় মোটেই নাই। বারান্দার চারিদিক একটা আঙ্গুরের লতায় ঢাকা। রেলিং এর উপরে আঙ্গুরের লতা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণে একটা নিমের মত গাছ। খাবার ঘরের পাশে একটা ঘুসর রঙ্গের কাকাতুয়া। হোটেলের কর্ত্রীর একটা বিড়াল ও দুইটি কুকুর অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিল। এক কথায় এ হোটেলটা মোটেই বিলাতী বা ফরাসী হোটেলের মত নহে। খাবার সময়ের তেমন কড়াকড়ি নাই। মোটের উপর বেশ একটু বাড়ীর মতন ভাব। সুতরাং সেই বেলা দুইটার খাওয়াও জুটিল।

সে দিন রবিবার, সুতরাং কাযের তাড়া ছিল না। এভোরা সহরটা একটা ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত, আয়তনে এত ছোট যে, মিনিট দশেক কোন দিকে চলিলেই সহরের বাহিরের ময়দানে পৌঁছান যায়। আমাদের হোটেলের ৩-তালার জানালা হইতেও এক দিকের মাঠ দেখা

যাইত। হাতে কিছু কাষ ছিল না, তাই সহরটা ঘুরিয়া দেখিতে বাহির হইলাম। পাহাড়ে-সহর বলিয়াই রাস্তাগুলি উঁচু-নীচু, কোন কোন যায়গায় পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য একবারে খাড়া সিঁড়ি তৈয়ার করা হইয়াছে। লিসবনের মত সমৃদ্ধ সহরে সিঁড়ির বদলে আধুনিক বিজ্ঞানের কৃপায় বৈদ্যুতিক lift-এর ব্যবস্থা হইয়াছে। হোটেল হইতে বাহির হইয়াই আবার ষ্টেশনের পথ ধরিলাম, আসিবার সময় পথের ধারে একটা বড় বাগান দেখিয়াছিলাম এবং তখনই মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম যে, বেলা দুর না হইলে ঐখানেই অবসরসময়ে একটু বেড়ান যাইবে।

সাধারণ উদ্যানের সদরদরজা

বাগানটি একটা উঁচু জমীতে অবস্থিত। সহরের রাস্তায় ধূলা ও আবর্জ্জনার অন্ত নাই। আফ্রিকার কাছে বলিয়াই বোধ হয় এভোরার অক্টোবর মাসেও খুব গরম পড়ে। সুতরাং এই বৃক্ষছায়া-সমন্বিত বাগানে সহরের লোকেরা সকাল-বিকাল, এমন কি, দ্বিপ্রহরেও ভটলা করিতে আসে। বাগানটি বেশ বড়। সর্ব্বদাই ঝাঁট দেওয়া ও জল ছিটান হইতেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট চৌবাচ্চা। রাস্তার দুই ধারে সিরীষ গাছের মত সরু পাতাওয়ালা একরকম গাছ, ঠিক মাঝখানে একটি বাস্তাগার। আর এক দিকে একটি প্রাচীন বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ তৈয়ার করা হইয়াছে (নকল ruins)। এই বাগানে আমাদের দেশের

ভাষা, দেশের মানুষ, এমন কি, দেশের জীবজন্তু বা গাছপালার প্রতিও আমাদের মনের কত বড় একটা অজানা টান রহিয়াছে, তাহা একবারে অপরিচিত সুদূর বিদেশে না গেলে অনুমান করা যায় না। কত দিন পর সন্ধ্যামণির সহিত সাক্ষাৎ, এমন প্রকাণ্ড স্বয়ম্বরসভার কোপ আমাদের দেশেও জন্মে না। ৪।৬ ঘণ্টার রেলে ঘোরার কষ্ট যেন ইহাদের দর্শনেই শেষ হইয়া গেল। এই বাগানে এক রকমের পাথরচোনার গাছ দেখিয়াছিলাম, তাহার কথা ও এইখানেই বলি। এই গাছের পত্রোদ্গম হয় ঠিক ফুলের কলিকার আকারে, পাতাগুলি জন্মে একটা একটা ডালের আগায়, আর বড় হইলে দূর হইতে ঠিক একটা সবুজ গোলাপের মত দেখায়। কিন্তু ফুলের আকারে সাদা পাতা এ গাছের আসল ফুল নহে। আসল ফুল ফুটে—পাতা যখন একবারে ঝরিয়া পড়ে। সন্ধ্যার ঘণ্টাখানিক আগেই ফটক বন্ধ হইবার ঘণ্টা পড়িল—সুতরাং সে দিনের মত বিদায় হইলাম। যে কয়দিন এভোরায় ছিলাম, প্রত্যহই সন্ধ্যায় ও সকালে এই বাগানে বেড়াইতে যাইতাম। কখনও বা প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইয়া নীচে আপেল ও আঙ্গুরের ক্ষেতে জল দেওয়া দেখিতাম, কখনও বা শাল পত্রপুঞ্জের অন্তরালে কূজনরত ছোট ছোট পাখীর দিকে চাহিয়া থাকিতাম

বাহির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই দেশের কথা মনে পড়িত, যাহার শারদ-গগনে সূর্য্যাস্তের শোভার তুলনা বুঝি কোথাও মিলে না।

বাগান হইতে বাহির হইয়া আবার সহরের রাস্তা ধরিলাম। হোটেলের কাছে আসিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একটা বেশ ফাঁকা জায়গায় পৌছান গেল। এই জায়গাটা এভোরার ঠিক কেন্দ্রস্থানে বলিলেই হয়। নাম Praca de geraldo বা জেরাল্দো স্কোয়ার। ছোট সহরের দোকান-পত্র, কারিখানা সবগুলি এইখানে। স্কোয়ার পাথর বাঁধান, বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া একটু জিরাইয়া লইতেছে। স্কোয়ারের মধ্যে capa (গাউন) গায় কয়েকটি স্কুল-কলেজের ছেলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধরণটা দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাহারা যে বেঞ্চের লোকগুলার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব, তাহা তাহারা এক মুহূর্ত্তও ভুলিতে পারে না।

এভোরার ঐশ্বর্য্যের অন্য কোনও আকর্ষণ এখন আর নাই। থিয়েটার ও বায়োস্কোপ আছে বটে, কিন্তু কোন বড় অভিনেতা এই দরিদ্র সহরে আসে না। এভোরার লাইব্রেরীতে প্রাচীন পুথি পড়িবার জন্য মাঝে মাঝে এখানে

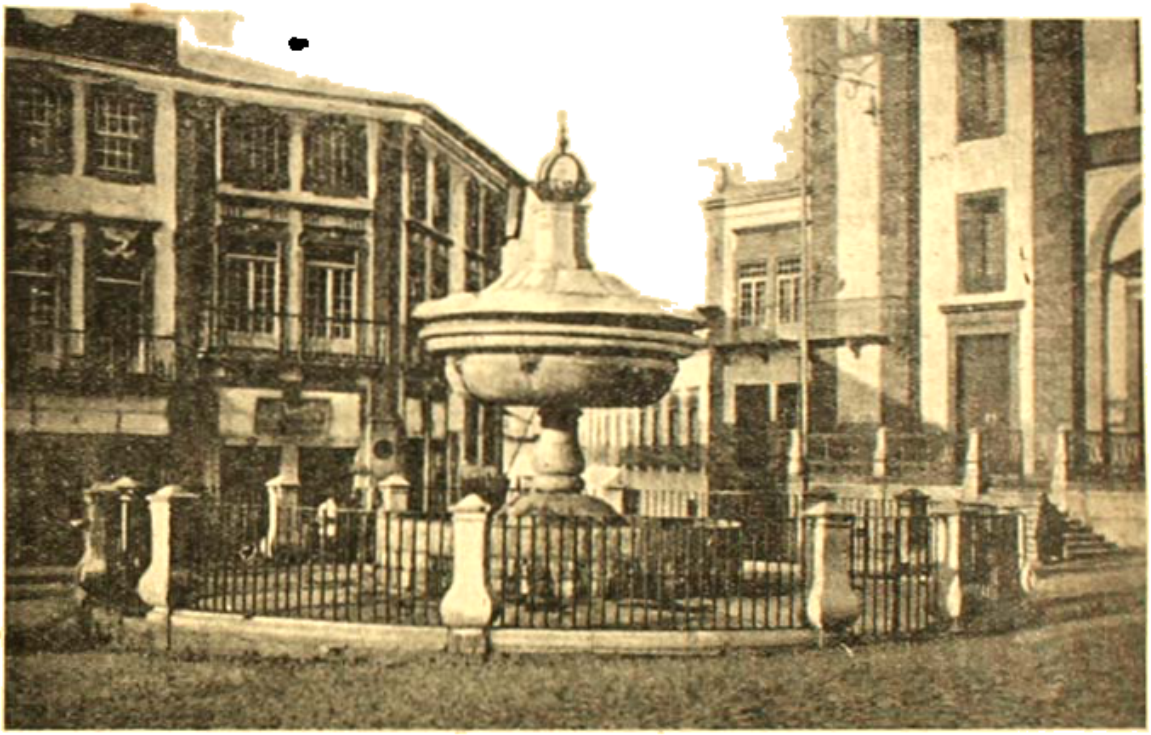

প্রাসা দো জেরাল্দোর ফোয়ারা

চারিদিকে কয়েকখানি লোহার বেঞ্চ—কিন্তু আমি যখন পৌছিয়াছি, তখন তাহার একখানিও খালি নাই। এ সহরটা যে বড়লোকের জায়গা নহে, তাহা বেঞ্চের লোকদের দেখিয়াই বেশ বুঝা গেল। ইহাদের বস্ত্রাদি ঠিক বায়স্কোপে দেখা দক্ষিণ-আমেরিকার ভাকাতদের পোষাকের মত। পরিধানে সরু কালো ইজার, গায়ে আটসাঁটা খাটো কোর্ত্তা, কোমরে একটা কালো কাপড় জড়ানো, মাথায় উঁচু টুপী, হাতে একটা লম্বা লাঠি। ইহাদেরই কাছে কাছে একটা ছেঁড়া জামা গায় ছোকরা গলায় বিবটের ফুড়ি ঝুলাইয়া খালি পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কখনও কখনও বা দুই এক জন বিদেশীর আগমন হয়। পর্ত্তুগীজ সাহিত্য ও পর্ত্তুগীজ ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের এখানে আসিতেই হইবে, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তথ্য-সঙ্কলনকারীরও একবার এভোরা আসা দরকার। সহরটা খুবই প্রাচীন। রোমান আমলের ডায়েনা দেবীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পুরাকালের অতীতে এখনও দেখা যায়। ইহা ছাড়া কয়েকটি মঠ ও গির্জ্জা ভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান বিশেষ কিছু নাই বলিলেই চলে। তাহার কথা পরে বলিব। এক সময়ে এ সহরে রাজা আসিতেন। জিল ভিসেন্তের কোন কোন নাটক এইখানেই রাজদরবারে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে পুস্তকালয়ের খোঁজে বাহির হইলাম। লিসবনের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ডেভিড লোপেজ এখানকার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ লোপেজ দে-সিলভার সতীর্থ। তিনি আমাকে একখানি পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার বন্ধুর বাড়ীর ঠিকানা জানেন না, কিন্তু এতোবার মত ছোট সহরে সকলেই সকলকে চিনে; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিয়া বাড়ী বাহির করিয়া লইতে অসুবিধা হইবে না। দেখিলাম, পথে যাহাদের সঙ্গে দেখা হয়, তাহারা অধ্যাপকদিগের বা অধ্যাপনার সম্বন্ধে পৌঁছাইয়া দিতেছি।" পথে চলিতে চলিতে সিপাহী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ফরাসী বলিতে পার? আমি এক আধটুকু ফরাসী ভাষা বুঝিতে পারি।" আমি বলিলাম যে, "আমার ফরাসী-জ্ঞান পর্তুগীজ অপেক্ষাও কম, তবে আমি ইংরাজী বলিতে পারি।" সিপাহী বলিল, "বাপ রে! ইংরাজী আমি মোটেই জানি না। লড়াই করিতে ফ্রান্সে গিয়াছিলাম, ফরাসী কিছু কিছু বুঝি। ইংরাজী তখন শুনিয়াছি খুবই, কিন্তু ও ভাষাটা বেজায় সিধুটে, আমার মগজে ঢোকে না।"

লাইব্রেরী খোলার কথা ১০টায়। কিন্তু কেরাণীরা

প্রাসা দো জেরালদো

বিশেষ কোন কৌতূহল পোষণ করে না। অগত্যা লাইব্রেরীর পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। এক জন বলিলেন যে, প্রাসা দো জেরালদোর কাছে একটা গলি বাহিয়া উঠিলেই একবারে লাইব্রেরীর সম্মুখে পৌঁছান যাইবে। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে গলি ভুল করা মোটেই বিস্ময়কর নহে। আর অন্য বিষয়ে কোন যোগ্যতা না থাকিলেও পথ ভুল করিবার বিশেষ পারদর্শিতা আমি দাবী করিতে পারি। সৌভাগ্যবশতঃ এক জন সিপাহীর সঙ্গে দেখা হইল। সে-ও লাইব্রেরীর দিকেই যাইতেছিল। আমার উচ্চারণ শুনিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে, আমি একবারে বিদেশী। সে বলিল, "চল, আমি তোমাকে একবারে ঠিক যায়গায় রোজ ঠিক সময় আসে না, কাজেই সময়মত খোলাও হয় না। ডাঃ লোপেজ দে-সিলভা স্থানীয় লিসিউর (কলেজের) অধ্যাপক। আগে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। প্রসিদ্ধ মার্কুইস পম্বালের আমলে তাহা উঠিয়া যায়। এখন এখানকার কলেজ হইতে ছাত্ররা উপাধি পরীক্ষা দিতে পারে। সে দিন কি একটা পরীক্ষা হইতেছিল। অধ্যাপক দে-সিলভা সেই জন্য লাইব্রেরীতে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার কলেজ লাইব্রেরী হইতে বেশী দূরে নহে। আমার কার্ড ও সুপারিস চিঠি পাইয়াই তিনি আসিলেন এবং প্রকাণ্ড পাঠ-কক্ষের মধ্যে একটা যায়গায় আমাকে বসাইয়া দিয়া লাইব্রেরীর ক্যাটালগ প্রভৃতি সমস্ত বুঝাইয়া

এভোরা লিসিউ (বিদ্যালয়)

দিলেন। পড়িবার ঘরে প্রায় শতাধিক পাঠকের স্থান হইতে পারে, কিন্তু ব্যবস্থা আছে মাত্র ১৬ জনের জন্য। তাহারাও বেশীর ভাগ আসনই খালি থাকে। মাঝে মাঝে দুই একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র আসিয়া ঘরে—উপন্যাস পড়িবার জন্য। সুতরাং লাইব্রেরীর কর্মচারীদের বিশেষ কোন কাজ থাকে না। গোয়ায় থাকিতে এখানে একখানা বাঙ্গালা হাতের লেখা পুথি আছে বলিয়া খবর পাইয়াছিলাম। আমি সর্ব্বপ্রথমেই সেই পুথির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পর্ত্তুগালে এখন অধিকাংশ লাইব্রেরী ও সরকারী দপ্তর-সমূহের যে অবস্থা, তাহাতে আমার মনে মনে একটু আশঙ্কা

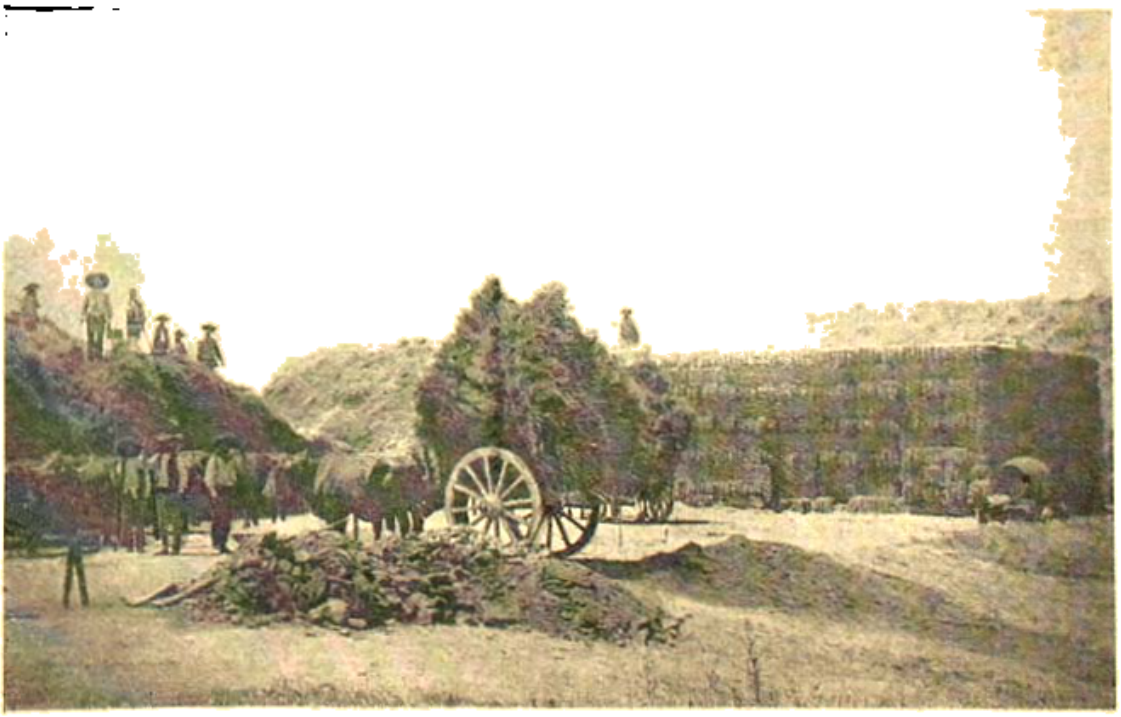

ছিল যে, হয় ত পুথিখানা না-ও পাওয়া যাইতে পারে। প্রধানতঃ এই পুথির খোঁজেই এতোরা গিয়াছিলাম, অতএব এতৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে বোধ হয় এই গ্রন্থই এতোরা গ্রন্থাগারের প্রধান সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পর্ত্তুগীজরা বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিল। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত বঙ্গের বিপুল সম্পদের বিবরণ-সংবলিত একখানি চিঠি লিসবনের তোরে দে তোম্বো বা সরকারী মহাফেজখানায় আছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ফাদার আলভারো দা কস্তা বাঙ্গালা-দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার একখানি পত্র এতোরার লাইব্রেরীতে কুঙ্গারিডারা সঙ্কলিত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যাইবে। পাদ্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি চট্টগ্রাম নামক একটা চরে বহু খৃষ্টান দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহারা বহু দিন যাবৎ কোনও পাদ্রীর সাক্ষাৎ পায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এতোরানিবাসী পাদ্রী মানুয়েল দে আসুনসাঁও প্রচারব্যপদেশে বাঙ্গালাদেশে আইসেন। তাঁহার আড্ডা ছিল ঢাকার সন্নিহিত ভাওয়ালে। তিনি নিজে বাঙ্গালাভাষা শিখিয়াছিলেন এবং প্রচারকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে হইলে অন্যান্য মিশনরীরই বাঙ্গালাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা দরকার বিবেচনায় স্বয়ং দুইখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই দুইখানি গ্রন্থের নাম Cathecismo da Doutrina Christan ordenado por modo de Dialogo em idioma Bengalae Portuguez বা ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ এবং Vocabulario em idioma bengalae portuguez dividido em duas partes। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির প্রথম ভাগে বাঙ্গালা ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ভাগে বাঙ্গালা ও পর্ত্তুগীজ অভিধান সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থই ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিসবনে ক্রাসিসকো দে-সিলভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম গ্রন্থখানি ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সেকালে পর্ত্তুগালের ছাপাখানায় বাঙ্গালা হরফ তৈয়ার হয় নাই। তাই পাদ্রী-রচিত বই দুইখানির বাঙ্গালা অংশও রোমান (ইংরাজী) হরফে লেখা হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় অজ্ঞ পাদ্রীদিগের সুবিধার জন্য বামদিকের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও ডানদিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্ত্তুগীজ অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল। ক্রেপার শাস্ত্রের একাধিক সংস্করণ হইয়াছিল, প্রথম সংস্করণের ললাটে লেখা আছে—

রোম মানুয়েলের প্রাসাদে

Crepar Xastrer Orth Bhed, Xixio Gurur Bichar, Fr Manoel da Assumpcam liqhinasen, o buzhninssen Bengallate Bnsll dexo, xon hazar xat xoho pointix bossor christor xormo bade Bhetton corilo boro thacurque D. Fr Miquel de Tovora Evorar xohorar Arce bispo Lisboate Francisco da Sylvar Xase

Paixaon quitaber xap. sorma. Xhot Zorino bostore 1743 xocol uchitei hucame.

"কেরাণীর শাস্ত্রের অর্থাৎ, শিশুশিক্ষার বিচার, যেই মানুষে না আসুক্‌সীয়ে লিখিয়াছেন ও ছাপাইয়াছেন,

বড় গির্জার অভ্যন্তর

বঙ্গালাতে, ভাওয়াল দেশে, সন ১৭৩৭ সাতাশে পঁচত্রিশ বঙ্গের খৃষ্টের জন্মবাদে, ভেটন করিলো রবো ঠাকুরকে দোম্ যেই বিগেল যে তাভোরা এভোরার শহরের আরও বিশপো, লিসবোয়াতে ফ্রান্সিসকো দা সিলভার সাথে, পাতশাহের কিতাবের ছাপ ছোরিনিয়া খৃষ্টের জন্ম বঙ্গের ১১৬১ সকল উচিতের হুকুমে।" ইহা হইতেই পাদ্রী মহাশয়ের বাঙ্গালায় খানিকটা নমুনা পাওয়া যাইতেছে। পাদ্রী মানুয়েল সম্বন্ধে এই দুইখানি গ্রন্থ ছাড়া আর কোনও খবর জানা যায় না। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত বিসেণ্টে বাকোলো মাসারো প্রণীত Bibliotheca Lusitanaতে তাহার নাম ও কেরাণীশাস্ত্রের অনুবাদের কথা আছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইনোসেন্সো ফ্রান্সিস্কো দা সিলভা তাঁহার Diccionario Bibliographico Portuguezeএ পাদ্রী মানুয়েল বিরচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধানের খবর দিয়াছেন। তিনি লিসবনের এক দোকানে ইহার এক খণ্ড দেখিয়াছিলেন এবং এভোরার গ্রন্থাগারে এক খণ্ড আছে বলিয়া সংবাদ পাইয়াছিলেন।

পাদ্রী মানুয়েলই বোধ হয় এভোরায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে আর একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লইয়া গিয়াছিলেন। এখানিও dialogo বা কথোপকথনের আকারে লেখা হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় পাদ্রী বলিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি তাঁহার লেখা নহে, বুদ্ধদাস ব্রাহ্মণের কোন আত্মীয়ের ইহার রচয়িতা। এই খৃষ্টান ভদ্রলোক হিন্দু ও খৃষ্টানদিগের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ধর্ম্ম তত্ত্বে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই বইখানির কথা পর্ত্তুগালেরও পর্ত্তুগীজ পণ্ডিত কুহ্না রিভারা তৎসঙ্কলিত এভোরা পুস্তকাগারের হস্তলিখিত পুথির তালিকায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। বইখানি পাদ্রী মানুয়েল পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বের মত এ বইখানিরও বাঙ্গালার অংশ রোমান হরফে লেখা। দুইখানি কথোপকথন গ্রন্থের সঙ্গেই পাদ্রী মানুয়েলের নাম বহিভাগে সংশ্লিষ্ট থাকায় অনেকেই ভুল করিয়াছেন যে, এ বইখানিও ছাপা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ সুনীতিকুমার তাঁহার উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে আবার হুইলের কথার উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে, রোম আক্কাদেমিয়ার গ্রন্থও ছাপা হইয়া গিয়াছে। আবার হুইল নিজে বোধ হয় এই পুথি কখনও দেখেন নাই, তাঁহার এক জন

স্পেনীয় বন্ধুর নিকট হইতে এতৎসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই স্পেনীয় ভদ্রলোক মানুয়েল-লিখিত গুরুশিষ্য-সংবাদের (ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ) সহিত আন্তোনিয়ো-লিখিত ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের গোলমাল করিয়া থাকিবেন। মানুয়েল বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিচারে আ ন্তো নি য়ো র গ্রন্থ মিশনারীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। আন্তোনিয়োর গ্রন্থের ভাষা মানুয়েলের ভাষা অপেক্ষা স্বভাবতঃই বিশুদ্ধ এবং এই গ্রন্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দশাবতার, তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার ভারতবাসী ও বাঙ্গালী। পাণ্ডুলিপির পত্রসংখ্যা ১২০। ইহার মধ্যে প্রায় ৮৫ পৃষ্ঠা আমি নকল করিয়া আনিয়াছি। স্থানান্তরে ও সময়ান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে কেবল গোড়ার ও শেষের দিকের কয়েক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

দোনা ইসাবেলার তোরণ—এতোরা সহরের একটি প্রাচীন দরজা

DIALOGO

Brahmane—Tomi care bhoso?
Rom—Pormexorere Purno Barmere.
B. Tobe tomora boro utom bhosona bhoso; amora tahare bhnoi.
R. Zodi tomora xei Purno Bromere bhoso; tobe queno eto cubit cudhoram nana odhormo bhosona deqhi.
B. Tomi emot guiamonto hoin amardiguer Poromexorere ninda coroho? Ehate tomardigur xastre eparniman nahi.
R. Amar-ghore xastre lighinsen ze zon dhormo ninda core, xe boro naroqui; ebona ze zon odhormere dhormo bole xe moha naroqui.

ব্রাহ্মণ। তুমি কারে ভজো?

রোমান। পরমেশ্বরেরে—পূর্ণো ব্রহ্মের।

ব্রা। তবে তোমরা বড়ো উত্তম ভজনা ভজো, আমরা তাহারে ভজি।

রো। যদি তোমরা সেই পূর্ণো ব্রহ্মেরে ভজো, তবে কেনো এতো কুবিত (কুরীত?) কুধরন নানা অধর্ম্ম ভজনা দেখি?

ব্রা। তুমি এমত জ্ঞা ন)মন্ত হ ই য়া আমারদিগের পরমেশ্বরেরে নিন্দা করহ? এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অ প নি বা প (অপরিণাম?) নাহি?

রো। আমারগোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, যে জন ধর্ম্মো নিন্দা করে, সে বড়ো নারকী; এবং যে জন অধর্ম্মেরে ধর্ম্মো বলে, সে মহানারকী।

গ্রন্থ শেষ হইয়াছে এই ভাবে—

R. Emot bhomo cotha ar na cohio, ar tirtho care coho taha buzhai.
B. Dhorile zog xar toto caron.

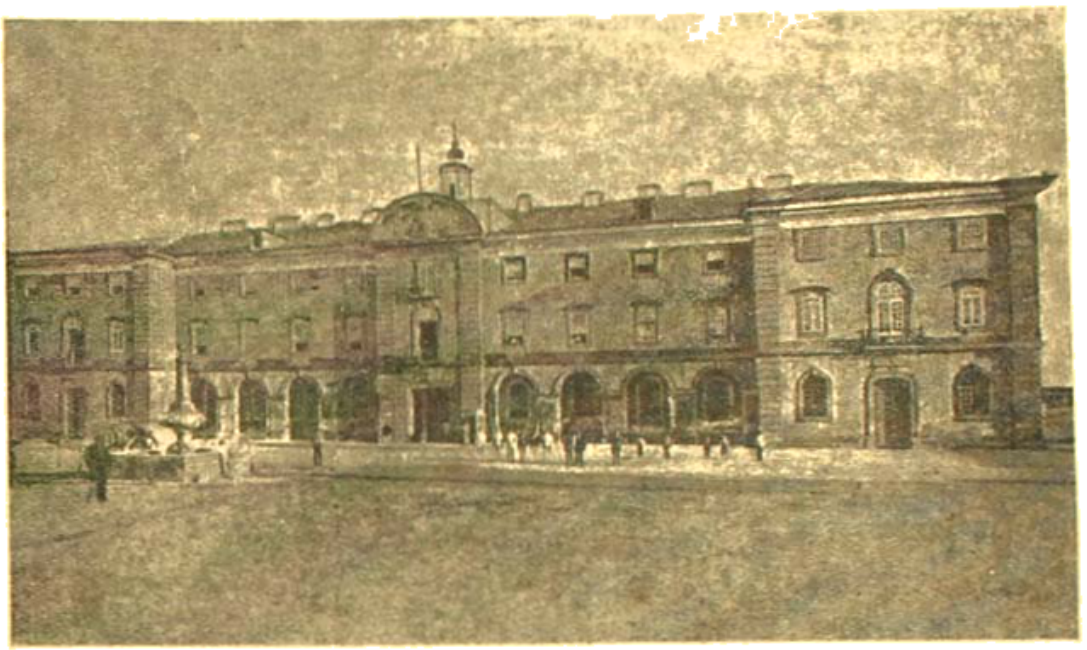

সেনা-নিবাস

R. Axa bes Daicuchu dhhang poixonio heo hoe bhoer cormo buzhio caron.
Te carone omuq dhorile he o moxirpalon Zormo cono din Mongolbure Brormo itiadi xober buzhio palou.
Apone Brormer mohima xrystti heo bicharon.

দেখা যাইতেছে যে, বিচার শেষ না করিয়াই গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা যে পূর্ব্ববঙ্গের, তাহা বলাই বাহুল্য, এমন কি, 'জ' ও "ঝ"এর অনুলিপি হইয়াছে Z ও Zh দিয়া। তবে পাদ্রীর হাতে পড়িয়া দুই এক যায়গায়

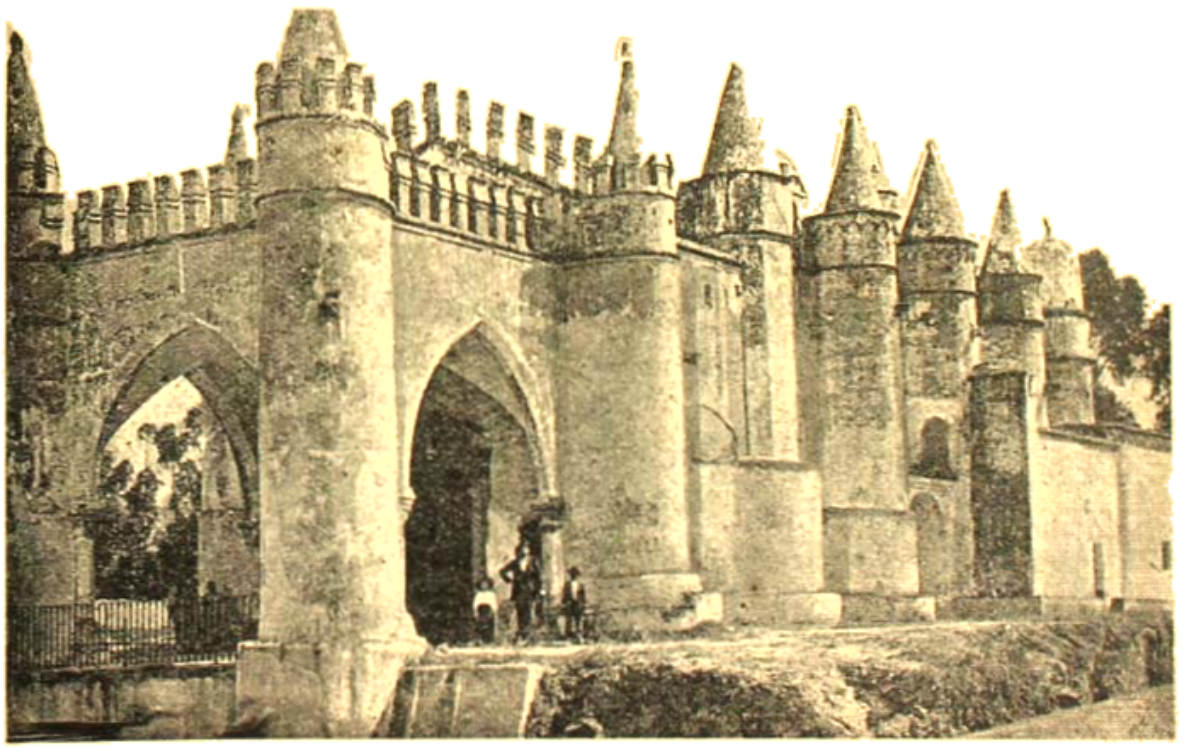

দাঁতের রাজ আশ্রম

দুই একটা শব্দের চেহারা খানিকটা বদলাইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের রচনাকাল বোধ হয় ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কারণ, পাদ্রী মানুয়েল ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে বোধ হয় বাঙ্গালাদেশে ছিলেন, ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লিসবনে তাঁহার গ্রন্থ ছাপা হয়। অতএব এই সময়ের মধ্যে তিনি স্বদেশে গমন করিয়া থাকিবেন এবং এভোরার বড় ঠাকুরের গ্রন্থালয়ের জন্য এই অমূল্য বাঙ্গালা গ্রন্থ লইয়া যাইয়া থাকিবেন। আজ দিশপের গ্রন্থালয়ই এভোরার সাধারণ লাইব্রেরী বা Bibiliotheca Publica Evorenseতে পরিণত হইয়াছে।

মানুয়েলের 'ক্রেপার শাস্ত্রের' একখানি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিও এই লাইব্রেরীতে আছে। তাহার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু তাহার আলোচনার স্থান ইহা নহে। এই পাণ্ডুলিপির শেষ ভাগেই একখানি অসমাপ্ত অভিধানের কিয়দংশ পাওয়া যায়। ইহাতে বাঙ্গালা ব্যতীত আরও দুই ভাষার পর্ত্তুগীজ শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। এই অভিধানখানির সঙ্গে পাদ্রী মানুয়েলের কোন সম্পর্ক ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ মারাঠা জাতির ইতিহাসসম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান্ চিঠিপত্র এই লাইব্রেরীতে আছে। কিন্তু তাহার কথা বিস্তারিত বলিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যাইবে।

লাইব্রেরীর নীচের কক্ষেই আর্কিয়োলজিকাল মিউজিয়ম। ইহাতে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। রোমান যুগের দুই একটা পাথর ব্যতীত আর সকল জিনিষই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পাঠাগারের সন্নিহিত কক্ষে অনেক প্রাচীন মুদ্রা আছে। লাইব্রেরীর অনতিদূরে চিত্রশালা। এখন ইহার অবস্থা তেমন ভাল নহে। ৭৮খানা আধুনিক ছবি ও ৭৮টি আধুনিক প্রস্তর-মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু অধ্যাপক দা-সিলভা বলিলেন যে, চিত্রশালার আগে অনেক ছবি ছিল। ভূমিকম্পে বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর আর টাকার অভাবে তাহার ফ্রেস্ক মেরামত করা হয় নাই। এভোরার মত ছোট সহরে যে পুরাতত্ত্ব ও আধুনিক শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহাই আমার নিকট বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিয়া মনে হইল। বাঙ্গালা দেশের ও রকম সহরে এ সকল বালাই মোটেই নাই।

হোটেল এবরেন্সিসে তখন অনেক সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহাদের এক জনের চেহারা অনেকটা ইংরেজের মত এবং তাঁহার সঙ্গিনী যে এভোরাবাসিনী নহেন, তাহা

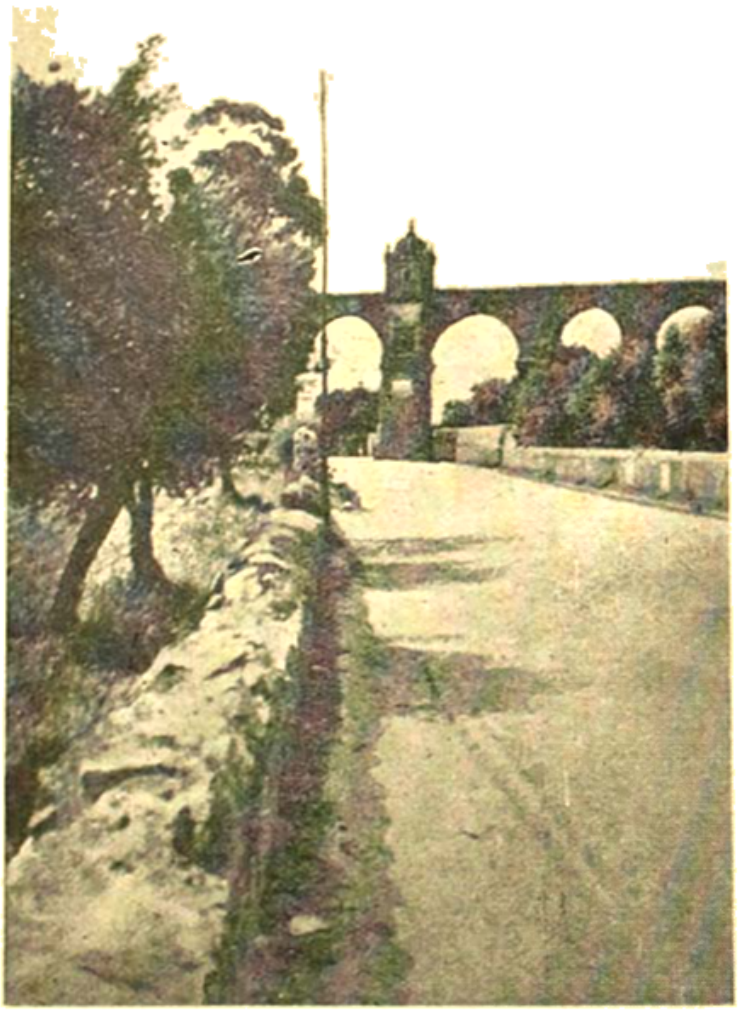

জলবাহক নল

প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায়। এক দিন তাঁহাদিগকে ইংরাজীতে কথা বলিতে শুনিয়া বড়ই কৌতূহল হইল। তাহার পর হঠাৎ মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি ইংরাজ আর ভদ্রলোকটি (তাঁহার ভ্রাতা) পর্টুগীজ হইলেও তাঁহার মাতা ইংরাজ-রমণী। সুতরাং তিনি ইংরাজী বলিতে পারেন।

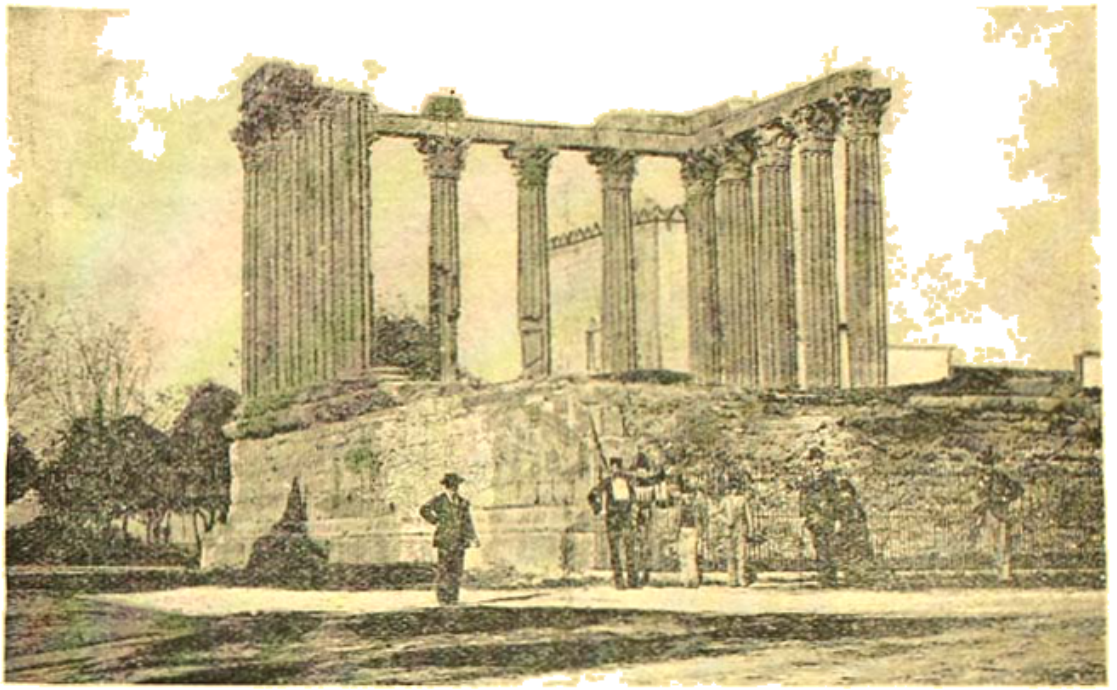

ডায়না মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হইবার পরই তিনি আমাকে তাঁহার ভ্রাতা (cousin) কাপ্তেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। কাপ্তেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি এভোরার ক্যাথিড্রাল ও সেখানকার রত্ন-খচিত ক্রুশ প্রভৃতি দেখিয়াছি কি না। ক্যাথিড্রালের নিকট দিয়া নিত্য ৩।৪ বার যাইতে হইত, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করি নাই। ইংরাজ মহিলাটি বলিলেন যে, Igreza dos Ossos বা অস্থিমন্দির যে থা ও

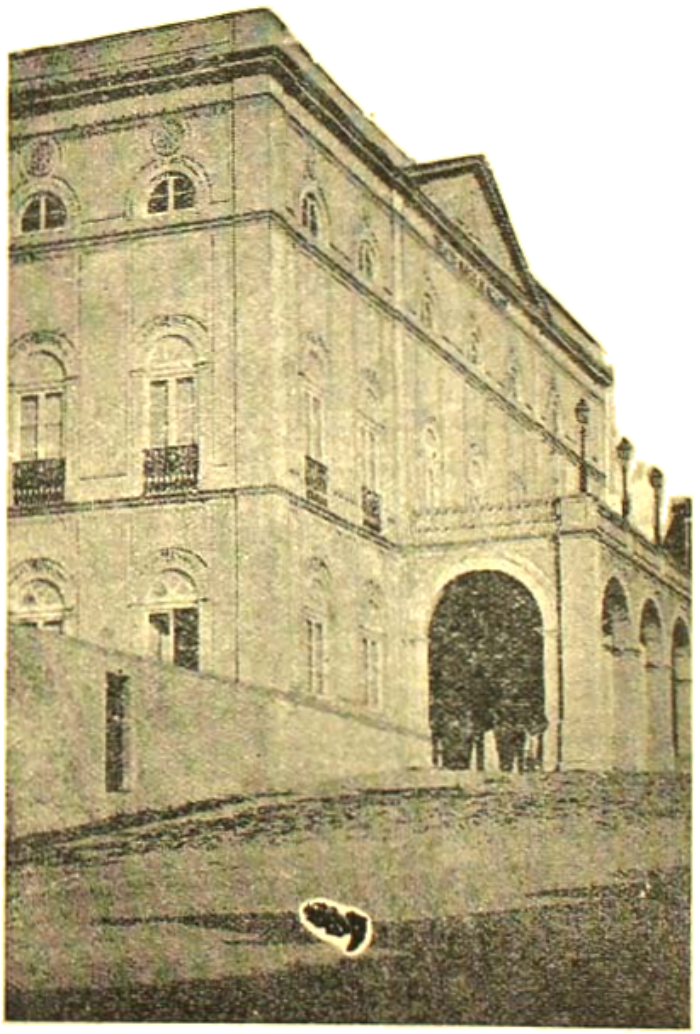

পরদিন প্রভাতেই এই দুইটি স্থান দেখিতে বাহির হইলাম।

অস্থিমন্দির এভোরার উদ্যানের নিতান্ত নিকটে। গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া অসাধারণ কিছুই দৃষ্টিতে পড়িল না। অন্যান্য রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জার মত ইহার অভ্যন্তর সুন্দর কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ, বেদী ও মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত। যীশু ও মেরীর মূর্ত্তির নিকট কয়েকটি মহিলা নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন। এক কোণে এক জন স্থবির যাজক নতশিরে একটি

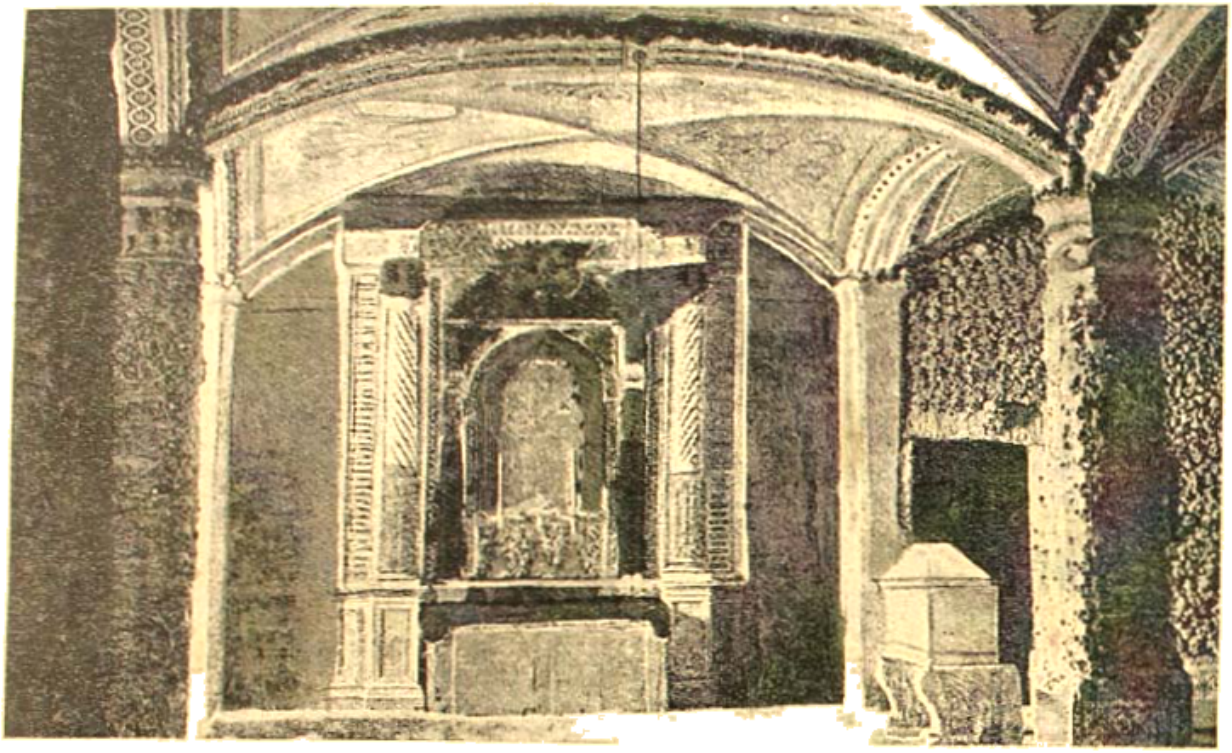

অদ্বি-মন্দির

শুনিতেছেন। এ রকম গায়গায় আসিলে স্বভাবতঃই মনে ভক্তির উদ্রেক হয়। কিন্তু আমি সেখানে গিয়াছিলাম কৌতূহল লইয়া। হাড়ের নাম-গন্ধও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা এক জন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, অস্থিমন্দির দেখিতে পারি কি না? দুইটি ছোট ছোট অন্ধকার ঘর অতিক্রম করিয়া একটা প্রশস্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া ভৃত্য আমাকে বলিল,"এই দেখ অস্থিমন্দির।" সেখানে আলোকের এতই অসদ্ভাব যে, হঠাৎ অদূরে প্রাচীরসংলগ্ন মূর্ত্তি ছাড়া

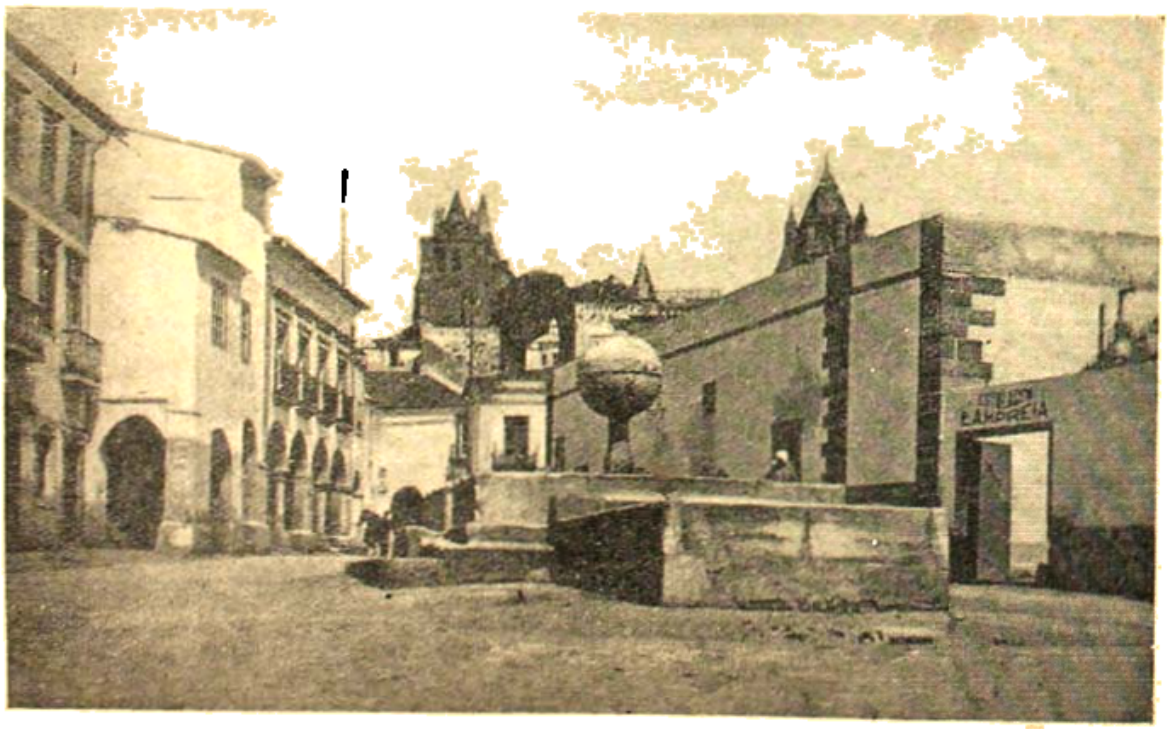

কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর অন্ধকারে চক্ষু একটু অভ্যস্ত হইলে দেখিতে পাইলাম, গৃহটির প্রাচীর ও স্তম্ভ অস্থি ও নরকঙ্কাল দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সমান আকারের কতকগুলি অস্থি বাছিয়া বাছিয়া শক্ত করিয়া গাঁথিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটা নরমুণ্ড বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথা হইতে এত কঙ্কাল আসিল, ধর্ম্মমন্দিরের প্রাচীর কেন অস্থিতে নির্ম্মিত হইল, তাহা কেহই জানে না। আমার বিস্ময় মনে হয় যে, যখন ধর্ম্মোন্মত্ত খৃষ্টানরা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, তখনই এই প্রাচীর ও স্তম্ভের উপকরণ সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষে বা এসিয়ার অন্য কোথাও এ রকমের মন্দির থাকিলে পাদ্রীরা বোধ হয় বর্ব্বর জাতির নৃশংসতার কথা ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন।

কাসতুষা আশ্রম

ক্যাথিড্রাল বা বড় গির্জ্জা গথিক রীতিতে নির্ম্মিত। ইহার অভ্যন্তরটি বড়ই সুন্দর। কিন্তু কোনেগো বা ক্যানন মহাশয় কাযে ব্যস্ত থাকায় রত্নখচিত ক্রুশ আর দেখা হইল না। ভাস্কো দা গামার সুস্মৃতি অর্থে লিসবনের জিরোনিমো গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এভোরার গির্জ্জার রত্নরাজিও বোধ হয় এসিয়া ও আফ্রিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

১৫ দিন এভোরায় থাকিয়া রাত্রি ১টার সময় লিসবনে ফিরিলাম। সেই গভীর রাত্রিতে টীমার যখন ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন দেখি যে, মাষ্টার মহাশয় আমার অপেক্ষায় তেজোর তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। পর্ত্তুগীজ ভদ্রলোকদিগের নিকট যে সৌজন্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি, জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না।

উদ্ভিদের বিদ্রোহ

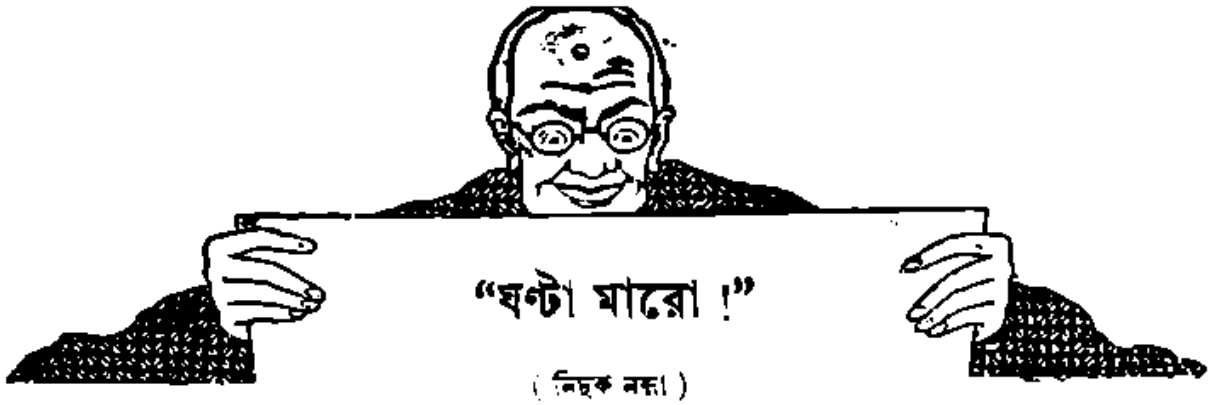

"ঘণ্টা মারো !"

(নিছক নক্সা)

হাতে কিছু পয়সা আছে, কিন্তু কাজকর্ম্ম নাই। এরূপ অবস্থায় দিনগুলো নিতান্ত দুর্ভর হইয়া পড়ে। সভা-সমিতি, নিমন্ত্রণ-ভোজ, ট্রাম-ট্যাক্সি, বায়স্কোপ-থিয়েটার সমবেত চেষ্টাতেও চব্বিশটা ঘণ্টাকে অতীতের অন্ধকূপে ঠেলিয়া দিতে পারে না। তাই সময় সময় রেলগাড়ীর আশ্রয় লই, কিন্তু আজ আমি কলিকাতা হইতে পলাইতেছি আমাদের নবা নভেলিষ্ট বাণীবাহনের হাত এড়াইতে। উপাধিমণ্ডল মহাসভা শীতলাবাহনের পরিবর্ত্তে কুক্ষণে ইঁহাকে খেতাব দিয়াছিল বাণীবাহন। সস্তার খবরের কাগজে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই, "আজ বৈকালে বাণীবাহন গড়ের মাঠে চায়ণ করিবেন।" "অদ্য বাণীবাহনের বাড়ীতে চা'র সহিত কচুরী ও জিলাপীর আদ্যশ্রাদ্ধ।" এমনই কত উদ্ধৃত করিব ? তবে পলাইতেছি কেন ? ইঁহার সহিত এক দিন আলাপ করিতে বসিলে তর্জ্জনীর খোঁচা খাইয়া সাত দিন পাঁজরার ব্যথা মরে না ; ইনিও পাঁজরায় তর্জ্জনীর খোঁচা না দিয়া কথা কহিতে পারেন না। পূর্ব্ব-ইঙ্গিতমত আমার ভৃত্য আসিয়া যেমন সংবাদ দিল, বাণীবাহন আসছেন, আমিও অমনি খিড়কীর দ্বার দিয়া—ঘণ্টা মারো !—সোজা হাওড়ায় রওনা। পৌঁছিয়াই দেখি, "বর্দ্ধমান লোক্যাল" ষ্টেশন ছাড়িবার জন্য অধীর হইয়া ফোঁস-ফোঁস করিয়া—আধুনিক ভাষায়—ফুঁসিতেছে। আমি টিকিট কিনিয়া গাড়ী চাপিয়া বসিলাম। পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়িল—"ঘণ্টা মারো !"

বিছানায় ছারপোকা, বাহিরে মশা, জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ, পাঠক কখনও এরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন কি ? আমার সে দিন তাই হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের গাড়ীতে উঠিলাম, কিছু দূরে প্লাটফরমে কি একটা গোল হইতেছিল, মুখ বাড়াইয়া তাহাই দেখিতেছি, এমন সময় সমস্বরে সম্বোধন শুনিলাম, আরে ভায়া যে ! চাহিয়া দেখি, হলধর খুড়ো এবং জলধর খুড়ো !

নাম শুনিলে মনে হয়, ইঁহারা দুই সহোদর ; ভগবান্ জানেন ! তবে উদরপূর্ত্তিতে ইঁহারা পরস্পরে যে পরস্পরের সহকর্ম্মী ও সহধর্ম্মী, তাহা হলপ করিয়া বলিতে পারি। ইঁহাদের দুই জনের অগম্য স্থান নাই—অগ্রাহ্য আহার নাই এবং অপরিহার্য্য লজ্জা নাই। পরিচিতমাত্রেই ইঁহাদের বলে "খুড়ো" আর পরিচিতমাত্রকেই ইঁহারা বলেন "ভায়া।" ভোজনে ইঁহাদের অশিক্ষিতপটুত্ব, তাহা সংগ্রহ করিবার নৈপুণ্য অসামান্য এবং নিখরচায় রেলপথে চলাচল করিবার কৌশল অগণ্য। তবে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব না কি বিধি-নির্দ্দিষ্ট, তাই ইঁহারা সে বিধি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। খুড়োদ্বয়ের পরস্পরে একটু বিশেষত্ব ছিল। হলধর বক্তা, জলধর নীরব শ্রোতা। বক্তা শুনিয়া পাঠক মনে করিবেন না, হলধর খুড়ো "সাভাবিক" অর্থাৎ সভাসমিতির বক্তা। ভোজন, নিমন্ত্রণ প্রভৃতি যোগাড় করিতে ইঁহাকে কখনও কখনও কিছু কিছু বাক্যব্যয় করিতে হয়। জলধর খুড়ো মুখ খোলেন মুখে কিছু দিবার নিমিত্ত, নহিলে বড় একটা নয়। কথা কহিবার বিশেষ প্রয়োজন হইলে তিনি হাঁ করেন, পরক্ষণেই অভ্যাসবশতঃ তাঁহার হাত আপনা হইতে মুখে উঠিয়া যায়, কি ভাবিয়া খুড়ো চুপ করিয়া থাকেন। তবে কখন কখন অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখ দিয়া দুটো একটা কথা বাহির হইয়া পড়ে।

সৃষ্টি সম্বন্ধে হলধর খুড়োর একটিমাত্র আক্ষেপ ছিল ; বলিতেন, সারা পৃথিবীটি যদি একটি মিষ্টান্নের পিণ্ড হইত এবং তিনি একমাত্র জীব তাহার উপর বসিয়া সেটিকে সাবাড় করিয়া একবারে স্বর্গরাজ্যে অমৃতভাণ্ড নিঃশেষ করিবার নিমিত্ত চলিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে—

সারা পৃথিবীটা একটা মিষ্টান্নের পিণ্ড হইলে সেটিকে সাবাড় করিয়া স্বর্গরাজ্যের অমৃতভাণ্ড নিঃশেষ করিতে পারিতেন! কিন্তু তাহা হইলে যে কি হইত, তাহা তাঁহার মুখে কখন শুনি নাই।

জলধরের কল্পনার এরূপ বিশালতা ছিল না। তিনি বলিতেন, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাকে একটু ইঙ্গিত করিলে সৃষ্টির অনেক মাল-মশালা তিনি বাঁচাইয়া দিতে পারিতেন। বিধাতার আর যাহাই গুণ থাক, মিতব্যয়িতার সার্টিফিকেট তাঁহাকে দেওয়া যায় না। এই যে জঠরপিণ্ড, ফুস্-ফুস্, প্লীহা, যকৃৎ, হৃদ্ভাণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি নিরর্থক কতকগুলো যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন, এর কি দরকার ছিল? এক পাকস্থলীতেই সব কায চ'লে যেত।

আমাদের হলধর খুড়ো আর জলধর খুড়োর জোড়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাই ইঁহারা পরস্পরে জোড় বাঁধিয়াছেন। বোধ হয়, কয়েক দিন পূর্ব্বে কোথায় ইঁহারা বুদ্ধদেবের অভিনয় দেখিয়াছিলেন। আমি যখন ট্রেণে উঠিলাম, তখন সমস্বরে ইঁহারা গাহিতেছেন—

কিসে পেলে খাই, কোথা গেলে পাই
নিমন্ত্রণ পেলে—না পেলেও যাই:
কিসে কিসে চাই, যত পাই খাই
কোথায় তলায়, ভাবি গো তাই।

আমি গাড়ীতে উঠিতেই উভয়ে সমস্বরে বলিলেন, আরে ভায়া যে! আমি তৎক্ষণাৎ বুক-পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম, রেস্ত কত আছে; কেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাড়ীভাড়া বল, খাওয়া বল, ইঁহাদের আত্মনেপদ কোনটাই নাই, সব পরস্মৈপদ। যাক্, আমিও বোরিয়া-হইয়া জাঁকিয়া বসিলাম, বাণীবাহনকে ত ফাঁকি দিয়াছি। গাড়ী চলিতে লাগিল, খুড়োরাও গানে ও গাড়ীর জাঁকানীতে ক্ষুধা শাণাইতে লাগিলেন। আমি কোথায় যাইব, বাগ, বিছানা, লগেজ কোন কিছু না লইয়া কেনই বা ব্যাধ-বিতাড়িত শিকারের মত গাড়ীতে উঠিলাম? দেখিলাম, সে সম্বন্ধে ইঁহাদের কোনই কৌতূহল নাই। উভয়েই দেখিলেন, আমার পকেট শূন্য নয়—ব্যস্, এই পর্য্যন্ত!

টিকিট দেখিবার ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে হলধর খুড়ো লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন; জলধর খুড়ো তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন; ট্রেণ থামিল, পরীক্ষক গাড়ীতে উঠিল, একটি ভদ্রলোক দেখাইবার জন্য টিকিট বাহির করিতেই জলধর খুড়ো চিলের মত ছোঁ মারিলেন এবং Sick Brother sir, My Examine first, noble sir, Railway Chief sir বলিয়া পরীক্ষকের সম্মুখে মুষ্টিভর মাল ধরিলেন। কিরিঙ্গী হইলেও পরীক্ষক একটু ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু তোমার ভাই হায়?

না বড় সাহেব, আমার কেউ নয়। টিকিট কিন্‌তে গিয়ে দেখি, পাচ্ছে না, আমি কিনে দিলুম, এই পেয়ে বস্‌ল; আমার কাঁধ ধ'রে ধ'রে গাড়ীতে এসেই শুয়ে পড়ল।

টিকেট হায় ত?

সে কি টীক সাহেব, আমি নিজে হাতে কিনে দিয়েছি।

আচ্ছা, হামার ডিউটি আছে, একবার দেখি।

জলধর খুড়ো বলিলেন, কি জানি হেড সাহেব, আছে কি হাত থেকে পড়েই গেছে।

টিকিট-সাহেব হলধর খুড়োর কাছে গিয়া মুখের চাপা খুলিয়া ডাকিলেন, বাবু, টিকেট।

আর যাবে কোথায়! ওয়াক্—ওয়াক্! হলধর কখন্ যে মুখে জল পুরিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং বিধাতারও

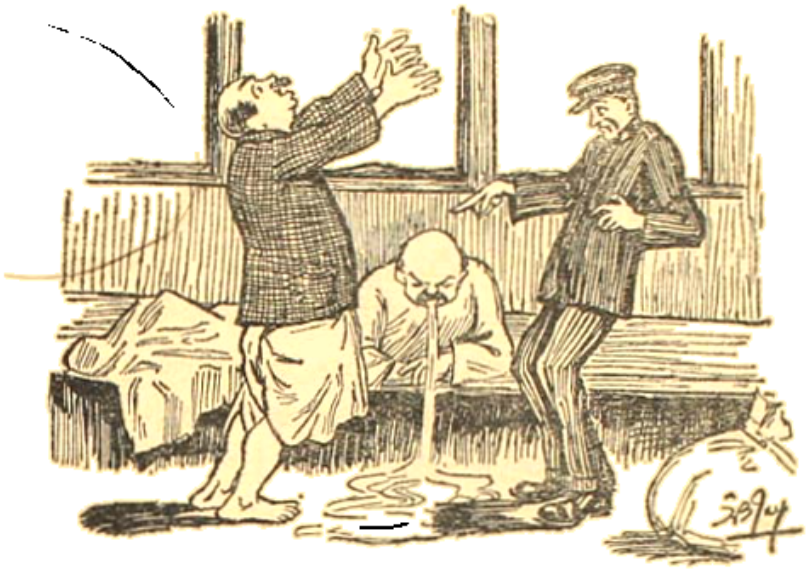

ওয়াক—ওয়াক !—টিকিট-সাহেব কয়েকপদ হটিয়া আসিয়া বলিলেন "কলেরা"

অগোচর। টিকিট-সাহেব কয়েক পদ হটিয়া আসিয়া বলিলেন, কলেরা।

শুনিয়াই জলধর খুড়ো সাহেবকে জড়াইয়া ধরিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কৌশলে তাঁহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে দরজার দিকে লইয়া গেলেন। "ঘণ্টা মারো !"—তখনই গাড়ী ছাড়িল। খুড়ো লুঠের ধন মালিককে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, টিকিট কিন্‌তে আছে মশায় !

ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কি মশায় ! টিকিট কিন্‌তে নেই কি রকম ? সে ত জুয়াচুরী।

সহসা জলধর খুড়োর দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। কি বল্‌লেন ? কথাটা আর একবার বলুন। আপনার পায় পড়ি, মশাই ! বলুন, আর একবার ! জুয়াচুরী ? আমি জুয়াচোর ! তা হ'লে মারুন আমায় জুতো ! মারুন, মশাই, মারুন, মারুন ! বলিতে বলিতে খুড়ো তাঁহার এক পাটি জুতা খুলিয়া লইলেন।

কি করেন, মশাই, কি করেন ? আমায় ক্ষমা করুন, মশাই ! আর কখন এমন কথা বল্‌ব না।

আর আমায় দেখা পাবেন কোথা যে বল্‌বেন, মশাই ? বলিয়া জলধর খুড়ো তাঁহার জুতাপাটি এমন ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন যে, সমস্ত বুচ্‌কি-বোচ্‌কা, গাঁটরী-পুঁটলের ভিতর হইতে সেটাকে টানিয়া বাহির করিতে অন্ততঃ তিন দিন সময় হলধর খুড়ো উঠিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া সীটে বসাইয়া বলিলেন, আপনি কি বল্‌ছেন ? সমস্ত রাজত্বটা চল্‌ছে জুয়াচুরীর ওপর দিয়ে, আর এই নিরস্ত্র বিবস্ত্র দেশে একখানা টিকিট না কিন্‌লেই জুচ্চুরী ! লজ্জা করে না ? ওয়ারেন হেষ্টিং যখন কাশীযাত্রা করেন, টিকিট কিনে গিয়েছিলেন না কি ? আপনি যদি কোন ইতিহাসে তাঁর টিকিট কেনা দেখাতে পারেন ত আপনার জুতা খাবো। বলিয়া হলধর খুড়ো বাকী পাটি ধরিলেন।

করেন কি, করেন কি, মশাই ! আপনারা ত আচ্ছা লোক দেখছি ! আমার ঘাট হয়েছে, মশায় ! সে পাটি ত কোথায় গিয়ে পড়েছে, তার ঠিক নেই !

হলধর খুড়ো বলিলেন, নাই হইল ঠিক। যখন জোচ্চোরের হাতে পড়েছেন, তখন ত যাবেই ! কিন্তু মশাই, আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান আছে। আপনাদের নীতিপাঠের দর্শ নয়, যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞান আছে। আমি আপনার জুতো খুঁজে নিয়ে আপনার হাতের জুতো খেয়ে তবে গাড়ী থেকে নাম্‌ব। আপনি কোন্ ষ্টেশনে নামবেন ?

তারকেশ্বরে।

দেবতার স্থানে যাবেন জুতো প'রে ? উঃ, দেশ গেল, জাতি গেল, ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল ! কিছু রইল না !

তা যা'ক্ মশাই ! একটু সবুর করুন, জুতো খুঁজি।

কি, আমরা ফেলেছি জুতো, আপনি খুঁজবেন ?

খুঁজিতে খুঁজিতে জুতা একটা বুচ্‌কীর আড়াল হইতে বাহির হইল। দুই পাটি মিলাইয়া হলধর বলিলেন, "দু' পাটিই এক রকম দেখছি। কোথা থেকে কিনেছিলেন ?

ডিগিনের দোকান থেকে মশাই, ছ' টাকা দাম নিয়েছে।

তা'র দোষ কি ? দিলে নেবে না কেন ?

সে কি মশাই ! জুতো কিনে দাম দেব না ?

দেন, আপনার সখ। কিন্তু দিতে আপনি বাধ্য নন।

বাধ্য নই কি রকম ? সে ব্যবসাদার। জিনিষ কিনে দাম দেব, তার আবার সখ কি ?

আপনার মত সৌখীন অনেক আছেন—যারা টিকিট না কিনে ট্রেণে চড়েন না, হার না দিয়ে জিনিষ কিনেন না! ভাড়া না দিয়ে ভাড়াটে বাড়ীতে থাকেন না!

ইতোমধ্যে জলধর খুড়ো হলধরের হাত হইতে জুতার অন্য পাটি লইয়া নিজের পায় দিয়া দেখিলেন। বলিলেন, বাঃ, ঠিক আমার পায়ের মত! যেন কয়মাস দিয়ে তৈরি! একটু লম্বায় বড়। তা ক্রমে ক্রমেই ছোট হয়ে যাবে। কি বল ভায়া!

ভায়া সে কথার কোন উত্তর না করিয়া বলিলেন, ও কি দেখ্‌ছেন মশায়, জুতো ত আর পালাবে না!

আমি মনে মনে ভাবিলাম, জুতো অবশ্য পালাবে না। কিন্তু যে পা দু'খানার সঙ্গে আপাততঃ সে সদ্ভাব করেছে, তার প্রেমে যে কুলত্যাগিনী হবে না, তার ঠিক কি! ঠিক তাহাই হইল। হলধর খুড়ো ভদ্রলোকটিকে নীতিকথা শুনাইতে লাগিলেন; কিন্তু যার যেখানে বেদনা, সেইখানেই তার হাত। সেওড়াফুলীতে ট্রেণ থামিতেই জলধর খুড়ো নামিয়া পড়িলেন। ভদ্রলোক চেঁচাইয়া বলিলেন, কোথা যান মশাই, জুতো দিয়ে যান, আমি যে এখনই নাম্‌বো।

আস্‌ছি আস্‌ছি, বলিয়া জলধর খুড়ো ভীড়ে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ষ্টেশনে দিনের মত আলো হইলেও রাত্রি-কালে ভদ্রলোক জলধর খুড়োকে ভীড়ের ভিতর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, দেখুন দিকি মশাই, কি লাহনা! আমাকে এখনই নাম্‌তে হবে!

হলধর বলিলেন, তা আপনি নামুন না।

খালি পায়ে?

না, ওর ঐ চটি প'রে! যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর হবে।

আরে মশায়, ও একটা ছেঁড়া চটি!

হ'লই বা চটি, আর হ'লই বা ছেঁড়া! স্বদেশের হিতার্থে আপনি এইটুকু স্বার্থত্যাগ করতে পারেন না?

আরে রাখুন মশাই, স্বদেশের হিতার্থে! কি নাম ওর? ওকে আপনি চেনেন?

কস্মিন্‌কালেও না। কে ও? ভারী আত্মসম্ভরি লোক ত। তা মশাই, আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ও ঠিক আপনার বাসায় পৌঁছে দেবে। কোন ভাবনা নেই!

কেমন ক'রে জান্‌লেন?

উনিও এক জন আপনার মত সৌখীন।

যান মশাই, এ ঠাট্টা নয়।

আজ্ঞে না, এ জুতো।

তখন গাড়ী ছাড়িবার দ্বিতীয় ঘণ্টা দিয়াছে। ভদ্রলোক অগত্যা জলধর খুড়োর ছেঁড়া চটি পরিয়া নামিয়া পড়িলেন এবং ঠিক ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে খুড়ো আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখের ভাব যেন কিছুই হয় নাই। খুড়োকুলের বিশেষত্ব এই, ইঁহাদের কথায়, কাযে বা মুখের ভাবে কখন বিজয়গর্ব্ব প্রকাশ পায় না। অতি নিরীহ ভালমানুষটির মত জলধর খুড়ো গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। গাড়ী ছাড়িল, কিন্তু জুতার মমতা লোক সহজে ছাড়িতে পারে না। ট্রেণ যখন ছাড়িয়াছে, ভদ্র-লোকটি খুড়োকে দেখিয়া গাড়ীর সঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। হলধর হাঁকিয়া বলিলেন, করেন কি, করেন কি মশাই! ছাই জুতোর জন্য কি প্রাণ খোয়াবেন!

নশায়, ছুড়ে ফেলে দিন। এই নিন্ আপনার চটি, বলিয়া সে ভদ্রলোক জলধরের চটি গাড়ীর ভিতর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। হলধর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

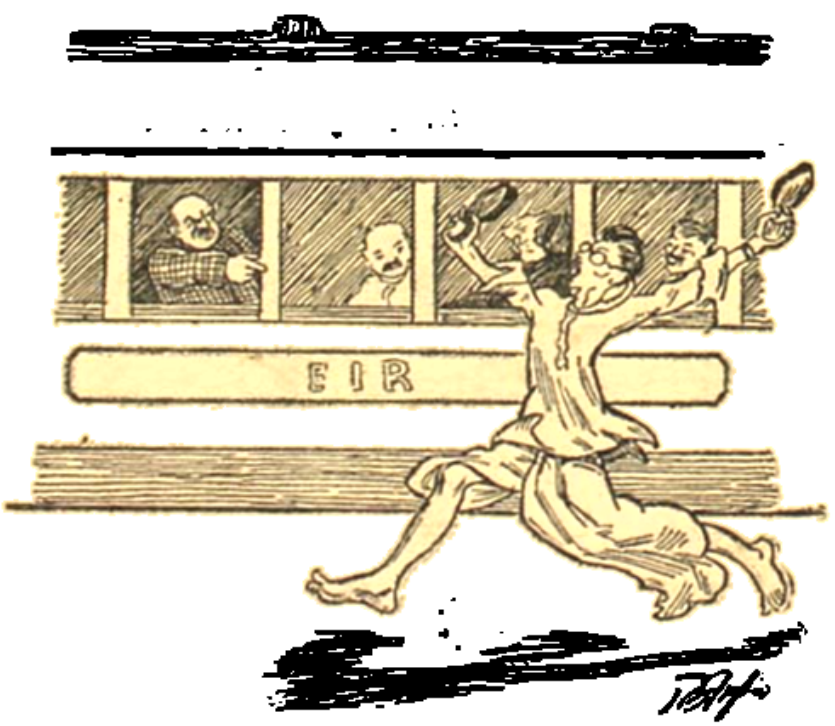

করেন কি, করেন কি মশাই! ছাই জুতোর জন্য কি প্রাণ খোয়াবেন!

দেখ ভায়া, দেবতা প্রত্যক্ষ! কিছুতে ছুতো দিয়ে তারকেশ্বরে ঢুকতে দিলে না। বাবা! সেখানে জল-জীয়ন্ত মুকুন্দ ঘোষ আছেন—সাক্ষাৎ কালভৈরব! শিবতুল্য স্থান!

জলধর খুড়োর তখন নাক ডাকিতেছে,—কিন্তু দুই চোখই খোলা! ঘোড়া দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়, খুড়ো আবার চোখ মেলিয়া ঘুমান! এ দিকে কত বেদনা, কত আনন্দ, কত আশা, উদ্বেগ, আশঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা, কত দুর্ভেদ্য দুরভিসন্ধি বহন করিয়া নিবিড় জমাট-বাঁধা অন্ধকারকে আলোকের তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত করিতে করিতে ট্রেণ চলিতে লাগিল। হলধর খুড়ো মুগ্ধ হইয়া তাহাই দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন, দেখ দেখ, ভায়া, গাড়ী বর্দ্ধমানে যাচ্ছে কি না! আশ-পাশের সব মাঠ ঠিক যেন সীতাভোগ, আর খালা টপ্ টপ্ গিল্‌ছে!

ব্যাণ্ডেলে গাড়ী থামিল। এতক্ষণ দুই খুড়ো আর আমি মাত্র গাড়ীতে ছিলাম। এই ষ্টেশনে ট্রেণ ছাড়িবার মুখে হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রায় সাত জন লোক গাড়ীতে উঠিলেন। হলধর খুড়োর প্রশ্নে তাঁরা উত্তর দিলেন, সকলেই বর্দ্ধমানের যাত্রী। এই সময় প্লাটফরমে ডাক উঠিল, পান—জলখাবার! নবাগত দলের এক ব্যক্তি ডাকিলেন, এই পান—জলখাবার! ছাঁচি পান আছে?

হায় বাবু।

দেও দু'পয়সার, বলিয়া ভদ্রলোক তাহার খালার উপর ঠক্ করিয়া একটা ডবল পয়সা ফেলিয়া দিলেন। বিক্রেতা অতি ধীরে একটি শালপাতার মোড়ক তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া 'পান—জলখাবার' হাঁকিতে হাঁকিতে একটু বেশী রকম তৎপরতার সহিত প্রস্থান করিল। দলের কেহ বলিলেন, বড় গুরুভোজন হয়েছে, আমাকে ভাই দুটো দিস্।

এ দিকে বাবুটি গাড়ীর আলোর নীচে আসিয়া উত্তমরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মোড়কটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এ যে গজা! এমন সময় আবার "ঘণ্টা বারো!"—গাড়ী ছাড়িল।

পানের বিক্রী বেশী। গজার খদ্দের কম। মূল্য হস্তগত করিয়া চতুর বিক্রেতা নির্ব্বিঘ্নে অবিক্রয়ের মাল গছাইয়া দিয়াছে! হলধর খুড়ো টপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, গজা! কক্‌খনো না!

আজ্ঞে হাঁ, এই দেখুন না! পাড়াগেঁয়ে ব'লে কি আর আমরা গজা চিনি না মশাই!

হলধর খুড়ো বাবুর হাত হইতে মোড়কটি লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিলেন, তাই ত! গজা বলেই ত মনে হচ্ছে। কৈ দেখি! বলিতে বলিতে অর্দ্ধখণ্ডের অন্তর্দ্ধান! তাহার পর চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, তাই বটে—গজাই ত বটে!

কৈ দেখি, দেখি! বলিয়া হঠাৎ জলধর খুড়ো উঠিয়া অপরার্দ্ধ গালে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, হুঁ, গজাই বটে! বলিয়া আবার তৃপ্তির সহিত চিবাইতে লাগিলেন, আর নবাগত দল সতৃষ্ণ নয়নে হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। তাঁহাদের ভিতর এক জন ছিলেন রসিক। তিনি বলিলেন, যা হ'ক্, গজা দিয়েছে ত, গাঁজা ত নয়!

অপর এক ব্যক্তি কহিল, স্থানটা বড় নুন মশাই।

হলধর বলিলেন, শুনছ ভায়া! এতক্ষণে এঁরা ষ্টের পেলেন, স্থানটা নুন!

জলধর তখনও গজার জাবর কাটিতেছিলেন, কোনই উত্তর দিলেন না।

হলধর জিজ্ঞাসিলেন, নিবাস?

বর্দ্ধমানে।

ব্যাণ্ডেলে আসা হয়েছিল কি গজা কিনতে?

না মশায়! বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে। তা খাবার পর পান দেবার একটা প্রথা আছে মশাই। আমরা ত দিয়ে থাকি। এঁরা দিলেন না। ভাবলুম, দেরী করি কেন? ষ্টেশনে কিনে খাব। তা দেখুন বিপত্তি! স্থানটা অতি দুষ্ট!

হলধর বলিলেন, দুষ্ট ব'লে দুষ্ট! টিকিট কিনেছিলেন কোথা থেকে? সেই এক জন বেড়ে বেচ্‌ছিল ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ! কেন বলুন দিকি?

আর ব'লে কি হবে?

বলুন না মশায়! আপনি দেখছি অতি ভদ্রলোক! বলুন না! আমরা কারুর কাছে ভাঙ্গব না।

দেখ্‌বেন মশায়! হাঙ্গেমা ঝাওয়া-আসা করতে হয়, ওঁদের কোপদৃষ্টি পড়লে—

রাম রাম! গুরুর দিব্যি মশায়, আমরা কাউকে কোন কথা বল্‌ব না।

দেখ্‌বেন! লোকটা বেজায় জোচ্চোর। করে কি জানেন, পুরানো টিকিট নতুন ব'লে চালায়। তিনবার জেল খেটেছে। তবে মুরুব্বীর জোর—

ভয়ে নবাগত দল অভিভূত হইয়া বলিল, আমাকেও কি পুরানো টিকিট দিয়েছে না কি মশায়?

না দেখলে কি ক'রে বলি! ইংরেজের আইন বড় শক্ত। দশ বার চুরি ক'রে ধরা পড়েছে ব'লে যে এবারও সে চুরি করেছে, এমন কথা নয়।

যাই হ'ক মশায়! আপনি আমাদের টিকিটগুলো দেখুন!

নেহাতই আমাকে জড়াবেন! আচ্ছা, দিন!

তাহারা গোছা করিয়া সাতখানি টিকিট খুড়োর হাতে দিল। হলধর বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া জলধরকে বলিলেন, ওহে ভায়া, এইবারে বাছ জাঁতিকলে পড়েছে।

জলধর দাঁড়াইয়া উঠিয়া একবারমাত্র হাঁ করিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন।

যিনি পান কিনিতেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসিলেন, জাঁতিকল কি মশাই? খুলে বলুন না! আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক—

ক'টি টাকাই মাটী! বলিয়া খুড়ো টিকিট কয়খানি ট্যাঁকে গুঁজিলেন। এ সব আর বছরকার আজকের দিনের টিকিট। এ বাবাল আমি ছাড়বো না মশায়! বেটাকে বাগে পেয়েছি। আপনারা এখন মাথামুড় খুঁড়লেও আর এ টিকিট দিচ্ছিনি। সে দিন বড় সায়েব বল্‌ছিলেন না, তোমরা কেবল কোম্পানীর অন্ন ধ্বংস করছ, চুরি ধরতে পারছ কৈ?

তা হ'ক মশায়! আমাদের টিকিট ক'খানা দিন।

টিকিট দেব কি মশাই! বেশী গোল করেন ত আপনাদের সুদ্ধ ধ'রে চালান দেব! এ কি চালাকি না কি? কোম্পানীকে ফাঁকি! আর আমরা তাঁর অন্ন খাই। চুপ ক'রে বসুন। কথাটি কবেন না। বর্দ্ধমানে নেমে আপনাদের ক'জনের সাক্ষী ডায়ারী করিয়ে ছেড়ে দেব।

এই দলের এক জন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, দোহাই মশাই, শেষ যেন মজাবেন না!

মজাব না! মজাই ত আমি—যাক্, আর দিব্যি করব না। মজাব মশাই! কিন্তু আপনাদের নয়, সেই মিয়াকে। 'বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যেয়ো ধান।'

আমি বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, সংসারে স্পর্দ্ধিত প্রগল্‌ভতা একটা বড় মূল্য ধন! নবাগত দল আঠার মত খুড়ো-যুগলকে জড়াইয়া ধরিল। গাড়ী চলিতে চলিতে কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, খাজা এবং মিহিচুর এর ভিতর কোন্‌টা খেতে খেতে আগে মুখ মেরে দেয়—খুড়ো-যুগল তাহাই পরীক্ষা করিতে বর্দ্ধমানে যাইতেছেন! নবাগত দলের ভিতর যিনি একটু মুরুব্বীগোছের—হলধর এবং জলধর তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্ব লইলেন, এ সকল মিষ্টান্ন কাহার দোকানে উৎকৃষ্ট প্রস্তুত হয়। বাবুটির সহিত সে মহলার পরিচয় আছে কি না এবং পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন কি না।

বাবুটি সোৎসাহে উত্তর দিলেন, খুব পারি, খুব পারি! শুধু পরিচয় কি? আমার নাম করলে জীবন ময়রা একশো টাকার মাল অমনি ছেড়ে দেবে।

হলধর বলিলেন, তবে ত মশাই, আপনাকে ছাড়ছি নি। নূতন কুটুমবাড়ীর তত্ত্ব, আপনাকে জামীন থাকতে হবে। জিনিষ খারাপ হয়—

খুব! খুব! বেটাকে দাম ত দেবই না, উল্টে দোকান তুলে দেব।

এই ত চাই মশাই! বেটারা তা হ'লে শাসনে থাকে।

গাড়ী ক্রমে বর্দ্ধমানে আসিয়া থামিল। খুড়োরা

তিনখানি টিকিট লইয়া মুরুব্বী বাবুটির সহিত বাহির হইয়া গেলেন। দলের বাকী কয়েক জনকে বাকী টিকিটগুলি দিয়া বলিয়া গেলেন, আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন, আমরা আসছি। পাঁচ জনে তিনখানি টিকিট লইয়া কি উপায়ে যে রেল-কোম্পানীর হাতে রক্ষা পাইবেন, ভাবিয়া পাইলাম না। তারের বেড়া ডিঙানো ছাড়া আর উপায় কি! ঘণ্টাখানেক পরে দেখি, তাঁহারা একে একে সেই ব্যাপারেই নিযুক্ত। এক জন ঘুমন্ত চাপরাশী সেই সময় "হেই" করিয়া উঠাতে কাঁটা-তারে এক জনের চাদর আটকাইয়া গেল! 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'—বাবুটি এই শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ দিয়া পলায়ন করিলেন। বর্দ্ধমানের রাজপ্রাসাদ, সোলাপবাগ, শ্যামসায়র, কৃষ্ণসায়র এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বমঙ্গলা দেখিবার যে বিশাল কল্পনা আমার মানসে জাগিয়াছিল, খুড়োশ্বশুরের শুভাগমনে ট্রেণ পাশ করিবার পর ষ্টেশনের আলোর মতই তাহা নিবিয়া গেল! আজ রাত্রিতে ইঁহারা সেই মুরুব্বী বাবুটিকে বলি দিবেন, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু কাল? সীতাভোগ, খাজা ও মতিচুরের মধ্যে মুখ মারিবার শক্তি কার কতটা, তাহা যে ইঁহারা এক দিনে নির্ণয় করিতে পারিবেন, তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, সে বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য আমি আর অপেক্ষা করিলাম না। যৎকিঞ্চিৎ জলযোগান্তে কয়েক ঘণ্টা এক-খানা বেঞ্চের উপর শয়ন করিয়া রাত্রি তিনটার ট্রেণে আবার কলিকাতা রওনা হইলাম।

মধ্যশ্রেণীর সে কক্ষে একমাত্র আমি আরোহী। বেঞ্চের উপর লম্বমান হইতেই স্বপ্ন দেখিলাম, যেন হলধর খুড়োর কপালে একটি শিং গজাইয়াছে এবং নির্ব্বিঘ্নে সেটিকে উদ্গত করা যায় কি না, জলধর খুড়ো সোলুপ নেত্রে তাহাই দেখিতেছেন। কিন্তু মনের আশঙ্কা কি শরীরী হইয়া স্বপ্নে দেখা দেয়! নহিলে ঠিক সেই গাড়ীতে বাণীবাহন কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল! তিনি আসিবামাত্র আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলাম স্বপ্ন। কিন্তু তথাপি কিছুক্ষণ ধরিয়া আমার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, আর ঘুমাইতে সাহস হইল না, পাছে স্বপ্নে আবার সে মূর্ত্তি আসিয়া দেখা দেয়। বেঞ্চে বসিয়া লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে মাঠপানে চাহিয়া রহিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ৪টা। ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শশী চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বনীকৃষ্ণ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে। রাত্রির নিথর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ট্রেণের সশব্দ গতি সমস্ত প্রান্তরকে যেন বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। মাঠের বৃহৎ বৃক্ষগুলা সবেগে তাড়িয়া আসিতেছে এবং সংঘর্ষ হইবার পূর্ব্বেই অপরাধী যান ছুটিয়া পলাইতেছে। এমনি চলিতে চলিতে মনে নাই কি একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। দুই এক জন উঠিল, দুই এক জন নামিল। পরক্ষণেই ষ্টেশন-মাষ্টার ঘুমভাঙ্গা জড়িত কণ্ঠে হাঁকিলেন, "ঘণ্টা মারো!" এই ঘণ্টা মারো শব্দটি ট্রেণ চালাইবার অমোঘ মন্ত্র। ইহার প্রয়োগ আমি কখন নিষ্ফল হইতে দেখি নাই। পিতা, মাতা বা প্রণয়িনীকে শেষ দেখা দেখিবার নিমিত্ত দারুণ রৌদ্রে গলদর্ঘ্মকলেবরে গাড়ী ধরিবার জন্য হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়াছে,—"ঘণ্টা মারো!" তোমার নৈরাশ্যকাতর চক্ষুর উপর উপহাসের অট্টহাস্য করিয়া এই নিষ্ঠুর দানব একসঙ্গে সহস্র চরণ সঞ্চালন করিয়া—ছুট! ইহার দেহ কঠিন কাষ্ঠগঠিত, পথ লৌহময়, হৃদয় অগ্নিকুণ্ড, খাদ্য অঙ্গার! কলিকাতায় যখন এই দৈত্যের প্রথম আবির্ভাব হয়, বর্দ্ধমান অঞ্চলের কয়েকটি ভদ্রলোক ইহাকে দেখিতে আসেন। "ঘণ্টা মারো" বলিয়া যখন ট্রেণ ছাড়া হইল, অনেকেই ভৌতিক কাণ্ড অনুমান করিয়া 'রাম রাম' বলিতে লাগিলেন। দেশে ফিরিয়া যখন ইঁহারা গল্প করিলেন যে, সত্যই হাতী, ঘোড়া, গরু, উট, গাধা কোনরূপ বাহনের সহায়তা না লইয়া গাড়ী চলিয়াছে, পল্লীর বিজ্ঞগণ পরস্পর চোখ-টেপাটিপি করিতে লাগিলেন যে, কলিকাতার লোক ইহাদিগকে বোকা পাইয়া খুব ঠকাইয়াছে। কিছু কাল পরে কয়েক জন পল্লীবাসী রেলপথে কালীঘাটে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন তান্ত্রিক ছিলেন—বিশ্বনাথ বাড়ুয্যে। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, গাড়ী চলে মন্ত্রের প্রভাবে এবং সে মন্ত্র ঐ "ঘণ্টা মারো।" সঙ্গীদের অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। এক জন বলিল, যে গাড়ীর মুখাগ্নি করে, তারই প্রভাবে গাড়ী চলে। এ ত প্রত্যক্ষ কথা। মুখাগ্নির প্রভাবে লোক স্বর্গে যেতে পারে, আর গাড়ী চলে না! বাড়ুয্যে সে কথা মানিয়া লইলেন না। বলিলেন, আস্ত কি হাউই যে, আগুন দিলেই সোঁ ক'রে স্বর্গে! জিদের বশে আর তিনি বাড়ী ফিরিলেন না, একবারে তাঁহার গুরুগৃহে উপস্থিত।

গুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ হইয়া নিবেদন করিলেন, গুরুদেব, বড় বিপদ! ইংরাজ বাহন ব্যতীত গাড়ী চালাইতেছে।

গুরু বলিলেন, তার আর আশ্চর্য্য কি? হনুমান্ ত্রেতায় লাফ দিয়ে সাগর পার হইয়াছিলেন, তাঁহার কোন পক্ষী বা বিমানচর বাহন ছিল না।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন, ঠিক ত! হনুর মন্ত্র ছিল 'জয় রাম', ইংরাজের মন্ত্র "ঘণ্টা মারো।" প্রভু, ঘণ্টা মারো কোন্ দেবতা?

গুরু হাসিয়া কহিলেন, বাপু, ইনিই খোস্-পাচড়ার অধীশ্বর ঘণ্টাকর্ণ।

শিষ্য গুরুর পদধূলি লইয়া প্রস্তাব করিলেন, প্রভু, আমি সাধন করিব।

গুরুদেব ঈষৎ চিন্তিত হইয়া বলিলেন, বাপু বিশ্বনাথ, ঘণ্টাকর্ণতন্ত্র এখন এক প্রকার লুপ্ত। ইংরাজরা শোনে তিনখানি পাতা পেয়েছিল, তারই বলে এই অসাধ্যসাধন করেছে। আমার কাছে পুরো চারখানি পাতা আছে। তা আমি তোমায় মন্ত্র দান করতে পারি, কিন্তু দক্ষিণা লেখা আছে বিস্তর। দক্ষিণা না হ'লে ত কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

বিশ্বনাথ বলিলেন, দেব, আমি ভিটে বেচব।

গুরু মন্ত্রদান করিলেন, 'ঘং ঘণ্টামারায় নমঃ।'

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যে সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এক মাসের অন্তে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবেন। তাহার পর সাধনার ঘটা, তিথি নির্ব্বাচন, রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, হবিষ্যাহার এবং প্রতিদিন দশ সহস্র করিয়া 'ঘং ঘণ্টা মারো' মন্ত্রজপ! তাঁহার শত্রুপক্ষ নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কবে কাহার ভদ্রাসন বে সংগোষ্ঠী সচল হইয়া রাতারাতি-বাঁকানদী, কৃষ্ণসায়র অথবা শ্যামসায়রের জলে ডুব মারিবে, ঠিক কি! সকলকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাহারা নিত্য নানাবিধ সওগাদ পাঠাইতে লাগিল। কাহারও চাষের উৎকৃষ্ট আলোচাল, কাহারও গৃহজাত গব্যঘৃত এবং দধি, দুগ্ধ, মাখন, কাহারও উদ্যান হইতে কাঁদি-কাঁদি কাঁচকলা। দিন দিন সাধকের দৈহিক উন্নতি দেখিয়া পাড়ার লোক বলাবলি করিতে লাগিল, ইহা সাধনার প্রত্যক্ষ ফল।

এক জন সদ্য বি, এ, পাশ বলিল, প্রত্যক্ষফল না ঘোচাফল। রোজ ঘি-দুধ খেলে আমি ওর দেড়া মুলতে পারি। ইহার পিতা শাসাইলেন যে, পুনরায় ওরূপ দুর্ব্বিনীত উক্তি করিলে তিনি বি, এ, পাশ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন খাতির রাখিবেন না, ত্যাজ্যপুত্র করিবেন। এ দিকে বিশ্বনাথের গৃহিণী কর্ত্তার দৈহিক শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মহা ভাবনায় পড়িলেন। বলা ত যায় না! দৈবাৎ যদি কর্ত্তার এ-দিক্ ও-দিক্ হয়, কাঁধ দিবে কে?

পুত্র মাতাকে সান্ত্বনা দিল, তুমি ভাবো কেন মা? যদি তাই হয়, মন্ত্রজপের ফলে বাবার মৃতদেহ আপনা-আপনি চ'লে মুড়ীঘাটে গিয়ে পৌঁছুবে। মুখে আগুন দেবার জন্য আমি পেছনে পেছনে ছুটে যেতে পারব কি না, সেই বরং ভাবনা। নইলে খাটও কিনতে হবে না, কাঁধকাঠও ভাঙতে হবে না। এ সাধকের বংশ, কে কবে বাসি মড়া হয়েছে, মা? উপযুক্ত সন্তানের সান্ত্বনায় জননী আশ্বস্তা হইলেন।

এ দিকে পল্লীর প্রধান মোদক গোলোক এক দিন স্বপ্ন দেখিয়া বলিল যে, বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যে তাহার দোকানে আসিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছেন, গোলোক, 'ঘণ্টা মারোর' জন্য তোমাকে রোজ আধ সের করিয়া মিষ্টান্ন দিতে হবে।

গোলোকও কম পাত্র নয়; বিশেষ সেই বি, এ, পাশ ছোঁড়াটা সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, খবরদার গোলোক। আমি বড় বড় প্রোফেসারের কাছে জেনেছি, 'ঘণ্টা মারো' দেবতা নয়।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন, বাপু, তোমরা ম্লেচ্ছভাষা পড়েছ, তোমাদের অধ্যাপকও ম্লেচ্ছ। তাঁদের কথা দেব কেন? ঘণ্টাকর্ণ হিন্দুর দেবতা, ম্লেচ্ছের হাতে প'ড়ে 'ঘণ্টা মারো' হয়েছেন। আমি বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকে যেমন আমাকে বলে বাঁড়ুয্যে।

গোলোক বলিল, মশায়, বন্দ্যোপাধ্যায়ই হও আর বাঁড়ুয্যেই হও, আমার কাছে চালাকী চলবে না। আমি ও সব মানিনি। যাও ঠাকুর, বানে বানে ঘরে যাও, কেন ব্যাভ্রম হবে?

মোদকের এই স্পর্দ্ধায় বিশ্বনাথ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, আর উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন, ঘং ঘণ্টা মারো! ঘং ঘণ্টা মারো!

তখন গোলোক মোদকের দোকান সহসা যেন সজীব হইয়া উঠিল। সীতাভোগ, মতিচুর, ছানাবড়া খোলা হইতে

গোলোক মোদকের দোকান—"ঘণ্টা মারো" মন্ত্রের জোরে সজীব হইয়া উঠিল।

লাফাইয়া পড়িয়া তাঁটার মত গড়াইতে গড়াইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। কচুরী, জিলাপী, খাজা প্রভৃতি চাকার মত পাক খাইতে খাইতে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' দেহে চাকলা উপস্থিত হইতেই বি, এ, পাশ ছোঁড়াটা দোকানের খুঁটি জাপ্‌টাইয়া ধরিল, তাহাতে চালাঘর মড়-মড় করিয়া উঠিল। গোলোক 'খুঁটি ছাড়ো, খুঁটি ছাড়ো', করিয়া চেঁচাইতে লাগিল এবং কিছুতে ছাড়ে না দেখিয়া বি, এ, পাশের হাতের উপর এক লাঠী বসাইয়া দিল। সে খুঁটি ছাড়িতেই ধূলায় পড়িয়া মড়-মড় অদৃশ্য হইয়া গেল। নিরুপায় গোলোক তখন বাড়ুয্যের দুটি পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঠাকুর, নিত্য আমি এক সের করিয়া মিঠাইমিঠায় যোগাইব, আপনি রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণের ক্রোধ খড়ের আগুন, যেমন দপ্‌ করিয়া জ্বলে, তেমনই দপ্‌ করিয়া নিবে। বাড়ুয্যে বলিলেন, কেমন, ঠিক ত?

আজ্ঞে ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে মিথ্যা ব'লে কি নরকে যাব। আপনি রক্ষা করুন।

কেমন, 'ঘণ্টা মারো' প্রত্যক্ষ দেখলি ত? আর কখন অবিশ্বাস করবি?

না ঠাকুর, কখন না। এই কাণ মল্‌ছি, নাক মল্‌ছি, নাকে খৎ দিচ্ছি।

বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আবার প্রত্যক্ষ দেখ। বলিয়া আবার মন্ত্র আওড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় হঠাৎ একটা ধুপ্‌ করিয়া শব্দ হওয়ায় গোলোকের ঘুম ভাঙ্গিল। 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালিয়া দোকান দেখিল, মিঠাই-মিঠায় যেমন ছিল, তেমনই থরে থরে সাজানো রহিয়াছে। উঃ, দেবতা সত্য, বাড়ুয্যে মশাই প্রত্যক্ষ। রাত্রির ব্যাপার পরদিবস পল্লীময়ে প্রচার করিবার জন্য গোলোকের মন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; কিন্তু সেই বি, এ, পাশের ঠাট্টার ভয়ে কোন কথাই ফুটিতে সাহস করিল না। এমন সময় দৈবের কর্ম্ম, সেই বি, এ, পাশ দোকানে আসিয়া বলিল, ওহে গোলোক, তুমি যে বলতে চিঠি চাটে না কি, আমি তখন হাসলুম, কিন্তু এই দেখ, কাল রাত্রিতে হঠাৎ আবার হাতটা ফুলে উঠেছে।

গোলোক আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না। বলিল, চিঠি নয়, বাবু, চিঠি নয়! বাক, যা হয়ে গেছে, তুমি কিছু মনে ক'র না।

বি, এ, বলিল, কি হে গোলোক, স্বপ্ন দেখছ না কি?

এই রে! এই সব প্রকাশ ক'রে দেবে দেখছি! গোলোক পল্লীময় সমস্ত ব্যাপার রাষ্ট্র করিয়া দিল। সেই দিন হইতে আশুতোষ ন্যায়রত্ন তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে রাত্রিতে ক'সে খাটের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন—বাড়ুয্যের স্ত্রীচরিত্র বড় ভাল নয়! সাধক হ'লে কি হয়—'স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।' বেটা ভৈরবী-চক্র করে।

বি, এ, বলিল, ন্যায়রত্ন মশায়! আপনি এ সব বিশ্বাস করেন?

না করব কেন? কামরূপ-কামাখ্যার ডাকিনীরা গাছ ছেলে দেশবিদেশে হাওয়া খেয়ে বেড়াত।

বলেন কি ন্যায়রত্ন মশায়! এ সব গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস ক'রে একটা নিরীহ স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করছেন?

বাপু, অত্যাচার করি আর যা-ই করি, তোমার এত মাথাব্যথা কেন? পরিবার আমার, না তোমার বাপু?

রাম রাম! আপনি আমার গুরুস্থানীয়, বলিতে বলিতে বি, এ, পাশ কাণে আঙ্গুল দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল; কিন্তু সেই দিন হইতে ন্যায়রত্ন বি, এ, পাশের উপর অত্যন্ত

সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই তৃতীয় পক্ষ লইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুহূর্ত্তের শান্তি ছিল না। বাড়ীর সামনে দিয়া যদি কেহ গান গাহিতে গাহিতে বা শিস্ দিতে দিতে গেল ত অধ্যাপক অমনি ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার কুমৎলব আছে। কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণব ভিখারীগণ ঘরে ঘরে নামগান করিয়া বেড়ায়। এক দিন প্রভাতে এক টহলদার ন্যায়রত্নের দ্বারে আসিয়া গাহিয়াছিল—"যশোদা বান্ধিল নাম"—গায়ককে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইল না। তৃতীয় পক্ষের নাম ছিল যশোদা। পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ খিল খুলিয়া খড়ম-হাতে দ্বারে আসিয়া ভ্যাংচাইয়া বলিলেন, যশোদা বান্ধিল নাম—

খড়ম হাতে করিয়া ন্যায়রত্নের টহলদারকে তাড়া।

রেখেছে রেখেছে—তা তোর বাবার কি রে হারামজাদা! ভদ্দর লোকের পাড়ায় আর গান পেলি নি! নোটো বেটা! বেরো, নইলে খড়ম-পেটা করব। এ পাড়ায় যদি ও গান গাইবি ত চোর ব'লে বাঁধিয়ে দেব। বেটা যশোদা-দুলাল হবে! আমি থাকতে নয়!

পণ্ডিত যদি বিদায়ের নিমন্ত্রণে যেতেন ত কেবল চিন্তা, কে তাঁহার জানালায় টোকা মারিতেছে। বিদায়টা তাড়াতাড়ি হাতাইয়া বাড়ীতে ফিরিতে পারিলে হয়! এক সভায় কোন পণ্ডিত তাঁহাকে পূর্ব্বপক্ষ করে, যশোদা পূর্ব্ব-জন্মে কে ছিলেন? ন্যায়রত্ন ঠাস করিয়া তাঁহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, যশোদা পূর্ব্বজন্মে ছিলেন তোমার বাবা! ন্যায়রত্নের আর বিদায় লওয়া হইল না। তাড়াতাড়ি এক জোড়া চটি পায়ে দিয়াই প্রস্থান, ঘরে আসিয়াই তৃতীয় পক্ষকে প্রশ্ন করিলেন, এত নাম থাকতে লোক তোমার নামই বা করে কেন? টহলদার বেটা তোমার নামে ছড়া বেঁধেছে। সভায় ভটচায্ জিজ্ঞাসা করে, তুমি পূর্ব্বজন্মে তার কে ছিলে? আমি কিছু বুঝি নি বটে।

তৃতীয় পক্ষ বলিল, তাতে আমার অপরাধ কি? আমি কি করব?

ন্যায়রত্ন বলিলেন, ও সব আমি শুনতে চাইনি। আমি জানতে চাই, লোক কেন তোমার নাম করতা ছায়? তোমার বাবা কেন ও নাম রাখা ছায়?

ইহার উত্তর কি! যশোদা অবাক্ হইয়া স্বামীকে দেখিতে লাগিল। সে দিন এই পর্য্যন্ত। পরদিন প্রভাতে ন্যায়রত্ন পরিত্যক্ত বিদায় আনিতে যাইবার সময় দেখিলেন, চটি তাঁর নয়, অপর লোকের। তিনি পরিধারকে প্রশ্ন করিলেন, আমার ঘরে কা'র চটি?

তা আমি কি ক'রে জান্‌ব! তুমি হয় ত কাল ভুলে পায় দিয়ে এসেছিলে!

আমি! আমার কি ভীমরথী হয়েছে! ও সব চালাকি ছাড়। কার চটি বল্।

ক্রমাগত খোঁচাইলে ক্ষুদ্র পতঙ্গও দংশন করে। যশোদা বলিল, দেখ, যদি অমন ক'রে রাত-দিন

ন্যায়রত্ন ঠাস্ করিয়া পণ্ডিতের গালে চড় বসিয়া বলিলেন—

"যশোদা পূর্ব্বজন্মে ছিলেন তোমার বাবা।"

মালাতন কর ত' আমি যেখানে দু'চোখ যায় চ'লে যাব।

আর যাকে দু'চোখে লাগে, তার গলায় মালা দেবে? আমি থাকতে তা' হবে না। বলিয়া ন্যায়রত্ন তৃতীয় পক্ষকে চাবি দিয়া বিদায় আনিতে গেলেন। এখন হইতে পরিধারকে ঘরে পুরিয়া চাবি না দিয়া ন্যায়রত্ন শৌচে পর্য্যন্ত গমন করিতেন না।

ন্যায়রত্নের তৃতীয়পক্ষ!

হায়! পণ্ডিত-মূর্খ! বি ধা তা তো মা র পক্ষীর কুঁচের মত চোখে, ছুঁচের মত মুখে, ডোবার মত নাকে, আর কপালজোড়া টা কে যে সতীত্বের জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কি দেখিতে পাও না? ষণ্ডোদার হাতে দশ অঙ্গুলী, সর্ব্বদাই দশ দিক্ নির্দ্দেশ করিতেছে! এক পায় শ্লীহা, অপর পায় যকৃৎ! এ জন্ত দু'টি পা-ই স্ফীত! পাড়ায় কোন কোন লোক বলিত, ইঁহার উদরে এবং পৃষ্ঠদেশে বিপুল গোদ হইয়াছে। বোধ করি কুব্জাসুন্দরীর দ্বিতীয় সংস্করণরূপে ইনি পৃথিবীতে আসিয়াছেন! কিন্তু ন্যায়রত্নের ধারণা, ইনি ত্রিভুবনের কাম্যবস্তু!

দিন যায়, থাকে না; তবে কখন গোদা পায়, কখন বায়ুবেগে। দেখিতে দেখিতে সে উৎসুক, উৎকণ্ঠিত পল্লীতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রভাত সমাগত হইল। মাঠে এক মাঠ—পর নয়—লোক। তার মধ্যে বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যে উচ্চ বেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, এখানে ত' রেলগাড়ী নাই, কি চালাব বল?

বি. এ. বলিল, গাড়ী নেই, বাড়ী আছে।

উত্তর প্রস্তাব। কার বাড়ী চালাবো?

জনমণ্ডলীতে মহা বাদানুবাদ উপস্থিত হইল—এ বলে ওর, ও বলে তার। গ্রামে একখান পোড়ো ভিটে ছিল, তাহার অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বেশী ভাগ লোক বলিল, সেইটে চালান বাঁড়ুয্যে মশায়!

গোলোক বলিল, আপনারা অমন কাযটি কোরো না। আমার দোকানের সীতাভোগ, মতিচুর, ছানাবড়ার দশা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। প্রথমে ইটপাটকেলগুলো গো গো ক'রে ছুটতে থাকবে; তার পর কড়ি-বরগা সব শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে মাথা ভেঙ্গে আসবে। মাঠে আর মানুষ থাকবে না। সব কম্মকাটা হবে!

বি, এ, পাশ বলিল, তোমার দোকানে যা ঘটেছিল, তার প্রমাণ কি?

মোদক বলিল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ—আমার লাঠী খেয়ে তোমার হাত কোলা।

বি, এ, বলিল, ও সব আমি মানি নি! বাঁড়ুয্যে মশায়ের যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে চালান!

খগরদার বেটা! তা হ'লে খুন করব! বলিয়া বি,-এর পিতা বি, এ-কে জাপ্টাইয়া ধরিলেন।

ন্যায়রত্ন মাঠে উপস্থিত ছিলেন। হাঁকিয়া বলিলেন, ছেড় না বাঁড়ুয্যে! ওড়াও ছোঁড়াকে! বাপ না ছাড়ে, বাপকে শুদ্ধ ওড়াও।

বাঁড়ুয্যে সগর্ব্বে প্রশ্ন করিলেন, আর কেউ চালান যেতে রাজী আছ?

কেউ না। মোদক বলিল, বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনি নেমে আসুন। আমরা অমনই বিশ্বাস করছি। প্রমাণ চাই না।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন, বল ত এই এক মাঠ লোক চালান ক'রে দি। একেবারে দাম্বোদরের গর্ভে!

মাঠ নিমেষে জনশূন্য হইয়া গেল। যিনি আমার কাছে এই পল্লীকাহিনী বলিয়াছিলেন, তিনি সে দিন সে মাঠে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় যিনি প্রত্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, তাঁহাকে আমার কিছুই বলিবার নাই। সময়ের স্বধর্ম্ম!

এ দিকে গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি নামিবার জন্য দ্বারের কাছে আসিয়াই দেখি, বাণীবাহন খাতা হাতে দাঁড়াইয়া একপাল হাসিতেছে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নূতন বউ

(গল্প)

১

শ্রাবণ মাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। যাদব দত্ত মহাশয় তামাকু সেবন করিতে করিতে তিন জন নিষ্কর্মা পল্লীবৃদ্ধের সহিত গল্প করিতেছেন—হারাণ মুখুয্যে, রাখাল মিত্র ও কেদার চক্রবর্ত্তী। দত্ত মহাশয়ের বয়সও পঞ্চাশের উপরে উঠিয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া, স্নানাহ্নিক সারিয়া আহ্নিক-পূজা শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন।

বেলা তখন প্রায় দশ ঘটিকা। পিয়ন আসিয়া তাঁহার হস্তে দুইখানি খামের চিঠি দিয়া গেল—একই হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা। একখানি তাঁহার নিজের নামে, অপরখানি তাঁহার মধ্যমা কন্যা নির্ম্মলকুমারীর নামে।

হুঁকা হইতে কলিকাটি খুলিয়া হারাণ মুখুয্যের হাতে দিয়া, চোখে চশমা লাগাইয়া দত্ত মহাশয় নিজ নামের পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল, উহাতে সন্তোষ ও প্রসন্নতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া দত্ত মহাশয় হাঁকিলেন, "রামা!" বৃদ্ধ রামা ভৃত্য আসিলে, তাহার হাতে কন্যার নামের পত্রখানি দিয়া বলিলেন, "তোর মেজদিদিমণিকে দি গে যা।"

হারাণ মুখুয্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি হে, হরুদা?"

"কলকাতা থেকে, মেজ জামাই লিখেছেন—এই দেখ না।"—বলিয়া পত্রখানি মুখুয্যের হস্তে দিলেন।

পত্রখানির মর্ম্ম প্রতিবেশিগণের মধ্যে প্রচারিত হয় ইহাই দত্ত মহাশয়ের অভিপ্রায়। তাহার একটু বিশেষ কারণও ছিল। দত্ত মহাশয় বড় মেয়েটির বিবাহ বেশ খরচ-পত্র করিয়াই দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাই তাহাতে সুবিধাজনক হয় নাই। মেজমেয়ে নির্ম্মলার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিতে গেলে এক কুড়াইয়া পাওয়া বোত্রহীন পাত্রের সহিত—সে পাত্রের বয়সও তখন ৩০ বৎসরের কম হইবে না। পিতামাতা জীবিত নাই, কলিকাতায় মাতুলালয়ে মানুষ হইয়াছিল, সে মামা-মামীও পরলোকগত—ছেলেটি তখন কলকাতায় মেসে থাকিয়া দালালী ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন করে, আয় অল্প; সুতরাং বিবাহ করিয়া বধূকে লইয়া যাইতে পারে নাই। আজ পাঁচ বৎসর বিবাহ করিয়াছে, চারি বৎসর হইল একটি কন্যা জন্মিয়াছে, কিন্তু এতাবৎকাল নির্ম্মলা পিতৃ-গৃহেই রহিয়াছে। ইহাতে পাড়ার লোক দত্ত মহাশয়কে ছি ছি করিত। জামাই প্রতি মাসে দুই তিন বার করিয়া আসে, দুই এক দিন থাকিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে কি? লোক বলে, সস্তায় কিস্তি-পাইয়া দত্ত মহাশয় চাল্‌চুলা-হীন এমন জামাই করিলেন যে, মেয়েটা বাপের বাড়ীতেই চিরস্থায়ী হইয়া রহিল, স্বামীর ঘর করা তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না। নির্ম্মলাও এ জন্য লজ্জিত—তার মা ইদানীং মাঝে মাঝে জামাইকে ইহা লইয়া একটু গঞ্জনা দিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। জামাই লিখিয়াছেন, এত দিনে কর্ম্মে তাঁহার একটু উন্নতি হইয়াছে, আয়বৃদ্ধি হইয়াছে, একটি ছোট বাড়ীও স্থির করিয়াছেন, এখন শ্বশুর মহাশয়ের আদেশ পাইলে স্ত্রী-কন্যাকে আসিয়া লইয়া যান।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে দত্ত মহাশয় বলিলেন, "পড় না, হেঁকে হেঁকেই পড়।" তাঁহার ইচ্ছা, উপস্থিত অপর দুই জনেও পত্রখানি শ্রবণ করিয়া, যথাসময়ে পাড়ায় এই কথা রটনা করুক।

মুখোপাধ্যায় তখন পড়িতে লাগিলেন.—

চিত্র ৩

[দিল্লী—ঔরঙ্গজেবের সময়ের দাসী]

"কলিকাতা

৯ই শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল

সখ্যোত্তীত প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

অদ্য একটি শুভসংবাদ আপনাকে দিবার জন্য এই পত্রখানি লিখিতেছি। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এত দিনে আমার একটু উন্নতি হইয়াছে। আমি একটি ভাল চাকরী যোগাড় করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বের দালালী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বিগত ইংরাজী ১লা তারিখ হইতে নূতন কর্ম্মে বাহাল হইয়াছি। আমার বেতন আপাততঃ দেড় শত টাকা হইয়াছে। সাহেব খুব অনুগ্রহ করিতেছেন এবং বলিয়াছেন যে, কায-কর্ম্ম ভাল করিতে পারিলে বৎসরান্তে আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

এত দিন অর্থাভাব বশতঃ আমার স্ত্রী-কন্যার ভরণ-পোষণের কোনও ভারই আমি লইতে সমর্থ হই নাই। এ জন্য আমি মহাশয়ের কাছে নিতান্তই লজ্জিত ছিলাম। এখন ঈশ্বরের কৃপায় কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া, স্ত্রী-কন্যাকে কাছে আনিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। মাসিক ৫০৲ টাকা ভাড়ায় শ্যামবাজারে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহও ঠিক করিয়াছি। এখন যদি মহাশয়ের অনুমতি হয় এবং পূজনীয়া শ্বশ্রূদেবী যদি আপত্তি না করেন, তবে এক দিনের ছুটী লইয়া গিয়া নির্ম্মলাকে লইয়া আসি। আগামী ১৭ই শ্রাবণ ইংরাজী মাসের ১লা তারিখ হইবে, ঐ দিন আমি আপিসে বেতন পাইব—ইহার পরে শ্রাবণ মাসমধ্যে একটি শুভদিন যদি স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। কারণ, ভাদ্র মাস পড়িয়া গেলে, এক মাস আবার অপেক্ষা করিতে হইবে।

পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাইবেন এবং আপনিও জানিবেন। আমি ভাল আছি। আপনাদের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আমার পূর্ব্ব-ঠিকানাতে পত্র লিখিলেই আমি পাইব। ইতি—

সেবক

শ্রীবসন্তকুমার বসু।

পাঠ শেষ করিয়া পত্রখানি দত্ত মহাশয়ের হস্তে ফেরত দিয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বেশ বেশ! ছোকরা বাহাদুর আছে—দেড়শো টাকা মাইনের চাকরী বাগানো—আজকালকার বাজারে কি সোজা কথা।"

রাখাল মিত্র বলিলেন, "ছোকরা বেশ চালাক-চতুর, সে ত আমরা বরাবর দেখছি!"

কেদার চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আর, বেশ বিনয়ী। চিঠি-খানি কেমন বিনয় ক'রে লিখেছে দেখ! আজকালকার ছেলেদের মত উদ্ধত প্রকৃতির নয়। তারা হ'লে মনে করত, নিজের লিগাল ওয়াইফ্‌কে নিয়ে আসবো, তার জন্যে অত দয়া ভিক্ষা, অত কাকুতি-মিনতি কেন?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং—মুখ্যু ত নয়, ছোকরার লেখাপড়া-জ্ঞান আছে—সহংশে জন্মও বোধ হয়, হবে না কেন?"

সুবিধা পাইয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন, "আহা, সেই জন্যেই ত! কি ঘটনায় বিবাহ দিয়েছিলাম, সবই ত তোমরা জান। গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে নির্ম্মলা ডুবে গিয়েছিল। বসন্ত নৌকোয় কোথায় যাচ্ছিল, তাই দেখে নৌকো থেকে লাফিয়ে প'ড়ে নির্ম্মলাকে জল থেকে তোলে। খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলাম, পাল্কী ক'রে মেয়েকে বাড়ী নিয়ে এলাম—বসন্তকেও সঙ্গে নিয়ে এলাম। ৩।৪ দিন তাকে বাড়ীতে রাখলাম, যেতে দিলাম না। দেখলাম, ছেলেটি রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বংশে, সব বিষয়েই ভাল, কেবল—মাত্র দোষ গরীব। বয়ে দালালী করি, খেয়ে থাকি, সামান্য আয়, মা-বাপ নেই, বাড়ী-ঘর নেই, তাই এত দিন আইবুড়ো আছে—নইলে কায়েথের ঘরের ত্রিশ বছরের ও রকম ছেলে কি আর অবিবাহিত থাকে? গিন্নীরও ছেলেটিকে বেশ পছন্দ হয়ে গেল; মেয়েও অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছিল। আমি বল্লাম, বেশ ত, ও যখন নির্ম্মলার জীবন দান করেছে, তখন নির্ম্মলা ওরই প্রাপ্য। হলেই বা গরীব—চিরদিন কি কারও সমান যায়? আমার মেয়ের ভাগ্যে ধন থাকে, জামাই ধনী হবে; যদি না থাকে, আমি মস্ত জমীদারের ছেলে এনে বিয়ে দিলেও, সে ছেলে বাপের বিষয় পেয়ে দু'দিনে ফরফর ক'রে গরীব হয়ে যেতে পারে।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আসল কথাই তাই। অদৃষ্টই মূল, ও ছাড়া আর পথ নেই, যতই যিনি হাঁকুপাকু করুন না কেন।"

রাখাল মিত্র বলিলেন, "কোন্ আপিসে চাকরী হয়েছে, তা ত বাবাজী লেখেন নি! কোনও গভর্ণমেণ্ট আপিসে বোধ হয়।"

দত্ত মহাশয় বলিলেন, "তা কি ক'রে হবে? পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কি কেউ গভর্মেণ্টের চাকরী পায়? কোনও মার্চেণ্ট আপিসে-টাপিসে হয়ে থাকবে বোধ হয়। যা হোক্, বাবাজী এলেই জান্তে পারা যাবে। মুখুয্যে ভায়া, ভাল দিন একটা স্থির ক'রে দাও না, পাঁজিখানা নিয়ে আসি।"

বলিয়া দত্ত মহাশয় উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহিণী কন্যার প্রমুখাৎ সংবাদটা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। বলিলেন, "তা হ'লে একটা দিন ঠিক ক'রে পাঠাই, কি বল?"

মেয়েকে লইয়া যান না বলিয়া গৃহিণী জামাতাকে কত গঞ্জনা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখন কন্যার আসন্নবিরহে তাঁহার মাতৃহৃদয় কাতর হইয়া উঠিল। বলিলেন, "এই পূজো আসছে—দুটো মাস পরে পাঠালে হ'ত না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "এখন যাক্ না, কিছুদিন পরে তখন নেয়ে নিয়ে এলেই হবে। আবার কলকত্তাটা হয়ে যাক্।"

"আচ্ছা, যা ভাল বোঝ, তাই কর"—বলিয়া গৃহিণী পঞ্জিকা বাহির করিয়া দিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ২১শে শ্রাবণ শুভদিন বলিয়া ধার্য্য করিলেন। দত্ত মহাশয় বিকালে তদনুসারে জামাতাকে পত্র লিখিয়া দিলেন।

২

আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—প্রায় সারা দিনই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। বৈঠকখানার তক্তপোষের উপর ফরাস বিছানায় মাধব দত্ত মহাশয় বৈকালিক নিদ্রা উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময় বৈঠকখানার ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া চারিটা বাজিল। সেই শব্দে দত্ত মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া, জানালা দিয়া চাহিয়া, আকাশের অবস্থা দেখিয়া, আরও খানিক ঘুমাইবার লোভে তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ সন্ধ্যায় জামাতা বাবাজীউ সস্ত্রীক ট্রেণে আসিয়া পৌঁছিবেন, সুতরাং রাত্রি-ভোজনের জন্য একটু বিশেষ আয়োজন করা আবশ্যক। সুতরাং তিনি উঠিয়া বসিয়া, হাই তুলিয়া, তিনটি তুড়ি দিয়া হাঁকিলেন, "রামা, তামাক দে।"

রামা ভৃত্য উঠানে বসিয়া, "বটী" পাতিয়া, খস্-খস্ শব্দে গোরুর জন্য খড় কাটিতেছিল, উত্তর দিল, "আজ্ঞে, যাই কত্তা।"

এই সময় দত্ত মহাশয়ের চারি বৎসর বয়স্কা দৌহিত্রী কমলা (নির্ম্মলার কন্যা) নাচিতে নাচিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ও দাদু, এখনও ঘুমুচ্ছ? কখন্ উঠবে তুমি, বেলা যে গেল!"

দত্ত মহাশয় দৌহিত্রীকে নিকটে ডাকিয়া, তাহার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, "হাঁ রে শালী! আমি ঘুমুচ্ছি কি উঠেছি, তা কি তুই দেখতে পাচ্ছিস্ নে?"

কমলা বলিল, "তা ত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু দিদিমা যে বল্লে, বৈঠকখানায় গিয়ে তোর দাদুকে বল্ গে, ও দাদু এখনও ঘুমুচ্ছ, কখন্ উঠবে তুমি?—তবে দিদিমাকে বলি গে যাই, তুমি উঠেছ?"

"আচ্ছা, বলবি এখন। যোস্ না একটু। আজ কে আস্‌বে জানিস্?"

"জানি। বাবা।"

"বাবা আসা অবধি তুই জেগে থাকতে পারবি?"

বালিকা আগ্রহভরে উত্তর করিল, "থাকতেই হবে! বাবা যে আমার জন্যে পুঁতুল নিয়ে আসবে মাকে লিখেছে, আমি পুঁতুল দেখবো না?"

রামা হুঁকা হাতে জলন্ত কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিল। দত্ত মহাশয় হুঁকা লইয়া বলিলেন, "ওরে রামা, তুই একবার চট্ ক'রে গঙ্গার ঘাটে যা দেখি। আজ সারা দিন ইলসে-গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, আজ খুব ইলিশ মাছ উঠবে। জেলেরা এতক্ষণ মাছের নৌকো ঘাটে লাগাচ্ছে। কেষ্টা, কি মতিলাল, কি রামধন—যে জেলের কাছে ভাল ইলিশ মাছ দেখবি, একটা নিয়ে আসবি। বেশ বড় দেখে একটা, আর বেশ চ্যাটালো রকম—লম্বা সরুসে মাছ আনিস্‌নে যেন, সেগুলো তেমন সোয়াদি হয় না। জেলেকে বলিস্ যে, আজ কর্ত্তার জামাই আসছেন, বেশ ভাল মাছ যেন দেয়। কাল সকালে এসে দাম নিয়ে যাবে। আর হাঁ—বাজারে হরিশ ময়রার দোকানে অমনি ব'লে যাস্ যে, এক সের ভাল ঝুনো-গোল্লা চাই। বেশ বড় বড় ক'রে যেন মণ্ডা বেঁধে রাখে। আসবার সময় এক হাতে ইলিশ মাছ, এক হাতে সন্দেশ নিয়ে আসবি। বেশ ক'রে ওজন দেখে নিবি, বুঝলি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া রামা প্রস্থান করিল। ইতোমধ্যে হারাণ মুখুয্যে প্রবেশ করিয়া, ব্রাহ্মণের হুঁকাটি সংগ্রহ করিয়া, তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন, বলিলেন, "আজ যে রকম ইলশে-গুঁড়ি বর্ষাচ্ছে—মাছ আজ ভালই পাবে বোধ হয়। তা, জামাই কখন্ এসে পৌঁছবেন?"

"সন্ধ্যে ৭টার গাড়ীতে। কলকাতায় থাকেন, রেলের ইলিশের মুখে-ভাজে ঘড়ি বেঁধে গুরুকাকার ক'রে ছেলে বেটারা যা বেচে, তাই গঙ্গার ইলিশ ব'লে খান ত! আসল গঙ্গার ইলিশ যে কি বস্তু, তা আজ বাবাজীকে দেখিয়ে দিই।"

মুখোপাধ্যায় কমলাকে আদর করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, তুই না কি আমাদের ছেড়ে চল্লি? তোর দাদুকে দিদিমাকে ছেড়ে চ'লে যাবি, তোর মন কেমন করবে না? সেখানে গিয়ে থাকতে পারবি?"

বালিকা গর্ব্বভরে বলিল, "খুব পারবো।"

দত্ত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "শুন্‌লে হে মুখুয্যে! হাঁ রে নেমোখারাম, এত দিন যে আমরা তোকে বুকে ক'রে মানুষ করলাম, আমাদের ছেড়ে চ'লে যেতে তোর মনে একটু কষ্টও হবে না?"

বালিকা বুঝিল, কথাটা সে অন্যায় বলিয়া ফেলিয়াছে। বড় লজ্জা হইল। মাতামহের দিকে ফিরিয়া, তাঁহার বুকের পাকা চুল টানিতে টানিতে বলিল, "মনে কষ্ট হবে না? খুব হবে। কিন্তু বেশী দিন ত সেখানে থাকবো না দাদু, আবার শীগ্‌গির চ'লে আসবো। আর তোমার জন্যে একটা খুব ভাল পুতুল কিনে আনবো। কলকাতায় অনেক পুতুল পাওয়া যায়—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, দুশো তিনশো।"

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া কমলার গালটি টিপিয়া বলিলেন, "তাই না কি? কলকাতায় আর কি পাওয়া যায় রে?"

কমলা উত্তর করিল, "উঃ—অনেক জিনিষ। থিয়েটর পাওয়া যায়, চিড়িয়াখানা পাওয়া যায়, কালীঘাট পাওয়া যায়—আরও কত সব ভাল ভাল জিনিষ মা বলছিল, সব আমার মনে নেই।"

এমন সময় ঝি আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, "খুকী, মা ডাকছে, দুধ খাবি চল।" কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদীরা আপনাকে একবার ডেকেছেন।"

"চল যাচ্ছি।"—বলিয়া দত্ত মহাশয় উঠিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যার পর মুখুয্যে আসছো ত?"

"হ্যাঁ, আসবো বৈ কি। জামাই বাবাজীর সঙ্গে দেখা করবো। জামাই বাবাজী সাতটার গাড়ীতে এসে পৌঁছবেন ত? তুমি কি নিজে যাবে ইষ্টিশানে?"

"না, যে জল-কাদা! লণ্ঠন হাতে রামাকেই পাঠিয়ে দেবো এখন।"

"আচ্ছা, সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে, আমি তা হ'লে ৮টার মধ্যেই আসবো এখন।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় বিদায় লইলেন, দত্ত মহাশয়ও নাতিনীর হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

৩

রাত্রি ৮টার পর লাঠি ও লণ্ঠন হস্তে মুখোপাধ্যায় দত্তভবনে আসিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানা শূন্য। শুনিলেন, জামাই বাবু আসিয়াছেন, এখন জলযোগ করিতেছেন। মুখোপাধ্যায় প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে স-জামাতা দত্ত মহাশয় প্রবেশ করিলেন। "কি বাবা বসন্ত, ভাল আছ ত?"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি কাকা!"—বলিয়া জামাতা, মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম করিলেন।

সকলে বসিলে মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "তোমার ভাল চাকরী হয়েছে, তোমার শ্বশুরের কাছে শুনে বড়ই সুখী হলাম, বাবাজী! সে দালালী-কালালী ছেড়ে দিয়েছ, ভালই করেছ। তোমরা শিক্ষিত লোক, ঐ সব উঞ্ছবৃত্তি কি তোমাদের পোষায়? তা, কোন্ আপিসে চাকরী হ'ল?"

"আজ্ঞে, ইংলিশম্যান আপিসে।"

"কিসের কারবার তাদের?"

"ইংলিশম্যান খবরের কাগজ। সাহেবদের কাগজ, খুব প্রতিপত্তি—বড় কাগজ। বড় বড় ইংরেজ কর্ম্মচারীরা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার সাহেবরা পর্য্যন্ত বেনামীতে তাতে প্রবন্ধ লেখেন।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বটে? বড় কাগজ তা হ'লে! অনেক সব বাঙ্গালী সেখানে চাকরী করে?"

"বিস্তর।"

"তার কি ঠিক আছে ? ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশো, দু'শো—যার যেমন পদ্য।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বটে ! তোমার পদটি ত তা হ'লে সেখানে বড় পদই বলতে হবে ! তুমি যদি আমার একটি উপকার কর, বাবা !"

"কি, বলুন !"

"আমার ছেলে ছেলেটা—তাকে তুমি দেখেছ—গেল বছর ম্যাট্রিক ফেল করলে। কত ক'রে বল্লাম, ওরে, আর এক বছর পড়্, আর এক বছর পড়্, তা সে কিছুতেই শুনলে না। সেই অবধি বাড়ীতেই ব'সে আছে। গাঁয়ের যত সব বজ্জাটে ছেলের সঙ্গেই তার মেলামেশা। ফুটবল খেলা, থিয়েটর করে—এই সব নিয়েই আছে। তাকে যদি বাবা, সাহেবকে ব'লে কয়ে তোমার আপিসে একটা ছোট-খাট কাযে ঢুকিয়ে নিতে পার, তবে গরীব ব্রাহ্মণের বড়ই উপকার করা হয়।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায়, জামাতার হাত দুটি ধরিলেন।

বসন্ত বিব্রত হইয়া বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, কাকা ! অত ক'রে আমায় বলতে হবে কেন ? এখন ত আমাদের আপিসে কোনও কায খালি নেই—একটা খালিটালি হলেই আমি চেষ্টা করব বৈ কি !"

মুখোপাধ্যায় হাত ছাড়িয়া বলিলেন,"তাই কোরো,বাবা ! দেখ, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আমার বন্ধুত্ব। একসঙ্গে পাঠশালায় গিয়েছি। সেই সময় থেকে দু' জনে আমরা হরিহর আত্মা বল্লেই হয়। তোমার উপর তোমার শ্বশুরের যদি কোনও দাবী থাকে, তবে আমারও সেই দাবী আছে জেনো।"

বসন্ত বলিল, "আজ্ঞে, সে ত ঠিক।"

তাহার পর অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কোথায় বাড়ী ভাড়া লইয়াছে, কিরূপ বাড়ী, আপিস হইতে কত দূর —ইত্যাদি। ক্রমে রাত্রি অধিক হয় দেখিয়া মুখোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলেন। বসন্তকে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ডাকিয়া পাঠাইলেন, সে অন্তঃপুরমধ্যে গেল।

পরদিন বসন্ত উঠিয়া, মুখহাত ধুইয়া, চা পান করিতেছে, এমন সময় তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া, আধ-ঘোমটা দিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন,"হ্যাঁ বাবা, নির্ম্মলের

বসন্ত কহিল, "কি কথা, মা ?"

"তোমার আপিস না কি রাত্তিরে ?"

"হ্যাঁ মা, তাই বটে। সকালবেলা আমাদের খবরের কাগজ বেরোয় কি না, তাই রাত ৯টা ১০টার সময় আমায় আপিসে যেতে হয়, সারারাত সেখানে থাকতে হয়। আবার, দিনের বেলাও ২।৪ ঘণ্টার জন্যে গিয়ে একটু দেখা শুনো ক'রে আসতে হয়।"

"তবেই ত ! বড়ই যে ভাবনার কথা হ'ল, বাবা ! তুমি না কি নির্ম্মলাকে বলেছ যে, দিন-রাত থাকবার জন্যে একটা ঝি ঠিক ক'রে রেখেছি, সে-ই তোমার রাত্রে আগলাবে, তোমার ভয় কি ? কিন্তু নির্ম্মলা যে মোটেই সাহস পাচ্ছে না বাবা ! বিদেশ-বিভূঁই, তায় ছেলেমানুষ, সারা রাত বাড়ীতে একটা পুরুষমানুষ থাকবে না, অসুখ-বিসুখ আছে, দায়-বিপদ আছে, আপিস থেকে তোমায় যদি ডেকে আনতে হয় ত কে যাবে বল দেখি ? নির্ম্মলা ত ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে। কর্ত্তাও শুনে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েছেন।"

বসন্ত বলিল, "সে জন্য কোনও ভাবনা নেই, মা ! আমি যে বাড়ীটা নিয়েছি,সেটা একটা বড় বাড়ীর আধখানা অংশ। এক অংশে বাড়ীওয়ালা সপরিবারে বাস করেন, এক অংশ ভাড়া দিয়েছেন। অবশ্য দুই অংশই আলাদা,—আলাদা সদর দরজা, কল, পাইখানা সবই আলাদা। দু' বাড়ীর একতলায় দোতলায় মাঝের দরজা-জানালা আছে। সেই দরজা খুললেই দু' বাড়ীর মেয়েদের স্বচ্ছন্দে যাতায়াত চলতে পারে। বাড়ীওয়ালা বাবুটির প্রবীণ বয়স, অতি ভদ্রলোক—তিনি আমায় বলেছেন, কোনও ভাবনা নেই তোমার, আমরা রয়েছি,দেখবো শুনবো—যখন যা দরকার।"

এই সময় দত্ত মহাশয় আসিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "বাবা বসন্ত, এক কায কর তুমি। দিনরাত্রির ঝি রেখেছ, বেশ সে-ও থাক্। রামাকেও তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। রামা নির্ম্মলাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে, ও বাড়ীতে থাকলে, নির্ম্মলার কোনও ভয় থাকবে না, আমরাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো।"

বসন্ত বলিল, "রামাকে নিয়ে যেতে বলছেন ? তা হ'লে—"

দত্ত মহাশয় বুঝিলেন, রামাকে লইয়া যাইতে জামাতার [illegible]

আমি বুঝতে পারছি। অবশ্য, এখন তোমার অল্প বেতন, তার কলকাতার খরচ, পেরে উঠবে কি না, তাই ভাবছ ত? রানাকে কেবল দুটি দুটি খেতে দিও। ও মাইনে যেমন এখান থেকে পায়, তেমনই পাবে। আর দু'মত কোরো না বাবা, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ওর দ্বারা তোমার অনেক উপকারও হবে।"

বসন্ত বলিল, "আজ্ঞে, আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন ওকে নিয়েই যাব।"

বেলা দুইটার পর বসন্ত যাত্রা করিল। তিনটার সময় ট্রেণ। দত্ত মহাশয় ষ্টেশনে গিয়া কন্যা-জামাতাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। হারাণ মুখুয্যেও সঙ্গে গিয়াছিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার সময় বসন্তকে তিনি পত্ত দিনের আবেদনের কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন।

নির্ম্মলা কলিকাতার বাসায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাড়ীখানি ছোট হইলেও সুন্দর ও সুসজ্জিত। দ্বিতলে দুইখানিমাত্র ঘর, কিন্তু ঘরগুলি বেশ বড় বড়। দেওয়ালগুলি সুন্দর পেন্টিং করা। মেঝেগুলিতে চক্‌চকে সাদা কালো মার্ব্বেল-পাথরের টালি বসানো। ধবধবে নেটের মশারিযুক্ত দুইখানি "হোয়াইট পালিস" পালঙ্ক পাশা-পাশি রক্ষিত। ভাল ভাল চেয়ার, টেবল রহিয়াছে, দেওয়ালে মানুষ সমান দুইখানা বড় বড় বেলোয়ারি আর্শি টাঙ্গানো। উভয় কক্ষেই বিদ্যুতের পাখা—বিদ্যুৎ-বাতি ঝুলিতেছে। জানালাদরজাগুলিতে চিকণের কার্টেন দেওয়া। একতলার ঘরগুলিও বেশ সুপরিসর—আলো বাতাস যথেষ্ট। সুন্দর একটি স্নানের ঘর, তার শুধু মেঝেতে নহে, দেওয়াল-গুলিতে পর্য্যন্ত মার্ব্বেল টালি বসানো। কলিকাতাবাসী ওয়াকিবহাল কেহ এই বাড়ীখানি দেখিলে বলিত—"পাগল না কি!—এই বাড়ীর ভাড়া ৫০৲ টাকা!" কিন্তু নির্ম্মলা বা রানার নিকট ভাড়ার এই অসঙ্গতি ধরা পড়িল না। তবে আসবাবগুলি দেখিয়া নির্ম্মলা বলিল, "হ্যাঁ গা, এই সব তুমি কিনেছ? এ সব ত দামী দামী জিনিষ, অনেক টাকার জিনিষ!"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "এ সব একটাও আমার নয়। আমি এত টাকা কোথায় পাব?"

"কার তবে এ সব? বাড়ীওয়ালার?"

"না। আমাদের আপিসের বড় সাহেব সে দিন বিলেত গেলেন কি না। এক বছরের ছুটী নিয়েছেন তিনি। আমাকে বল্লেন, 'বসন্ত, আমার আসবাবপত্রগুলো রাখবার জন্যে মিছামিছি একটা বছর বাড়ী ভাড়া দেবো! তার চেয়ে কতক ছোট সাহেব রাখুন, কতক তুমি রাখ। আমি এসে আবার নেবো, বেশ যত্ন ক'রে রেখ, যেন নষ্ট না হয়।' আমি দেখলাম, আমার ও কিছু কিছু আসবাবপত্র কিনতেই হবে—একবারে সব পারবো না অবিশ্যি—মাসে মাসে দুটো একটা ক'রে কিনতে হবে। আপাততঃ এইগুলোতে কায চালাই—তার পর বড় সাহেব এলে, তখন নিজের কেনা যাবে। সাহেবের বাড়ী থেকে এইগুলো গিয়ে নিয়ে আসতে—ঘুটে ভাড়াই লেগে গেল ১৭৲ টাকা।"

সরলা বালিকা গালে হাত দিয়া বলিল, "ও বাবা! ঘুটে ভাড়া স—তে—রো টাকা! আর, এই সব বিদ্যুৎ-পাখাগুলো?"

"এ গুলোও সব বড় সাহেবের জিনিষ।"

সে রাত্রি বসন্ত স্ত্রীর নিকটেই রহিল। বলিল, "দু'দিনের ছুটী নিয়েছিলাম কি না! কালকে আর আজকে। কাল থেকে রাত্রিতে আবার আপিস। কাল খাওয়া-দাওয়ার পর দিনের বেলা একবার বেরুতে হবে। তার পর আবার রাত্রে যেতে হবে।"

৪

সপ্তাহ পরে এক দিন নির্ম্মলা তার স্বামীকে কহিল, "হ্যাঁ গা, এ বাড়ীর ভাড়া না কি শুনলাম এক শো টাকা? তুমি যে বলেছিলে, পঞ্চাশ টাকা?"

বসন্ত বলিল, "কে বল্লে তোমায়?"

"বাড়ীওয়ালা বাবুর মেয়ে সুহাসের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে কি না। তুমি যখন দুপুরবেলা কাযে বেরিয়ে যাও, তখন সে আসে। আমায় লুডো খেলতে শিখিয়েছে, আমরা লুডো খেলি। আজ আমাকে সুহাস জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার স্বামীর মাইনে কত, ভাই?' আমি বল্লাম,' দেড়শো টাকা।' সে বল্লে, 'কক্ষনো নয়, তোমার স্বামীর মাইনে নিশ্চয়ই বেশী। যার দেড়শো টাকা মাইনে, সে কি কখনও মাসে একশো টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া নিতে পারে'?"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "ওঃ—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। আমি এই বাড়ী যখন ভাড়া নিই, তখন বাড়ীওয়ালা আমার

বলেছিল, 'অনেক খরচপত্র ক'রে বাড়ী তৈরি করেছি, এ বাড়ীর একশো টাকা ভাড়াই আমি ধার্য্য ক'রে রেখেছিলাম, কিন্তু একশো টাকা কেউ দিতে চায় না। খালি প'ড়ে থাকে, তার চেয়ে আপনাকে পঞ্চাশ টাকায় দিচ্ছি—কিন্তু কাউকে বলবেন না, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে ত বলবেন, একশো টাকা ভাড়া, কেন না, আপনি যদি অন্য বাড়ীতে উঠে যান, তা হ'লে কেউ আর তখন ৫০ টাকার বেশী দিতে চাইবে না।'—মেয়েদের পেটে ও কথা থাকে না, তাই বোধ হয়, বাড়ীতে বলেছেন, একশো টাকা ভাড়া পাব।"

নির্ম্মলা বলিল, "ওঃ—এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।"

বসন্ত বলিল, "কের যদি এ কথা ওঠে ত তুমি বোলো যে, হ্যাঁ, একশো টাকাই ভাড়া ঠিক হয়েছে বটে, তবে ওঁকে ত ও সব টাকা পকেট থেকে দিতে হয় না, অর্দ্ধেক বাড়ীভাড়া আপিস থেকে পান।"

"আচ্ছা, তাই বলবো।"

প্রাতে বসন্ত যখন আসে, তখন প্রায় বেলা ৯টা। আসিয়া স্নানাহার করে, তার পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাহির হইয়া যায়। কোনও দিন বৈকালে ৪টায়, কোনও দিন ৬টায় ফিরিয়া আসে, আবার রাত্রি ৯টা কিম্বা ১০টায় সময় বাহির হইয়া যায়। প্রথম দিনই সে নির্ম্মলাকে বলিয়াছিল, "রাত্রির জন্য আমার খাবার কোরো না—আপিসে গিয়ে খাই কি না। রাত্রিতে যারা কাজ করে, আপিসেই রোজ তাদের জন্যে খানা তৈরী হয়।" সুতরাং নির্ম্মলা প্রায়ই একবেলা রাঁধিয়া দুই বেলা খায়। দুর্গা ঝি রামার ঘরের দাওয়ায়, সে নিজের জন্য ও রামার জন্য রন্ধন করে, সে-ও এক বেলা রাঁধে। সুতরাং সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে উনান জ্বলে না।

বসন্ত রামাকে বাজার চিনাইয়া দিয়াছে, বাজার-হাট সেই করে। দুর্গা ঝি গোয়ালাবাড়ীতে গিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিয়া, খাঁটি দুধ দোহাইয়া আনে। এক দিন রামা বলিল, "জামাই-বাবু, আপনার আপিসটি ত আমায় চিনিয়ে দিলেন না। যদি হঠাৎ কোনও দিন কোনও দরকারই হয়!"

বসন্ত বলিল, "আরও দিন কতক যাক্, নিয়ে যাব এক দিন তোকে সঙ্গে ক'রে। কলকাতার পথঘাট আগে তোর অভ্যাস হোক্। নইলে শেষে কি মোটর চাপা প'ড়ে বুড়ো বয়সে প্রাণটা খোয়াবি?"

এক দিন সন্ধ্যার সময় বসন্ত বাড়ী আসিলে নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওগো, আজ সুহাস আমায় একটা ভারি মজার কথা বলেছে।"

বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

"ও বলে কি জান? বলে, 'তোমার স্বামী রাত্রে বাড়ীতে থাকেন না, বাড়ীতে খানও না, রাত ৯টা ১০টার সময় চ'লে যান, আবার পরদিন সেই বেলা ৯টায় আসেন, কেন বল দেখি?' আমি বল্লাম, 'কি করবেন ভাই, ছাপাখানায় চাকরি, সারারাত খবরের কাগজ ছাপেন, সকালবেলা কাগজ বেরোয়, কাযেই রাতে বাড়ী থাকতে পারেন না।' সে বলে, 'তুমি ভাই সরল মানুষ; আমার স্বামী যদি আমায় ঐ কথা বলতেন, আমি কিন্তু বিশ্বাস করতাম না। আমি মনে করতাম, আমায় বুঝি ঐ রকম বোকা বুঝিয়ে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নির্ম্মলা থামিল। বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "বোকা বুঝিয়ে—কি?"

নির্ম্মলা বলিল, "যাও, আমি বলবো না, সে ছাই কথা।"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "তোমার সখী এই কথা বলে ত যে, আমি হ'লে মনে করতাম যে, আমায় বোকা বুঝিয়ে, হয় ত আমার স্বামী কোনও কু-স্থানে গিয়ে রাত কাটান।"

নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ, তাই। তবে, এমন রূঢ়ভাবে বলেনি। বলেছিল, 'অন্য কোথাও হাওয়া খেতে যান।' প্রথমে ত আমি 'হাওয়া খাওয়া' মানেই বুঝতে পারিনি, শেষে সে খুলে বল্লে। তুমি কিন্তু ইসারাতেই বুঝতে পেরেছ—উঃ, তোমার খুব বুদ্ধি কিন্তু।"

বসন্ত হাসিতে লাগিল। বলিল, "সুহাস আর কত দিন বাপের বাড়ী থাকবে?"

"পূজো পর্য্যন্ত। পূজোর সময় ওর বর আসবে—পূজোর পর ওকে নিয়ে আবার পশ্চিমে চ'লে যাবে।"

ইহার কয়েক দিন পরে, এক দিন বসন্ত আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি শ্রান্তিবিলাস পড়েছ?"

"হ্যাঁ, পড়েছি। তুমিই ত সে বই কিনে বাপের বাড়ীতে আমায় দিয়ে এসেছিলে! কেন?"

বসন্ত বলিল, "আচ্ছা, কাল বেলা দু'টোর সময় আমি কোথায় ছিলাম?"

"কেন ? তুমি খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে।"

"কাল সারাদিন আমি একবারও বেরিয়েছিলাম বাড়ী থেকে ?"

"না, সেই রাত ৯টার সময় ত আপিস গেলে। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ গা ?"

"একটা ভারি মজা হয়েছে। আজ দুপুরের পর আমি আপিসে গেলে, এক জন আমায় বল্লে, 'কাল বেলা দুটোর সময় মোটরে চ'ড়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন ?' আমি বল্লাম, 'কৈ, আমি ত কোথাও যাইনি—আমি ত কাল সারা দিন বাড়ীতেই ছিলাম।' সে বল্লে, 'বিলক্ষণ ! আমি নিজের চোখে দেখলাম, আপনি প্রকাণ্ড একখানা হল্‌দে রঙের মোটরে চ'ড়ে, হ্যারিসন রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন, এক জন বুড়ো মত লোক আপনার পাশে ব'সে ছিল, আর আপনি বল্‌ছেন, আমি যাইনি !' আমি বল্লাম, 'নিশ্চয়ই আমি নয়, তা হ'লে আমার মত চেহারা অন্য কাউকে আপনি দেখেছেন।' সে কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করলে না। বল্লে, 'না, নিশ্চয়ই আপনি। ঠিক আপনার চেহারা, এই রকম পঞ্জাবী গায়ে, চাদর এই রকম খুলে গায়ে জড়ানো, আপনি ভিন্ন অন্য কেউ হতেই পারে না।'—ঠিক ভ্রান্তিবিলাস নয় ?"

নির্ম্মলা বলিল, "হ্যাঁ, তাই ত ! ভারী আশ্চর্য্য ত !"

কয়েক দিন পরে নির্ম্মলা এক দিন সন্ধ্যাবেলা স্বামীকে বলিল, "হ্যাঁ গা, আজ তুমি আপিস থেকে অন্য কোথাও গিয়েছিলে কি ?"

বসন্ত বলিল, "না। কেন বল দেখি ?"

"সুহাসের মুখে শুন্‌লাম, আজ তার বাবা দেখেছেন, একখানা হল্‌দে মোটরে চ'ড়ে তুমি হাওড়া ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছ।"

বসন্ত কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "তাই ত ! ভারি মুস্কিল হ'ল যে ! নিশ্চয়ই সেই লোকটা। আচ্ছা, আমি বাড়ী না থাকার সময় সেই লোকটা এসে তোমায় যদি ডাকে, তুমি ত তা হ'লে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে চ'লে যাবে।"

নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "রক্ষে কর।"

বসন্ত বলিল, "কেন, মন্দ কি ? গরীব স্বামীর পরিবর্ত্তে ধনী স্বামী পাবে। বস্ত মোটরে চ'ড়ে চ'লে যাবে, আমি ব্যাচারী ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকবো।"

নির্ম্মলা বলিল, "দেখ, কের যদি ঐ সব কুকথা বল্‌বে, তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমি আর কথাই কব না !"

দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাস আসিয়া পড়িল। সুহাসিনীর স্বামী পশ্চিম হইতে আসিলেন ; তিনি বসন্তের সমবয়সী। দুই জনে আলাপ-পরিচয় হইল।

৫

সপ্তমীপূজার দিন বেলা ৪টার সময় বসন্ত বলিল, "আজ আমি এখনই বেরুচ্ছি—আপিসে কায বেশী পড়েছে—আজ আর সন্ধ্যাবেলা আমি আসতে পারবো না।—কাল একবারে বেলা ৯টার সময় আসবো।"

নির্ম্মলা বলিল, "ভ্যালা চাকরী হয়েছে বাবু, হ্যাঃ ! পূজোর তিন দিনও ছুটী নেই।"

বসন্ত বলিল, "ছুটী চুলোয় যাক্—কায়ের আরও বেশী ভিড়। বেন, পোষ্ট আপিস আর খবরের কাগজের আপিসে পালে-পার্ব্বণে ছুটী ত নেই-ই, বরং কায চতুর্গুণ বেড়ে যায়।"

স্বামী চলিয়া গেলে নির্ম্মলা সুহাসিনীর নিকটে দুর্গাকে পাঠাইয়া একখানা উপন্যাস আনাইয়া তাহাই পড়িতে বসিল। অন্য দিন সন্ধ্যাবেলা সে গা ধোয়, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে, আজ আর সে সব কিছু করার তার চাড় হইল না।

ছয়টার সময় সুহাসিনী আসিয়া বলিল, "তোমার ঝির কাছে শুন্‌লাম, দাদা বাবু না কি আজ সন্ধ্যেবেলা আর আসবেন না ?"

"হ্যাঁ, সে ত সেই ৪টার সময়ই বেরিয়ে গেছে।"

"এক কায করবে ভাই ?"

"কি ?"

"আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি। আমার আর মা'র জন্যে ও একটা বক্স নিয়েছিল। মা প্রথমে যাবেন বলেছিলেন, এখন আর যেতে চাচ্ছেন না। তুমি কেন খুকীকে নিয়ে চল না ভাই আমার সঙ্গে।"

নির্ম্মলা বহি বন্ধ করিয়া বলিল, "যাব ? কিন্তু ওঁকে ত বলা হয় নি।"

"তার জন্যে আর কি হয়েছে ?"

"তোমার উনি কোথায় বসবেন ?"

"ও কথ্খনো বক্সে বসে না। বলে, মেয়েদের সঙ্গে বস্‌তে ওর লজ্জা করে। চল চল, কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাও, খুকীকে দুধ-টুধ খাওয়াও, ঠিক ৭টার সময় বেরুতে হবে।"

"কি বই হবে?"

"কৃষ্ণকান্তের উইল।"

"সেই ভ্রমর, রোহিণী-টোহিনী?"

"হ্যাঁ।"

"যেতে ত ইচ্ছে করছে খুবই।"

"রামাকেও নিয়ে চল। তুমি আমি একখানা গাড়ীতে যাব, রামা কোচবাক্সে ব'সে যাবে এখন। ও আর একটা গাড়ীতে যাবে।"

"আচ্ছা, রামাকে জিজ্ঞাসা করি।"—বলিয়া নির্ম্মলা তাহাকে ডাকিল। রামা আসিলে নির্ম্মলা তাহাকে সুহাসিনীর প্রস্তাবের কথা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোদের জামাই বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নি, এ ভাবে গেলে তিনি শেষে রাগ করবেন না ত, রামুদা?"

রামা বলিল, "না, রাগ করবেন কেন? কোনও অবন্দ কায ত করা হচ্চে না!"—সুতরাং নির্ম্মলা থিয়েটরে যাইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিজ প্রসাধনে নিযুক্ত হইল।

নির্ম্মলা ও সুহাসিনী যখন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বক্সে প্রবেশ করিল, তখন অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দুই জনে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিল।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইলে আলো জ্বলিয়া উঠিল। সোডা-লেমনেড পাণ-সিগারেটওয়ালারা মহা কোলাহল বাধাইয়া তুলিল। নির্ম্মলা ও সুহাসিনী অন্যান্য বক্সের অধিকারিণী মহিলাগণের বসন-ভূষণের পারিপাট্য দেখিতে লাগিল। কোনও কোনও বক্সে মহিলাগণের সঙ্গে দুই একটি পুরুষও বসিয়া আছে। তার পর তাহারা নিম্নে দৃষ্টিপাত করিল। সুহাসিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ ভাই, ঐ খুকীর বাবা নয়?"

নির্ম্মলা বলিল, "কোথায়?"

"ঐ যে একেবারে সামনের সীটে, গদী-আঁটা বেঞ্চির মাঝখানে?"

নির্ম্মলা সেই লোকটির পানে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তিনিই ত। তা, এখানে তিনি কি ক'রে এলেন? ব'লে গেছেন যে, সন্ধ্যে থেকেই আপিসে খুব কায।"

সুহাস বলিল, "তা কিছু আশ্চর্য্য নয়। খবরের কাগজ-ওয়ালাদের আবার থিয়েটরের অভিনয়ের সমালোচনা লিখতে হয় কি না, নৈলে তারা বিজ্ঞাপন দেবে কেন? ওঁর আপিস থেকে আর কাউকে না পেয়ে আজ ওঁকেই পাঠি-য়েছে বোধ হয়।"

নির্ম্মলা যেন সান্ত্বনা পাইয়া বলিল, "তা হ'তে পারে বটে।"

খুকী এই সময় বায়না ধরিল, "মা, আমি বাবার কাছে যাব। এখান থেকে আমি ভাল দেখতে পাচ্ছিনে—আমি বাবার কাছে বস্‌বো।"

নির্ম্মলা বলিল, "কি ক'রে যাবি? কোথা দিয়ে কোথা যেতে হয়, তা কি তুই জানিস্? শেষে হারিয়ে যাস্ যদি। উনি যদি আমাদের দেখতে পান, তা হ'লে নিশ্চয়ই এখানে আসবেন, তখন তুই সঙ্গে যাস্।"

চোখো-চোখি হইবার আশায় নির্ম্মলা একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল; কিন্তু উদ্দিষ্ট ব্যক্তি উপরে চাহিল না। ক্রমে কনসার্ট থামিল, আলো নিবিল, দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক শেষে আলো জ্বলিলে দেখা গেল, নিম্নের সে আসন শূন্য, সেখানে কেহই নাই। ক্ষণকাল পরে নির্ম্মলা দেখিল, তাহার সম্মুখে, বিপরীত দিকের বক্সে তার স্বামী প্রবেশ করিয়া, দুইটি মহিলার সহিত কথা কহিতেছেন। উভয়েই যুবতী—এক জন সুশ্রী, এক জন কৃষ্ণকায়া। দুই জনের মাঝখানে একটি সাত আট বৎসরের বালক বসিয়া আছে। দেখিয়া নির্ম্মলা খুব বিস্মিত হইল। সুহাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিল। খুকী বলিল, "ঐ মা, বাবা ওখানে এসেছে—আমি বাবার কাছে যাই!"

নির্ম্মলা বলিল, "যা, গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।"

বালিকা চলিয়া গেল। নির্ম্মলা সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ভাই ওরা? উনি ওদের সঙ্গে কথা কোচ্ছেন কেন?"

সুহাস বলিল, "তাও আর বুঝতে পারলে না নেকুরাম। ওদের দুটির মধ্যে একটি তোমার উপ-সতীন। ওরই আপিসে ত রোজ রাত্তিরে তোমার স্বামী চাকরী করতে যান।"

নির্ম্মলা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া, একদৃষ্টে সেই বক্সের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার যেন কান্না পাইতে লাগিল।

অর্দ্ধ মিনিট পরেই দেখিল, স্বামী সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া অদৃশ্য হইলেন।

একটু পরেই খুকী ফিরিয়া আসিল। তার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে। নির্ম্মলা ব্যস্তভাবে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খুকী, কি হয়েছে ?"

খুকী ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "মা, বাবা বল্লে, আমি তোর বাবা নই। বল্লে, আমি ত তোকে চিনি না বাছা ? কার মেয়ে তুই ? কোথায় থাকিস্ ?"—বলিয়া সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

নির্ম্মলা বলিল, "ও মা, সর্ব্বনেশে! ছি ছি, মার, মার, কাকে আমার স্বামী ব'লে মনে করেছিলাম ? না রে খুকী, ও তিনি ন'ন। ঠিক তাঁর মত দেখতে আর এক জন। তুই তাঁর বুকের কলজে, তোকে কি তিনি বলতে পারেন, আমি তোর বাবা নই !"

সুহাস বলিল, "তুমি কি বলছ তাই, আমি বুঝতে পারছিনে।"

নির্ম্মলা বলিল, "কেন, তোমায় কি আমি বলিনি ? বলিনি বোধ হয়। সে দিন যে তুমি আমায় বলেছিলে, একখানা হল্‌দে রঙের মোটর গাড়ীতে উনি হাওড়া ষ্টেশনে যাচ্ছেন, তোমার বাবা দেখে এসেছেন—সে উনি নন। ঠিক ওঁর চেহারা, এই কলকাতায় আর এক জন লোক আছে, সে একখানা হল্‌দে রঙের মোটর চ'ড়ে বেড়ায়। ওঁর কত বন্ধু কত সময় তাকে দেখে উনি মনে করেছে—উনি সে কথা আমায় বলেছেন।"

সুহাস বলিল, "বল কি ! খুব আশ্চর্য্য ত !"

এই সময় থিয়েটরের দিকে সেইখান দিয়ে যাইতে দেখিয়া, নির্ম্মলা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ও ঝি, তুমি একবার গিয়ে দেখে এস ত বাছা, একখানা বাড়ীর মোটর গাড়ী হল্‌দে রঙের দাঁড়িয়ে আছে কি না ; যদি থাকে ত জিজ্ঞাসা ক'রো, কার গাড়ী।"

"আচ্ছা"—বলিয়া ঝি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিল, "হল্‌দে রঙের মোটর দাঁড়িয়ে আছে, বল্লে, ভবানীপুরের হেমন্ত বাবুর গাড়ী।"

নির্ম্মলা সহাস্যে সুহাসিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "শুনলে ত ?"

কনসার্ট থামিল, আলো নিবিল। তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল।

পরদিন বেলা ৯টার সময় বসন্ত বাড়ী আসিলে নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কি কাল থিয়েটরে গিয়েছিলে ?"

বসন্ত সবিস্ময়ে বলিল, "থিয়েটরে! তুমি স্বপ্ন দেখেছ না কি ? কাল সেই সন্ধ্যে থেকে সকাল ৭টা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম মোছবার অবকাশ পাইনি—আমি যাব থিয়েটর দেখতে ? তুমি ত বেশ !"

নির্ম্মলা তখন গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। সুহাস প্রথমে কি সন্দেহ করিয়াছিল এবং কি পাঠাইয়া খবর লইবার কথাও বলিল। শুনিয়া বসন্ত বলিল, "তুমিও তা হ'লে দেখেছ তাকে ? কি সর্ব্বনাশ! সে যদি তোমায় এসে বল্‌ত, চল, বাড়ী যাই, তুমি ত তা হ'লে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে চ'লে যেতে ?"

নির্ম্মলা বলিল, "ব'কো না যাদু, যাও! রোজ রোজ এক ঠাট্টা কি ভাল লাগে ? দূরে থেকে দেখেছি বলেই আমার ভুল হয়েছিল, কাছে এসে ডাকলে কি আর আমার ভুল হ'ত ?"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "আমার নিজের মেয়েই যখন চিনতে না পেরে তাকে বাবা বল্লে,—আমার শ্বশুরের মেয়ে কি তফাৎ বুঝতে পারত ?"

নির্ম্মলা বলিল, "যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। আর কক্ষনো আমি তোমার সঙ্গে ভিন্ন এক পা বাইরে যাব না।"

৬

পূজা অন্তে সুহাসিনী তার স্বামীর সঙ্গে পশ্চিম চলিয়া গেল। এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে নির্ম্মলা একটি সমবয়সী সহৃদয়া সখী পাইয়াছিল—তাহার অভাবে নির্ম্মলার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, নির্ম্মলার আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার পর যথারীতি বসন্ত আপিসে চলিয়া গেল, কিন্তু তার পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে ফিরিয়া আসিল না। ১০টা বাজিল, ১১টা বাজিল, তথাপি স্বামী না আসায় নির্ম্মলা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রামাকে ডাকিয়া বলিল "বাবুর ত কোন [illegible]

এল না। কি হ'ল, কেন এলেন না, কিছুই যে বুঝতে পারছিনে।"

মামা বলিল, "কত দিন বলেছি, আমাকে কি জামাই-বাবু তাঁর আপিস চিনিয়ে দিয়েছেন যে যাব?"

নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তা হ'লে কি হবে, মামুদা?"

"বাড়ীওয়ালা বাবুকে বলি গে। তিনি বোধ হয় সে আপিস চেনেন, তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই।"

"তুমি যাও দাদা—শীগ্‌গির যাও।"

নির্ম্মলা উৎকণ্ঠিতভাবে মামার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ মাঝের দরজা খুলিয়া, বাড়ীওয়ালা বাবুর স্ত্রী আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "হাঁ বাছা, মামু বলছে, আজ তোমার স্বামী না কি এখনও বাড়ী আসেননি?"

"হাঁ মা। আমি বড় ভাবনায় পড়েছি। কি হবে মা?"

"ভয় কি, হয় ত কোনও কাযে আটকে পড়েছেন। তা তিনি বলেন, বেয়েকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস, জামাই কোন্ আপিসে চাকরী করেন, তা হ'লে উনি এখনই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবেন।"

নির্ম্মলা সরোদনে বলিল, "খবরের কাগজের আপিসে কায করেন।"

"তা ত হ'ল, কিন্তু কোন্ খবরের কাগজের আপিসে?"

"ইংরিজী খবরের কাগজ।"

"কিন্তু সে কাগজের নাম কি? ইংরিজী খবরের কাগজ ত অমন কত বেরোয় কলকাতা থেকে।"

"তা জানিনে মা, ইংরিজী খবরের কাগজ, তাই জানি।"

"আচ্ছা, কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করি, দাঁড়াও।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "উনি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বল্লেন, সমস্ত প্রধান প্রধান ইংরেজী খবরের কাগজের আপিসেই আমি যাব, গিয়ে খোঁজ করব।"

নির্ম্মলা তখনও আহার করে নাই জানিয়া তিনি তাহাকে খাওয়াইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা বলিল, "না মা, তাঁর খবর না পেলে আমি কিছুতেই খেতে পারব না।" আবার গলা দিয়ে অন্নজল গলবে কেন? অবশেষে অনেক কষ্টে তিনি নির্ম্মলাকে এক গ্লাস সরবৎ পান করাইয়া গৃহে গেলেন।

বেলা দেড়টার সময় বাড়ীওয়ালা বাবু ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া নির্ম্মলাকে জানাইলেন, কলিকাতার সমস্ত ইংরাজী দৈনিকের আপিসেই তিনি গিয়াছিলেন, কিন্তু বসন্তকুমার বসু কেহ কোথাও চাকরী করে না।

নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার বাবাকে এখানে আসবার জন্তে টেলিগ্রাম ক'রে দিতে বল।"—নির্ম্মলা পিতার ঠিকানা বলিয়া দিল।

সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হইল, তথাপি বসন্তের দেখা নাই অথবা তাহার তরফ হইতে কোনও সংবাদও নাই। পিতাও আসিয়া পৌঁছিলেন না।

রাত্রি এগারোটার সময় দুয়ারের কড়ায় খট্-খট্ করিয়া আওয়াজ হইল। পিতা আসিয়াছেন মনে করিয়া নির্ম্মলা নিজে ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। একটি ৭।৮ বৎসর-বয়স্ক বালকের হাত ধরিয়া তার স্বামী দাঁড়াইয়া—তাহার চুল উস্কখুস্ক, মুখ শুকাইয়া আধখানি হইয়া গিয়াছে। সে ভগ্ন-স্বরে ডাকিল—"নির্ম্মল!"

সেই মুহূর্ত্তে খোলা দরজার ভিতর দিয়া নির্ম্মলার দৃষ্টিতে পড়িল, হলদে রঙের বৃহৎ এক মোটরকার বাহির-বারান্দার নিম্নে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নির্ম্মলা একটা অস্ফুট ভীতিধ্বনি করিয়া দুই তিন পদ পিছাইয়া গেল।

"ভয় নেই নির্ম্মল!—তোমারই স্বামী আমি, অন্ত কেউ নই। এইমাত্র নিমতলার ঘাট থেকে ফিরছি। সে দিন থিয়েটারে বসে যে রোগা স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিলে, সে সত্যিই তোমার সতীন—উপসতীন নয়—আমার প্রথমা স্ত্রী—তাকে পুড়িয়ে এলাম।—এই ছেলেটিকেও সে দিন তুমি বসে দেখেছিলে। এই নাও—আজ থেকে খোকা তোমারই ছেলে হ'ল।"

বালক এই কথায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে নির্ম্মলা সমস্তই বুঝিতে পারিল। সে ছুটিয়া গিয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া লইল। স্বামীর হাতখানি ধরিয়া বলিল, "ভিতরে এস।"

বসন্ত—অথবা হেমন্ত (কারণ, হেমন্তই এই দুর্ভাগ্যের আসল নাম) বলিল, "দাঁড়াও, গাড়ীটার ব্যবস্থা ক'রে আসি।"—বলিয়া সে বাহির হইয়া বলিল, "বিনোদ, গাড়ী নিয়ে আবার নিমতলায় যাও। ওঁদের সব বাড়ী পৌঁছে দিয়ে, গাড়ী সেখানেই রেখ। আজ রাত্রে আমি আর খোকা এইখানেই রইলাম—কাল বেলা ৯টার সময় গাড়ী নিয়ে আসবে।"

নির্ম্মলা রান্নাঘরে গিয়া তাড়াতাড়ি নেবু বিয়া চিনির সরবৎ প্রস্তুত করিয়া, স্বামীকে ও খোকাকে পান করাইয়া বলিল, "হ্যাঁ গা, দুটি ভাত চড়িয়ে দিই, ভাতে—ভাত ?"

হেমন্ত বলিল, "আমি ত কিছুই খেতে পারবো না। খোকাও বোধ হয়, ভাত হ'তে হ'তে ঘুমিয়ে পড়বে। দুধ-টুধ থাকে ত ওকে একটু দাও।"

"আজ সারাদিন বোধ হয় তোমার খাওয়া হয় নি ?"

"না হওয়ারই মধ্যে। ক'দিন থেকেই খোকার মা অসুখে পড়েছিলেন। কাল রাত ১০টার সময় ভবানীপুরে বাড়ী গিয়ে দেখলাম, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, জীবনের আশা ডাক্তাররা ছেড়েই দিয়েছে। সেই তখন থেকে, আজ বেলা তিনটে অবধি যমে-মানুষে যুদ্ধ। তিনটের সময় সব শেষ হয়ে গেল, যোগাড়-যন্তর ক'রে বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যে হ'ল। আমি না আসাতে তুমি কত ভাবছো—তা মাঝে মাঝে মনে পড়ছে বটে—কিন্তু কাউকে দিয়ে একটা খবর যে দেবো তোমাকে, তা পেরে উঠলাম না। তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?"

নির্ম্মলা বলিল, "দুপুরবেলা সরবৎ খেয়েছি।"

হেমন্ত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা আমি আগেই জানি। আচ্ছা, দাও দুটো ভাত চড়িয়ে—দুজনেই খাব এখন। খুকী কোথা ?"

"সে উপরে ঘুমুচ্ছে।"

"তাকে এনে আমার কোলে দাও।"

"তুমি উপরে চল।"

"আচ্ছা, তাই চল।"

দ্বিতলে গিয়া নির্ম্মলা খোকাকে কোলে করিয়া সোফার উপর বসিয়া তাহাকে দুধ ও সন্দেশ খাওয়াইতে লাগিল। হেমন্ত খাটের উপর বসিয়া, ঘুমন্ত খুকীকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে চুমো খাইতে খাইতে বলিতে লাগিল, "মা—বাবা আমায় বল্লে যে, আমি তোর বাবা নয়!—এই ব'লে বাছা আমার এক দিন কেঁদেছিল। 'আমি তোর বাবা নয়'—বলতে আমার বুকটা যে ফেটে গিয়েছিল রে, তা কি তুই জানিস ?"—বলিয়া হেমন্ত ঘুমন্ত মেয়েকে আবার চুমা খাইল।

পরদিন বেলা ১০টার ট্রেণে দত্ত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রথমটা জামাতার উপর মনে মনে তাঁহার খুব রাগ হইল—কিন্তু শেষে যখন শুনিলেন, সম্প্রতি 'ইংলিশ ব্যাঙ্কে' চাকরী করার কথাটা মিথ্যা হইলেও, প্রথমে কথিত দালালী ব্যবসায়টা খাঁটি সত্য, সে ব্যবসায় বিশেষ জাঁকালো রকমের, এবং সে ব্যবসায় হইতে সামান্যভাবে বৎসরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; তখন তাঁহার সমস্ত রাগ জল হইয়া গেল।

পরদিন দত্ত মহাশয় জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বাবাজী, প্রথম যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা, তখন তুমি নিজের পরিচয়টি গোপন করেছিলে কেন ?"

হেমন্ত বলিল, "আজ্ঞে না, নির্ম্মলাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে গঙ্গার ঘাটে আপনি যখন পাল্কী এনেছিলেন, আপনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তখন আমার প্রকৃত নামই বলেছিলাম—হেমন্তকুমার বসু। বাড়ী নিয়ে গিয়ে আপনি আমায় বসন্ত বসন্ত ব'লে ডাকতে লাগলেন। আমি প্রতিবাদ করি নি—কারণ, তা করার কোনও দরকার মনে করি নি।"

"পরীর সেজেছিলে কেন ?"

"আজ্ঞে, কায়েতের ছেলে, ৩০ বছর বয়স হয়েছে, পরীর না সাজলে, তত দিন পর্য্যন্ত আইবুড় থাকার কৈফিয়ৎ কি দিই ? আর, প্রকৃত কথা জানলে আপনি কি আর সতীনের উপর মেয়ে দিতেন ?"

নির্ম্মলা এক দীর্ঘ পত্রে সুহাসিনীকে সমস্ত ব্যাপার জানাইল। শেষে লিখিল, "তুমি যাহা অনুমান করিয়াছিলে, তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইল,—উনি রাত্রে চাকরী করিতে যাইতেন না;—আমাকে বোকা বুঝাইয়া হাওয়া খাইতেই যাইতেন বটে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, উহা বিশুদ্ধ বায়ু, দূষিত হাওয়া নহে।"

পরলোকগতা পত্নীর শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ম্মলাকে হেমন্ত এই বাড়ীতেই রাখিল। তাহার পর একটা ভাল দিন দেখিয়া, হেমন্তের জননী তাঁহার নূতন বউকে আনাইয়া বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জাতিস্মর

বৃষ্টি-বাদলার দিন ছাড়া প্রত্যহ সন্ধ্যার একটু আগে অজিত তার সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসা থেকে বেরিয়ে গোল-দীঘিটাকে পাঁচ ছয় বার প্রদক্ষিণ ক'রে সোজা বাসায় ফিরে আসে। এ ছাড়া সে কোথাও যায় না—থিয়েটারেও না, বায়োস্কোপেও না, মাঠে ফুটবল বা ক্রিকেটের দিকেও না, অর্থাৎ যাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সুশীল ও সুবোধ' বালক ব'লে গিয়েছেন, অজিতও ঠিক তাই,—নামটা গোপাল হ'লে বর্ণনাটা একবারে মিলে যেত। সত্য সত্যই অজিত 'যা পায়, তাই খায়' 'যা পায়, তাই পরে',—যদিও সে মালিকপুরের এক লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ওয়ালা জমীদার বীরেশ্বর বসুর একমাত্র সন্তান।

গ্রামের ইংরাজী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতায় এসে অজিত প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হয়েছিল এবং দুই বৎসর ইডেন হিন্দু হষ্টেলেই কাটিয়েছিল। আই-এ পাশ করার পর বীরেশ্বর বাবু ছেলেকে হষ্টেলে না রেখে সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ছোট একখানি নূতন দোতলা বাড়ী ভাড়া ক'রে চাকর ও ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ক'রে সেই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তার তত্ত্বাবধান করবার জন্য তাঁদেরই গ্রামের রামমোহন বসুর ছেলে কিশোরীমোহনকে বাসায় রেখেছিলেন। কিশোরী অজিতের অপেক্ষা ছয় সাত বছরের বড়। সে বি-এ পাশ ক'রে বছরখানেক খুলনা গবর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেছিল। তাহার পর বীরেশ্বর বাবুই চেষ্টা ক'রে এক বছর আগে অজিত আই-এ পাশ করবার পর কলিকাতায় হিন্দু স্কুলে নিয়ে আসেন এবং তাকে অজিতের কলিকাতার অভিভাবক ক'রে দেন। কিশোরীর বাড়ীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, এ দিকে মাইনেও পাচ্ছে পঁচাত্তর টাকা। এ অবস্থায় নি-খরচায় কোথাও থাকতে এক দিকে তার যেমন সঙ্কোচ-বোধ হয়েছিল, আর এক দিকে বীরেশ্বর বাবুর ন্যায় ধনী পরোপকারী স্বজাতি জমীদারের স্নেহের অনুগ্রহও সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। বিশেষতঃ অজিতকে সে বড়ই স্নেহ করত। অজিতও তাকে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি করত, আবার বন্ধু বলেও মনে করত।

বৎসরে লাখ টাকা আয়ের জমীদারের ছেলেরা হষ্টেলে থেকে কলেজে পড়লে তাদের সম্মানের লাঘব হয় না, এ কথা বীরেশ্বর বাবু জানতেন। কারণ, তিনিও এককালে ঐ প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিলেন এবং হষ্টেলেই থাকতেন। তিনিও বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছিলেন, একবার ফেল হয়ে আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু অজিতের জন্য নানা কারণে দুই বছর হষ্টেলে রাখার পর, তাঁকে বাসা ভাড়া করতে হয়েছিল এবং যেখানে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় চ'লে যেত, সেখানে দুই শত টাকা ব্যয় করতে তিনি কাতর হননি। পূর্ব্বেই বলেছি, অজিত একবারে 'সুবোধ' বালক ছিল, অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে সে একটু বেশী পরিমাণে সেকেলে ভাবাপন্ন ছিল। কলেজের ছেলে বি-এ পড়ে, বড় জমীদারের একমাত্র সন্তান, সে কি না প্রাতঃকালে উঠে চা', বিস্কুট, রুটী খাবে না, শুধু কি তাই—স্নান না ক'রে জল খাবে না, আর সে জলখাবারও তেমনই—ছোলা ভিজানো, আদা আর লবণ, মাছ-মাংস খাবে না, ডিম খাবে না—খাবে ডাল-ভাত, শাকচচ্চড়ি, দুধ-ঘি পর্য্যন্ত সব সময় খেতে চায় না। সারা কলিকাতায় ছেলেরা মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা দেখতে যায়, থিয়েটার-বায়স্কোপে যায়, যেখানে যাঁর বক্তৃতা হয়, দল বেঁধে শুনতে যায়, তলন্টিয়ারী করে, মাসিকপত্রে গল্প কবিতা লেখে, কেহ কেহ বা সুবিধামত প্রেম-চর্চ্চাও করে, পড়ার বই সরিয়ে রেখে ইংরাজী, বাঙ্গালা নভেল পড়ে; অজিত এ সকলের সীমানা দিয়েও যায় না। তার কাছ পড়া—তাও যে খুব মনোযোগের সঙ্গে সে কলেজের পাঠ্য পড়ে,

তা মনে হয় না—যেন অগত্যা তাকে কলেজে যেতে হয়, পাশের পড়া পড়তে হয়। অথচ,গীতা-ভাগবতও সে পড়ে না, ধর্ম্ম ও নীতিকথারও আলোচনা করে না। তার কায কলেজে যাওয়া, পড়াশুনা করা, সন্ধ্যার পূর্ব্বে যথানিয়মে গোলদীঘিতে পাঁচ দাত পাক খাওয়া, আর চুপ ক'রে ব'সে থাকা। সে যে কি ভাবে, তা বেশ পরিষ্কার ক'রে সে-ও বল্‌তে পারে না ; সে বলে,'কি যে ভাবি, তা আমিই জেবে পাই নে।' এমন ছেলেকে ইডেন হষ্টেলে বন্দী ক'রে রাখা বীরেশ্বর বাবু ভাল মনে করলেন না ; তাই তিনি অজিতের জন্ত একটা বাসা ক'রে দিলেন এবং কিশোরীকে তার সঙ্গে দিলেন।

বীরেশ্বর বাবু জেবে পান না, তাঁর ছেলে এমন হ'লো কি ক'রে ? তিনি সেকেলে মানুষ নন ; বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছিলেন। পাড়াগেঁয়ে জমীদার হলেও গোঁড়া হিন্দুও ছিলেন না, অনাচারী খৃষ্টানও ছিলেন না; পিতৃপিতামহের আমলের ক্রিয়াকাণ্ড বজায় রেখেছিলেন ; আবার একেলে প্রথার চা-বিস্কুটও বাড়ীতে অবাধে চল্‌ত,টীকিওয়ালা বিস্তারত্নের দলেরও গতিবিধি ছিল, আবার হাল ফ্যাসানের পতিতোদ্ধারীরাও তাঁর কাছে সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হ'তো না। জমীদার হলেও তাঁর মেজাজ উঁচু ছিল না ; তিনি একবারে সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। নেশার মধ্যে তিনি তামাক খেতেন এবং সে তামাক বেশ তরিবৎ ক'রে দিতে হতো। খুব ভাল তামাক না হ'লে তাঁর চল্‌ত না। এই তামাক সাজার জন্তই তাঁর এক জন খানসামা ছিল। ইহা ছাড়া আর কোন রকম বিলাসিতাই তাঁর ছিল না।

আর একটি গুণ বীরেশ্বর বাবুর ছিল ; তিনি সদানন্দ রসিক পুরুষ ছিলেন। সকলের সঙ্গে হাসি-তামাসা কর্‌তেন ; আর এ তামাসা-ঠাট্টার পাত্রাপাত্রভেদ ছিল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গেও যেমন রসিকতা করতেন, গরীব প্রজা সলিমুল্লার সঙ্গেও সেই ভাব। তাঁহার আদর-আপ্যায়নে ইতর-বিশেষ ছিল না ; সূর্য্যরশ্মির মত তাঁর সমস্ত ব্যবহার সকলেই সমভাবে ভোগ করত। ইহারই জন্ত তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ও অজাতশত্রু ছিলেন।

এক দিন বৈকালে পাঁচটার পর যথানিয়মে গোলদিঘীতে চক্র দিবার জন্ত অজিত বাহির হবে, এমন সময় বীরেশ্বর বাবু এসে উপস্থিত ; তাঁর সঙ্গে বিপিন খানসামা ; তার এক হাতে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ, আর এক হাতে গড়গড়া।

বীরেশ্বর বাবুকে দেখে অজিত দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—বাবা !

বীরেশ্বর বাবু সহাস্যমুখে বলিলেন,—বাঃ, ঠিক চিনে ফেলেছ দেখছি !

অজিত বল্‌ল,—খবর নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ এমন সময়ে যে, বাবা !

বীরেশ্বর বাবু তেমনই হাসিমুখে বল্‌লেন,—তাই ত, মাণিকপুরের প্রবল প্রতাপ জমীদার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু মহাশয়ের যে কোথাও যেতে হ'লে লাট সাহেবের মত এক মাস আগে টুর-প্রোগ্রাম ছাপিয়ে দিতে হয়, অভ্যর্থনা করবার সুযোগ দিতে হয়, এ কথাটা ভুল হয়ে গিয়েছিল, বাবা !

অজিত হেসে বল্‌ল—আমি বুঝি তাই বলছি। হঠাৎ এসে পড়েছেন, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

বীরেশ্বর বাবু বল্‌লেন,—ওহে বাপু, মধ্যে মধ্যে হাজির অল্ জমীদার হ'তে হয়। তোমরা কেমন থাক, কি দিয়ে ভাত খাও, কেমন বিছানায় শোও, গীতা পড় কি জেমা-বস্তা পড়, কবিতা লেখ কি উপন্যাস লেখ, বিছানার উপর কাঁচি-মার্কা সিগারেট থাকে কি হাভেনা চুরুট থাকে,বাবুনে রাঁধে কি রেস্তোঁরায় সে কায শেষ কর,এ সব জান্‌তে হ'লে হঠাৎ আসা দরকার অর্থাৎ যাকে তোমরা ইংরাজীতে সারপ্রাইজ ভিজিট (surprise visit) বল, তার দরকার, এ কথা ত বোঝো।

অজিত বল্‌ল—বাবার বাবুচাতুরী আর কোন দিনই গেল না।

বীরেশ্বর বাবু বল্‌লেন—কেন যাবে ! আমি কি বুড়ো হয়েছি ; বয়স এই ত তেতাল্লিশ বছর মাত্র। এরই মধ্যে গম্ভীর হব কেন, বাপু! তবে এ কথা বল্‌তে পার যে, তোমার মত ছেলের বাবা ব'লে পরিচয় দিতে হ'লে একটু ভারিকী হওয়া দরকার। ওরে বাবা বিপিনবিহারী, দাঁড়িয়ে তন্‌ছ কি বাবা ? গলা যে শুকিয়ে গিয়েছে ; গড়গড়াটায় জল ফিরিয়ে বেশ জুত ক'রে তামাক সাজ ত, বাবা !

অজিত বল্‌লে—আপনি কি দাঁড়িয়েই থাকবেন ?

বীরেশ্বর বাবু বল্‌লেন—বস্‌বার কি সময় আছে, বাবা, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে ; আমাকে সাতটার ট্রেণ

ধ'রে বাড়ী ফিরে যেতে হবে, তা জান? ট্রেণ ফেল হ'লে জয়রামপুর ষ্টেশনে ব'সে পাল্‌কীর বেহারাগুলো যে বাপান্ত সুরু করবে। আর এখন ষ্টেশনেও নামতে হয় যে, সেখানে যেন ট্রেণ কিছুতেই দাঁড়াতে রাজী হয় না। যাক সে সে কথা। হ্যাঁ, একটু বস্‌তে হবে বৈ কি। দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস বড় একটা নেই।

এই ব'লে বীরেশ্বর বাবু অজিতের চৌকীর উপর অতি সন্তর্পণে বস্‌তেই চৌকীখানা একটু শব্দ ক'রে উঠল। তিনি অমনই দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—ওরে বেটা বিপ্‌নে, তাকে ত শ্রীমান্ কিশোরীকে। এখনই যে গো-হত্যা হচ্ছিল। সে বুঝি পরদা সাফ্‌ করবার জন্য বসুমতী আফিসের পাশের আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড় থেকে এই কেওড়াকাঠের তক্তপোষ কিনেছে! না বাবা, তোমার এ আসনে শর্ম্মা বস্‌ছেন না।—এই ব'লে তিনি পাশের একখানি টুলের উপর ব'সে অজিতকে বল্‌লেন—বাবা, কিশোরীকে একবার ডাক দেখি। সে কি বাসায় নেই? তারই সঙ্গে যে আমার বিশেষ দরকার আছে।

অজিত বল্‌ল,—আমি দেখছি। আপনি ততক্ষণ তামাক খান।

বিপিন তখন তামাক নিয়ে হাজির। বীরেশ্বর বাবু বল্‌লেন,—বাস্, এখন আধ ঘণ্টা বেশ বিশ্রাম করতে পারব। বাবা, হুগলীর ঘোড়াগাড়ীগুলো কি ভয়ানক! একেবারে লক্কড়। ওর চেয়ে আমার জয়রামপুরের গো-যান বহুৎ আচ্ছা।

অজিত বল্‌ল,—হুগলী গিয়েছিলেন কি করতে, বাবা? মামলা-মোকর্দ্দমা ছিল না কি? তা হলেই বা আপনি যাবেন কেন? নায়েব মশাই ত ও-সব করেন।

বীরেশ্বর বাবু বল্‌লেন,—মামলাই বটে, বাবা! কিন্তু, সে মামলা নায়েবের জুরিস্‌ডিক্‌সনের নয়।—এই যে শ্রীমান্ কিশোরীমোহন! আমি ভাবছিলাম, তুমি বুঝি ঘরে নেই।

কিশোরী মাথা নীচু ক'রে বীরেশ্বর বাবুকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি তার হাত ধ'রে তুলে বল্‌লেন,—অমনই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি। তুমি ত শুধু মাথা নোয়ালে; আমার বাবাজীবন সে কথাই ভুলে গেলেন।

অজিত অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি তাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, আরে বাবা, আমি কোন্ সময় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেছি।

কিশোরী বল্‌ল,—এখন কি ক'রে এলেন আপনি, এখন ত ট্রেণ নেই।

বীরেশ্বর বাবু বল্‌লেন—দরকার পড়লে স্পেশেল ট্রেণও ভাড়া করতে হয়। আমি শেষ রাত্রির গাড়ীতে এসেছি। হুগলীতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই আস্‌ছি। তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে কিশোরী, আমাকে এই সাড়ে সাতটার ট্রেণেই ফিরতে হবে, পাল্কী-বেহারারা ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে। চল, পাশের ঘরে গিয়ে বসি। প্রাইভেট কথা। অজিত, তুমি বেরিও না। কল্‌কাতায় যখন এলামই, তখন তোমার মায়ের জন্য 'মাথাঘষা, তেলের মসলা, চীনের সিন্দুর' না নিয়ে গেলে তিনি চাই কি, এই প্রৌঢ়বয়সে আমাকে ডাইভোর্স ও করতে পারেন,—যে রকম স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতাপ!

এই ব'লে এক হাতে গড়গড়া নিয়ে, অপর হাত দিয়ে কিশোরীকে ধ'রে পাশের ঘরে গেলেন। সেখানে একখানি চেয়ারে ব'সে বল্‌লেন, শোন, কিশোরীমোহন, আমি হুগলীর কাছে স্বরূপনগরে গিয়েছিলাম—একটি মেয়ে দেখতে। স্বরূপনগর বেশ বড় গ্রাম, অনেক ভদ্রলোকের বাস। হুগলী থেকে বেশী দূর নয়,—এই মাইল পাঁচেক, একেবারে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পাশেই গ্রাম। মেয়ের বাপের নাম হরিচরণ ঘোষ। অবস্থাপন্ন মানুষ; খুব ভদ্রলোক, একটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে। মেয়েটির বয়স এই চৌদ্দ বছর। দেখতে পরমা সুন্দরী, আর তাকে দেখেই অজিতের মুখ মনে পড়েছিল। বস্তুর বেদেখনে বুঝলাম, তাতে মেয়েটি খুব শান্ত, লেখাপড়াও বেশ জানে। আর তোমরা যাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে থাক, সেই কুলকোষ্ঠীবিচার আমি কিন্তু মানি, একটু-আধটুকু জানিও। মেয়েটির হাতের রেখা পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, সৌভাগ্যযোগ আছে, আয়ুও অনেক ভাল রেখা আছে, আয়ুও দীর্ঘ। মেয়েটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি তার সঙ্গে অজিতের বিয়ে দিতে চাই। বাবাজীবনের যে রকম ভাব দেখছি, তাতে তিনি বিবেকানন্দ-দিসেকেণ্ডই হবেন, কি হরিদাস বাবাজী হবেন ব'লে মনে করেছেন, তা ঠিক বুঝতে পারছিনে। তার

প্রতীকারের জন্য আমি তাকে অতি শীঘ্রই বেঁধে ফেলতে চাই। বুঝেছ? এখন আমার দেখাই যে তোমরা নিরোদার্থা করবে, তা আমি চাইনে। তোমাকে আর অজিতকে এক দিন স্বরূপনগরে গিয়ে মেয়েটি দেখে আসতে হবে। এ আমার আদেশ। আমার আদেশ তোমরা উপেক্ষা করতে পারবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। তাই আমি হরিচরণ বাবুকে ব'লে এসেছি, তোমরা দুই জন এই রবিবারের প্রাতঃকালের গাড়ীতে হুগলীঘাট ষ্টেশনে যাবে। সেখানে হরিচরণ বাবু লোক রাখবেন; আর একখানি ট্যাক্সি রাখবেন। তোমরা গিয়ে মেয়ে দেখে আসবে এবং এসেই তোমাদের মতামত আমাকে জানাবে। আমি ব'লে এসেছি, তুমি শুক্রবারে হরিচরণ বাবুকে পত্র লিখবে। কারণ, তোমরা যদি এখান থেকে আহারাদি শেষ ক'রে যেতে চাও, তা হ'লে সে কথা হরিচরণ বাবুকে জানাবে এবং কোন্ ট্রেণে কখন্ হুগলীঘাটে পৌঁছবে, তাও লিখে দেবে। তিনি সেই অনুসারে সব ব্যবস্থা করবেন। আমার এ আদেশ, বুঝলে? অজিতকে ব'লো, সে যেন কিছুতেই এ আদেশ অমান্য না করে। এখন চল। একখানা ট্যাক্সি ডাক। কিছু জিনিষপত্র কিনে নিয়ে একেবারে ষ্টেশনে যেতে হবে। যে অবেলায় আহার হয়েছে, তাতে আজ রাত্রি দুরে থাক, বাড়ী গিয়ে কাল সারাদিন উপবাসে থাকতে হবে।

এই ব'লে অজিত যে ঘরে ব'সে ছিল, সেইখানে এসে বীরেশ্বর বাবু তাহাকে বললেন—আমার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। কিশোরীকে যা ব'লে গেলাম, সেই অনুসারে কাষ ক'রো। এখন চল, একখানা ট্যাক্সি নিয়ে কিঞ্চিৎ জিনিষ কিনে ষ্টেশনে যাই। কি বলছ? আজকের রাতটা থেকে গেলে ভাল হয় না? না, বাবা, সে হচ্ছে না। কাল সকালে বাড়ীতে থাকতেই হবে। ওঃ, খাবার কথা! সে আর দুদিন না খেলেও চলবে, বুঝলে? ওরে ব্যাটা বিপনে, বোধা সেলি রে বাপধন! চল্, দেরী করিস্ নে।

বীরেশ্বর বাবু যে ব্যবস্থা করেছিলেন, কিশোরীরা তা একটু উল্টে দিয়েছিল। অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে আহার করা তাদের ভাল মনে হয় নাই। কিশোরী হরিচরণ বাবুকে লিখে দিয়েছিল, তারা রবিবার সাড়ে বারোটার গাড়ীতে বেরুবে; নৈহাটীতে গাড়ী বদল ক'রে তারা দেড়টার সময় হুগলীঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিবে।

তারা দুই জন যখন হুগলীঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন দেখল, পূর্ব্ব-বন্দোবস্তমত ষ্টেশনে এক জন লোক রয়েছে। সে বলল যে, একখানি ট্যাক্সিও অপেক্ষা করছে। যাবার সময় কিশোরী এক জন চাকর সঙ্গে নেবার কথা বলেছিল; কিন্তু অজিত তাতে স্বীকৃত হয়নি। সে বলল—কি যে বল কিশোরীদা, সাড়ে বারোটার গাড়ীতে যাব, আবার খুব দেরী হলেও চাটগাঁ মেলে ফিরতেই হবে; এই সময়-টুকুর জন্য সঙ্গে চাকর নেও, দরওয়ান নেও, এক জন সরকার নেও—কি যে বল তুমি? দেখ, সেখানে অকারণ বিলম্ব করতে পারবে না। তাদের বাড়ী পৌঁছিতে দুটো—বড় জোর আড়াইটে হবে; সেখানে আধঘণ্টা না হয় তিন কোয়ার্টার থাকব। সাড়ে তিনটায় বেরিয়ে ষ্টেশনে এসে পাঁচটার গাড়ী ধরতে হবে; নিতান্ত যদি পথে বিলম্ব হয়, চাটগাঁ মেল পাওয়া চাই-ই, নইলে সেই রাত এগারটা। তুমি ত বচনবাগীশ, বাবার প্রধান শিষ্য; তাই তোমাকে আগে থাকতেই ব'লে রাখলাম।

কিশোরী বলল—আগে যাই ত; তার পর সে কথা হবে।

তাদের ট্যাক্সি যখন স্বরূপনগরে প্রবেশ করল, অজিত তখন যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল; সে উদাসভাবে চারিদিক চাইতে লাগল; এক একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করতে লাগল। কিশোরী তার এই ভাব দেখে জিজ্ঞাসা করল, কি অজিত, অমন ক'রে চারিদিক চেয়ে কি দেখছ? আরে, ক'নে দেখতে যাচ্ছ, মনটা কোথায় প্রফুল্ল হবে, তা নয়, তুমি যে গম্ভীর হয়ে গেলে।

অজিতের কাণে বোধ হয় সে কথা প্রবেশলাভই করল না; সে পূর্ব্বের মত চারিদিকে দেখতে লাগল। অকস্মাৎ তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল—তাই ত, এ কোথায় এলাম?

কিশোরী তার কথা বুঝতে না পেরে বলল—সে কি? আমরা যে স্বরূপনগর যাচ্ছি।

সঙ্গের লোকটি বলল—বাবু, এই গ্রামের নামই স্বরূপ-নগর; আর একটু গেলেই বাবুদের বাড়ী।

অজিত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল—তা জানি।

কিশোরী অবাক্ হয়ে বলল—সে কি হে, তুমি কি কোন দিন এ গ্রামে এসেছিলে এর আগে?

অজিত [illegible]

গ্রাম আমি চিনি। এই বলেই সে যেন কি ভাবতে লাগ্‌ল। তার মুখের দিকে চেয়ে কিশোরী বেশ বুঝতে পারল, অজিত যেন কি মনে আন্‌বার চেষ্টা করছে।

ইতোমধ্যেই তাদের ট্যাক্‌সি হরিচরণ বাবুর সহরের উঠানে গিয়ে উপস্থিত হলো। হরিচরণ বাবু এবং আর তিন চার জন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা করল।

অজিত ট্যাক্‌সি থেকে নেমে যেন যন্ত্রচালিতের মত ভদ্রলোকদের অনুসরণ করল; তার দৃষ্টি তখনও চারিদিকে ঘুরছে; সে যেন কিছুই ঠাহর করতে পারছে না।

বারান্দায় উঠেই অজিত অগ্রসর হয়ে হরিচরণ বাবুর পায়ের ধুলো নিল; তাহার পর তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তাহার এই ভাব দেখে কিশোরী চুপে চুপে বল্‌ল—ও কি অজিত, অমন করছ কেন?

অজিত নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌ল—না, কিছু না, বড় রৌদ্র লেগেছিল কি না, তাই।

তখন সকলে সুসজ্জিত বৈঠকখানায় গিয়ে আসন গ্রহণ করল। হরিচরণ বাবু বল্‌লেন—তোমার কোন কষ্ট হয় নি ত, বাবা!

অজিত এই কথা শুনে পুনরায় হরিচরণ বাবুর দিকে চাইল; তাহার দৃষ্টিতে বিস্ময় প্রকাশ পেতে লাগল।

কিশোরী বল্‌ল—না, কষ্ট আর কি! এইটুকু পথ বই ত নয়।

এক জন প্রতিবেশী বল্‌লেন- তোমরা হাতে মুখে জল দিয়ে নেও। ওহে হরিচরণ, আর বিলম্ব করো না, তিনটে বেজে গেছে। তিনটে চৌদ্দ মিনিট পর্য্যন্ত সময় ভাল। এখনই মেয়ে নিয়ে এসো। শুভ ব্যাপারটা যথা-সময়ে হয়ে যাক্, তার পর জলখাবারের ব্যবস্থা ক'রো।

হরিচরণ বাবু বল্‌লেন—আমার শোবার ঘরে সব ঠিক আছে। সেখানেই মেয়ে দেখানো হবে; জলখাবারও সেখানেই সাজানো হয়েছে।

অজিত এক পাশে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। সে এই সময় তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট এক জন ভদ্রলোককে বল্‌ল—এখানে ত এ দালান ছিল না, একখানা আটচালা ঘর ছিল।

ছিল, বছর দশেক আগে সেটা ভেঙ্গে ফেলে এই বৈঠকখানা তৈরী করেছি। তুমি কি বাবা, এর আগে এখানে এসে-ছিলে?

অজিত সে কথার কোন উত্তরই দিল না।

এই সময় বাড়ীর ভিতর থেকে এক জন এসে বল্‌লে—সব ঠিক হয়েছে, আপনারা আসুন।

তখন সকলে উঠে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। উঠান পার হয়ে বারান্দায় উঠে হরিচরণ বাবু বল্‌লেন—এই ঘরে আস্‌তে হবে।

কিশোরী প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করল। তাহার পরেই অজিত সেই ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়েই চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—ঁ্যা, এ যে আমার শোবার ঘর। তাহার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না, সে অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে যাবার মত হতেই এক জন তাকে ধ'রে নিয়ে পাশের পালঙ্কের উপর শুইয়ে দিল। চারিদিকে 'কি হ'লো, কি হ'লো' ব'লে সোর-গোল আরম্ভ হ'লো।

এক জন বল্‌লেন—ওরে, শীগ্‌গির এক জন গিয়ে নগেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়। ছেলে যে মূর্চ্ছা গিয়েছে।

তখন চারিদিকে লোক দৌড়িল। কিশোরী অজিতের মাথা কোলের উপর নিয়ে বসেছে; এক জন বাতাস করতে লাগ্‌ল; হরিচরণ বাবু অজিতের মুখে মাথায় জলের ঝাপ্টা দিতে লাগ্‌লেন। সকলের মনেই বিশেষ আতঙ্কের সঞ্চার হ'লো। হরিচরণ বল্‌তে লাগ্‌লেন—মা দুর্গা, এ কি হ'লো। আমার যে সর্ব্বনাশ হ'লো গো!

প্রতিবেশী এক জন বল্‌লেন—কোন ভয় নেই হরিচরণ; রোদের মধ্যে এতখানি পথ এসে শরীর অবসন্ন হয়েছে। খুব হাওয়া কর, এখনই জ্ঞান হবে।

ঠিক তাই হ'লো। মিনিট দুই তিন পরেই অজিতের জ্ঞানসঞ্চার হ'লো। সে চোখ মেল্‌তেই কিশোরী বল্‌ল—কি ভাই অজিত, শরীর কেমন বোধ হচ্ছে?

অজিত উঠে বস্‌তে চেষ্টা করল। হরিচরণ বাবু বল্‌লেন—না, না, উঠো না বাবা, শুয়ে থাক।

অজিত অতি ধীরস্বরে বল্‌ল—হঠাৎ আমার মাথা ঘুরে এসেছিল। তাহার পর ঘরের চারিদিক চেয়ে কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত বল্‌তে লাগ্‌ল—এ যে আমারই বাড়ী।

চেনা। হরিচরণ বাবুর দিকে চেয়ে বল্‌ল—আমি আপনাকে দেখেই কি যেন মনে করতে চেষ্টা করছিলাম, তখন পারি নি। আপনি যে আমার বাবা। এই বলেই সে তাড়াতাড়ি উঠে হরিচরণ বাবুর দিকে যেতেই তিনি চীৎকার ক'রে অজিতকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠলেন—ওরে অবিনাশ, তুই যে আমার ছেলে। আমি আঠারো বছর আগে এই ঘরেই তোর মুখে শেষ 'বাবা' ডাক শুনেছিলাম। আজ সেই স্বর যে আমার কাণে বাজ্‌ছে। ভগবান, তোমার লীলা বুঝা ভার।

অজিত বল্‌ল—আমার মা কৈ?

তখন আর কে লজ্জার ধার ধারে। হরিচরণ বাবুর স্ত্রী উন্মাদিনীর মত দৌড়ে এসে অজিতকে হরিচরণ বাবুর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লেন—আমার মাণিক, আমার অবিনাশ, বাবা আমার!

তখন হরিচরণ বাবুর গৃহ আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হ'লো। সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। হরিচরণ বাবু বল্‌লেন—তোমাদের আমি ছেড়ে দিচ্ছিনে। বীরেশ্বর বাবুকে এখনই 'তার' ক'রে দিচ্ছি, তিনি যেন রাত্রির গাড়ীতেই আসেন। ট্যাক্সি বিদায় ক'রে দেওয়া হ'লো।

পরদিন ভোরেই হাঁপাতে হাঁপাতে বীরেশ্বর বাবু এসে পড়লেন। সকল কথা শুনে তিনি একবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। কিশোরীর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—ওহে কিশোরী, জান ত There are more things in heaven and earth—যাক্ গে সে কথা। শুনুন হরিচরণ বাবু, আমি এক কথা বলি। আপনার মেয়ে ত এখন আমারও মেয়ে হয়ে গেল, কেমন? কিন্তু, আমি ত সহজে আমার অধিকার ছাড়ছি নে। দেখুন, এই কিশোরী আমার পুত্রতুল্য। ওর বাপ নেই; আমিই ওর অভিভাবক। ও যে খুব ভাল ছেলে, তা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। ওরই সঙ্গে আমি সুষমার বিয়ের প্রস্তাব করছি। ওরাও আমারই মত কুলীন—একেবারে পাকা কুলীন রায়বোচন্দ বাবুর ছেলে। অবস্থাও ভাল, হিন্দু স্কুলের মাষ্টার। এর পর আরও উন্নতি হবে। আর না হলেই বা কি। অজিতের এই ভগিনীর বিয়েতে আমি জামাই-মেয়েকে দশ হাজার টাকা আর একখানি চালুক যৌতুক দেব। কি বল শ্রীমান্ অজিতকুমার?

অজিত ঘাড় হেঁট ক'রে রইল। হরিচরণ বাবু বীরেশ্বর বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌লেন—আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আমার পরম সৌভাগ্য!

বীরেশ্বর বাবু হেসে বল্‌লেন—দেখলে, এর নাম প্রজাপতির খেলা। জাতিস্মর কথাটা তোমরা গাঁজাখুরি বল্‌তে কিশোরীমোহন। এখন দেখলে? তাই ত বলি, আমার ছেলে অমন হয়েছিল কেন? এ যে হরিচরণ বাবু, আমাদের ভাগের ছেলে, হাঃ, হাঃ, হাঃ, কি বল?

শ্রী অধীর সেন

অ-চেনা

বীরেন্দ্রনাথ কিছু দিন কলিকাতা হাইকোর্টে যাতায়াত করিয়া দেখিলেন যে, ভাগ্যই একমাত্র ফলবন্ত বৃক্ষ। ভাগ্য না ফলিলে বিদ্যাও কিছু নয়, পৌরুষও কিছু নয়। তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী করচ লইয়া ফিরিয়াছেন; কিন্তু ভাগ্যের কবচটি আনিতে পারেন নাই। টাকার সহিত যখন নিতান্তই মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হইল, তখন তিনি এক দিন বৈকালে বাঁ করিয়া দার্জ্জিলিং রওনা হইলেন। অনেকেই মনে করিল বি, এন, রায় সাহেব কলিকাতার গরম সহ্য করিতে পারিলেন না। পসার না হইলেও রায় সাহেবের চাল ছিল বড়। তিনি বিলাত হইতে যুগপৎ আইনের অভিজ্ঞতা ও সাহেবী মেজাজ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কাযেই তাঁহার দার্জ্জিলিং-গমনে কেহই আশ্চর্য্যান্বিত হইল না।

বীরেন্দ্রনাথ বিলাতে থাকিতেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। বর্ত্তমানে সংসারে তাঁহার মা ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। তিনিও তাঁহার পল্লীগ্রামের শ্বশুর-ভবনে কোনও প্রকারে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া অগত্যা সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং রায় সাহেব সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন;—সামান্য একটু অন্তরায় ছিল, কিন্তু সে তত দর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। সে অন্তরায়টুকু এই, বীরেন্দ্র বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রের পিতা অবিবাহিত অবস্থায় পুত্রকে বিলাত পাঠাইতে প্রস্তুত ছিলেন না; সেই জন্য পুত্রের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সুদূর পল্লীগ্রামের একটি ছোট মেয়েকে তাঁহার 'গলায় গাঁথিয়া' দিয়াছিলেন। মেয়েটির বয়স তখন মাত্র ১০ বৎসর। এই হাস্যকর ব্যাপারে বীরেন্দ্রের মনের অবস্থা যে কি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু হঠাৎ বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল না বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোনও কারণে হউক, তাঁহার পিতা এই বিবাহে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার আরও ধারণা ছিল যে, বীরেন যখন তিন চার বৎসর পরে ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহার স্ত্রী যৌবনলীলায় পদার্পণ করিবে। সুতরাং পাত্রী ছোট হইলে ক্ষতি কি? কিন্তু বীরেনের মেজাজ অন্যরূপ ছিল। তিনি কোনও প্রকারেই দুগ্ধপোষ্য শিশুর পত্নীত্বের দাবী স্বীকার করিতে পারিলেন না। বরং এক অজ্ঞাত ষড়যন্ত্রের ফলে তাহাকে এই মানসিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইল, সে জন্য তিনি একবারে চটিয়া লাল হইলেন। ইহার পরে তিনি আর তাহার ষড়যন্ত্রকারী আত্মীয়দিগের—অর্থাৎ পিতা ও শ্বশুরের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখেন নাই। তাঁহার বিলাতের ব্যয়-ভার বহন করিতেন বিজ্ঞান-সমিতি।

বীরেন্দ্র বিলাতে গিয়া এতই শিখিবার জিনিষ দেখিলেন যে, তাহার জ্ঞান-পিপাসা তিন বৎসরে কোনও মতে পরিতৃপ্ত হইল না। সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর সেখানে কাটাইয়া ব্যারিষ্টারী পরওয়ানা লইয়া তিনি এক বৎসরের উপর দেশে ফিরিয়াছেন। কিন্তু বিলাতের আবহাওয়া তাঁহার এতই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, দেশের কোনও জিনিষের সঙ্গে তিনি মানাইয়া চলিতে অপারগ হইলেন। তাহার শ্বশুরপক্ষ হইতে অনেক সাধ্য-সাধনা, অনুরোধ-উপরোধ তিনি উপহাসের হাসিতে উড়াইয়া দিলেন। সে বিবাহ যে বিবাহই নহে, এ কথাও তিনি স্পষ্ট বলিতে ছাড়িলেন না,—যদিও তিনি আইন-সমুদ্রের পরপার দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাহার সুচিন্তিত অভিমত ছিল এই যে, (ক) বিনা প্রণয়ে কোনও বিবাহ হইতে পারে না এবং হইলেও সভ্যসমাজে তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না। (খ) পাত্র বা পাত্রীর মধ্যে কোনও পক্ষ শিশু থাকিলে অর্থাৎ জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বাবস্থায় যদি বিবাহ হয়, তাহা তত্তৎপক্ষীয়রা অনায়াসে ইচ্ছানুসারে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। (গ) পাত্র-পাত্রীর রুচির গরমিল হইলে তাহাদের বিবাহ অন্য যে কোনও নামে অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় বিবাহ নামের যোগ্য নহে।

উপরি-লিখিত প্রত্যেক দফা অনুসারেই তাঁহার বিবাহ অসিদ্ধ ও নামঞ্জুর। মোট কথা এই, চাঁদের আলোর মত বর্ণ না হইলে, সোনালী কেশ্ না হইলে, চরণকমল উচ্চ বুট-মণ্ডিত না হইলে, ইত্যাদি ইত্যাদি, কি 'বিবাহ' করা চলে?

দার্জিলিং গিয়া একটি অপেক্ষাকৃত সস্তা হোটেলের ক্ষুদ্র কামরায় বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার আইনের বইগুলি গুছাইয়া লইয়া বসিলেন, তাঁহার দরজায় ঝলীকৃত কাষ্ঠফলকের উপর সাদা ধবধবে হরফে 'Mr. B. N. Ray B. A. LL B. Barrister at Law (Inner Temple) উৎকীর্ণ হইয়া আত্মপরিচয় দোদুল্যমান হইল। কোর্টের যথারীতি হাজিরা চলিতে লাগিল। কিন্তু টাকা নামক পদার্থ এই পাহাড়ের সু-উচ্চ দৃঙ্গেও আকাশকুসুমে পরিণত হইবার গতিক দেখা গেল।

ইতোমধ্যে একটি শুভযোগ ঘটিল, দার্জিলিঙের সুবিখ্যাত উকীল মদনমোহন সাহার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। মদনমোহন তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়েই অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। দুই একটি মোকর্দ্দমায় তিনি মিষ্টার রায়কে সঙ্গে লইয়া দেখিলেন যে, মিষ্টার রায় দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করেন না অর্থাৎ তাঁহার আইনের অভিজ্ঞতা থাক বা না থাক, মুখ-জোর যথেষ্ট আছে। আইনের অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ লভ্য হয়, এই বলিয়া তিনি আপনাকে ও মক্কেলদিগকে সান্ত্বনা দিলেন। মদনমোহন বাবুর একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল।

প্রথম যে দিন মিষ্টার রায় মদন বাবুর কন্যাকে দেখিলেন, সে দিন তাঁহার পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন ছিল। সে দিন তাঁহার ভবনে রায় সাহেবের খানা খাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। রায় যখন রিক্‌শ করিয়া 'পথের ধারে' (Step aside) ভবনে উপনীত হইলেন, তখন কাঞ্চনজঙ্ঘার সুবর্ণ-চূড়ায় লালের ঈষৎ আভা আঁধারের কোলে চলিয়া পড়িতেছিল। রায় রিক্‌শ ত্যাগ করিয়া ছোট পাহাড়ের পথ ধরিয়া মদন বাবুর লতায় ঘেরা বাসভবনে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইলেন, ক্ষুদ্র একটি কুসুম-বাটিকার মধ্যে এক তরুণী পায়চারী করিতেছেন। তিনি যে আগন্তুককে দেখিতে পাইলেন, তাহা প্রভৃতি নানা জাতীয় পাহাড়ী ফুলের মাঝে তাহাকে পরীর মত বোধ হইতেছিল। সে দিন সেই ছোট ফুল-বাটিকায় যেন রঙ্গের মহামহোৎসব পড়িয়া গিয়াছিল! সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারেও তাহাদের সে রঙ্গের মাহাত্ম্য ঢাকা পড়ে নাই। রায় সাহেবের চক্ষু যেন আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না, পদযুগল আপনা হইতেই অচল হইয়া আসিল। তিনি জানিতেন, এরূপ ভাবে কোনও ভদ্র মহিলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা অন্যায়; কিন্তু জীবনে এমন সময় কখনও কখনও আসে যে, জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা কোনও প্রকার নোটিশ না দিয়াই অন্তর্ধান করে। এক জন প্রেমিক বলিয়াছেন—

হেরইতে রূপ সায়রে মন ডুবল।
ভাগ্যে ভাগ্যে রহল পরাণ।

একবার দেখিয়াই সেই রূপসাগরের মধ্যে আবার মন নিমগ্ন হইয়া গেল। মন সে অগাধ সাগরের তলা পাইল না, কাযেই আমার মন একবারে ডুবিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। বহুভাগ্যে প্রাণ রহিয়া গেল; প্রাণও বুঝি যাইত। কিন্তু ভাগ্যের জোরে সে যাত্রা প্রাণ লইয়া পরিত্রাণ পাইয়াছি। এখন প্রাণটি কেবল আমার আছে, আর সকলই সে রূপের সায়র মাঝে ডুবিয়া গিয়াছে।

রায় সাহেবেরও অবস্থা সেইরূপ হইল। তাঁহার এত দিন মনে হইয়াছিল যে, সুন্দরী অপ্সরা, কিন্নরী, হৌরী যত কিছু আছে, তাহারা গরবে টিকিতে না পারিয়া সাগর পারের শীতপ্রধান দেশে গিয়া দলে দলে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু আজ তিনি ভাবিলেন যে, উহাদের দুই একটি পাহাড়ে পর্ব্বতে থাকিলেও থাকিতে পারে।

"আপনি কি মিষ্টার রায়?"

"হাঁ; আপনি কি মিস্ শা?"

"হাঁ; বাবা আপনার জন্যে বাইরেই অপেক্ষা করছেন।"

"আপনাকে দেখে অত্যন্ত সুখী হলুম, নমস্কার।" রায় সাহেবের নমস্কার করিবার ভঙ্গী দেখিয়া মিস্ শা মনে মনে প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। কুসুম-বাটিকা হইতে বাহির হইয়া তিনি মিষ্টার রায়কে পথ দেখাইয়া লইয়া

বারান্দায় একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় মদন বাবু একটি দীর্ঘ ও স্থূল চুরুট মুখে দিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি সাগ্রহে পান করিয়া রায় সাহেবের করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। তখন অল্প অল্প সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল। শা মহাশয় বলিলেন, "আমার কন্যার সঙ্গে আলাপ হয়েছে? মণি, মিষ্টার রায়কে নমস্কার করেছ? ওর নাম মণিকর্ণিকা।"

মণি দেশীয় প্রথায় রায় সাহেবের পদধূলি লইতে গেলে তিনি অনিচ্ছাসহকারে বারান্দার প্রান্তে সরিয়া গেলেন। সে যাত্রা তিনি যে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন, তাহাও ঐ রূপ-সায়রের ঢেউয়ের গতিকে। তবে "বহু ভাগ্যে রহল পরাণ।"

মদন বাবু বলিলেন, "মণি, যাও, আমাদের খাবার দেখ গে। মিষ্টার রায়ের সঙ্গে আমার একটু জরুরী কায আছে, সেইটুকু এই অবসরে সেরে নি। ঐ কাযটুকুর জন্যই ওঁকে আধঘণ্টাখানেক আগে আসতে বলেছিলাম। উনি কিছু মনে করবেন না। আমরা ঠিক সময়েই খেতে যাব, তুমি তার জন্যে ভেব না।"

বেহারা আসিয়া একটু হাল্কা মদ্য দিয়া গেল। বিলাতী প্রথা অনুসারে মিষ্টার রায় ধন্যবাদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। ততক্ষণ একটি ছোট অ্যাটাচি কেস্ খুলিয়া মদন বাবু কতকগুলি নথী বাহির করিলেন এবং সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনি এই কেস্ নিতে সম্মত আছেন, মিষ্টার রায়?"

রায় সাহেবের মস্তিষ্ক তখন হাল্কা মদ্যে ও রূপের মদিরায় কিছু গোল পাকাইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন,—"আপনি যা বলবেন, তাই আমার স্বীকার্য্য—"

"কত কি চাইব, বলুন?"—

"সে আমি কি বলব? আপনি যা হয় ক'রে নেবেন—"

"তবু আপনার কাছ থেকে একটা আভাস না পেলে—"

"কেস্‌টা বেশ জটিল ব'লে বোধ হচ্ছে। শ' পাঁচেক নেবে না?"—

মদন বাবু একটা সেরাজ হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া রায় সাহেবের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন, "এই পাঁচ শ' টাকা তবু আপনার নথী দেখার জন্য—"

"অশেষ ধন্যবাদ! আমি আপনার নিকট কতজ্ঞ কৃতজ্ঞ—" বলিয়া রায় টাকাগুলি তাঁহার ডিনার সুটের নিম্নকক্ষস্থ কোটের পকেটে গুঁজিলেন। তিনি মনে মনে রূপকথার রাজপুত্রের কথা ভাবিতেছিলেন, অর্দ্ধেক রাজ্য ও পাওয়া গেল, এখন এই সঙ্গে অবশ্য কন্যা-লাভ হয় না?

ডিনার-টেবলে পিতা, কন্যা ও রায় ব্যতীত আর কেহ ছিল না। দেশী ও বিলাতী আহারের প্রাচুর্য্যে রায় সাহেব বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। এত আয়োজন, এত আড়ম্বর কি এক জন ব্রিফলেস্ ব্যারিষ্টারের জন্য কেহ করে? নিশ্চয়ই শা মহাশয়ের অন্য মতলব কিছু আছে। ভোজনের সময় শা মহাশয় তাঁহার কন্যার নানা বিষয়িণী প্রতিভার উল্লেখ করিয়া কন্যার কুটিল বক্রদৃষ্টি ও রায়ের সস্মিত অভিনন্দন লাভ করিলেন। তাহাতেও রায়ের মনে একটি ধারণা—তা সে অনুমানই হউক আর যা-ই হউক—ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল।

অধিক রাত্রিতে যখন রায় তাঁহার হোটেলে ফিরিলেন, তখন তাঁহার চোখে লাগিয়াছে রূপের নেশা, বক্ষে প্রেম বাধিয়াছে বাসা, আর মস্তিষ্কে আনন্দ-মদিরা শ্যাম্পেনের সঙ্গে মিশিয়া রীতিমত তাণ্ডব জুড়িয়া দিয়াছে।

অতঃপর মদনালয়ে রায়ের গতিবিধি ক্রমশঃই ঘন ঘন হইতে লাগিল। তাহাতে মদন বাবু বা তাঁহার কন্যার কোনও আপত্তি বা অপ্রীতি দেখা গেল না। মিস্ শা বা মণিকর্ণিকার ঘনিষ্ঠতা শুক্লপক্ষে শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। সেটা রায় সাহেবের নিকট নিতান্ত মন্দ লাগিতেছিল না। মণি সেণ্টহেরীজ হোমের ছাত্রী, ইংরেজী বোলচাল জানে, পিয়ানো বাজাইতেও কিছু শিখিয়াছে, সুতরাং তাহার ন্যায় জীবন-সঙ্গিনী পাইলে ভারতের যত অন্ধতমসাচ্ছন্ন দেশে একরূপ ভালই চলিতে পারে। মদন বাবুর সম্মতি পাইলে শীঘ্রই এ ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা যায়। কিন্তু?—কিন্তু নাই। সেই কোন্ কালে এক অবোধ বালিকার সঙ্গে একটা মুহূর্ত্তের সম্বন্ধ হইয়াছিল; সে একরূপ চুকিয়া গিয়াছে। এখন সে কথা লইয়া আর কেহ নাড়াচাড়া করিবে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি একবার মনে বারেক বলিয়া করিয়া অগ্রসর হওয়াই ভাল। তখন

আর তাঁহার আপত্তি করিবার উপায় থাকিবে না। কারণ, ক্রমেই যেরূপ মেশামেশি হইতেছে, তাহাতে শেষ মুহূর্তে বিবাহের সম্বন্ধ কখনও ভাঙ্গিতে পারে না। হিন্দুমতে একাধিক বিবাহ করিতে কিছু বাধা নাই। ভরণ-পোষণের জন্যও সে পক্ষ কিছু করিতে পারিবে না। কেন না, তাহারা বেজায় গোঁড়া হিন্দু; বিলাত-ফেরতের সহিত যে স্ত্রী বাস করিতে রাজি নহে, (তাহারাই প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল), সে ভরণ-পোষণ চাহিবে কিরূপে?

এইরূপ সন্দেহ-দোলায় দুলিতে দুলিতে রায় সাহেব এক সাদা ইজের, নীলরঙের কোট, সাদা জুতা পরিয়া একখানি র‍্যাকেট হস্তে এক অপরাহ্ণে 'পথের ধারে' উপনীত হইলেন; তাঁহার সে দিন টেনিস্ খেলিবার নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি গিয়া দেখিলেন, খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এক দিকে মণি, অপর দিকে মণির পিতা ও আর একটি তরুণী। রায় সাহেব কোটটি খুলিয়া 'বয়ে'র হস্তে দিয়া মণির পার্শ্বে গিয়া জুটিলেন। মদন বাবু জালের নিকট আসিয়া অপর তরুণীকে দেখাইয়া বলিলেন, মিষ্টার রায়, ইনি মণির বন্ধু শান্তা চ্যাটার্জি,—মিষ্টার রায়। উভয়ে র‍্যাকেট কপালে ঠুকিয়া অভিবাদন করিলেন। শান্তা কিছুক্ষণ মিষ্টার রায়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আপনার স্থানে ফিরিয়া গেল। হঠাৎ সে চোখে রুমাল দিয়া টেনিস্ কোর্ট পরিত্যাগ করিল। মণি ছুটিয়া গিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি—হ'লো কি বন্ধু?"

"কিছু না, চোখে হঠাৎ কি উড়ে পড়লো—"

"ওঃ, ম্যাঞ্জিলিঙের পোকাগুলো চোখে গেলে যন্ত্র চোখ জ্বালা করে—"

"এখনই ভাল হয়ে যাবে। তোমরা খেলো, আমি আস্‌ছি—" বলিয়া শান্তা বসিবার ঘরে গেল ও হাত দুইখানির মধ্যে মুখ রাখিয়া বসিয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, "এই ত সে-ই। অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিন্তু আমার মন বল্‌ছে যে সে-ই। কখনও ভুল হয় নি—ভুল কি হ'তে পারে?—

আর সকলের ভুল হইলেও হইতে পারে, শান্তার ভুল হইতে পারে না। সে যে এই সুদীর্ঘ আট নয় বৎসর এই মূর্ত্তিরই ধ্যান করিয়াছে। স্বামী বিলাত গিয়াছেন, সাহেব হইয়া ফিরিবেন, তাঁহার উপযুক্ত না হইলে চলিবে কেন? এই মনে করিয়া সে যে মেম সাহেব সাজিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। তাহার পিতার অবস্থা তেমন ভাল নয়। কাযেই তিনি তাহার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পারিয়া উঠেন নাই। তাই তিনি বরিশালে এক মিশনরী মেমের করে কন্যাটিকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সে মেমেটিকে আপন কন্যার মত যত্ন করিয়া মেমসাহেবী শিখাইয়াছে, এমন কি, তাহার কাছে থাকিয়া তাহার রংও কতকটা ফিরিঙ্গীদের মত হইয়াছে। সে মেম যখন ম্যাঞ্জিলিং সেণ্ট মেরীজ হোমের অধ্যক্ষতা পাইলেন, তখন এই মেয়েটিকেও লইয়া আসিবার জন্য যত্ন করিলেন। মেয়ের বাপ বিশেষ আপত্তি করিলেন না, কারণ, তখন রায় সাহেব তাঁহাকে একরূপ জবাব দিয়াছেন। মেম শান্তার জন্য চোখের জল ফেলিলেন। 'শান্তা' নামটি মেমের দেওয়া। তাহার প্রকৃত নাম 'চপলা'।

এক বৎসরের উপর হইল, শান্তা সেণ্ট মেরীজ হোমে আসিয়া রহিয়াছে। স্কুলে পড়ে, রোগীর শুশ্রূষা করে, আর গৃহকর্ম্মে মেম সাহেবের সাহায্য করে। এখানেই তাহার মণি শা'র সঙ্গে আলাপ। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। আজ মণির ভাবী বর টেনিস্ খেলিতে আসিবেন বলিয়া তাহাকেও খেলার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল।

শান্তার অনুপস্থিতিতেও খেলা কিছুক্ষণ চলিল। কিন্তু এক পশলা বৃষ্টি আসিয়া পড়ায় খেলা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। আর রায় সাহেবেরও হাত তেমন খুলিল না। তিনি সহসা কিছু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজ যে যুবতীটি খেলিতে আসিয়াছিলেন, তিনি কে? চকিতে চাহিয়া যিনি চলিয়া গেলেন, তিনি কি ম্যাঞ্জিলিঙে থাকেন? বড় সুন্দর চেহারাটি। মণির রং অপেক্ষা এই নূতন পরিচিতার রং ঢের উজ্জ্বল। মণি অপেক্ষা তিনি অন্ততঃ তিন ইঞ্চি চাপা। চাপা না হইলে মেয়েদের মানায় না। মণি কিছু স্থূল, তিনি ছিপছিপে; মেয়েদের পক্ষে স্থূল হওয়া অপেক্ষা আর দোষাবহ কিছুই হইতে পারে না। স্থূল রমণী কোনও নাটক-নভেলে এ পর্য্যন্ত নায়িকা বলিয়া কথিত হয়েন নাই। রায় সাহেব খেলা অপেক্ষা এই বিষয়ই বেশী ভাবিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি যে এমন আর একটিও সুন্দরী রমণী দেখেন নাই, ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল।

তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া মদন বাবু ভাবিলেন যে, তাহার কন্যার প্রভাব যথার্থভাবে ক্রিয়া করিতেছে। আর বিলম্ব নয়, এই বারে একটা পাকাপাকি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খেলিতে খেলিতে যখন বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, তখন সকলেই গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। মণি গৃহাভ্যন্তরে গেলেন। মদন বাবু রায় সাহেবকে লইয়া বারান্দার এক কোণে গিয়া বসিলেন। বারান্দায় কাচের বেড়ায় বৃষ্টির ধারা নানা প্রকার মনোরম্য ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। মদন বাবু সিগারেটের বাক্স মিষ্টার রায়ের দিকে বাড়াইয়া দিলেন এবং নিজেও একটি মুখে পুরিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিয়া মদন বাবু বলিলেন, মিষ্টার রায়, একটি কথা বল্‌বো, কিছু মনে কর্‌বেন না?"

রায় সাহেব বলিলেন, "কি বলেন? আপনি এখানে আমার অভিভাবকস্বরূপ। আপনি কোনও কথা বল্‌বেন, তার জন্যে সঙ্কোচ করা আপনার পক্ষে—"

"দেখুন, আমার কন্যাটি বড় হয়েছে—"

"এখন আর কি বড়, ওর বন্ধুটি ত আরও বড়। ওর বোধ হয় যে হয় নি?—"

"না। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, মণিকে শীঘ্রই সৎপাত্রস্থ ক'রে ফেলি।"

"তা ফেলুন না! Certainly সে কথা কি আর বল্‌তে? ঐ যে শান্তা চাটার্জ্জি, উনি বোধ হয় খৃষ্টান—"

"না, না, খৃষ্টান নয়; তবে খৃষ্টানদের কাছে থাকে। মণির জন্য আমি অনেক দিন থেকে মনে করছি এবং আপনারও চিত্তের যেরূপ অবস্থা দেখছি, তাতে—"

"নিশ্চয়ই! আপনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাব্‌বেন না, মিষ্টার রা। আমার সম্বন্ধে হয় ত আপনি ভ্রান্ত ধারণা করেছেন। আপনার মেয়ের বন্ধুর সঙ্গে আমার এই আজ প্রথম দেখা। তাঁর প্রতি আমার চিত্তের কোনওরূপ আগ্রহ হ'তে পারে না।"

"আমি সে কথা বলছি না, মিষ্টার রায়। আপনি মণির প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হয়েছেন—"

"Of course! মিষ্টার রা, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি, এখনই—এই মুহূর্ত্তে—"

"তা হ'লে আমি বিবাহের জোগাড় করতে পারি কি?"—.

এই সময়ে মণি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "বাবা, শান্তা আপনাকে এখনই একবার ডাক্‌ছে। এখনই আসুন, একটুও বিলম্ব করবেন না।"

মিষ্টার রায় লাফাইয়া উঠিলেন; "আপনার বন্ধুটির কি কোনও অসুখ হয়েছে? আমি ফার্ষ্ট এড দিতে জানি। লণ্ডনে শিখেছিলাম, বুঝলেন?"

"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, মিষ্টার রায়! আপনাকে কিছু করতে হবে না, ধন্যবাদ।" বলিয়া মণি তাহার পিতাকে টানিয়া লইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে খেলা ছাড়িয়া মণি যখন ঘরে ঢুকিল, তখনও তাহার বন্ধু আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ভাবিতেছে। মণি লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কেমন দেখলি বল আমার ভাবী বর?—"

শান্তা বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে-চাহনি দেখিয়া মণির বাহুবেষ্টনী শিথিল হইয়া পড়িল। সে বলিল, "হাঁ ক'রে রইলি যে—চুরি করতে ইচ্ছে হচ্ছে না কি?"

"কে চোর? হায় রে অদৃষ্ট!"

"সে কি?"

"কিছু না।"

"তবে? তুমি যে খুশী হলে না?"

"ও যে আমার বর। তোমার খুশী হয়ে দিতে বল না কি?"

'সে কি?'

"ওঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।"

মণি সেই শীতেও পলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। সে আর অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া তাহার বাবাকে ডাকিতে গেল।

মদন বাবু কন্যার গতির সঙ্গে গতি রক্ষা করিতে পারিয়া উঠিতেছিলেন না। তাহার পর তাঁহার মনও অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে পাষণ্ডকে তিনি এত দিন নানা ভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, সে আজ তাঁহার প্রতি এমন ব্যবহার করিল? সে ত বিবাহের প্রস্তাবে আনন্দে অধীর

হইয়া উঠিল না! সে ত এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের জন্য একবারও ধন্যবাদ দিল না! বরং পুনঃ পুনঃ এক নবাগতার সম্বন্ধে খোঁজ লইতে ব্যস্ত! তিনি প্রায় এক বৎসর যাবৎ তাহাকে বহন না করিলে আজ তাহার উপায় কি হইত? এমনই ভাবনা দ্রুতবেগে তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছিল। তিনি আরও ভাবিতেছিলেন যে, শান্তাকে আর আসিতে বলিয়া ভাল কায হয় নাই। শান্তা যে মণি অপেক্ষা অনেক সুন্দরী, ইহা মদন বাবুর অভিজ্ঞ চক্ষু এড়ায় নাই।

মণি বলিল, "শান্তা বলছে, বাবা, যে, মিষ্টার রায়কে হয় ত ও চেনে—"

মদন বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "বটে! কোথায় দেখা?"

"সে তুমি ওকে জিজ্ঞাসা কর। আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে"—বলিতে বলিতে মণির কণ্ঠস্বর বেদনায় ভারী হইয়া উঠিল।

মদন বাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি? আমাকে সব খুলে বল দেখি শান্তা, তোমাদের বাড়ী কি রায়েদের দেশে?"

"আচ্ছা, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না। উনি কি রামেশ্বর রায় মশায়ের ছেলে? ওঁর বাড়ী কি রহমৎপুর?"

সে আর লজ্জায় মাথা খাইয়া শ্বশুরের নাম করিয়া বলিল। মদন বাবু পুনরায় বারান্দায় আসিলেন। বীরেন্দ্রনাথ রায় তৎক্ষণ চুরুটের ধূমে আপনার চিন্তার কাছুস উড়াইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, হিন্দুমতে যদি রাজি হয়, তবে এ দুইটি ফুল কি এক বৃন্তে ফুটিতে পারে না?

মদন বাবু ফিরিয়া আসিতেই রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "ভাল ত?"

মদন বাবু সংক্ষেপে 'হুঁ' বলিয়া গম্ভীর হইয়া বসিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধভুক্ত চুরুটটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "মিষ্টার রায়, আপনার কিছু পরিচয় জানতে হয়। যদি কিছু মনে না করেন—"

রায় বলিলেন, "নিশ্চয়ই নয়। আমাদের দেশের খবর জানতে চান? আমাদের দেশ বরিশাল জিলার নিকটে রহমৎপুর। Beastly place জঘন্য স্থান, বুঝেছেন মিষ্টার শা, যেমন পাড়াগাঁ হয়ে থাকে।'

"আপনারা?—"

"আমরা? আমরা পাড়াগাঁয়ের নামে আঁৎকে উঠি।"

"আমি তা জিজ্ঞাসা করছি নে। আপনারা কি! ব্রাহ্মণ ত বটে?—"

"নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। একশ' বার ব্রাহ্মণ। তবে পৈতে-টৈতে নেই মশায়। বিলেতে যাবার সময় সেটা কালাপানিতে সমর্পণ করেছিলাম,—ঠিক তার উপযুক্ত স্থান নয় কি? কি বলেন!—"

রায় উচ্চ হাস্য করিলেন! মদন বাবু পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ঠাকুরের নামটি যদি দয়া ক'রে—"

"Let me see রামেশ্বর বাঁড়ুয্যে, উপাধি রায়। এইবার আপনার জেরা শেষ হলো, আশা করি!"

মদন বাবু তাঁহাকে ক্ষমা করিতে বলিয়া গৃহাভ্যন্তরে আসিলেন। যেমন যেমন শুনিয়াছিলেন, তিনি শান্তার নিকট ব্যক্ত করিলেন। শান্তা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "উনিই আমার স্বামী।"

মদন বাবু পুলকিত হইয়া তখনই রায়কে খবর দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু শান্তা বলিল, "উনি আমায় গ্রহণ করবেন না। আমার বয়স যখন নয় দশ বছর, তখন ওঁর বাবা বিলেত যাবার আগে জেদ ক'রে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই উনি রাগ ক'রে আর আমায় গ্রহণ করবেন না, বলেছেন। আমার বাবা তাই আমায় মেয়ের স্কুলে রেখে পড়াচ্ছেন।"

মদন বাবু বলিলেন, "আমি এখন সব বুঝতে পারছি। কিন্তু না, উনি তোমায় নিশ্চয়ই নেবেন।"

শান্তা মণির গায়ে যেন মিলাইয়া যাইতে চাহিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে বলিল, "কায নেই। আমার পরিচয় পেলে উনি হয় ত এ বাড়ীতেই আর কখনও আসবেন না।"

"সে আমি সব ঠিক ক'রে নেবো এখন। একটু চা দেখ ত, মা লক্ষ্মি।" এই বলিয়া মদন বাবু প্রস্থান করিলেন।

বারান্দায় টিপয়ে চা দেওয়া হইল। আর দুইখানি চেয়ারও সেখানে রক্ষিত হইল। মণি ও শান্তা হাতে মুখে জল দিয়া সেখানে গিয়া জুটিল। রায় পুলকে আত্মহারা হইলেন।

মণি ও তাহার পিতা লক্ষ্য করিলেন যে, শান্তার সহিত আলাপ করিবার জন্য রায় নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন। শান্তা দুই একটি কথায় জবাব দিতেছে। রায়ের পক্ষপাতিত্বে মণি কিছুমাত্র দুঃখিত হইল না। তবে সে

রূপান্তিত ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস তাহাকে সময়ে সময়ে কিছু বাড়া দিতে লাগিল।

চা-পান ও অন্যান্য উপকরণ-ভক্ষণ সমাপ্ত হইলে, মদন বাবু উঠিলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। কুয়াসায় সমস্ত পাহাড়টি ঢাকিয়া গিয়াছে। মদন বাবু ধীরে ধীরে কুসুম-বাটিকার দিকে অগ্রসর হইলেন; সুতরাং সকলেই তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

কুসুম-বাটিকায় ভ্রমণ করিতে করিতে মদন বাবু অন্য ধার দিয়া সরিয়া পড়িলেন। কন্যাও বুঝিল। সে-ও ফুল তুলিতে তুলিতে প্রস্থান করিল। রহিল শুধু শান্তা আর রায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। কুসুম-বনের ফুলগুলি রঙ্গের ঢেউ তুলিয়া দুলিতেছিল। রায় সাহেব বিলাতী প্রথায় শান্তার বাহু আপনার বাহু-বন্ধনে বেড়িতে চাহিলেন। কিন্তু শান্তা একটু অগ্রসর হইয়া সে আপ্যায়ন হইতে আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু রায় ছাড়িবার পাত্র নহেন। এমন কুসুমগন্ধ, এমন হাল্‌কা হাওয়া, মন কি চঞ্চল না হইয়া পারে? তিনি ভয়ে ভয়ে শান্তার করপল্লব বক্ষে উঠাইয়া তাহাতে অধর স্পর্শ করিলেন। শান্তা হাত ছাড়াইয়া লইল; তাহার নয়নে দুই এক বিন্দু অশ্রু সঞ্চারিত হইল।

পশ্চাৎ হইতে মণি বলিল, "প্রণাম কর্, প্রণাম কর্। ও সব বিলাতী ঢঙ্ রেখে দে।"

শান্তা নীচু হইয়া রায়ের পায়ের কাছে গড় করিল। মণি বলিল, "মিষ্টার রায়, আপনার স্ত্রী চপলা আপনাকে প্রণাম করছেন। আশীর্ব্বাদ করুন।"

রায় অবাক্ হইয়া একবার মণি আর একবার শান্তার দিকে চাহিতে লাগিল।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

বনের গন্ধরাজ

আমরা বনের অযতনে ফোটা গরবী কুসুম গন্ধরাজ,
দুটি মালঞ্চে, কপালের দোষে কেবনে এলাম এ বন-মাঝ!
বল পেলব বুকের পরতে উথলে সুধার মতন হাসি,
তোর দুলনে তুচ্ছ রাজার ভূতলে হাজার রতনরাশি,
আমরা বনফুল, মাধুরী অতুল, গহনে গোপনে প্রবাসী আজ।
আমরা গরীব, বনের গরব, অন্ধ কোণের গন্ধরাজ!

• • • •

চম্পা, চামেলী, মল্লিকা, বেলি, বল্লরী-রম্বা অপরাজিতা,
তোমরা তা'দের আদর করিছ, মোরা আঁধারের লাজুক মিতা!
ফুটে নাক জল, আসে নাক মালী,
হাতে লয়ে ডালি আসে না কেহ,
মোরা অযতনে রয়েছি গোপনে, সাজাই না কারো মধু দেহ।
সুখের আদরে, বধূর বাসরে, মধুর রাতির আবরণে,
আমরা কোথাও নাই, নাই, নাই, ফুটি আর ঝরি আঁধার বনে।

• • • •

সেচিবা সলিল, গুঁড়াইয়া মাটী, কেয়ারী বাঁধিয়া হায় কে দিবে?
কোন বালিকার কালো আঁখিপাতে কবু কি কলিকা মঞ্জরিবে?
নব-দম্পতি প্রথম প্রেমের স্বপনের মায়া নয়নে মাখি'
অপেখিয়া কবু রবে কি দেখিতে মোরা পাশে পাশে ফুটিনু না কি?
হায়, সে ভাগ্য নয় আমাদের, আমাদের হেথা বিফলে আসা,
করমের দোষে পরম তৃপ্তি হরণ করেছে করম-নাশা!
মোর পদমূলে লুটে না মলয়, ফুটে না মধুপ গুঞ্জরিতে,
অরুণ-আভায়, গোধূলি নিশায়, নারি জ্যো'স্নার মুঞ্জরিতে!

• • • •

পঞ্জরে বাজে পুঞ্জিত ব্যথা, হাহাকার করে হৃদয়, হায়—
নিদয় বিধাতা, এ বিধান দিতে হায় গো হৃদয়ে হলো না মায়া?
পূজারী বিহীন পূজা দেবতা, দীর্ণ দেউলে ধ্বসিয়া মরে—
তুলসী, কুন্দ, ঘাস, আকন্দ, কাশ, এরণ্ডে চামর করে!
হায় গো, সুরভা জনমিয়া নিতি অবগুণ্ঠনে লভিছে চিতা,
সফল করিতে অবলুণ্ঠনে, প্রেমে, চুম্বনে, ফুটে না মিতা।
নিখিলে কাহারো নহি বাঞ্ছিত, নহি এ সুচির লাঞ্ছনায়!
খেয়ালী কবির খেয়ালীতে শুধু খোসটা, কাঁচলি দুলিয়া যায়!

শ্রীহরেন্দু দত্ত

ব্যনোগী টিব্বা

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটীতে মুসুরী গিয়া বাজারের পূবপায় একটি ছোট দোতলা বাড়ীতে আশ্রয় পাই। বাড়ীর মালিক আমার আত্মীয়; সুতরাং সেখানে থাকার কোনও কষ্ট ছিল না। তাঁহাদের বাড়ীতে দেখিলাম, সব পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা এত পরিষ্কার থাক কেমন করিয়া? তাঁহারা বলিলেন, না থাকিয়া করি কি? ময়লা হইলেই শিসু হয়। ছারপোকার চেয়ে শিসু অনেক বেশী কষ্টকর। ছারপোকা মারিলে মরে, শিসুর গায়ে খোলা আছে, টিপিলে মরে না, আর তার কামড়ও খুব কঠিন। যে ঘরটিতে আমি থাকিতাম, তাহার পূবদিকে জানালা ছিল, খুলিলেই একটি খড্, কত গভীর, বলা যায় না। তাহারও ওপারে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি—এক সারি দু'সারি। তার পর, তার পর, না কি, দূরে—অনেক দূরে, বরফের পাহাড় দেখা যায়। কিন্তু আকাশ হয় ধূম, নয় ধূলায় আচ্ছন্ন থাকায় দেখা যায় না। এখন আমার নিতান্ত ইচ্ছা—বরফের পাহাড় দেখি। বাড়ী বসিয়া দেখিতে পাইব বলিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ত হইল না। আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম এবং সকলকে আমার দুঃখের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলাম। তাঁহারা বলিলেন, আচ্ছা, যদি সত্যই বরফের পাহাড় দেখিতে চাও, তবে চল, এক দিন ব্যনোগী টিব্বায় যাই। সেটা ১১ হাজার ফুট উঁচু। সেখানে এত ধূমও নাই, এত ধূলাও নাই। আর সেখানে বাঙ্গালীদের একটা মস্ত কীর্ত্তিও আছে।

শুনিয়া অবধি ব্যনোগী টিব্বায় যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এক দিন রাত্রি ৪টার সময় উঠিয়া আমরা চারি পাঁচ জন, কেহ ডাণ্ডিতে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া যাত্রা করিলাম। সেই সকালে এক পেট বা হয় তাই খাইয়া লইলাম। আর যত খাইলাম, তাহার দ্বিগুণ খাবার সঙ্গে লইলাম। কারণ, পাহাড়ে হাঁটিলে ক্ষুধা খুব বেশী হয়। রাস্তায় কিছু পাওয়া যায় না। বাজারের উত্তর মুড়ার ঠিক পিছনে পূবের দিকে আমাদের বাড়ী, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একটি সাঁকো, সাঁকোর ঠিক সম্মুখেই মুসুরীর লাইব্রেরী। লাইব্রেরীর পূবধার দিয়া একটু গিয়াই আমাদিগকে একটা চড়াই উঠিতে হইল। চড়াইটা শতখানেক ফুট হইবে। তাহার পর একটা পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া রাস্তা, রাস্তাটা বেশ চাটাল—বরাবর সমান। প্রায় ৭ মাইল চলিয়া গিয়াছে সোজা পশ্চিমমুখ। আমার মনটা খুব খুশী হইল—একবারে পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া যাইতেছি। মুসুরীর সীমানা পার হইয়া আর বাড়ী-ঘর কিছুই নাই। পূবের দিকে খড্ আর পশ্চিমের দিকে একটা বেড়া। বেড়া গোলাপগাছের। হলদে হলদে গোলাপফুল রাশি রাশি ফুটিয়া আছে, বেড়া কত মাইল, মনে নাই—তবে ২।৩ মাইল হইবে। বেড়ার ওধারে বাগান, তাহার অপর সীমা অনেক দূরে—অনেক নীচে। এই বেড়ায় ঘেরা বাগানটি শুনিলাম দেরাদুনের উইলিয়ম 'সাহেবের।' তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা দিল্লীর শেষ বাদশা সাহ আলমের সময় দিল্লী ও আগ্রা সুবার অনেক অংশ দখল করিয়া স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। এখন অনেকগুলি 'সাহেবই' ঐ দুই সুবায় ২।১০ লাখ টাকার জমী দখল করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে টমাস 'সাহেব' এক জন, ফ্রেজর 'সাহেব' এক জন, হার্সে 'সাহেব' এক জন, সমরু 'সাহেব' এক জন। সমরুর স্ত্রী বেগম সমরু রীতিমত রেজিমেণ্ট রাখিয়া নিজেই রাজত্ব করিতেন। আপনার সৈন্যসামন্ত শুদ্ধ সমস্ত রাজ্য বাড়ীঘর সমস্ত ইংরাজদের দিয়া গিয়াছেন। উইলিয়াম 'সাহেবের' পূর্ব্ব-পুরুষও এইরূপ হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিতেন। ইংরাজরা দেরাদুন দখল করিলে সেখানেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা বাড়ী-ঘর-দুয়ার বাগান সব করিয়াছিলেন। পাহাড়ের গায়ে যে প্রকাণ্ড বাগান, সেটি তাঁহার। আমাদের দেশের বাগান যেমন সমতল জমীর উপর চারিদিকে ঘেরা, এ সেরূপ নহে। জমী বিষম ঢালু, বাগানটি যেন কাত হইয়া রহিয়াছে। বাগানের ভিতর শীতের দেশের সব রকম গাছ আছে। আকরোট, নাস্পাতি, আলু-বোখারা, আক্সির, তিমলা প্রভৃতি ফলের গাছ, বাচ্ বোরাশ, সরলা, দেওদার ইত্যাদি বাহাদুরী কাঠের গাছ, নানারকম লতা—কেহ বা গাছে জড়াইয়া আছে, কেহ বা জমীতে খেলিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ভূর্জ্জপত্রের গাছ—পাখীতে ঠোকরাইয়া উপরকার

ছালে গর্ত্ত করিয়াছে, ভিতরকার ছাল টানিয়া বাহির করিয়াছে। এই ভিতরকার ছালের নামই ভূর্জ্জপত্র। কতকটা বা গাছে লাগিয়া আছে, কতকটা বা মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে। আমরা বেড়ার বাহির হইতে বাগানের শোভা দেখিতেছি। আমরা বেড়ার বাহিরে রাস্তায়ই আছি। আমাদের দক্ষিণে কোনরূপ বেড়া নাই, কিন্তু বিশেষ অসাবধান হইলে গড়াইয়া একেবারে ৩।৪ হাজার ফুট নীচে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ততটা অসাবধান কিন্তু আমরা হই নাই। আমাদের রাস্তাটি—বাঁকা নয়, পায়ে চলা রাস্তা, মাঝে মাঝে উঁচু আছে। উঁচুর উপর ঘাসও জন্মিয়াছে। বাঙ্গালার মাঠে পায়ে চলা রাস্তা যেমন, ইহাও ঠিক তাই। কিন্তু রাস্তায় অনেক দেওদারের গাছ। দেওদারের গাছ—সরলা গাছেরই মত। দেওদারের গাছ আমি পূর্ব্বে দেখি নাই—এই প্রথম। ফুই-ই কাউজাতীয় গাছ—ইংরাজীতে ফার বলে। পাতা এক একটি সরল রেখা। ফুইয়ের পাতাই থোকা থোকা হয়। সরলার রং সোনার মত। দেওদারের রং কাল, কিন্তু কেলোর মত গাঢ় নয়। কেলো এই জাতীয় গাছ। মুসুরীতে তখন দেখি নাই, সিকলার অনেক আছে। সরলা ৩।৪০ ফুট না উঠিলে তাহার ডাল বাহির হয় না; কিন্তু দেওদার ছয়ফুট-সাত হইবার আগেই ডালে ভরিয়া যায়। সরলার ডাল ফাঁক ফাঁক, কিন্তু দেওদারের ডাল ঘন; সেই জন্য দেওদারের গাছের মাথায় ঝোপ ঝোপ বলিয়া বোধ হয়। সরলার ঝোপ ত থাকেই না, বেশ তফাৎ তফাৎ—দেখিতে ঠিক বাঁশের মত। বিজলী বাতির কল্যাণে আমাদের দেশের লোক সে কালের বেলোয়ারের ঝাড় ভুলিয়া গিয়াছে। বেলোয়ারের ঝাড়ের যেমন নীচে বড় বড় ডাল ও প্রত্যেক ডালের মাথায় ২।৩টি করিয়া বাতি। যত উপরে উঠিতে থাকিবে, ডালগুলি তত ছোট হইয়া আসিবে; কিন্তু বাতি নীচেও যে কটা, উপরেও সে কটা থাকিবে। আর সকলের উপর ডাল নাই। একটিমাত্র ফানুস, তাতে একটি বাতি। সমস্তটা দেখিতে ঠিক মোচার আগার মত। সরলা গাছও ঠিক তাই। ৩।৪০ ফুটের উপর এক জায়গা হইতে বড় বড় ডাল বাহির হইল—প্রত্যেক ডাল হইতে কতকগুলি কেঁকড়ী বাহির হইল, প্রত্যেক কেঁকড়ীর মাথায় এক গোছা করিয়া পাতা। পাতাগুলি ১-লম্বা, সরু এবং রেখার আকার। সরলার গাছকে অনেক জায়গায় কাঁড়ের গাছ বলে।

বেলা হইতে লাগিল—রৌদ্র উঠিল। আমরা দেবদারুর তলায় মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া রৌদ্রের হাত এড়াইতে লাগিলাম ও হাঁপ ছাড়িতে লাগিলাম। সমতল দেশে বাস, যে দিকে চাই, সমতল দেখিতে পাই, আমাদের পক্ষে সাড়ে ছ হাজার ফুট একটি পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া চলিয়া বেড়ানই একটি আশ্চর্য্য জিনিষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা সমতল দেশের লোক, আমাদের চারিটা বই দিক নাই—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম। কিন্তু পাহাড়ে গিয়া দেখিলাম, আর দুইটা দিক বাহির হইল। উপর আর নীচে। আমরা এত উপরে উঠিয়াছি যে, আমাদের আর উপরে দিক নাই, কেবল নীচে দিক; ডাইনেও নীচে, বাঁয়েও নীচে। উইলিয়াম 'সাহেবের' বাগান অনেক দূর ছাড়িয়া আসিয়াছি।

ক্রমে ক্রমে আমরা মুসুরীর পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া যে সাত মাইল পথ আসিবার কথা, তাহার শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন আমাদের নামিতে হইবে। নামিবার জন্য 'সাহেবরা' যে রাস্তা করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনেক জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সুতরাং নামা বেশ কষ্ট ও বিপদের কথা হইয়াছে। পাহাড়ে নামার পথকে পাকডাণ্ডী বলে এবং এক ঢালুও নয়, এক গোড়েনও নয়। একবার খানিক গোড়েন ধরিয়া নামিয়া আসিলাম। এক জায়গায় দাঁড়াইলাম, আবার উল্টা দিকে গোড়েন ধরিয়া নামিতে লাগিলাম। এইরূপ হয় ত ২ শত ফুট চলিয়া মাত্র ২০ ফুট নামিলাম। এখন মনে করুন, ৩ হাজার ফুট নামিতে হইলে কিরূপ পাক খাইতে হইবে। ইহার মধ্যে আবার যদি কোথাও পাথর বা পাথরের ঢিপি থাকে, কষ্ট আরও বাড়িয়া যাইবে। যতক্ষণ উপরে ছিলাম, ঢালুর অবস্থা এমনই ছিল যে, পা বেশ চলিতে পারে। যতই নীচে নামিতে লাগিলাম, ততই ঢালুর খাড়াই বাড়িতে লাগিল; নামা কষ্টকর হইতে লাগিল। যাই হউক, সাড়ে আটটা নটার সময় আমরা যতদূর নামিবার নামিয়া আসিয়াছি, আর নামিতে হইবে না, সামনেই এক নদী। নদীতে এক বিন্দু জল নাই, কিন্তু তাহার খাতে কোন গাছপালা, এমন কি, ঘাসও নাই। নদীর খোলা কত

চটালো, কত সহেয়া, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

খাড় পার হইয়াই আমাদিগকে উঠিতে হইল। বানোগী টিব্বাটি শুনিয়াছি সমুদ্রের জল হইতে ১১ হাজার ফুট উঁচু। আমরা বুসুরীতে যেখানে ছিলাম, সেটা সাড়ে ছ হাজার, নামিয়াছি তিন হাজার; সুতরাং আমাদের এখনও আট হাজার ফুট উঠিতে হইবে। পাহাড়ে উঠায় তত ভয় নাই, একটু পরিশ্রম হয়, একটু শ্বাস লইতে হয়, একটু হাঁপ ছাড়িতে হয়; কিন্তু পড়িয়া মরিবার ভয় হয় না। নামিবার সময় মহা মুস্কিল;—পরিশ্রম অত হয় না, হাঁপ ছাড়িতে হয় না, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়, এইবার পড়িয়া যাইব। হয় সাম্‌নে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইব, না হয় পাশে একেবারে খডের ভিতর পড়িয়া যাইব।

ব্যানোগী টিব্বার গা দিয়া উপরে উঠিবার যে রাস্তাটি ছিল, সেটি বেশ চালু। আমরা স্বচ্ছন্দে উঠিতে লাগিলাম। তাহাতে বেশী পাক খাইতে হয় না, কিন্তু তিন তালের ছই তাল উঠিয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম। পাহাড়ের খানিক ধস্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রায় ২ শত ফুট রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সেটুকু পার হওয়া যায় কি করিয়া? ২ শত ফুট বই ত নয়, সোজাসুজি চলিয়াই যাই। কিন্তু একটি পা দিয়াই দেখি, কেবল বজরী অর্থাৎ কুচো কুচো পাথর। পা দিলেই পা হড়কাইয়া যায়। একবার হড়কাইলে কোথায় যাইব, ঠিক নাই; কিন্তু ইহজগতে যে থাকিব না, সেটা ঠিক। সুতরাং পা'টি তুলিয়াই পরস্পর মুখচাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। শেষ স্থির হইল, পাহাড়ের গায়ে যে ঘাস থাকে, সেগুলি খুব শক্ত, কিছুতেই ছিঁড়ে না, হাত দিয়া সেই ঘাসের মুটা ধরিয়া হয় হামাগুড়ি দিয়া, না হয়, পায়ে চলিয়া, যেখানে ধস্ ভাঙ্গিয়াছে, তাহার ৫০ ফুট উপর দিয়া এই ছই শত ফুট পার হইতে হইবে। সেই ভাবেই আমরা পার হইলাম। খুব উপরে গিয়া আর এক বিপদ। সেখানে কেবল পাথর, তাহা কাটিয়া রাস্তা তৈয়ারী হয় নাই। সেই পাথরের উপর দিয়া গিয়া আমরা কষ্টেসৃষ্টে বানোগী টিব্বার মাথায় চড়িলাম। মাথাটি বিঘা ছই জমী হইবে। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা, মাঝখানটা একটু নীচু, পূবে একটু বেশী উঁচু, পশ্চিমে একটু কম নীচু। পূবের উঁচু জায়গায় পূর্ব্বে কয়েকখানি ঘর ছিল। ঘরগুলির দেয়াল পাথরের—খালি ধরান—চুণকাম করা। ছাদ ছিল টিনের—উড়িয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর যে যখন আসিয়াছে, কয়লা দিয়া নাম লিখিয়া গিয়াছে। অনেক নাম লেখা আছে। আমরাও আমাদের নাম কয়লা দিয়া লিখিয়া রাখিলাম।

শুনিলাম, এই ঘরগুলি রাধানাথ শিকদার মহাশয়ের তারা-ঘর (observatory) ছিল। তিনি এইখানে অনেক দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। প্রথম আমলের হিন্দু কলেজে যে সকল ছাত্র অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার সকলের চেয়ে বড়। তিনি প্রথম হইতেই সার্ভেয়ার জেনারেল আফিসে ঢুকিয়াছিলেন এবং খুব উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার বেতন ৮ শত টাকা হইয়াছিল। তখনকার কালে ৮ শত টাকা বেতন—বিশেষ বাঙ্গালীর পক্ষে খুব বড় বাহিনা। রাধানাথ শিকদার জরীপের এক নূতন রীতি বাহির করিয়াছিলেন। তাহা অনেক দিন তাঁহার নামে চলিয়াছিল, এখন অনেক হাত বদল হইয়া তাহা রেট্রেসেস্ মেথড হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

একটু সুস্থ হইয়া, একটু জল মুখে দিয়া, ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে যাহা দেখিলাম—তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা বোধ হয় মানুষের নাই। বেলা তখন ১২টা। উত্তরদিকে ফিরিয়া দেখিলাম, বরফের পাহাড় দূরে, কিন্তু বোধ হইতে লাগিল নিকটে। উত্তরপশ্চিম কোণে কুসুর পাহাড়—সব বরফ; কিন্তু শীতকাল হইলে যেমন রাশীকৃত বরফ হয়, এখেবারে ফাঁক থাকে না, এ সে রকম নহে। অনেক যায়গাই ফাঁক হইয়া গিয়াছে—বরফ গলিয়া গিয়াছে—অথবা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে বরফ আছে, সেখানে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে; আর যেখানে নাই, সেখানে একবারে অন্ধকার। হয় ত আবার একটু পাশেই সামান্য বরফের উপর একটু সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে মাত্র, ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। উত্তরপূর্ব্বে ধবলাগিরি। তত গ্রীষ্মকালেও বরফের রাশি ত্রিভুজাকারে আকাশের গায়ে লাগিয়া আছে। কিন্তু অনেক দূর একটু ম্লান বোধ হইতেছে। সংস্কৃত কবিরা যে বলেন, রাজাদের বাড়ীগুলা মেঘ ভেদ করিয়া উঠে, মেঘ চাটে—ধবলাগিরি দেখিলে একটু একটু তাহার মর্ম্ম বুঝা যায়। ধবলাগিরির শিখর মেঘরাজ্যেরও উপরে—তিনি যেন আকাশ ভেদ

করিয়া উঠিতেছেন। কুলুর পাহাড় হইতে ধবলাগিরি পর্য্যন্ত যে সকল ছোট ছোট পাহাড় আছে, তাহাতে কত বিচিত্র বিচিত্র রংই যে হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাহারা ধবলাগিরি বা কুলুর পাহাড়ের মত উচ্চও নহে, প্রকাণ্ডও নহে এবং মাথা ঘুরাইয়া দিবার মতও নহে। একটি জিনিষ কিন্তু সর্ব্বত্রই আছে। শোভাটী সব যায়গাই আছে, আর সে শোভা অত্যন্ত মনোলোভা। আর একটি জিনিষ রঙের বাহার। কোথাও সাদার উপর লালের আভা, কোথাও লালের উপর সাদার আভা। কোথাও আভাটা ঘন, কোথাও ফিঁকে, কোথাও চক্‌চকে, আবার কোথাও ম্যাড়্‌মেড়ে। আমার কাছে অতি চমৎকারই বোধ হইল। কারণ, আমি ঐ দেখিতেই গিয়াছিলাম এবং এত দিন দেখিতে পাই নাই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও—আর সময় নাই, অল্পসময়ের মধ্যে চারিদিক দেখিয়া লইতে হইবে, তাই উত্তরদিক হইতে চক্ষু ফিরাইলাম। পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখি, মুসুরী, ল্যাণ্ডর প্রভৃতি পাহাড় হইতে আমরা অনেক উঁচুতে। মুসুরীর সকলের উঁচু যে শিখর—নাম লালটিব্বা, সেটিও একটি ছোট চিপি বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পূর্ব্বদিকে চক্ষু ফিরাইবার পূর্ব্বে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি ও বরফের মধ্যে পাহাড় যেখানে আছে, ইহার মধ্যে অগণ্য ছোট ছোট পাহাড়ের সারি—অনেক নীচে বোধ হইতে লাগিল, যেন লাঙ্গলের ফাল দিয়া জমীটা চষিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়গুলা উঁচু মাটী আর নদীগুলা লাঙ্গলের কালের দাগ। অথবা যেন সমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা সমানে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কাটিতেছে না, কেনা হইতেছে না। এই যে ঢেউ-খেলান জমী, ইহার নাম গড়োয়াল। এখানে গ্রাম আছে, নগর আছে, বাজার আছে, হাট আছে, মাঠ আছে, বাট আছে, এখানেও খাজনা আদায় হয়, গোমস্তারা খাজনা আদায় করে। খেরে টাকা আদায় না করিতে পারিলে তাঁরা হাজতে যায়।

পূবের দিকে পাহাড়গুলো উঁচু উঁচু—ঠিক যেন নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছে। কেবল চূড়ার উপর চূড়া। এখানেও গ্রাম নগর সবই আছে। যেখানে সরলা ও দেবদারুর বন আছে, সেগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। একটা একটা গাছই দেখিতে কত সুন্দর। যেখানে ঝাঁক বাঁধিয়া ঐ সব গাছ হইয়াছে, সেখানে আরও সুন্দর। আবার যেখানে পর্ব্বতের গায়ে হইয়াছে, ক্রমে উপর হইতে নীচে নামিতেছে, সেখানে ত একবারে চমৎকার। আমার এইরূপ একটি সরলার বনে দিনকতক বাস করিতে হইয়াছিল। একটা ছুরি বা পেরেক দিয়া সরলার গায়ে একটি লম্বালম্বি দাগ দিলেই উহা হইতে এক রকম রস বাহির হইত এবং তাহার গন্ধে বাড়ীটা ভর্ হইয়া উঠিত। ঐ পাতলা রসই ঘন হইয়া গন্ধবিরজা হয় এবং বাজারে বিক্রয় হয়।

পূবদিকেও যেমন দেখিলাম, পশ্চিমেও তেমনই পর্ব্বতের পর পর্ব্বত বরাবর পঞ্জাব পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণদিক অতি সুন্দর। নিকটেই মুসুরীর সারি সারি পাহাড়—সাড়ে ছহাজার ফুট উঁচু। এই সব পাহাড়ের আড়াল হওয়ায় দেরাদুনটা আমরা দেখিতে পাইলাম না, শিবালিক পর্ব্বতও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু শিবালিকের দক্ষিণ-দিকে বরাবর ঘু ঘু করিতেছে। দেরাদুন হইতে ৫৩ মাইল সাহারাণপুর। সাহারাণপুর বেশ দেখা যাইতে লাগিল। রেলগাড়ীগুলি পিপড়ের সারির মত পূবদিক হইতে আসিয়া উইয়ের চিপির মত একটি ষ্টেশনে থামিল—খানিক থামিয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গেল। চোখ টানিয়া টানিয়া আরও দূরে—আরও দূরে দেখিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ একটা আলো চোখে লাগিল। তত দূর হইতে কিসের আলো আসে, আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। এক জন জরিপ মহা-লের লোক আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলিলেন, দিল্লীর জুম্মা মসজেদের সার্সির উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়াছে, তাই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। বিশ্বাস হইল না, কিন্তু মনে করিলাম, হবেও বা।

আমরা এইরূপে পর্ব্বতের শোভা দেখিতে নিমগ্ন আছি, এমন সময় আমাদের এক ঘোর শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চিমদিক হইতে হাওয়া উঠিল। অত উপরে হাওয়া, বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসিল—ধূম ও ধূলা। পাহাড়ে ধুন্ধুলা বলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাহাড়ে ছটা দিক আছে—সব দিকই ধুন্ধুলায় ভরিয়া গেল। এতক্ষণ একতানমনপ্রাণে যাহা দেখিতে-ছিলাম, তাহার আর কিছুই দেখা গেল না। আমরা বিষাদে মগ্ন হইয়া গেলাম। ধুন্ধুলা শীঘ্র ছাড়িবে না বুঝিয়া নামি-বার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নামিবার সময় অত হাঁপও

লাগে না, পরিশ্রমও হয় না, আর ঘামও বাহির হয় না। যেখানে কোন বিপদ নাই, সেই রকম জায়গায় গা ছাড়িয়া দিলেই হয়, আপনিই নামিয়া আসে। যেখানে বিপদ আছে, সেখানে অতি সন্তর্পণে পা ফেলিতে হয়। কারণ, পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী। যখনকার কথা বলিতেছি, সে সময়ে এক রকম লাঠি পাওয়া যাইত, তাহার মাথাটা খুব শক্ত একরকম বাঁশের আর নীচে এক রকম ছুঁচাল লোহা খুব শক্ত করিয়া আঁটা। সে লাঠি হাতে থাকিলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম হইত; কিন্তু এখন সে লাঠি আর পাওয়া যায় না; তিনি আবদুস্ এইটে পড়িয়া চম্পট দিয়াছেন।

আমরা নামিতে লাগিলাম। যেখানে খেসু জাগিয়াছিল, উঠিবার সময় সেখানে খুব কষ্ট পাইয়াছিলাম, সেখানে প্রাণ হাতে করিয়া নামিলাম। ক্রমে ক্রমে আসিয়া নীচের নদীতে উপস্থিত হইলাম। যাইবার সময় বলিতে ভুলিয়াছিলাম, নদীর ঠিক মাঝখানে একটি মোচার আকার পাহাড় আছে, তাহা ৩০।৪০ ফুট উঁচু হইবে। তাহার মাথায় একটি আকন্দগাছ। আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দুই হাজার ফুটের উপরে উঠিয়া সুন্দরীর রাস্তা পাইলাম আর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলাম। সেই সুন্দরীর গাছ, সেই দেওদারের গাছ, সেই উইলিয়ম 'সাহেবের' বাগানের বেড়া, সেই মুন্সুরীর লাইব্রেরী, সেই লাইব্রেরীর সামনে ঝাঁকো। তার পর মুন্সুরীর বাজার, বাজারের পিছনে আমাদের বাড়ী। রাত্রি ৯টা হইয়াছিল, কিন্তু বেশ চাঁদিনীর আলো ছিল। রাস্তায়ও অন্ধকার হয় নাই, বাটীতেও অন্ধকার হয় নাই, কিন্তু রাত চৌটা হইতে বুঝিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, অল্পসময়ের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

শ্রীহরপ্রসাদশাস্ত্রী

জেরা

CROSS-EXAMINATION

আরণ্যক

উষার প্রথম চরণপাতের অরুণরাগ তখনও আকাশের ঈষৎ-উত্তর লঘু মেঘবাহিতে প্রতিফলিত হয় নাই। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা, ফুলের কোরক, নিদ্রাতুর পল্লবগুচ্ছ যেন নিশ্চল, মহিমান্বিত বনস্পতি সকল যেন ব্রাহ্মমুহূর্তের গভীর ধ্যানে সমাধিস্থ, নিশ্বাস তাহাদের প্রাণায়াম-নিরুদ্ধ। প্রকৃতি নির্নিমেষ উন্মেষে প্রভাতের প্রতীক্ষায় সমাসীন। এমন নিশ্বাসের মৃদুনিঃস্বন বনস্থলীর উপর দিয়া কাঁপিয়া ভাসিয়া গেল, যেন জাগরণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে চেতনার ঈষৎ উন্মেষ। দীপ্তনেত্র নিশাচর শ্বাপদসকল নৈশ বিহার সমাপন করিয়া আপন আপন প্রচ্ছন্ন আবাসে আশ্রয় লইতেছে, কাংস্যনিনাদে অরণ্যভূমিকে সচকিত করিয়া শ্যেন বিহঙ্গ উষার আগমন-বার্ত্তা সর্ব্বাগ্রে প্রচার করিল।

ঝোপের মধ্যে ব্যাঘ্রের অবস্থান

আরতিলগ্নের ধূপ-ধূমাচ্ছন্ন পবিত্র তিমিরচ্ছায়ার মত অরণ্যের অন্তর্ভাগে তখনও অস্পষ্ট অন্ধকার, যেন কোন দেবমন্দির দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। অদূরে সম্মুখভাগে মসৃণগাত্র কোনও জীব শুভক্ষণের অপেক্ষা করিতেছে, এখনই সুগম্ভীর শঙ্খধ্বনিতে চারিদিক জাগ্রত করিবে। বায়স ও শ্যেনকণ্ঠের কর্কশ তীক্ষ্ণস্বরে সমস্ত নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িল। একে একে গায়ক পক্ষী সকল বন্দনা-গানের সুমধুর ধ্বনিতে বনভূমিকে মুখর করিয়া তুলিল। শান্ত আরণ্য আশ্রমের প্রভাত বৈতালিকদিগের এই ঐক্যতান, সামগানের মধ্যে "কাকের কর্কশকণ্ঠ" এবং চিলের তীব্র তীক্ষ্ণস্বর যদি দূরত্বের সাহায্যে ক্রমশঃ কোমল ও নম্র হইয়া না আসে, তবে বিষাদী সুরের মত প্রতিকঠোর ও বাদুলের অসম্বদ্ধ প্রলাপের মত পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধন্য অবস্থায় যে সকল পাখীর স্বর তীব্র ও কর্কশ, তাহারাই মানুষের কথা

ও দোয়েল পাখীর সুরিই নিখুঁত পর্য্যন্ত অবিকল নকল করিতে পারে। কোকিলের অনুকরণবৃত্তি অদ্ভুত; বাল্যকালে ছেলেদেরে উভয়েই পিতার মত গায়, কৃষ্ণবর্ণে দেহ আবৃত করিয়া রাখে এবং যত দিন না তারুণ্যের প্রারম্ভে কুলায় ছাড়িয়া বাহির হয়, তত দিন আর বর্ণবিষমতা ঘটে না, ঘর ছাড়িলেই কোকিলা স্ত্রীজাতিসুলভ পরিচ্ছদ পরিধান করে। তবে প্রাণিজগতে সাধারণতঃ নিয়ম এই যে, পিতামাতা বিভিন্ন বর্ণের হইলেও, বাল্যকালে শাবকগণের মাতার সহিত বর্ণসাম্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যমনস্কতা বশতঃ প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি, আবার প্রকৃতির উৎসবক্ষেত্রে ফিরিতে হইবে। অযুত কোরকগুচ্ছ ও পুষ্পমঞ্জরী, যাহাদের সূচনা হইয়াছিল স্নিগ্ধ হরিৎ পর্ণপুটের মধ্যে, বিকসিত হইয়া তাহারা অগ্নিবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে। আবার কেহ বা বিকচপ্রফুল্লদল অবারিত করিয়া উন্মিষদ্ধৃদয়ে প্রতীক্ষমাণ বিশ্বজগতে জাগরণের সুরভি সংবাদ প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। যে ব্যক্তি অরণ্যের মধ্যে প্রকৃতির উৎসবের দিনে প্রভাতজাগরণের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নাই, বিহঙ্গরাজের শৃঙ্গধ্বনির সহিত গায়কমণ্ডলীর সমবেত সঙ্গীত শ্রবণ করে নাই, তাহাকে যথার্থ বনস্পতিবিহারী বলা যায় না। এ গৌরব লাভ করিতে হইলে শুধু সৌন্দর্য্যসম্ভোগ নহে, জীবহিংসায় সংযম ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হয়।

শিকারের জন্য আমাদের পুরাতন আস্তানায় আসিয়াছিলাম। সেখানে শুষ্ক, শার্দ্দূল, হরিণ ও মহিষ অপ্রতুল ছিল না। শরৎকালে গয়াল সুলভদর্শন না হইলেও এ বৎসর বর্ষা বহুকালব্যাপী স্থায়ী হওয়ায় কয়েকটি তখনও প্রবাসযাত্র

ব্যাঘ্রভয়ে ভীত হস্তীর পলায়নে শিকারীর বৃক্ষশাখা অবলম্বন

করে নাই। চারিটির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহার মধ্যে গয়াল-প্রবর দলপতি ভিন্ন সকলেই স্ত্রীজাতি। দেবীপক্ষ যদিও মহিষাসুরের বিনাশকাল, তবুও ইহাদের উদ্ধার করা নিষেধ ছিল, কেন না, শার্দ্দূলরাজের গুণাগমনের জন্যই বিশেষরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমাদের

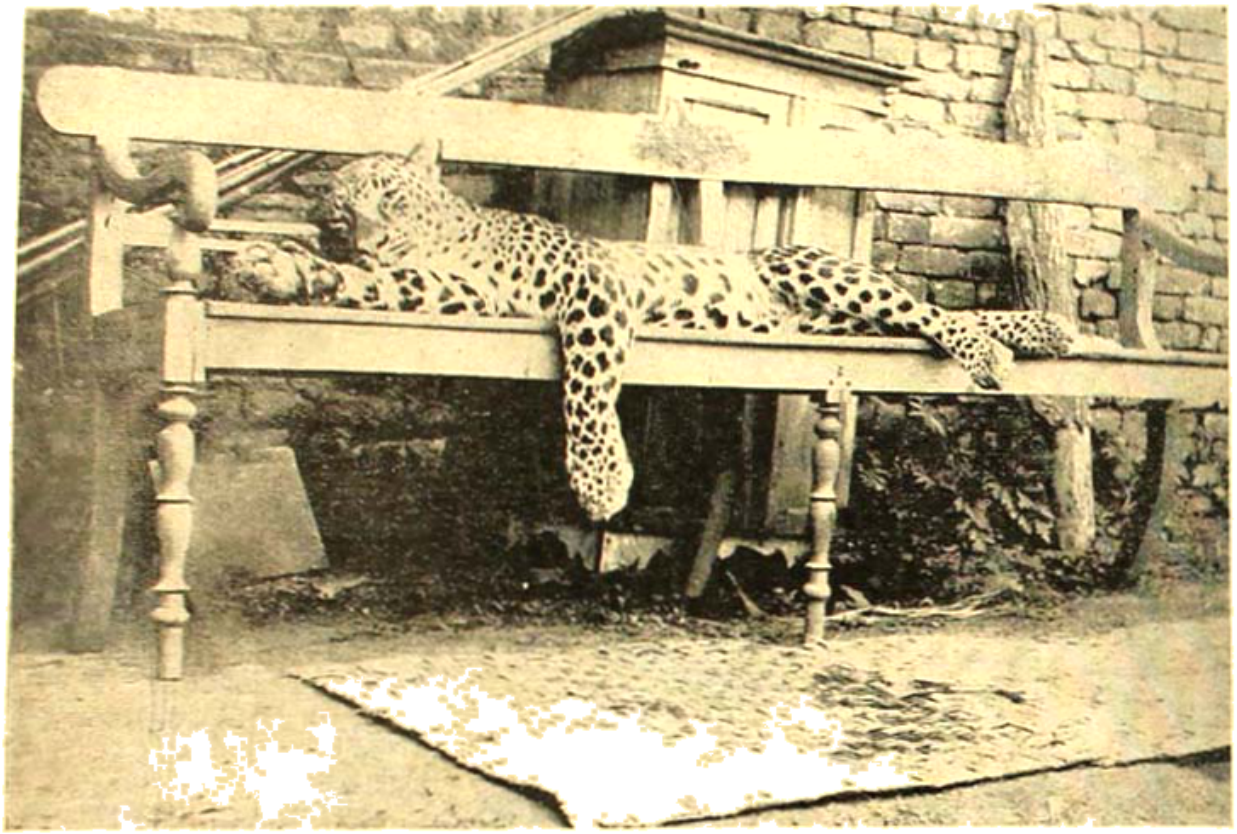

শিবিরে মৃত শার্দ্দূল

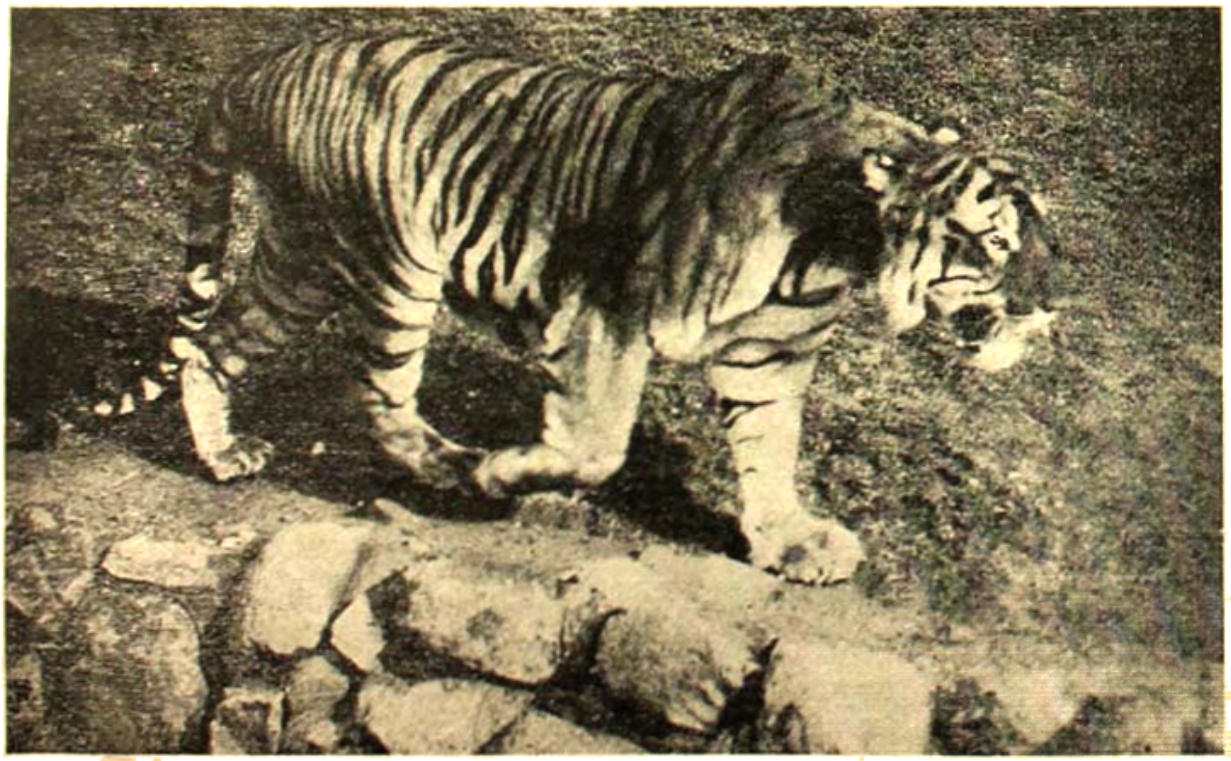

মহীশূর ব্যাঘ্রের শিকার অন্বেষণ

সহিত এই পরাজিতের সাক্ষাৎকার অকস্মাৎ হয়, তবে স্বাগত জানাইবার সুযোগ হয় নাই। কেন না, দর্শন-মাত্রেই সবলবলে দশদে বনভূমি কম্পিত করিয়া তাহাদের চিরোধান ঘটে, যে পর্য্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম, আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই।

ঘটে, তবে ছায়াবাজীর মত তাহারা যে কোন্ পথে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। যাহাদের উপর পথের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, সম্ভবতঃ তাহাদেরই অনবধানতার ফল। আমাদের মধ্যে এক জন চিত্রল হরিণ শুনী করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই শব্দে সতর্ক তাহারাও

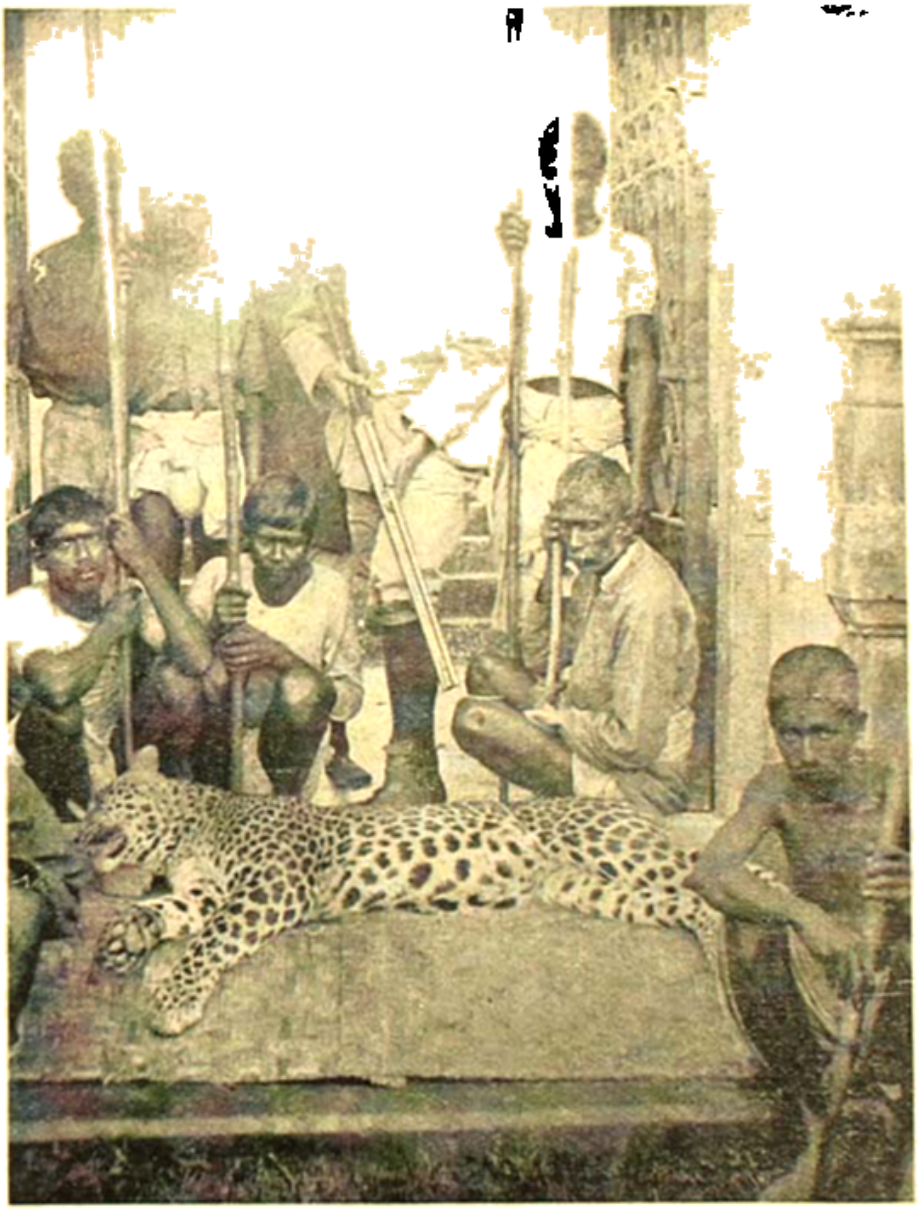

শিকারিবৃন্দ পরিবৃত মিঃ কে, এন, চৌধুরী

বৈশাখ মাস, নববর্ষের সূচনা, এই সময়েই সাম্বর হরিণ পুরাতন শৃঙ্গ বর্জ্জন করিয়া নূতন ধারণ করে, এই অবস্থায় আমরা দুইটিকে দেখিয়াছিলাম। একটি চিত্রল হরিণও মখমলের মত সুকোমল নবোদ্ভিন্ন শৃঙ্গ ধারণ করিয়া ফিরিতেছিল। ব্যাঘ্রদম্পতি-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল পলায়ন করিয়াছিল। একটি চিত্রক ব্যাঘ্রের রহস্যপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত ছাড়া সেবার অধিকতর কৌতুকজনক ঘটনা আর ঘটে নাই। চিত্রক জাতির মধ্যে দেহায়তনে ও সৌষ্ঠবে এই ব্যাঘ্রটি ছিল আদর্শস্বরূপ। অলস ধীর গতিতে সে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীযুত ম—উচ্চমঞ্চের

নিরাপদ আশ্রয় হইতে বন্দুক আওয়াজ করিলেন, মুহূর্ত্তে চিত্রক পপাত ধরণীতলে। সকলেরই বিশ্বাস হইল, শুধু পতনও নহে, মৃত্যুও বটে। শিকারী মহাশয় সাফল্যের আনন্দাতিশয্যে বন্দুকটি পার্শ্বে রাখিয়া চুরুটটিকায় অগ্নি-সংযোগ করিতেছেন মাত্র, অমনই চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহুবলে নিমেষের মধ্যে "বিদ্ধিত নিমেষহত" নেত্রের

আমাদের শিকারের জঙ্গল পিটাইবার জন্য যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা জঙ্গলেরই বাসিন্দা, বনরাজ্যের বিধি-নিয়ম, বন্যজন্তুদিগের আচরণ-অভ্যাস, জীবনযাত্রার প্রণালী-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা, শিকার সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ও উৎসাহ, উভয়ই প্রচুর। তবে সাধারণতঃ জঙ্গলবাসিগণের যেমন সুগঠিত সুঠাম বপু দেখা যায়, ইহাদের সেরূপ

শিকারী হস্তী

সম্মুখ হইতে অরণ্যের অন্তরালে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। পথে ক্ষণকালের জন্য জঙ্গলপরিদর্শক মহাশয়ের প্রতি যে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছিল, তাহারই মন্ত্রশক্তিতে সেই ভদ্রলোকের বন্দুকের লক্ষ্য বিচলিত হইল। অতঃপর আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

• • •

দেহসম্পদ ছিল না। অন্য শিকারীরা ইহাদের সহিত ব্যাঘ্রের তুলনা করিত, এই হিংস্রজন্তুদের মতই ইহারা দিনের পর দিন উপবাস করিতে কষ্ট বোধ করে না, আবার আহার্য্য যখন পায়, তখন এতই অপরিমিত আহার অনায়াসে করে যে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তবে শিকারীমাত্রেই আমিষ আহার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী, এ পক্ষপাত এমনই

অধিক যে, তাহাদের মাংসের জন্য একবারেই পাগল বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। সাম্বর হরিণের মৃতদেহের উপর একপালে রাক্ষসের মত গিয়া পড়িত। আর যখন দেখার একসঙ্গে দুইটি হরিণ মারা পড়ে, তখন আর তাহাদের আহ্লাদের পারাপার ছিল না। ইহারা ব্যাঘ্র শিকারের জন্য গুলী-বারুদের খরচকে নিতান্ত অপব্যয় মনে করে। কোন একজন গোণ্ডকে আবার বন্ধুর বাচান হইতে যে ভাবে পিপীলিকা ধরিয়া খাইতে দেখিয়াছিলাম, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রশ্ন করিলে হাসিয়া বলিল, খাইতে খুবই ভাল, ঈষৎ অম্লস্বাদ। গারো পর্ব্বতে একবার একটি প্রকাণ্ড মহিষ আমার গুলীতে মারা পড়ে, শকুনের ভিড় জমিয়া গেল দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি বুঝিয়া, মহেন্দ্র বলিল, একটু সবুর করুন, পাহাড়িয়াদের ভিড় শকুনের দ্বিগুণ হইতে দেরী লাগিবে না। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, সে বীভৎস দৃশ্য জীবনে ভুলিব না। অসংখ্য গারো একসঙ্গে হাঁচড়-পাঁচড়, ঠেলা-ঠেলি, হুড়াহুড়ি, মারামারি করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের ছুরী ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র রক্তমাখা করিয়া পড়িতেছে। কেহ বা ভোজালি কিংবা কুকরী দিয়া বড় বড় মাংসের টুকরা কাটিয়া বুড়ি বোঝাই করিতেছে, কেহ বা প্রকাণ্ড একটা সুচে দড়ি পরাইয়া মাংসের মালা গাঁথিয়া লইতেছে, এক টুকরাও পড়িতে পাইতেছে না। আমাদের আধুনিক সভ্যতার দিনেও এই আদিম মাংসলোলুপতা এখনও দূর হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তির প্রকাশ যে কি ভীষণ কুৎসিত, তাহা চোখে না দেখিলে বুঝা কঠিন। নরমাংসভোজী বর্ব্বর কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবারণের জন্যই যে হত্যাকারী তাহা নহে, সে বিশ্বাস করে, মৃত শত্রুর মাংস আহার করিয়া সেই বীর্য্যের অধিকারী হইবে এবং এই উপায়েই সে তাহার বীরত্বকে সম্মানিত করিল। সভ্যতা-গর্ব্বিত শিক্ষিত মানুষের অনুকূলে এ কথা আর বলা চলে না।

• • • • •

সমস্ত পৃথিবীর মুমূর্ষু অরণ্যানী ও পীড়িত তরুরাজি আজ সভ্যতার অভিযানের প্রতি ভীত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যেখানে রেল-লাইন বসিতেছে, খনি খোদিবার দুর্ব্বাঘাতে মখমল-সুকোমল প্রান্তর প্রদারিত, মোটর-পথ নির্ম্মিত হইতেছে, সেইখানেই প্রকৃতি জননীর মুখশ্রী বিষাদ-মণ্ডিত, দৃষ্টি ক্লান্ত ও কাতর। তাঁহার মানব সন্তানের মত আর কোন জীব তাঁহার বিধি-নিষেধের অবজ্ঞা করে নাই,

মৃত হরিণের চর্ম্ম উন্মোচন

শুধু পাপ হস্তে কে আর এমন করিয়া বনশ্রী মর্দ্দিত করিয়াছে, জীবরাজ্য ধ্বংসের মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া প্রলয় সৃষ্টি করিয়াছে?

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তরালে যৎকিঞ্চিৎ !

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইজ্জৎ-রক্ষা

(পল্লীকাহিনী)

১

মড়িপোড়া গ্রামের চাষি-সমাজে কেষ্টো মণ্ডল এখন সব চেয়ে মাতব্বর গৃহস্থ। পচা খড়ের জীর্ণ কুটীর হইতে হাউই-য়ের মত বেগে তাহাকে সৌভাগ্যের ঊর্দ্ধাকাশে হু হু শব্দে উঠিতে দেখিয়া মড়িপোড়া গ্রামের ইতর-ভদ্র সকল লোক সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল।

কিন্তু কেষ্টোর প্রথম জীবনটা বড়ই কষ্টে কাটিয়াছিল। তাহার পিতা ভিখু মণ্ডল বহু দিন চাটুর্য্যে জমীদারদের খান-সামাগিরী করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে—সেই এগার বৎসর বয়সে কেষ্টো বড়ই বিপন্ন হইয়াছিল। পাড়ার লোকের গরুর রাখালী করিয়া তাহার ও তাহার মাতার জীবিকার সংস্থান করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এ জন্য তাহার মা প্রতিবেশী বাঁড়ুয্যেবাড়ী দাসীগিরী করিয়া কেষ্টোকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল।

বয়স একটু বেশী হইলে কেষ্টো গরুর রাখালগিরী ছাড়িয়া খেজুরে গুড়ের ব্যবসায় আরম্ভ করে। ইহাই তাহার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সূচনা; কিন্তু এই ব্যবসায়ে তাহার কিছু মূলধনের প্রয়োজন হয় নাই। একবার আশ্বিনমাসে বিজয়া দশমীর পরদিন চাটুর্য্যেদের বুড়া কর্ত্তা রাম বাবুকে বিজয়ার প্রণাম করিতে গিয়া কেষ্টো বলিল, "বাবু, আমার বাপ আপনারই খেয়ে মানুষ হয়েছেল; আমার ত সংসার অচল, তা আপনার বাগবাগিচেগুলাতে অনেক খেজুর-গাছ; ওগুলা এবার আমিই কাইতে চাই, গুড়ের 'বাইন' করব মনে করছি।"

রাম বাবু বলিলেন, "তা পারিস্ ত বন্দ কি? পরের গরু চরিয়ে কি পেট ভরে? বেশ, গাছগুলো এবার তুই-ই জমা নিস্। আমি চক্কবর্ত্তীকে (নায়েব) ব'লে দেব—সে যেন আর কারও সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে। কিন্তু গাছের কি খাজনা দিতে হয় জানিস্ ত? এক এক গাছে তিন সের গুড়।"

কেষ্টো বলিল, "তা আর জানিনে? শিবুতি গাছে তিন সের গুড় আমি 'নিখ্‌দে' খাজনা দিতে পারবো। চক্কোত্তী মশায় যেন গাছগুলো হুদ্ ক'রে আর কাউকে দিয়ে না ফালে। তেনাকেও আমি অতুষ্ট করবো না।"

বৃদ্ধ জমীদার তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন না। কোজাগরলক্ষ্মীপূজার দিন কেষ্টো 'লক্ষণ' করিয়া জমীদারের বাগানের পাঁচ গণ্ডা গাছ কুড়িয়া আসিল। ক্রমে সে জমী-দারের ও পাড়া-পড়শীদের খেজুরগাছ দুই চারিটি করিয়া কুড়িতে কুড়িতে দেখিল—চার কুড়ি গাছ কুড়িয়া ফেলি-য়াছে! তাহার একটু ভয় হইল; এতগুলি গাছ সে একা কি করিয়া সামলাইয়া উঠিবে? অথচ আশ্বিনমাসের মধ্যেই সব গাছ বাঁধিতে আরম্ভ না করিলে দু' পয়সা লাভের আশা নাই। এই সময় নূতন খেজুররসে যে 'সরাগুড়' হইবে, তাহার আকার একখানি বড় বাতাসার মত হইলেও প্রত্যহ পনের ষোল গণ্ডা 'গুড়' হাতে হাতে উঠিয়া যাইবে। এক একখানি এক পয়সা দিয়া কিনিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। তাহার সোনার মত রং, আর বাবু-মনোলোভা গন্ধের কথা স্মরণ করিয়া কেষ্টো দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। না, এত ঝঞ্ঝাট সে সহ্য করিতে পারিবে না।

এক দিন সন্ধ্যাকালে সে তাহাদের ঢেঁকির চালায় ঢেঁকির উপর বসিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতেছে, এমন সময় বাঁড়ুয্যেদের কুবাণ বাঁশী বাগ্দী তাহার সম্মুখে উপস্থিত। বাঁশী কেষ্টোকে ঢেঁকির পিঠে চিন্তামগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিয়া বলিল, "কি হে কেষ্টো দাদা, ওরা সন্ধ্যে ব্যালায়

ঢেঁকির ওপর বসা কি ভাগ্যি নেগেছে? গিন্নীর সঙ্গে কগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়েছে বুঝি? তামুক-টামুক খাচ্ছো না?"

কেষ্টো মুখ ভার করিয়া বলিল, "তাক্তোর গিন্নী! মা ত বৌটার বিয়ে দিয়ে চতুর্ভুজ হয়েছে; আমি এখন কি ক'রে সংসার চালাই? একটা ফন্দী করেছি ভাই! ঐ চটখান টেনে নিয়ে বোস; তামুক খাওয়াচ্ছি। তোর সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে।"

কেষ্টো তামাক সাজিয়া আগুন ধরাইল এবং গোটে কল্‌কেটা ভাবা হুঁকায় বসাইয়া, দুই এক টানে আগুনটুকু জমকাইয়া লইয়া কল্‌কেটা বাঁশীকে নামাইয়া দিল। বাঁশী উভয় হস্তে কলিকাটির পুচ্ছদেশ সজোরে চাপিয়া ধরিয়া মাথা কাত করিয়া দুই চারিটা টান দিল; তাহার পর এমন এক দম্ কষিল যে, কলিকার আগুন ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! বাঁশী কলিকাটি কেষ্টোর হাতে ফেরত দিয়া, নাক-মুখ দিয়া আগ্নেয়গিরির ধূম্রোদ্গারের ন্যায় ধোঁয়া ছাড়িয়া বিকৃত মুখে বলিল, "এ তোমার কি রকম ভ্যাল্‌সা তামুক, কেষ্টো দাদা! তলব তামুক নৈলে কি টেনে সুখ হয়?"

কেষ্টো হুঁকা রাখিয়া রাগ করিয়া বলিল, "তোর চাই বড় তামুক (গাঁজা), তা নৈলে তোর মন উঠ্‌বে না; আমি গরীব মানুষ, তা এখন কুতাই পাই বল্ দিকিন্। তা তোকে আমি বড় তামুক খাওয়াতে পারি—যদি তুই আমার একটু কায ক'রে দিতে রাজী হ'স্।"

বাঁশী আশ্বস্ত চিত্তে বলিল, "কি কায বল ত দাদা! আজ এক মাস গাঁজার মুখ দেখি নি, পেরাণডা আই-ঢাই করছে—'গাঁজার গুণে, গহনবনে, ফিদে তেষ্টা নাশ করে,'—দাদা, নিতেই যোগির ঘোলখানা যদি আন্‌তে পারতে, তবে একটু কেত্তন গাইতাম। আমাদের শ'বাবু খাসা কেত্তন গায়; আমি একটু একটু শিখে নিয়েছি।"

কেষ্টো বলিল, "তোর দু'চোর কেত্তনে আর কায নেই। এখন কাযের কথা শোন্। আমি বাবার মুরুব্বী রায় বাবুকে বুঝে-সুঝে রাজী ক'রো তেনার আর পাড়া-পড়শীদের চার কুড়ি খেজুরগাছ কাটিয়েছি। এতগুলো গাছ একা ত সামাল দিতে পারব না; তুই যদি বিশ পঁচিশটে গাছে ঠিলি বেঁধে দিস্—তা হ'লে তোকে তোর মনের আশ মিটিয়ে গাঁজা খাওয়াব। সাঁজের ব্যালা আর খুব তোরে তোর ত' কোন কায নেই। তুই কায-কাম সেরে এসে বিকেলে ঠিলি বাঁধবি, ভোরবেলা ঠিলিগুলো খুলে এনে আমার 'বাইনে' (রস জাল দেওয়ার স্থান) রেখে যাবি। রোজ তোর দু'বেলা দু'পয়সার গাঁজার বরাদ্দ থাকল।"

বাঁশী মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "বেশ মজার কথা বুঝে, কেষ্টো দাদা! তুমি চার কুড়ি গাছ বাঁধ্‌বা। কাত্তিক থেকে ফাগুন মাসের শেষ ইস্তক, এক এক গাছে কিছু না হয় ত এক মণ সোয়া মণ গুড় কামাবা। এই ক' মাসে চার কুড়ি গাছে এক শ' মণ গুড় ঘরে না তুলে ছাড়ছো না। জমীদারকে গাছ পিছু তিন সের গুড় খাজনা দিবা, বাকী সবই তোমার। আর আমার ব্যালায় শুধু দু'ব্যালা দু'পয়সার গাঁজা? আমি অত বোকা নই, কেষ্টো দাদা! আমি তাতে রাজী নই।"

অবশেষে বাঁশী প্রত্যেক গাছে মাসে দুই সের গুড় ও প্রত্যহ দুই পয়সার গাঁজার বরাদ্দ করিয়া দেড় কুড়ি গাছে—অপরাহ্ণে ঠিলি বাঁধিবার ও সকালে তাহা খুলিয়া আনিয়া দেওয়ার ভার লইল। কেষ্টো বাঁশীকে গাছ কাটিবার দা, গাছে উঠিবার দড়ি ও ঠিলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিল। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে তাহারা খেজুরগাছ 'বাঁধিতে' আরম্ভ করিল।

কেষ্টো বাড়ীর কাছে কাঁকড়া তেঁতুলগাছের তলায় গুড়ের 'বাইন' করিল; সারাদিন ধরিয়া সে লোকের বাগানে, মাঠে জঙ্গল কাটিয়া ফেলিয়া আসিত, শুকাইলে তাহা আঁটি বাঁধিয়া বাইনে লইয়া আসিত; গুড়ের লোভে পাড়ার ছেলেরাও তাহা বহিয়া আনিত। কেষ্টো প্রত্যহ রস সংগ্রহ করিবার ঠিলিগুলি বাঁশের বাঁকের দুই দিকে ঝুলাইয়া খেজুরগাছে ঠিলি বাঁধিতে যাইত। সে মোটা দড়ার সাহায্যে গাছে উঠিয়া গাছের মাথায় তিন চার হাত নীচে দুই হাত দীর্ঘ বংশদণ্ডের দ্বারা 'আড়' বাঁধিত এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া খেজুরগাছের বিদারিত স্কন্ধ চাঁচিয়া-ছুলিয়া বাঁশের নলীর মুখে ঠিলি বাঁধিত; অতঃপর একটি খর্জ্জুর-শাখা টানিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা সেই ঠিলি গাছের সঙ্গে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিত; নতুবা বায়ুপ্রবাহে ঠিলি 'নলীর' মুখ হইতে সরিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিত। পাছে কেহ রাত্রিকালে গাছে উঠিয়া রস চুরী করে, এই ভয়ে সে ছোট ছোট খেজুর-গাছের ঠিলির ভিতর মানকচুর চাকা ফেলিয়া রাখিত; কিন্তু এরূপ করিয়াও কেষ্টো নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না, গ্রামের

দুই ছেলেরা পেপের ডাল সংগ্রহ করিয়া রাত্রিকালে খেজুর-গাছে উঠিত এবং সেই নলের সাহায্যে ঠিলির ঊর্দ্ধাংশের রস মুখ দিয়া আকর্ষণ করিয়া আকণ্ঠ পান করিত; মানকচু-গুলি ঠিলির তলায় পড়িয়া থাকায় তলার রসে 'মুখ চুলকা-লেও' উপরের রস অবিকৃত থাকিত। এই চুরী নিবারণের জন্য কেষ্টো কোন কোন রাত্রিতে লাঠি ঘাড়ে লইয়া গাছের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইত। এক এক দিন বাশীও তাহার সঙ্গে যাইত। গাঁজার ও গুড়ের লোভে সে তাহার কাযে গাফিলী করিত না।

কার্ত্তিকমাসে যখন রসের পরিমাণ অল্প হইত, তখন কেষ্টো রস জ্বাল দিয়া 'সরাগুড়' করিত। সে ঠিলিগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে মাটীতে বসাইয়া, একখানি কাপড় প্রসারিত করিয়া ঠিলিগুলির মুখ ঢাকিত, এবং প্রত্যেক ঠিলির মুখের কাপড়ের উপর এক 'গুড়ং' (নারিকেলের মালানির্ম্মিত হাতা) গুড় ঢালিয়া দিত। সেই গুড় কয়েক মিনিটের মধ্যে জমিয়া যাইত। ইহাই 'সরাগুড়।' তাহা সে ডালায় সাজাইয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত। এই গুড়-গুলির আকার বাতাসা অপেক্ষা অধিক বড় না হইলেও সেই নূতন গুড়ের এরূপ প্রবল আকর্ষণী শক্তি যে, এক ডালা গুড় আধঘণ্টার মধ্যেই উঠিয়া যাইত।—এই উপায়ে কেষ্টো প্রত্যহ পাঁচ সিকে দেড় টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। পয়সাগুলি সে টাকা গাঁথিয়া ফেলিত; যাহা অতিরিক্ত থাকিত—তদ্দ্বারা সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিত।

শীতকালে রসের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইলে কেষ্টো প্রত্যহ পনের ষোল গণ্ডা 'সরাগুড়' করিয়া, অবশিষ্ট গুড় ঝোলা অবস্থায় কলসীতে সঞ্চয় করিত, তাহা সে গ্রামা মুদী-ময়রা-দের নিকট মণদরে বিক্রয় করিত।

এই ভাবে গুড়ের 'বাইন' করিয়া প্রথম বৎসরেই কেষ্টোর হাতে শ-দেড়েক টাকা জমিয়া গেল। এই টাকা-গুলি সে কি ভাবে খাটাইবে, প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিল না। তাহার সাংসারিক অবস্থা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল হওয়ায় চাষি-সমাজে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা বাহির হইল। তাহার যে সকল স্বজাতীয় চাষী, আত্মীয়প্রতিবেশী তাহাকে তাচ্ছীল্য করিত, তাহারা তাহাকে বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে দেখিয়া সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল, "আরে [illegible]

কেষ্টো মনে মনে হাসিয়া ধূমপানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিত। সে কাহাকেও চটাইত না।

কেহ কেহ কেষ্টোকে বলিল, "হাতে দু'টাকা হয়েছে কেষ্টো ভাই, 'মহাজনী' জুড়ে দাও। সুদী কারবারে দশ দিনে কেঁপে উঠ্‌বা।"

কেষ্টো মাথা নাড়িয়া বলিল, "পাজি-পুঁথি পরকে দিয়ে, দৈবিত্তি ব্যাড়ায় হাবাত হয়ে—ও কাযের কথা নয়। শেষে সুদে-আসলে সব যাক্; আর আমার পুঁজিও ভারী!"

বাঙ্গুঘোষের ভজহরি বাবুর খুব বাগানের সখ। তিনি একটি আম ও লীচুর বাগান করিয়াছিলেন। আম, লীচু ফলিতে আরম্ভ করিলে দুই এক বৎসরেই মড়িপোড়া গ্রামে এই বাগানের খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল। বৈশাখমাসের প্রথমে কেষ্টো ভজহরি বাবুকে ধরিয়া এই বাগান ফলকর বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ২ শত টাকায় সে সেই বৎসরের সমস্ত ফল কিনিয়া লইল; তাহাতে অগ্রিম ৫০৲ টাকা দিতে হইল। কথা থাকিল, জ্যৈষ্ঠমাসে ফল বিক্রয় আরম্ভ হইলে আরও ৫০৲ টাকা দিবে; আষাঢ়মাসে আম ফুরাইলে অবশিষ্ট ১ শত টাকা দিবে। ফল পাকিবার পূর্ব্বে কেষ্টো বাগানে 'টোঙ্গ' (বাগান পাহারা দেওয়ার জন্য কুটীর) বাঁধিল এবং তিন জন রাখাল নিযুক্ত করিয়া বাগান পাহারা দিতে লাগিল। সে বৎসর বৈশাখের ঝড়ে অধিক আম নষ্ট হয় নাই, লীচুও যথেষ্ট ফলিয়াছিল। কেষ্টো আম ও লীচু বিক্রয় করিয়া ২ শত টাকা লাভ করিল।

বাগান ফলকর জমা লইয়া লাভ হওয়ায় কেষ্টোর লোভ বাড়িয়া গেল। মড়িপোড়া গ্রামের মিউনিসিপালিটীর রাস্তার ধারে বিস্তর আম, কাঁঠাল ও নারিকেলগাছ আছে। প্রতি বৎসর সেই সকল গাছের ফল নীলাম হয়। কেষ্টো নীলামের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান সূর্য্য বাবু ও দারোগা চিন্তহরণ বাবুর দরবারে হাজিরা দিতে লাগিল; এই দুই দেবতার মনোরঞ্জন করিতে তাহাকে কিরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল—তাহা কেষ্টোই জানে। কিন্তু তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইল। এক দিন অপরাহ্ণে মিউনিসি-পালিটীর গাছের ফল নীলাম হইল; কেষ্টোকে নগদ টাকায় তাহা কিনিয়া লইতে হইল বটে, কিন্তু যে টাকা তাহাকে দিতে হইল, তাহার চতুর্গুণ অর্থ সে ফল বিক্রয় করিয়া [illegible]

২

অর্থাগম প্রবল হইলেও কেষ্টো তাহার উন্নতির মূল 'গুড়ের বাইন' ছাড়িল না। তখন তাহার ধনবল প্রবল। সে লোকজন রাখিয়া খেজুরগাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া গুড়ের ব্যবসা চালাইতে লাগিল। মড়িপোড়া গ্রামে তিন কেষ্টো; এ জন্য তাহার নাম হইল, 'গুড়ে কেষ্টো।' আমরাও অতঃপর তাহাকে 'গুড়ে কেষ্টো'ই বলিব।

'গুড়ে কেষ্টো' এইবার চাষ-আবাদে মনোনিবেশ করিল। তখন তাহার অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে, বাড়ীতে চারিখানি উলুখড়ের চৌরী ঘর উঠিয়াছে। সে জমীদার-কোম্পানীর নায়েব হিরিধর বিশ্বাসের নিকট দরবার করিয়া তাঁহাকে পূজায় সন্তুষ্ট করিল এবং তাঁহার নিকট এক খাদা (বোল বিঘা) জমী বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সে পূর্ব্বেই দুইখানি লাঙ্গল ও ২ জোড়া বলদ সংগ্রহ করিয়াছিল। সে দশ বিঘা জমীতে পাট বপন করিল। অবশিষ্ট জমীতে ধান ও মসিনার আবাদ করিল। পাট উঠিয়া গেলে সেই জমীতে সোঘুর বপন করিল। সে বৎসর পাটের মণ ২৫৲ টাকা। তিসিও (মসিনা) খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইল। 'গুড়ে কেষ্টো' এক বৎসরের ফসলেই লাল হইয়া গেল।

চাষ-আবাদ উপলক্ষে জমীদার-কোম্পানীর নায়েব হিরিধর বিশ্বাসের সহিত গুড়ে কেষ্টোর একটু 'পীরিত-প্রেমের' হইয়াছিল; কারণ, অবস্থার উন্নতির সঙ্গে তাহার চাল-চলনেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সে তখন ছুতা পরিত, ধোপদস্ত ধুতি, জামা ব্যবহার করিত; তাহার পুত্র হরি-বোলাকে গ্রাম্য ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়াছিল এবং তাহাদের চাষিসমাজে সে 'দশ জনের এক জন' বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল।

এক দিন সন্ধ্যার পর 'গুড়ে কেষ্টো' নায়েব হিরিধর বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। নায়েব মহাশয় তখন তাঁহার কাছারী-ঘরের ফরাসে বসিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন। তাঁহার ফরাসের এক পাশে বসিয়া একটা 'হরিকেন' লণ্ঠন সেই কক্ষের অন্ধকার দূর করিতেছিল। কেষ্টোকে দেখিয়া নায়েব মহাশয় দাঁত বাহির করিয়া বলিলেন, "এসো মণ্ডলের পো, ঐ কম্বলখান বিছিয়ে ব'সো।"

গুড়ে কেষ্টো নায়েব মহাশয় অপেক্ষা জাত্যংশে হীন [illegible] বসার ফরাসের এক প্রান্তে তাহাকে বসিতে না দিয়া, মাটীতে কম্বল বিছাইয়া বসিতে বলায় তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল; কিন্তু নায়েবের নিকট দরবারে আসিয়াছে, সুতরাং কোন প্রকাশ করিল না। অবশেষে নায়েব যখন তাঁহার গড়গড়া হইতে কলকেটা নামাইয়া দিয়া 'তামাক ইচ্ছে' করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন গুড়ে কেষ্টোর অন্তরাত্মা নায়েবের এই বে-ইজ্জতজনক ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "বাবা ধর্ম্মরাজের মানত আছে, আমি টানা-কল্কের তামুক খাইনে।"

নায়েব বলিলেন, "তবে কি মনে ক'রে আসা হয়েছে—মণ্ডলের পো! কোন দরবার-টরবার আছে না কি?"

গুড়ে কেষ্টো মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, মথুর হালদারা বল্‌ছিল, এবার বাজারের কয়লী 'ডাক্' হবে। ওটা যদি আমাকেই বিলি ক'রে দেওয়া হয়, তা হ'লে গরীব প্রেজাটা পিরতিপালন হ'তো।"

নায়েব। এক খাদা ভুঁই আবাদ করছো, দু'তিনটে বাগান ঠ্যাকাচ্ছো, গুড়ের ব্যবসা করছো—তাতেও পেট ভরছে না, আবার কয়লীর লোভ?

গুড়ে কেষ্টো। আজ্ঞে, অপুষ্যি অনেকগুলি, ডানে আন্‌তে বাঁয়ে কুলোয় না। ঐ কয়লী থেকে যদি দু'পয়সা আসে, এই ভরসায় আপনার কাছে আসা। চিচরণ ধ'রে প'ড়ে আছি।

নায়েব হিরিধর কথায় ভুলিবার পাত্র ছিলেন না; কিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি হুঙ্কার দিলেন, "মথরো, তামাক দিয়ে যা।" মথুর সাহেব-কোম্পানীর হালদারা এবং নায়েব মহাশয়ের খানসামা; সে নায়েবের হাটবাজার করিত, গরু দুহিত, ছেলে ধরিত,—তাহার অনেক কায।

মথুর গড়গড়ায় কলকে বসাইয়া গুড়ে কেষ্টোর মুখের দিকে চাহিল, দু'জনের চোখে চোখে ইসারা হইয়া গেল, নায়েব মহাশয় তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি হাসিয়া কেষ্টোকে বলিলেন, "হিরিধরের চিচরণ ধ'রে ত অনেক মিঞাই প'ড়ে আছে, তুমি ত একা নও, কেষ্টো!—আমাদের বাজারে মাসে না হোক এক গাড়ী [illegible]

জাতি নিষ্পেষণ

তাদের কাছে জমীদারের খাজনা আর কয়ালী আদায় করবার জন্ত সায়েব-সরকার এক জন লোক রেখেছেন; বাজারে আলু, পটল, শাক-সব্জী, মাছ, কি ফল-ফুলারী যারা বিক্রী করে—তাদের কাছে দৈনিক খাজনাও সে আদায় করে; কিন্তু নোতুন ম্যানেজার সায়েব আমাকে হুকুম দিয়েছেন—এ সব আদায়-পত্তর আর খাসে রাখা হবে না। ওটা নীলেম ক'রে দেওয়া হবে। যে নীলেম ডাকবে, চার কিস্তীতে সে খাজনা পরিশোধ করবে। আমরা লাভ-লোকসানের দায়িক নই!—তা তুমি নীলেম ডাকতে পার। যে সব চেয়ে বেশী টাকা ডাকবে, কয়ালী তাকেই দেওয়া হবে। এ ত আর আমার বাবার ধনের কথা নয়। সায়েব কোম্পানী, চুটিয়ে পয়সা আদায় করতে জানে।"

গুড়ে কেষ্টো ভয়ে ভয়ে বলিল, "ডাক কত টাকা পর্য্যন্ত উঠতে পারে?"

নায়েব। তা কি বলা যায়, মণ্ডলের পো! যদি কিছুও না হয়, তবু এই বাজারটায় বার অঙ্কে ছ'শো টাকা কয়ালী আদায় হয়। তাঁতিপাড়ার 'ঠনা কেষ্টো' বল্‌ছিল—নীলেম ডেকে আর কি হবে, আশিখানা তিনশো টাকায় ওটা তাকে বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হোক। তা দেখি আরও দুই চার দিন। চোতবাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ত সময় আছে। যে বেশী টাকায় বন্দোবস্ত করতে চাইবে—তাকেই দেওয়া হবে। চার'শো রূপেয়া—এক, চার'শো রূপেয়া—দো' ব'লে হাঁকাহাঁকি ক'রে আর ফল কি?"

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, কয়ালীটা এক বৎসরের জন্ত গুড়ে কেষ্টোকেই ইজারা দেওয়া হইবে। সে চার কিস্তীতে জমীদারকে দুই শত টাকা খাজনা দিবে। এতদ্ভিন্ন নায়েব মশায়কে এক শত টাকা 'নজরানা' দিতে হইবে। দলীল রেজেষ্ট্রীর দিন কেষ্টো জমীদার সরকারে পঞ্চাশ টাকা জমা দিবে, নায়েবও পঞ্চাশ টাকা আগাম লইবেন।

গুড়ে কেষ্টো কার্য্যোদ্ধার করিয়া প্রস্থান করিবার সময় মথুর তাহার অনুসরণ করিল। পথে আসিয়া সে বলিল, "খুব ভাগ করলে কেষ্টো দাদা, ঐ তিন শো টাকা ত পুজোর আগেই তুলতে পারবা। তার পর সবই তোমার লাভ। চুটিয়ে কয়েলী কর, দাদা! আমার পাওনাটার কথা যেন ভুলো না।"

গুড়ে কেষ্টো বলিল, "তুমিই আমাকে এ পথ দেখিয়ে দিয়েছ। তোমাকে ত পাঁচ টাকা দেব বলিছি। লেখা-পড়াটা আগে শেষ হোক।"

৩

বাজারের কয়ালী হস্তগত হওয়ায় কেষ্টোর মান-সম্ভ্রম প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া গেল। যে সকল মাল-বোঝাই গাড়ীতে বিবিধ পণ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্ত আমদানী হয়, তাহা ওজন করিবার অধিকার—কেষ্টোরই একচেটে; কারণ, সে জমীদার-কোম্পানীর লাইসেন্স-প্রাপ্ত কয়াল। সে সেই সকল গাড়োয়ানের নিকট 'কয়ালী' (ওজন করিয়া দেওয়ার পারিশ্রমিক) ও জমীদারের খাজনা আদায় করে। মুলো, বেগুণ, শসা, কুমড়ো, শাকসব্জী, ও মৎস্যবিক্রেতাদের নিকট সে দৈনিক খাজনার পয়সা গ্রহণ করে, আবার মুঠা মুঠা তরিতরকারী, মাছ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যও তাহাদের ভালা হইতে জোর করিয়া তুলিয়া লয়। এগুলি তাহার উপরি পাওনা। দরিদ্র পণ্যবিক্রেতারা প্রতিবাদ করে, কিন্তু ফল হয় না। নায়েবের নিকট নালিশ করিলে তিনি বলেন, "গুড়ে কেষ্টো বাজার ইজারা নিয়েছে, নবলক্ষ টাকা সায়েব কোম্পানীকে দিতে হয়েছে; সে কি টাকা ঘর থেকে দিবে? তোদের না পোষায়—তোরা জমীদারের বাজারে বাবসা করতে না এলেই পারিস্।" সোজা জবাব পাইয়া তাহারা হতাশ হইয়া চলিয়া যায় এবং দূরে গিয়া নায়েবের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করে। গুড়ে কেষ্টোর প্রতি নায়েবের এইরূপ পক্ষপাতের কারণ ছিল। কেষ্টো দোকানী-পসারীদের নিকট যে সকল তরি-তরকারী শাকসাছ আদায় করিত, নায়েবকে হাতে রাখিবার জন্ত তাহার কিয়দংশ নায়েবের বাসায় পাঠাইত।

বাজারের কয়ালী হস্তগত করিয়া গুড়ে কেষ্টোর লোলুপ দৃষ্টি পারঘাটার উপর পড়িল। মড়িপোড়া গ্রামের প্রান্ত-বাহিনী বাজনা নদীতে একটি খেয়াঘাট আছে। নদীর অন্ত পারবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীরা সেই খেয়াঘাটের নৌকায় পার হইয়া মড়িপোড়ায় আসে। হাট, বাজার, স্কুল, পাঠশালা, আফিস, আদালত, সবলই এই মড়িপোড়া গ্রামে অবস্থিত; এই গ্রাম জিলার একটি মহকুমা। এই জন্ত নদীপারবর্ত্তী বহু গ্রামের লোকজনকে নানা কার্য্যোপলক্ষে

এই খেয়া-ঘাটে আসিয়া নদী পার হইতে হয়। এই খেয়াঘাট স্থানীয় লোকাল বোর্ডের সম্পত্তি। প্রতি বৎসর মাঘমাসে এই ঘাট নীলাম হয়। ঘাট ইজারা লইতে পারিলে যথেষ্ট লাভ হইবে বুঝিয়া শুড়ে কেষ্টো জেদাজেদি করিয়া লোকাল বোর্ডের নিকট হইতে ঘাট ডাকিয়া লইল। বাজারের ইজারাদার পারঘাটারও ইজারাদার হইল।

শুড়ে কেষ্টো ক্রমে আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ ও সামান্য কথা, অশ্বত্থগাছ হইল। সে চালাঘর ভাঙ্গিয়া পাকা ইমারত আরম্ভ করিল। সংসারে এখন তাহার বিস্তর আত্মীয়-স্বজন। প্রতিদিন তাহার বাড়ীতে দু'বেলা ত্রিশখানা পাতা পড়ে। শুড়ে কেষ্টো অর্থে সামর্থ্যে তাহাদের চাষি-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সমাজের 'মোড়ল' হইয়া বসিল। তাহার জনবল ও অর্থবল দেখিয়া সমাজের বুড়া বুড়া মণ্ডলরাও তাহাকে সমাজের 'চাই' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

এত দিন পরে শুড়ে কেষ্টো সমাজ-সংস্কারে মনোনিবেশ করিল। এক দিন সায়ংকালে সে সমাজের সকলকে তাহার নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় ডাকিয়া আনিয়া এক "বৈঠক" বসাইল। এই বৈঠকে সে প্রস্তাব করিল—তাহার স্বজাতীয় কোন লোক গরুর গাড়ীতে মানুষ বহিতে পারিবে না; যাহারা খানসামাগিরী করে—তাহাদিগকে চাকরীতে ইস্তফা দিতে হইবে, এবং যে সকল স্বামিপুত্রহীনা অনাথা ভদ্রলোকের বাসায় বা বাড়ীতে চাকরাণীগিরী করে, তাহাদিগকে সাত দিনের মধ্যে চাকরী ছাড়িয়া দিতে হইবে। যাহারা সমাজের (অর্থাৎ তাহার) এই হুকুম না মানিবে, তাহাদিগকে 'একঘরে' করিয়া রাখা হইবে। যাহাদের এই সকল হীনকার্য্যে সমাজের মাথা হেঁট হইতেছে—তাহাদিগকে সমাজচ্যুত না করিলে সমাজের ইজ্জৎ রক্ষা হইবে না।

শুড়ে কেষ্টোর সমাজের অনেক লোক গোয়ারী গাড়ী বহিত, অনেকে খানসামাগিরী করিত এবং বড়িপোতা গ্রামের অনেক ভদ্রলোকের পরিচারিকা তাহার আত্মীয়া বা কুটুম্বিনী।

শুড়ে কেষ্টোর প্রস্তাব শুনিয়া বৃদ্ধ রামবাহু দাস সেই বৈঠকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বা নক্কীর ক্ষেপার আজ [illegible] 'আক্কেল' [illegible] কেষ্টো। [illegible] বাবা

ত্রিপু মণ্ডল 'ছেরদ্ধা কাল' হারাধন চাটুর্য্যের খানসামাগিরী ক'রে তোমাকে 'পিরতিপালন' করেলো। তেনার স্বগ্গ' হ'লে তোমার মা একাল-সেকাল বাড়ুয্যে বাড়ীতে দাসীগিরী করলে; আজ টাকার মুখ দেখে সমাজের এক্কোত্তের দিকে তোমার নজর পড়েছে! তা গাড়ীতে মানুষ না বইলে, খানসামাগিরী কি বাঁদীগিরী না করলে, যাদের প্যাটের ভাত জোটে না, কি ক'রে তাদের সংসার চল্‌বে—তার হদিস্ কুল্‌তে পার?"

কেষ্টো বলিল, "মানুষ বওয়া ছলে বেহারার কায। গাড়ীতে মাল বও, ইট বও, চুণ-সুরকী, 'খন্ধ কুটো' বও, তাতে ইজ্জৎ নষ্ট হবে না। খানসামাগিরী ছেড়ে ব্যবসা-ট্যাবসা কর; মুগ-কলাই, ধান-চালের আড়ত মারো, গাছ কিনে আলানী কাঠ বিক্রী কর। রোজগারের ভাবনা কি? খানসামাগিরী দাসীগিরী বড় নীচ কায।—ওতে সমাজের ইজ্জৎ মারা যায়।"

বটদাস গাড়োয়ানী করে, সে গোয়ারী গাড়ী বহে। সে উঠিয়া বলিল, "মাল চেয়ে কি মানুষ অধম যে, মাল বইলে জাত যাবে না, মানুষ বইতেই যাতো দোষ? এ্যাতো মাল কুলানে পাব? আর আমার মামাতো ভাই হীরু, মজুমদারবাড়ী খানসামাগিরী করে; সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে কি খাবে? বেবসা করতে বল্‌চো যে, সে পুঁজি-পাটা পাবে কুত্তায়? সব্বাইয়ের অদেষ্ট ত আর তোমার মতোন নয়। চাকরী ছেড়ে তারা আবড়া চুষ্‌বে? যা নয় তাই! প্যাটে ভাত নেই, ইজ্জৎ নিয়ে ধুয়ে খাব!"

ভূষণ দাস ধরাণীগিরী করিত, সে দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া এখন আর কায়কর্ম্ম করিতে পারে না। সংসারে তাহার দুইটি বিধবা কন্যা। একটির নাম কালী, অন্যটির নাম তারা। কালী স্থানীয় মোক্তার পদ্মলোচন বাবুর বাসায় ও তারা সবডিভিজনাল অফিসার মিঃ সেনের বাসায় পরিচারিকার কায করে। ভূষণ দাসও এই বৈঠকে উপস্থিত হইয়াছিল। সে গলায় বস্ত্র দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, কাতর স্বরে বলিল, "আমার মেয়ে দুটো চাকরী ক'রে দু'পয়সা আনে, তাই কোন রকমে আমি দুটো অপ্যান্ন নিয়ে খেয়ে প'রে বাঁচ্‌ছি। ওরা চাকরী ছেড়ে দিলে আমাকে না খেয়ে মরতে হবে। দশঠাকুর আমার আবস্থা [illegible]"

শুড়ে কেষ্টো বলিল, "তোমার এক মেয়ে, সে মোক্তারের বাড়ী চাকরী করে—সে ভাতে কুমোর ; আর এক মেয়ে, সে হাকিমের চাকরাণী—সে ভাতে সোনার বেণে। যারা কুমোর আর সোনার বেণের এঁটো সাফ্ করে, তারা সমাজে চলতে পারে না। তারা চাকরী ছেড়ে দিয়ে গরু পিথুক, ধান ভেনে চাল তৈরেরী করুক, মুড়ি ভেজে বিক্রী করুক ; স্বাধীন ব্যবসা করতে কি আমি বারণ করছি ?"

ভুবণ বলিল, "ও সব করতে ত পুঁজি চাই ; আর ও সব বেবসা কি সবাই করতে পারে ? তুমি যাই বল আর যাই কর, আমি আমার মেয়েদের চাকরী ছাড়তে বলতে পারব না।"

নানা তর্ক-বিতর্কের পর বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল ; শুড়ে কেষ্টোর ইজ্জৎ-রক্ষার প্রস্তাবে অধিকাংশেরই অমত হইল। তাহার জিদ বজায় রহিল না। বৈঠকে তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল—দেখিয়া কেষ্টো ক্রোধে ক্ষোভে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং যাহারা তাহার সাধুসঙ্কল্প ব্যর্থ করিল, তাহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

৪

সুযোগের অভাব হইল না। এই ঘটনার তিন মাস পরে শুড়ে কেষ্টোর মা আশী বৎসর বয়সে রক্ত-আমাশয় রোগে প্রাণত্যাগ করিল। শুড়ে কেষ্টোর যথেষ্ট লোকবল ছিল। আঠার জন বাছা, বাছা জোয়ান তাহার আহ্বানে তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। তাহারা কেষ্টোর মাতার মৃত-দেহ খাটুলীতে তুলিয়া কাঁধে বহিয়া পনের ক্রোশ দূরবর্ত্তী নবদ্বীপে চলিল। কেষ্টো তাহার মাতার মৃতদেহ গরুর গাড়ীতেও গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে পারিত ; কিন্তু বর্ষাকালে দুর্গম পথ দিয়া গরুর গাড়ী ছই দিনের পূর্ব্বে নবদ্বীপে পৌঁছিতে পারিত না। এই জন্য কেষ্টোর মা 'জাত বেহা-রার' কাঁধে চড়িয়া গঙ্গালাভ করিতে চলিল। কেষ্টোর মাতৃ-ভক্তি দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এইভাবে 'মায়ের গঙ্গা দিতে' অনেক বড় লোকও পারে না !

কেষ্টো যথাসময়ে কাছা পরিয়া নবদ্বীপ হইতে বাড়ী ফিরিল এবং মহা উৎসাহে শ্রাদ্ধের আয়োজনে রত হইল। তাহার স্বজাতীয়রা মনে করিয়াছিল, কেষ্টো 'কাঁচা কলার' (ঠিড়া-দৈ-) দিবে। কেহ কেহ এ সম্বন্ধে কেষ্টোর মত জিজ্ঞাসা করিল। কেষ্টো বলিল, "মা ত একবারের বেশী ৪'বার মরতে আসবে না। আমি 'ব্রেযোদ্ধুগ্‌ণ্ড' আর ষোড়শ এ সকলের কিছুই বাদ দেব না। আর আমি 'কাঁচা কলার' দিলে কি আবার ইজ্জৎ বজায় থাকবে ? দশ জন গায়ে থুথো দেবে না ?"

কেষ্টোর কথা শুনিয়া চাষিসমাজ আনন্দে উৎফুল্ল হইল। পাকা কলারের (মুচি) পক্ষে অনেকেরই রসনায় লালার সঞ্চার হইল।

শ্রাদ্ধের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কেষ্টোর বাড়ীতে আবার এক সামাজিক বৈঠক বসিল। সেই বৈঠকে কেষ্টো তাহার পূর্ব্ব-প্রস্তাবের উত্থাপন করিল। সে বলিল, "মায়ের শ্রেয়াদ্ধে আমি পাকা কলার দেব বটে, কিন্তু যারা সোয়ারীর গাড়ী বওয়া না ছাড়বে, আর চাকরাণীগিরী বাহাল রাখবে, তাদের একঘরে হয়ে থাকতেই হবে। আমি তাদের মেহনত করবো না।"

দশঠাকুর এবার কেষ্টোর 'পেরেস্তাব' অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, পাকা কলারে 'মেহনতো' বাদ পড়িবে, ইহা অসহ্য ! যাহারা গাড়ীতে মানুষ বহিত, তাহারা দশঠাকুরের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিল, আর তাহারা 'সোয়ারী' বহিবে না। এমন কি, বুড়া ভুবণ দাসকেও প্রতিজ্ঞা করিতে হইল—তাহার দুই কন্যা কালী ও তারা চাকরী ছাড়িয়া দিবে।

কেষ্টো বলিল, "এ খুব ভাল কথা। এ রকম না করলে কি এজ্জৎ বজায় থাকে। কালী আর তারা যেন কালই চাকরী ছেড়ে আবার বাড়ীতে ছেরাদ্দর যোগাড়-যন্তোর করতে আসে। এখনও কত কায বাকী। গরু সেবা, মুড়ির চাল তৈরেরি,কাঙ্গালী বিদেয়ের জন্যে চিঁড়ে কোটা—এ সব কি শুধু বাড়ীর 'লোক' দিয়ে হয়ে ওঠে ? কালী ও তারাকে কালই আমার বাড়ী পেঠিয়ে দিও, তাউই !"

ভুবণ দাস শুড়ে কেষ্টোর মামাতো ভাইয়ের শ্বশুর। যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সে দশঠাকুরের সম্মুখে ভুবণ দাসের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

পরদিন সকালে কালী ও তারা মনিব-বাড়ী গিয়া বলিল —তাহারা আর চাকরী করিবে না। চাকরী করিলে তাহা-দিগকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। শুড়ে কেষ্টোর বাড়শ্রাদ্ধে তাহাদিগকে একঘরে করা হইবে। শুড়ে কেষ্টো সমাজের মোড়ল। তাহার আদেশে তাহাদের সমাজের কোন স্ত্রীলোক আর দাসীগিরী করিবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেন তাঁহার পরিচারিকার ব্যবহারে

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন ; তিনি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন,ওড়ে কেষ্টো তাঁহার পরিচারিকার পিতাকে সস্তাই এক-ঘরে করিবার ভয় দেখাইয়াছে : কারণ, তাহার কন্যা সোনার-বেণের এঁটো সাফ্ করে! মিঃ সেন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও নূতন চাকরাণী সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

এক দিন পরে মড়িপোড়ার ফৌজদারী আদালতের প্রবীণ মোক্তার পদ্মলোচন পাল সবডিভিজনাল অফিসার মিঃ সেনের বাসায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং কাতরভাবে বলিলেন,"হুজুর, বাজারের কয়াল ওড়ে কেষ্টোর দৌরাত্ম্যে এ গ্রামে বাস করা কঠিন হয়ে উঠল! আমার বাসায় এক ঝি ছিল—তারই স্বজাতি। ঝিটাকে সে ভয় দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাকে বলেছে—'কুমোরের বাসন মাজিস্,তোর বাবাকে 'একঘরে' করব।'—এক-ঘরে হওয়ার ভয়ে সে চাকরী ছেড়ে পালিয়েছে। ঝি মিলোতে পারছিনে হুজুর! নাকালের একশেষ হচ্ছে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া বলিলেন, "ও দুঃখের কথা আর বলেন কেন পদ্মলোচন বাবু! আমার বাসায় এক ঝি ছিল, তার নাম তারা, সে বোধ হয়, আপনার বাসার ঝি'র বোন্। আমার ঝিও চাকরী ছেড়ে চ'লে গিয়েছে ; সেই ওড়েটাই না কি তাকে ভয় দেখিয়েছে—'সোনার বেণের এঁটো যদি সাফ করিস্—তোকে একঘরে করব।'—সে বেচারা নিতান্ত অনিচ্ছায় চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছে। আমার বাসায় বেশ সুখেই ছিল, চাকরী ছাড়বার ইচ্ছা ছিল না ; ভয় দেখিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কণ্ঠী মারলে! অনাথা বিধবা সে, বাপ অন্ধ, চাকরী না করলে কি তার এক দিনও চলবে? আমি অনেক চেষ্টাতেও দ্বিতীয় ঝি সংগ্রহ করিতে পারি নি। যহা মুস্কিলেই পড়া গেছে।"

পদ্মলোচন মোক্তার করযোড়ে বলিলেন, "হুজুর, এর একটা প্রতিবিধান করুন ; বাজারের কয়ালী আর পার-ঘাটার ইজেরদারী পেয়ে ওড়ে কেষ্টোর ভারী তেজ হয়েছে। মানুষকে মানুষ ব'লে গ্রাহ্য করছে না! হুজুরেরই কি তাড়িয়ে নিলে, আমরা ত সামান্য লোক!"

মিঃ সেন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "শুনেছি, ওড়ে কেষ্টো সমাজের মোড়ল সেজে ইজ্জৎ রক্ষার জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার মা না কি মারা গেছে ; শ্রাদ্ধ করবে, জানেন কি?"

পদ্মলোচন বাবু বলিলেন, "আমার সেই ঝির কাছে শুনেছি, কাল তার অশৌচান্ত হবে, পরশু শ্রাদ্ধ।"

মিঃ সেন বলিলেন, "পরশু শ্রাদ্ধ? আচ্ছা, আপনি বাসায় যান। তার আর পার মাবের শ্রাদ্ধ একদিনে হ'তে পারে কি না,শাস্ত্র খোঁটে তার একটা ব্যবস্থা দেখ্‌তে হবে।"

পদ্মলোচন বাবু আশ্বস্ত চিত্তে বাসায় ফিরিলেন।

৫

পরদিন ওড়ে কেষ্টোর অশৌচান্ত। সে পরিজনবর্গ সঙ্গে লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল। সেখানে স্নানান্তে পিণ্ডদান করিয়া মাথা মুড়াইল, তাহার পর এক মাসের ব্যবহৃত কাচা নাপিতকে দান করিয়া নূতন কাচা পরিয়া বাড়ী ফিরিল। বাড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় দুই জন পুলিস কন্‌ষ্টেবল সহ থানার ছোট দারগা গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট-বলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া কোর্টে চলিলেন। এই আকস্মিক বিপদে তাহার বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কুটুম্ব-কুটুম্বিনী, আত্মীয়-স্বজনে তাহার বাড়ী পূর্ণ, চতুর্দ্দিকে কর্ম্ম-কোলাহল, এ সময় এ কি বিভ্রাট!

তখন বেলা ১২টা, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেন তাঁহার খাস-কামরায় বসিয়া ছিলেন। কাচা গলায় ন্যাড়া মাথায় ওড়ে কেষ্টো তাঁহার সম্মুখে নীত হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "গবর্ণমেণ্টের আইন কারও মা-বাপের শ্রাদ্ধের তোয়াক্কা রাখে না, অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হয়। তোমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভয়ানক অভিযোগ আছে।"

ওড়ে কেষ্টো চোখের জল মুছিয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর, আপনার চাকরাণী নিজের ইচ্ছেয় চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের মেয়ে-ছেলেরা পরের বাসায় চাকরাণীগিরী করলে তাদের ইজ্জৎ রক্ষে হয় না। নিজের ইজ্জৎ রক্ষের জন্যে সে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, আমার কি অপরাধ হুজুর?"

হাকিম বলিলেন, "আমি তোমার সে অপরাধের বিচার করতে বসি নি। আমার চাকরাণীর চাকরী ছাড়িয়ে নিয়ে তুমি চিরদিন তার আর তার বুড়ো বাপের প্রতিপালনভার নেবে কি না, তাও আমার জান্‌বার দরকার নেই। তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হয়েছে, তা সপ্রমাণ হ'লে আমি তোমাকে একটি বছরের জন্যে শ্রীঘরে পাঠাব। জেলখানায় ব'সে তোমার মা'র শ্রাদ্ধ করবে।—এই ঐসবাইল! ফরিয়াদীদের ডাক।"

ইস্‌মাইল ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাসী। সে অবিলম্বে পাল্কী-তলা হইতে দুইটি স্ত্রীলোককে লইয়া আসিল; উভয়েই মুসলমান-রমণী। এক জনের নাম হারাণী, অন্যটির নাম মতি বেওয়া।

হারাণী বলিল, "হুজুর, আমি তিন দিন আগে আটঘরা থেকে আউলের চাল বিচ্‌তে এই গাঁয়ে এসেলাম। আমাকে কাজলা পার হয়ে আসতি হয়; তা গাঙে (নদীতে) এক হাঁটুর বেশী পানি নেই, আমি চালের বস্তা মাতায় নিয়ে হ্যাঁটেই 'গাঙ' পার হলেলাম। এই ইজেরদার মিন্‌সে পাটুনীর ঘরে ব'সে তামুক খাচ্ছিল। আমাকে বল্লে, 'গাঙ পার হলি—পারানী দিয়ে যা।' আমি কইলাম, 'পানি দিয়ে হ্যাঁটে পার হয়েছি, পারানী চাইছ কোন্ আক্কেলে?'—শুনে মিন্‌সে কেঁদো বাঘের মত গজরিয়ে আমাকে তাড়া ক'রে এলো, বল্লে, 'এক জগ্‌গর টাকা দিয়ে ঘাট নিয়েছি, তুই জল দিয়েই পার হ, আর আশমান দিয়েই পার হ, আমার পারানী না দিয়ে যাবি কুত্তার?'—আমি তার নৈকোয় পার হই নি, পারানী দিমু ক্যান্?—তা মিন্‌সে ছাড়লে না, আমার মাথা থেকে ছালাটা টেনে নামিয়ে ন্যাতের স্তারের এক পোয়া চাল কেড়ে নিলে। আমি গরীব মেয়েমানুষ, তাতার পুত কেউ নেই, ভাড়া ভেনে খাই। আমার ওপর এ কি জুলুম হুজুর!"

হাকিম বলিলেন, "তোর কোন সাক্ষী আছে?"

হারাণী বলিল, "আমাদের গাঁয়ের নিতাই ঘোষ বাবুদের বাড়া দুধের জুগান দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, সে দেখেছে, আরও অনেকে তখন পারঘাটায় ছেলো—তাদের চিনিনে হুজুর!"

হাকিম বলিলেন, "নিতাই ঘোষ তাদের চিনতে পারে। দারগা বাবু, নিতাই ঘোষকে তলব দেবেন।—মতি বেওয়া, তোমার কি নালিশ?"

মতি করযোড়ে বলিল, "আমি হুজুর চেনুকীগিরি করি। দু' টাকার ধান কিনে চাল করি, তা এই গাঁয়ের মদ্দি বিচে যাই। মুন্সীপাড়ায় আমার ঘর। এই করাল মিন্‌সে ভারী নচ্ছার, বাজারে চাল্ বিচ্‌তে গেলে খাজনা নেবে, আবার এক আঁচল চাল 'তোলা' নেবে। দু' টাকার চাল বিচে যদি ঐ মিন্‌সেকে দু' গণ্ডা পয়সার মাল দিতে হয়—তবে আমার থাকে কি? ঐ ভয়ে আমি বাজারে না গিয়ে গাঁয়ের মদ্দি চাল বিচে যাই। আজ দু'দিন হ'ল, এই করাল মিন্‌সে পথে আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে বুঝে, 'লুকিয়ে লুকিয়ে চাল বিক্রি ক'রে পালাচ্ছিস, আমার কয়ালী দিয়ে যা। নিত্যি ফাঁকি দিস্। আজ আর ছাড়ছি নে।'—আমি বল্‌লাম, 'আমি গাঁয়ের মদ্দি চাল বিচে যাই, তোমাকে কয়ালী দেব ক্যান্? তুমি কি আমার চাল বিচে দিয়েছ? না, আমি বাজারে গিয়ে তোমার চালায় বসেছি যে কয়ালী নিবা?'—আমার কথা শুনে মিন্‌সে আমাকে তেড়ে মারতে এলো, বল্‌লে—'এক জগ্‌গর টাকা দিয়ে কয়ালী নিয়েছি, জমীদারের মাটীতে চাল বিক্রী করবি—আমাকে কয়ালী দিবি নে? এ গাঁয়ে চাল নিয়ে ঢুকলেই কয়ালী আদায় করবো।' আমি তাকে পৈসা দিলাম না। তাই ঐ শত্তেকখোয়ারীর বেটা আমার 'ন্যাতের স্তার' (সেতের সের) কেড়ে নিলে। বলে, '২ পয়সা কয়ালী দিয়ে স্তার ফিরে নিয়ে যাবি।' কি করি? ২ পৈসার জন্যি ত ২ গণ্ডা পয়সার স্তারটা ছাড়তে পারি নে। ২ পয়সা দিতি হ'ল।"

হাকিম বলিলেন, "তোর সাক্ষী কে?"

মতি বেওয়া বলিল, "ডাকঘরের সাম্‌নে ও আমার স্তার কেড়ে নিয়েলো। ডাক-বাবুরা সুদ্ধাই আমার সাক্ষী।"

হাকিম গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "Cheating, Extortion। দারোগা বাবু, আপনি পোষ্ট আফিসে সন্ধান নেবেন ত, কে কে এ ব্যাপারের সাক্ষী আছে। আমি কালই এ মামলা করব। আদালী হাজতে থাকবে।"

এবার গুড়ে বেল্লো হাউ হাউ শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। হাকিমের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হুজুর, এ রকম কর্ম্ম আর কখন হবে না। এবারকার মত আমাকে মাপ করুন। নৈলে আমার জাত যায়।"

হাকিম পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "আগুনে হাত দিলেই হাত পোড়ে, অপরাধ করলেই শাস্তি নিতে হয়। অপরাধ করেছ, উচিত শাস্তি পাবে; মায়ের শ্রাদ্ধ পরে ক'র, এখন হাজতে পচ। জেলখানায় দিনকত ঘানি টান্‌লেই তোমার ইজ্জৎ বেড়ে যাবে। রাস্কেল, তুমি এ জন্মে মুদ্দুক পেয়েছ? যা খুসী, তাই করবে?"

গুড়ে বেল্লো জামিন দিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিল; কিন্তু সে হাকিমের কি কাড়িয়া লইয়াছে শুনিয়া কোন মোক্তার তাহার জামিন হইতে সম্মত হইলেন না; বিশেষতঃ সে সামাজিক ইজ্জতের দোহাই দিয়া যেরূপ অশান্তি-সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কেহই সমর্থনযোগ্য মনে করিলেন

না। অবশেষে মোক্তার পদ্মলোচন বাবুই আসামীর পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহার উদ্ধারে অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, "আসামী যদি ফরিয়াদীদের ক্ষতিপূরণ করে এবং হজুরের সম্মুখে নাকে খত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে—এ রকম কায আর কখন করবে না এবং আজই আমাদের চাকরাণী দুটোকে কাযে পাঠিয়ে দেবে,—তা হ'লে হজুর, এক বৎসরের জন্য আসামীকে জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ ক'রে ছেড়ে দিলে বোধ হয় আইনের মর্য্যাদা রক্ষা হ'তে পারে; তবে তাতে আসামীর ইজ্জৎ রক্ষা হবে কি না, তা এ অধীনের অজ্ঞাত।"

বলা বাহুল্য, গুড়ে কেষ্টো হাকিমের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া নাকে খৎ দিল ও অঙ্গীকার করিল, এরূপ অপকর্ম্ম আর কখন করিবে না। জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ হইয়া সে ম্লান মুখে বাড়ী ফিরিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও মোক্তার স্ব স্ব বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন—কালী ও তারা রান্নীকৃত উচ্ছিষ্ট বাসন পরিষ্কার করিতেছে। গুড়ে কেষ্টোর মাতৃশ্রাদ্ধের লুচির ফলারে ভূষণ দাসকে একঘরে করিবার প্রস্তাব অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ধামা-চাপা রহিল।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

SHIVA.

Thou pure light
of my head
Thousandfold
flame.

CHRIST.

Thou true light
of my heart
Thousandfold
love.

SHAKTI.

Thou warm light
of my life
Thousandfold
blossom.

DR. HANS KOESTER.
(GERMAN CONSUL)

শিব

নির্ম্মল আলোক ত্বংহি
মম শিরে।
প্রদীপ্ত সহস্র শিখা
জ্যোতি-চিরে॥

খৃষ্ট

সত্যের আলোক তুমি
মম হৃদি-বাসে।
সহস্র ধারায় প্রেম
ঢল ঢল ভাসে॥

শক্তি

জীবনের জ্যোতিস্নাত
তুমি তেজোময়ী।
কলিকা সহস্র দল-
জ্বলিত-বিজয়ী॥

শ্রীজগদানন্দ বসু অনূদিত।

খাদ্য-প্রাণ (Vitamins)

বর্ত্তমান সময়ে খাদ্যের পুষ্টিগুণ সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অনুবিস্তর গবেষণা চলিতেছে। পূর্ব্বে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা ছিল যে, জীবের দেহপুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য খাদ্যের মধ্যে ছানা-জাতীয় (Proteins), চর্ব্বিজাতীয় (Fat), শর্করা বা শালি-জাতীয় (Carbo hydrates), লবণ-জাতীয় (Salts) এবং জল উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলেই যথেষ্ট হইত। এক্ষণে ঐ প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীবদেহের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন জাতীয় উপাদান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধাবস্থায় (Chemically pure protein, fat and carbo hydrates) খাইতে দিলে প্রাণিগণের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন হয় না। কিছুদিন ঐরূপ বিশুদ্ধ খাদ্যের উপর নির্ভর করিলে তাহাদের শরীরের বৃদ্ধি স্থগিত হয়, তাহারা ওজনে ক্রমশঃ কমিয়া যায় এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিবিধ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু ঐ সকল খাদ্যের উপাদানসমূহ তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ করিলে এরূপ বিভ্রাট ঘটে না। পুনশ্চ ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কতিপয় খাদ্যদ্রব্যকে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিলে [যেমন সহজ উপায়ে উৎপন্ন চাউলের পরিবর্ত্তে কলে ছাঁটা চাউল (Milled or polished rice), আস্ত গম পিষিয়া মোটা আটার পরিবর্ত্তে ধবধবে সাদা কলের ময়দা White flour ইত্যাদি] কতিপয় উৎকট রোগ (যেমন Beriberi) আবির্ভূত হয় এবং প্রাণিগণ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বভাবজাত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে উপরিউক্ত বিভিন্নজাতীয় উপাদান ব্যতীত জীবনরক্ষোপযোগী এমন কোন বিশেষ দ্রব্য থাকে, যাহার অভাবে অন্য সকল জাতীয় উপাদান যথোচিত পরিমাণে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলেও দেহপুষ্টি ও শরীররক্ষা হয় না। শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই অত্যাবশ্যক দেহপুষ্টিসহায়ক পদার্থকে Vitamin নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা আমাদের যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যের প্রাণস্বরূপ, এ জন্য আমরা ভাষায় এই পদার্থকে খাদ্য-প্রাণ বলিব।

বহুদিন হইতে এ বিষয়ে শারীরতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত এবং চিকিৎসকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেও ১৪।২০ বৎসর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক কোনরূপ গবেষণার সূত্রপাত হয় নাই। টাটকা ফল-মূল ও তরি-তরকারির অভাবে মনুষ্য ও ইতর জীবগণের মধ্যে স্কার্ভি (Scurvy) নামক এক প্রকার রক্তদুষ্ট রোগ উপস্থিত হইয়া অকালমৃত্যু সংঘটিত হয়, ইহা অনেক দিন হইতে চিকিৎসকদিগের জানা ছিল। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ব্যাক্‌ষ্ট্রম্ (Backstrom) এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, অত্যন্ত শীত, সমুদ্রবায়ু বা লবণাক্ত মাংসের ব্যবহার প্রভৃতি কোনটাই স্কার্ভি রোগের কারণ নহে। টাটকা তরি-তরকারি, ফল ও মূলের অভাবেই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সদ্যঃসংগৃহীত উদ্ভিজ্জ খাদ্যই এই রোগের মহৌষধ।

বিখ্যাত ভাস্কোডি গামা (Vasco de Gama) জাহাজে ১৬০ জন নাবিক লইয়া কেপ্ অফ্ গুড হোপ্ পরিবেষ্টন করিয়া যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই দীর্ঘদিনব্যাপী জলযাত্রাকালীন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে টাটকা তরি-তরকারির অভাব হওয়াতে জাহাজের ১ শত জন নাবিক স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লণ্ডন নগরে স্কার্ভি রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। উদ্যানজাত ও ক্ষেত্রজাত ফলমূল ও তরি-তরকারির ব্যবহারে ঐ রোগ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

স্কার্ভি রোগ বহুদিন পর্য্যন্ত নাবিক ও সৈন্যগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। যখন বাষ্পীয় পোতের আবিষ্কার হয় নাই, তখন এক একটি সমুদ্রযাত্রা বহুদিন ব্যাপিয়া চলিত এবং জাহাজের মধ্যে টাট্‌কা তরি-তরকারির অভাবে নাবিকগণ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যুদ্ধকালেও সৈন্যদিগের মধ্যে যখনই টাট্‌কা উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইত, তখনই তাহাদিগের মধ্যে এই রোগ বিস্তৃতভাবে পরিব্যাপ্ত হইতে দেখা যাইত। বিশেষতঃ

প্রবল শত্রু কর্তৃক কোন নগর বহুদিন অবরুদ্ধ হইলে, টাট্‌কা ফল-মূল ও তরি-তরকারীর অভাবে নগরবাসীদিগের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে Dr. James Lind লিখিয়াছিলেন যে, সৈন্যগণের মধ্যে যুদ্ধে যাহারা নিহত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক লোক স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তিনিও বলিয়া গিয়াছেন যে, খাদ্যের মধ্যে টাট্‌কা ফলমূল শাক-সব্জীর অভাব হইলেই এই রোগ উপস্থিত হয়।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কুক্ ১২ জন স্কার্ভি-রোগাক্রান্ত নাবিকের উপর খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা করেন। তিনি কমলালেবু এবং টক্ লেবুর রস ব্যবহার করাইয়া এই সকল রোগীকে অল্পদিনের মধ্যেই রোগমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি রয়াল-সোসাইটী (Royal Society) হইতে Copley medal পুরস্কার প্রাপ্ত হন। লেবুর রস আজি পর্য্যন্ত স্কার্ভি রোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আইন অনুসারে এক্ষণে প্রত্যেক জাহাজে যথোচিত পরিমাণ লেবুরস রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিগত মহাসমরে মেসোপটেমিয়া প্রদেশে কুট্ (Kut) সহর যখন তুর্কগণ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, তখন অবরুদ্ধ ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে ভাইটামিন্-সংযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের অভাবে বেরিবেরি ও স্কার্ভি রোগ প্রবলভাবে প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা গিয়াছিল। ইষ্ট্ (Yeast) নামক উৎসেচক পদার্থের (Ferment) কাথ এবং অঙ্কুরিত শস্যাদি ব্যবহার করিয়া সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। এই দুই পদার্থের মধ্যে কয়েক জাতীয় ভাইটামিন্ প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে।

নিম্নশ্রেণীর জীবগণের উপর বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যগ্রহণের ফল বহুদিন হইতে পরীক্ষা করিয়া আসা হইতেছে, এবং খাদ্যবিশেষ গ্রহণে দেহবৃদ্ধি স্থগিত হইয়া বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপন্ন ও অকালমৃত্যু সাধিত হয়, ইহাও পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। পায়রাকে কেবলমাত্র কলে ছাঁটা চাউল (Polished rice) খাইতে দিলে উহারা এক প্রকার বেরিবেরি রোগে (Polyneuritis) আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহা বিস্তর পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। জনসঙ্ঘের অভাবে শিশু-সন্তানগণের অস্থি অসার থাকিয়া তাহাদিগের রিকেট (Rickets) নামক উৎকট রোগ উৎপন্ন হয় এবং এই রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহারা আজীবন বিকল-দেহ লইয়া অবস্থিতি করে অথবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাও চিকিৎসকদিগের অজ্ঞাত ছিল না। এই সকল রোগকে ইংরাজীতে ডিফিসিয়েন্সি ডিজিজ্ (Deficiency disease) কহে। কিন্তু ভাইটামিনের অভাবেই যে এই সকল রোগের আবির্ভাব হয়, তাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেহ অবগত ছিলেন না। ডাক্তার হপ্‌কিন্‌স্ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত পরীক্ষা করিয়া এই অত্যাবশ্যক পদার্থের আবিষ্কার করেন। তিনি এই জাতীয় পদার্থের Accessory food factor নাম প্রদান করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ফঙ্ক্ (Funk) তাঁহার বহুদিনব্যাপী গবেষণার ফলস্বরূপ প্রকাশ করেন যে, এই সকল পদার্থের অভাবেই বেরিবেরি রোগ উৎপন্ন হয়। তিনি প্রথমে এই পদার্থকে ভাইটামিন্ (Vitamin) নামে অভিহিত করেন। তদবধি ভাইটামিন্ সম্বন্ধে য়ুরোপ ও আমেরিকাতে বিস্তর গবেষণা চলিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে বহু পরীক্ষার দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রোটিন্ প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় সাধারণ খাদ্য-উপাদান ব্যতীত দেহপুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তিন জাতীয় ভাইটামিনের একান্ত আবশ্যক। ইহাদিগের যে কোন একটির অভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং দেহমধ্যে রিকেট্, বেরিবেরি, স্কার্ভি প্রভৃতি বিবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই তিন জাতীয় খাদ্য-প্রাণ ইংরাজীতে ভাইটামিন্ A, ভাইটামিন্ B এবং Vitamin C নামে পরিচিত। অনেক খাদ্য-দ্রব্যে এই তিন জাতীয় ভাইটামিন্ অল্পাধিক পরিমাণে একত্র অবস্থিতি করে। পুনশ্চ কোন কোন খাদ্যদ্রব্যে ইহাদিগের মধ্যে একটি বা দুইটির অস্তিত্ব মাত্র সপ্রমাণ হইয়াছে। দুগ্ধ, মাখন, কড্‌লিভার তৈল, কমলালেবু, বিলাতী বেগুণ (Tomato), লেমন (Lemon) বাঠা, ডিমের পীতাংশ, বাঁধাকপি, পালম শাক, লেটুস প্রভৃতি পদার্থে খাদ্যপ্রাণ 'এ' প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে। খাদ্যমধ্যে এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশুদিগের রিকেট নামক অস্থিব্যাধি উৎপন্ন হয়।

মকাই, নানাবিধ ডাল, অঙ্কুরযুক্ত আস্ত ছোলা, মটর, মুগ প্রভৃতি শস্য, ডিমের পীতাংশ, ইষ্ট (Yeast) এবং বাদাম প্রভৃতির মধ্যে খাদ্য-প্রাণ 'বি' যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাবে দুরারোগ্য বেরি-বেরি রোগ জন্মে।

কমলা লেবু ও গোড়া লেবুর (Lemon) রস, বিলাতী বেগুন, বাঁধা কপি প্রভৃতি টাটকা তরি-তরকারি, শাক-শব্জী ও ফল-মূলের মধ্যে খাদ্য-প্রাণ 'সি' প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে। আমাদের খাদ্যে এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাব হইলে স্কার্ভি নামক উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্কার্ভি রোগে লেবুর রস বা ঘষি বা অঙ্কুরিত মটর বা ছোলা প্রত্যহ খাদ্যরূপে ব্যবহার করিলে সত্বর বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চাউলের কুঁড়া, গমের ভূসি, আছাটা বা অল্প ছাঁটা চাউল, যব ও ইষ্ট, নামক উৎসেচক পদার্থের (Ferment) মধ্যে বেরি-বেরি-নিবারক ভাইটামিন্ অবস্থিতি করে। কলে ছাঁটা চাউল (Milled rice), শাদা ধব্‌ধবে ময়দা (White flour) ও উহা দ্বারা প্রস্তুত রুটী বা পাউরুটী, সাগুদানা (Sago) টেপিওকা (Tapioca) এবং টিনের কৌটায় রক্ষিত বিবিধ খাদ্যের মধ্যে বেরি-বেরি-নিবারক ভাইটামিনের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।

মাখন, কড্‌লিভার তৈল এবং ডিমের কুসুমের (পীতাংশ) মধ্যে "এ" জাতীয় ভাইটামিন্ (রিকেট-নিবারক) যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। অন্যান্য অন্তর চর্ব্বি বা উদ্ভিজ্জ-তৈলে এই জাতীয় ভাইটামিন্ নিতান্ত অল্প-পরিমাণে থাকে, এমন কি, অনেক সময়ে ভাইটামিন্ পাওয়া যায় না।

"এ," "বি," ও "সি" ব্যতীত অপর কয়েক জাতীয় ভাইটামিন্ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদিগের একটি ভাইটামিন্ 'ডি' (D) নামে পরিচিত। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, খাদ্যে এই জাতীয় ভাইটামিনের অবস্থিতি অস্থিগঠনের সহায়ক। সম্প্রতি ভাইটামিন্ "এক্স" (X) নামক আর এক জাতীয় খাদ্য-প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা সন্তান-উৎপাদিকা শক্তির বিশেষ অনুকূল; খাদ্যে ইহার অভাব হইলে বংশবৃদ্ধির অন্তরায় ঘটিয়া থাকে।

অভাব হইলে তাহার সন্তান সন্ততিকে প্রায়শঃ রিকেট রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ঐ সকল শিশু সন্তান কেবল মাতার স্তনদুগ্ধের উপর নির্ভর করিলেও, জননীর খাদ্যের দোষে স্তন-দুগ্ধে "এ" জাতীয় খাদ্যপ্রাণের সবিশেষ অভাব হেতু তাহাদিগের রিকেট রোগ জন্মে। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, যে শিশু মাতৃস্তনদুগ্ধ পান করে, সে কখনই রিকেট রোগে আক্রান্ত হয় না। এই ধারণা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে বলিয়া এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে। স্তনদুগ্ধের গুণাগুণ মাতার খাদ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রসূতির খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব ঘটিলে তাহার স্তনদুগ্ধ শিশুর শরীরপোষণোপযোগী হয় না, সুতরাং ঐ দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং সে রিকেট প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রসূতির খাদ্যের মধ্যে দোহন, মাখন, ঘৃত এবং টাটকা শাক-শব্জী তরি-তরকারি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে স্তনদুগ্ধে ভাইটামিনের অভাব হয় না। গর্ভিণী স্ত্রীলোক এবং সদ্য-প্রসূতা মাতার খাদ্য ভাইটামিন্ সম্বন্ধে যাহাতে সবিশেষ পুষ্টিকর হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন, নচেৎ আমাদের সন্তান-সন্ততি কখনই দৃঢ়কায়, সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা নাই এবং রুগ্ন, অপূর্ণ ও দুর্ব্বল শিশু-সন্তান হইতে সবল ও দীর্ঘজীবী জাতি গঠিত হইবার আশা নিতান্ত দুরাশামাত্র।

পৃথিবীর নানা দেশে স্ত্রীজাতির খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে স্থানে প্রসূতির খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পদার্থ, মাছের তেল ও টাটকা শাক-শব্জী অধিক পরিমাণে থাকে, সেই সকল স্থানের শিশুদিগের মধ্যে রিকেট্ রোগের প্রাদুর্ভাব মোটেই দেখা যায় না। অপরন্তু যে সকল শিশুসন্তান প্রধানতঃ বোতল বা টিনে রক্ষিত কৃত্রিম শিশু-খাদ্যের (Artificial Infant Food) উপর অধিক নির্ভর করে, তাহাদিগের মধ্যেই রিকেট্ রোগ প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়।

বাহিরে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল বিবিধ কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, যদি আমাদের খাদ্যের মধ্যে দুধ, মাখন, ঘৃত, মাছ, ডিম ও ফল-মূল তরি-তরকারি যথাপরিমাণে থাকে, তাহা হইলে আমরা অনেক সময়ে রোগের আক্রমণ হইতে

সমর্থ হই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে দুধ, ঘি, মাছ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাব হওয়াতে এবং অতি পরিষ্কৃত চাউল, ময়দা প্রভৃতি সৌখীন পদার্থের ব্যবহার সর্ব্বাধিক প্রচলিত হওয়ায় আমাদের স্বাস্থ্যের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, আমাদের রোগ-প্রতিষেধ করিবার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং দেশে অকালমৃত্যুর এরূপ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে।

খাদ্যের পুষ্টিগুণ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, শাকজাতীয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ (গাছের সবুজ পাতা) আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে যথোচিত পরিমাণে থাকা একান্ত আবশ্যক। পালংশাক এবং বাঁধাকপির সবুজ পাতার মধ্যে ভাইটামিন্ জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। সকল জাতীয় শাকসব্জীর মধ্যেই লৌহঘটিত (Iron) এবং চূণ-ঘটিত (Calcium) পদার্থ প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে এবং এই দুই জাতীয় লবণ আমাদিগের রক্ত, অস্থি ও শারীরিক অন্যান্য উপাদান গঠনের সবিশেষ সহায়তা করে। খাদ্যের মধ্যে ভাইটামিন্ ও এই সকল লবণজাতীয় উপাদানের অভাব ঘটিলে আমাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং আমরা শারীরিক পূর্ণতা লাভ করিতে পারি না। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের কৃষকমণ্ডলী ও শ্রমজীবিগণকে অনেক সময়ে লাউ এবং "শাক-পাতাড়ের" উপর নির্ভর করিতে হয়, অথচ তাহাদের স্বাস্থ্য সহরের ধনী সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। "শাক-পাতাড়" হইতে তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন্ এবং প্রয়োজনীয় লবণসমূহ সংগ্রহ করিতে পারে বলিয়া তাহাদের শরীর এরূপ সুস্থ ও সবল থাকে। বর্ত্তমান সময়ে পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, "শাক পাতাড়" একবারেই অবহেলার সামগ্রী নহে। এই জাতীয় পদার্থ কতকাংশ কাঁচা অবস্থায় এবং কতকাংশ সিদ্ধাবস্থায় প্রত্যহ ভক্ষণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যে গরু বাঁধা থাকিয়া ভুষি, কলাই, খড়, খৈল ইত্যাদি খাদ্য ভক্ষণ করে, তাহার দুগ্ধে অধিক পরিমাণে ভাইটামিন্ থাকে না, কিন্তু যে গরু মাঠে চরিয়া তৃণ ভক্ষণ করে, তাহার দুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন্ থাকে।

ভাইটামিনের রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত নিশ্চয়রূপে কিছু জানা যায় নাই। ইহাদের মধ্যে দুই একগুলিই সুরাসার (Alcohol) ও ইথারে (Ether) দ্রব হয়।

খাদ্যদ্রব্য হইতে সুরাসার সাহায্যে এই সকল ভিন্নজাতীয় ভাইটামিন্‌কে পৃথক্ করিয়া বেরিবেরি, রিকেট্, স্কার্ভি প্রভৃতি রোগে মনুষ্য ও জীবজন্তুর প্রতি খাদ্যের সহিত প্রযুক্ত হইতেছে এবং তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিতেছে। ইষ্ট (Yeast) নামক পদার্থের (যাহার সাহায্যে শর্করা হইতে সুরা প্রস্তুত হয়) মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন্ আছে। উপরি-উক্ত উপায়ে ইষ্ট হইতে ভাইটামিন্ পৃথক্কৃত হইয়া গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মেসোপটেমিয়াতে বেরিবেরি-রোগাক্রান্ত সৈন্যদিগের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া আশ্চর্য্য উপকার প্রদর্শন করিয়াছে।

ভাইটামিন্‌গুলি অধিক উত্তাপ-সংযোগে নষ্ট হইয়া যায়। "এ" ও "বি" জাতীয় ভাইটামিন্ অপেক্ষাকৃত একটু বেশী উত্তাপ সহ্য করিতে পারে; কিন্তু "সি" জাতীয় ভাইটামিন্ ফুটন্ত জলের উত্তাপেই অতিশয় হীনশক্তি হইয়া পড়ে। দুধের মধ্যে "এ" জাতীয় ভাইটামিন্ থাকে; দুধ অল্পক্ষণের জন্য ফুটাইয়া লইলে উহার ভাইটামিন্ নষ্ট হয় না। মাখন হইতে ঘি প্রস্তুত করিবার সময় অত্যন্ত অধিক উত্তাপ না দিলে উহার মধ্যস্থিত "এ" ভাইটামিন্ বিনষ্ট হয় না, ঘৃতের মধ্যেই থাকিয়া যায়। ঘৃতের মধ্যে ভাইটামিন্ থাকে বলিয়া খাদ্য হিসাবে যত প্রকার চর্ব্বি বা উদ্ভিজ্জ-তৈল আমরা ব্যবহার করি, তাহাদিগের মধ্যে ঘৃতই শ্রেষ্ঠ-গুণ-সম্পন্ন। বোধ হয়, ইহার ব্যবহারিক উপকারিতা লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারগণ "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" নামক বচনটির অনৈতিকতা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

তরকারী সিদ্ধ হইবার সময়ে উহার মধ্যস্থিত "সি" ভাইটামিন্ অধিক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য কতকগুলি তরিতরকারী কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। টোমাটো, মূলা, বর্ষটী, কলাইশুঁটি, শসা, পিঁয়াজ, বাঁধাকপির সবুজ পাতা প্রভৃতি কতকগুলি ফল ও শাক-জাতীয় তরকারী প্রত্যহ কাঁচা অবস্থায় আমাদের ভক্ষণ করা উচিত। য়ুরোপীয়গণ নানা শাকজাতীয় তরকারী ও বিট-পালম প্রভৃতি মূল পদার্থ প্রত্যহ স্যালাড্ (Salad) রূপে ভক্ষণ করিয়া তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন্ সংগ্রহ

মুগ, ছোলা, মটর প্রভৃতি শস্যাদি দুই এক দিন ভিজাইয়া রাখিলে উহার অঙ্কুর নির্গত হয় এবং ঐ অঙ্কুরিত শস্যের মধ্যে "বি" ও "সি" জাতীয় ভাইটামিন্ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। গত যুদ্ধে মেসোপটেমিয়াতে অঙ্কুরিত শস্য ব্যবহৃত হইয়া সৈন্যদিগের মধ্যে স্কার্ভি রোগ একবারে নিবারিত হইয়াছিল। তথায় ছোলা ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া পরে জল ফেলিয়া দিয়া উহাকে এক বা দুই দিন আর্দ্র ভিজা অবস্থায় রাখা হইত। এইরূপে উহার অঙ্কুরোদ্গম হইলে উহাকে ২০ মিনিট মাত্রকাল জলে সিদ্ধ করিয়া সৈন্যদিগকে খাইতে দেওয়া হইত। ইহার পূর্ব্বে বহুসংখ্যক সেনা স্কার্ভি রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, কিন্তু এই অঙ্কুরিত শস্য ব্যবহার করিবার পর তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই দুরন্ত স্কার্ভি রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। বেরিবেরি রোগেও অঙ্কুরিত শস্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রাতঃকালে ভিজা ছোলা, গুড় বা আদার সহিত খাইবার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা অতি স্বাস্থ্যপ্রদ প্রথা; উহা পুনঃ প্রচলিত হইলে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবার আশা করা যায়। তবে অঙ্কুরিত অবস্থায় এই সকল শস্য ব্যবহৃত হইলে অধিক উপকার দর্শে।

অধিকাংশ কৃত্রিম খাদ্যের [যেমন টিনের কৌটা বা বোতলে রক্ষিত মাছ, মাংস, ফল, তরিতরকারী, জাম (Jam), জেলি (Jelly) প্রভৃতি] মধ্যে ভাইটামিনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, সুতরাং খাদ্য হিসাবে এগুলি নিতান্ত নিকৃষ্টগুণসম্পন্ন। এই সকল খাদ্যের উপর একান্ত নির্ভর করিলে রিকেট, স্কার্ভি প্রভৃতি উৎকট রোগ উপস্থিত হইয়া অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতে দেখা যায়। সময় থাকিতে ঐ সকল রোগে টাট্‌কা মাছ, মাংস, দুধ, মাখন, ফল, তরিতরকারী প্রভৃতি ভাইটামিন-পূর্ণ খাদ্য খাইতে দিলে রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করে। শিশুগণকে কৃত্রিম খাদ্য বেশী দিন খাইতে দিলে উহারা রিকেট্ বা স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হইয়া, হয় মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা আজীবন চিররুগ্ন থাকিয়া যায়।

ডাক্তার ম্যাকারিসন্ বহু পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আমাদের দেহমধ্যে ভাইটামিন্ স্বভাবতই অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করে। এই ভাইটামিনের সাহায্যে আমরা আমাদিগের খাদ্যমধ্যস্থিত প্রোটিন্ প্রভৃতি বিভিন্নজাতীয় সার-পদার্থ দেহের বিভিন্ন কার্য্যে উপযুক্তরূপে লাগাইতে সমর্থ হই। ভাইটামিন্‌গুলি পরস্পর পৃথক্ গুণসম্পন্ন; স্বাস্থ্যরক্ষা-কার্য্যে ইহার একটি অপরটির স্থান অধিকার করিতে পারে না। পূর্ণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকল জাতীয় ভাইটামিনের দেহমধ্যে অবস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। পেশী (Muscle) অপেক্ষা দেহস্থিত আভ্যন্তরিক অন্যান্য গণ্ড (Glands)] মধ্যে ভাইটামিন্ অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। "এ" জাতীয় ভাইটামিন্ যে শুধু রিকেট্ রোগ নিবারণ করে, তাহা নহে; ইহা দ্বারা আমাদের দেহের সম্যক্ পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধিত হয়। "বি" জাতীয় ভাইটামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা দেহস্থ কোষসমূহের (বিশেষতঃ স্নায়ুকোষের) পুষ্টিসাধন এবং তাহাদের ক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত "বি" জাতীয় ভাইটামিন্ শর্করাজাতীয় খাদ্য পরিপাকের এবং উহাকে দেহের কার্য্যে লাগাইবার সহায়তা করে। "সি" জাতীয় ভাইটামিন্ আমাদের দেহের বৃদ্ধি-সাধনের বিশেষ অনুকূল। এই বৃদ্ধি-সাধনের জন্য দেহের মধ্যে যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হয়, "সি" জাতীয় ভাইটামিন্ সাহায্যে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সূর্য্যের আলোক-সাহায্যে রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হইয়া বৃক্ষের পত্রাদি প্রভৃতি সবুজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন্ উৎপন্ন হইয়া তথায় সঞ্চিত থাকে। মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তু উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া যাবতীয় ভাইটামিন্ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়। নিয়মিতভাবে রৌদ্র সেবন করিলে দেহমধ্যে ভাইটামিনের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে সকল খাদ্যদ্রব্যে ভাইটামিন্ অল্পপরিমাণে থাকে, তাহা কিয়ৎক্ষণ রৌদ্রে রাখিলে উহার মধ্যে ভাইটামিনের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

যে সকল খাদ্যদ্রব্যমধ্যে ভাইটামিনের পরিমাণ অধিক থাকে, তাহাই আমাদের ব্যবহার করা বিধেয়। আমাদের ব্যবহারের দোষে খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে ভাইটামিনের পরিমাণ কমিয়া না যায়, তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই জন্য খুব পরিষ্কৃত (Milled) চাউল, খুব পরিষ্কৃত ময়দা (White flour) প্রভৃতি সৌখীন দ্রব্যের ব্যবহার একবারে পরিত্যাগ করা উচিত। কোন্ খাদ্যের মধ্যে কোন জাতীয় ভাইটামিন্ থাকে এবং কত পরিমাণে থাকে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আশা করি, এই তালিকা 'বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকাগণকে পরিবারস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জন্য উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য-নির্ব্বাচনকার্য্যে সহায়তা করিবে। যে সকল পদার্থে ভাইটামিনের পরিমাণ সামান্য মাত্র, তাহা একটি + যোগ চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভাইটামিন্ দুইটি যোগ চিহ্ন (+ +), তাহারও অপেক্ষা অধিক ভাইটামিন্ থাকিলে ঐ দ্রব্য তিনটি যোগ চিহ্ন (+ + +) দ্বারা এবং প্রচুর পরিমাণ ভাইটামিনের অস্তিত্ব চারিটি যোগচিহ্ন (+ + + +) দ্বারা সূচিত হইয়াছে। যে কোন জাতীয় ভাইটামিনের অভাব শূন্য (০) চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। ভাইটামিন্ সম্বন্ধে যে সকল খাদ্যের এ পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষা

তালিকা।

আমাদিগের নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতীয় খাদ্য-প্রাণ অবস্থিতি করে এবং মোটামুটি কোন্‌টে কি পরিমাণেই বা থাকে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

খাদ্যের নাম	খাদ্য-প্রাণ (Vitamin)			খাদ্যের নাম	খাদ্য-প্রাণ (Vitamin)		
	এ (A)	বি (B)	সি (C)		এ (A)	বি (B)	সি (C)
দুগ্ধবর্গ।				মাংসবর্গ।			
কাঁচা দুধ	++	+	+	মাংস (কাঁচা)	+	+	+
মাঠা তোলা দুধ	•	+	+	ঐ (সিদ্ধ)	+	+	+ (কম)
পাষ্টুরাইজড দুধ	++	+	+(কম)	ঐ (ভাজা)			•
বেশী জাল দেওয়া দুধ	+	+ (কম)	•	ঐ (টিনে রক্ষিত)		•	•
ঘন দুধ (চিনি দেওয়া) (Condensed Milk)	+	+	+	মস্তিষ্ক (Brain)	+	++	
				যকৃৎ (Liver)	++	++	
পনির	+			মূত্রগুণ (Kidney)	++	+	
দধি বা ঘোল	+	+++	+	প্যান্‌ক্রিয়াস্ Pancreas	+	+++	
মাঠা	++	•	•	হৃৎপিণ্ড (Heart)	++	++	
ঘৃতবর্গ।				মাংসের কাথ (Tinned meat extract)	•	•	•
মাখন	+++	•	•	জিলাটিন্ (Gelatin)	•	++	•
ঘৃত	মাখনের অপেক্ষা কিছু কম	•	•	মৎস্যবর্গ।			
				মৎস্য	++	++	?
মেদবর্গ (চর্ব্বি)।				ঐ যকৃৎ	++		
শুকরের চর্ব্বি (Lard)	•	•	•	ঐ ডিম্ব	+	++	
মেষের চর্ব্বি	+	•	•	ডিম্ববর্গ।			
গরুর চর্ব্বি	++	•	•	ডিম্ব	++	+++	•
তৈলবর্গ।				ঐ কুসুম(Yellow part)	++	+++	•
কড্‌লিভার তৈল	++++	•	•	ঐ শ্বেতাংশ (White part)	•	•	•
বাদামের তৈল	•	•	•	শর্করাবর্গ।			
নারিকেল তৈল	•	•	•	চিনি	•	•	•
অলিভ তৈল	+(কম)	•	•	মধু		++	
চীনাবাদামের তৈল	+(কম)	•	•	ফলবর্গ।			
তিল তৈল	•	•	•	বাদাম	+	++	
ভেজিটেবল ঘি	•	•	•	নারিকেল (শাঁস)		++	
ধান্যবর্গ।				ঐ (দুধ)			++
চাউল আধাটা বা অর্দ্ধছাটা	+	++	•	আখরোট	+	++	
ঐ কলে ছাটা (Polished)	•	•	•	আপেল		+	+
ঐ কুঁড়া (Bran)	+	++		কলা	+?	+(কম)	+(কম)
যব (আস্ত)	•	++	•	আঙ্গুর		+ঐ	+ঐ
মকাই (আস্ত দানা)	+	++	•	গোড়াসেবু (Lemon)		+	++++
জোয়ার (Millet)	+	++	•	পাতি বা কাগজি সেবু		+	++
ওট্ (Oat)	+?	+	•	কমলা সেবু	++	+++	++ ++
ওট্ মীল্ (Oat meal)		+(কম)	•	পীচ		+	
গম (আস্ত)	+	++		রাস্পবেরি			++

খাদ্যের নাম	খাদ্য-প্রাণ (Vitamin)			খাদ্যের নাম	খাদ্য-প্রাণ (Vitamin)		
	এ (A)	বি (B)	সি (C)		এ (A)	বি (B)	সি (C)
ধান্যবর্গ :				**ফলবর্গ :**			
ধবধবে সাদা ময়দা (White flour)				ব্লুবেরি			++
সাদা পাউরুটী (White bread)				চেস্‌নট (Chesnut)	++	+++	
ব্রাউন্ পাউরুটী (Whole meat bread)	+	+++	•	বিলাতি বেগুণ (Tomato)	++	+++	++++
গমের ভূসি	+	+++		নারিকেল	?	+	++
তরকারি ও শাকবর্গ :				কিস্‌মিস্		+	+
আলু (ছাড়া)	+(কম)	+	++	খেজুর (শুষ্ক)		•	
ঐ (সিদ্ধ)		+	+	**ডালবর্গ (Pulses)**			
বাঁধা কপি (সবুজ পাতা)	++	+	+++	মসুর (আস্ত)	+	++	•
ঐ (শাদা পাতা)	•			বটর (ঐ)	+	++	
ঐ (সিদ্ধ)	+	+	++	ঐ (অঙ্কুরিত)	+	++	++
ফুলকপি			+	বরবটি		+++	
কলাই সুঁটি	+	++	+++	দাল (অন্যান্য)	+	++	
গাজর	+	+	+	সরু বীন্	+	++	
রসুন			++	চীনা বাদাম	+	++	
লেটুস্ (Lettuce)	++	+	++				
পিঁয়াজ		++	++	**অন্যান্য খাদ্য**			
বীট (Beet)	+	+	++				
পালং শাক	+++	+++	+++	টিনে রক্ষিত মাংস			•
সিলারি (Celery)		+		মার্গারিন্ (Vegetable Margarin)	•		•
ক্রেস্ (Cress)			++	চা, কফি, কোকো	•		•
ব্যাঙের ছাতা (Mushroom)			++	জাম্ (jam)	•		•
পার্সনি (Parsnip)			+++	সাগু (Sago)	•		•
শালগম			+++	টেপিওকা (Tapioca)	•		•
ওয়াটার্ ক্রেস্ (Water cress)			++	মীট্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট (Meat extract)		•	•
ইষ্ট (Yeast)		++	•				

শ্রীচণ্ডীচরণ বসু ।

রাসায়নিক গবেষণায় জার্ম্মাণীর সৌভাগ্য

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, বেঙ্গল-কেমিক্যাল্ অমুক ঔষধ প্রস্তুত করে না কেন?" বেঙ্গল-কেমিক্যাল্ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইলেও অন্যূন তিন চারি শত দেশী ও বিলাতী ঔষধ প্রস্তুত করে। কিন্তু গত ৭০ বৎসরের মধ্যে রাসায়নিক জগতে যে অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ সাধারণে জ্ঞাত নহেন; জার্ম্মাণীর রাসায়নিল্পের অভ্যুত্থান হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এক জন ফরাসী রাসায়নিক গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "রসায়ন ফরাসী দেশজ শাস্ত্র, অষ্টাদশশতাব্দী লাবোয়াসিয়ে ইহার জনয়িতা।" অতি দর্পে হতা লঙ্কা.—নিয়তির অলঙ্ঘ্যবিধানে ফরাসীর এ দর্প চূর্ণ হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জার্ম্মাণীতে রসায়নচর্চ্চা এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, আজ জার্ম্মাণী রসায়ন জগতে অপ্রতিহতপ্রভাবে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে, এক একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করে; থার্ম্মোপাইলি হইতে ওয়াটারলু পর্য্যন্ত জগতের অনেক যুদ্ধ উদাহরণস্বরূপ দর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাসায়নিকের আজীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনার ফল কি প্রকারে নবযুগের অবতারণা করে, তাহা সম্ভবতঃ জনসাধারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যে দিন লুই পাস্তর (Louis Pasteur) জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন তথ্য প্রকাশ করিলেন, গাজন (Fermentation), পচন (Putrefaction) প্রভৃতি ব্যাপারে অদৃশ্য বীজাণুর প্রভাব প্রমাণ করিলেন, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিবস। বিশ্বজনীন মানবতার অবতার লর্ড লিষ্টার (Lord Lister) ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আধুনিক অস্ত্রোপচারের অহেতুকী ভীতির নিরসন করিয়া রোগক্লিষ্ট মানবকে আশার বাণী শুনাইলেন। মহামতি পাস্তরের এই মহৎ আবিষ্কারের ফলেই জীবাণুশূন্য পাত্রে দুগ্ধ, মাংস, সুপক্ক ফল প্রভৃতি সংরক্ষিত হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে। এই অদৃশ্য জীবাণু জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র বিদ্যমান; উপযুক্ত খাদ্যের সন্ধান পাইলেই তাহাকে আশ্রয় করিয়া রক্তবীজের বংশের ন্যায় সংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যবস্তুরও আমূল রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সুদূর অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ মেষবাংস এখন শ্বেতদ্বীপবাসীর রসনাকে তৃপ্তি দিতেছে, আমেরিকার সুপুষ্ট ফল শর্করারসে সিক্তিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরিত ও ব্যবহৃত হইতেছে। গৌরীশৃঙ্গ অভিযানকারী, মেরুসন্নিহিত অজ্ঞাত দেশসমূহের আবিষ্কারক অথবা সুদূর মরুবক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের পক্ষে জীবন ধারণ করিবার একমাত্র উপায় জীবাণুশূন্য পাত্রে সংরক্ষিত এই সকল খাদ্যসম্ভার। কিন্তু এই যে বিশাল ব্যবসায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, সমগ্র জাতির আর্থিক অবস্থাকে যাহার উপর আংশিক নির্ভর করিতে হইতেছে, তাহার মূলে পাস্তরের "ক্ষুদ্র" একটি আবিষ্ক্রিয়া।

জার্ম্মাণী ও অন্যান্য দেশে গত ৫০ বৎসরের মধ্যে আলকাতরা হইতে নিঃসৃত দ্রব্য হইতে নানাপ্রকার ঔষধ, রঙ্গের উপাদান, বিস্ফোরক প্রভৃতির এক বিরাট ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল ব্যবসায়ের জোরেই পরাজিত, বিধ্বস্ত, ক্ষতসর্ব্বস্ব জার্ম্মাণী আজ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। এই সকল ব্যবসায়ের ইতিহাস আরব্যোপন্যাসের আখ্যায়িকা হইতেও মনোরম। আলকাতরা নামক ঘনীকৃত নরনের পীড়াদায়ক পদার্থেই এই ইন্দ্রজাল সাধিত করিয়াছে,—"রূপে কি করে বাপু, গুণ থাকে যদি?"

সুদূর অতীতে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠ বিশাল অরণ্যানীসমাকুল ছিল—মনুষ্য তখন ধরাধামে অবতীর্ণ হয় নাই। ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণের ফলে নানাপ্রকার প্রলয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া এই সকল অতিকায় বৃক্ষ কালক্রমে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। পৃথিবীর বুকিপত হইয়া অসহ্য চাপ ও উত্তাপের ফলে এই সকল মহীরুহ ক্রমে ক্রমে পাথুরিয়া কয়লায় পরিবর্ত্তিত হয়। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে সুচতুর মানব ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া পাথুরিয়া

করলা ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু সকল সময়ে খনি হইতে আহৃত হইয়াই করলা ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না ; তাহার পূর্ব্বে উহাকে বায়ু বা তাপের সংস্পর্শে আংশিকভাবে অগ্নিদগ্ধ করিয়া লঘু করিয়া লইতে হয়। পূর্ব্বে উন্মুক্ত প্রান্তরে পাথুরিয়া করলা স্তূপাকার করিয়া দগ্ধ করা হইত। এখনও আমাদের দেশে অনেক স্থলে এই ভাবেই পাথুরিয়া করলাকে পারিবারিক ব্যবহার্য্য করলায় পরিবর্ত্তিত করা হয়। ইহাকে "কোক্" করলা বলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম কাঁচা পাথুরিয়া করলা বৃহদ্যন্ত্রে আবদ্ধ করিয়া "শুষ্ক তির্য্যক্ পাতিত" (Dry distilled) করা হয়। ফলে দেখা গেল যে, ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণে বায়বীয়, তরল ও কঠিন পদার্থ নিঃসৃত হইয়া আসিল। দাহ্য বাষ্প (Coal Gas) রাজপথ ও দোকানঘর আলোকিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, কিন্তু এমোনিয়া নামক সহজদ্রাব্য বাষ্প, ন্যাপ্‌থা (Naptha) নামক দাহ্য তরল পদার্থ এবং পর্ব্বতপ্রমাণ পিচ ও আলকাতরা লইয়া গ্যাস-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তৃগণ মহা-সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। এমোনিয়া না হয় নিকটবর্ত্তী জলাশয় অথবা স্রোতস্বিনীতে ঢালিয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতেও অব্যাহতি ছিল না। তীব্র গন্ধে জলচর জীবসকল পলায়ন পাইতে লাগিল এবং পানীয় জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িল। আলকাতরার সমস্যা আরও গুরু হইয়া দাঁড়াইল—সামান্য কিছু কাষ্ঠ-সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে ব্যয় হইত, অবশিষ্ট অংশ লইয়া কি যে করা যায়, তাহা কেহই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাইকেল ফ্যারাডে ন্যাপ্‌থা হইতে বেনজীন নামক পদার্থ বিশ্লিষ্ট করেন ; এই পদার্থের আবিষ্কারই রাসায়নিক জগতে যুগান্তর আনয়ন করে। পরে দেখা গেল, আলকাতরাকে তির্য্যক্‌পাতিত করিলে ইহা হইতে বেনজীন (Benzene), টলুইন (Toluene), ন্যাপ্‌থালীন (Napthalene), কার্ব্বলিক এসিড (Carbolic acid)প্রভৃতি নানা প্রকার মূল্যবান্ বস্তু পাওয়া যায়। কলিকাতার সন্নিহিত নারিকেলডাঙ্গায় ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর যে কারখানা আছে, তাহাতেও পাথুরিয়া করলা হইতে প্রচুর পরিমাণে আলকাতরা, পিচ ও এমোনিয়া প্রভৃতি বৎসর নিঃসৃত হয় ; কিন্তু আলকাতরার তির্য্যক্‌পাতন আমাদের দেশে বিশেষ হয় না। সম্প্রতি বেঙ্গল কেমিক্যাল পাণিহাটীতে প্রায় এক শত বিঘা জমীর উপর বিস্তৃতাকারে নূতন কারখানা খুলিয়াছেন, সেখানে আলকাতরা হইতে ফিনিয়োল্ (Phencol) নামক দুর্গন্ধনাশক, জীবাণুধ্বংসকারী তরল পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

রাসায়নিক গবেষণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, এমোনিয়াকে গন্ধকদ্রাবকের সাহায্যে দ্রাবিত করিলে যে পদার্থের উদ্ভব হয়, তাহা জমীর সার হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্। উপর্য্যুপরি শস্য উৎপন্ন হইলে ভূমি যখন অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে, তখন নাইট্রোজেন উপাদানযুক্ত সার জমীতে দিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স, বিশেষতঃ আমেরিকা (যাহা প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ)—প্রভৃতি দেশে এই সার পরম উপকারী পদার্থরূপে গৃহীত হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বে যে এমোনিয়া জঞ্জালস্বরূপ ফেলিয়া দেওয়া হইত, তাহা এখন কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়ক সার প্রস্তুতে ব্যয়িত হইতেছে। এক ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর আড়াই লক্ষ টন্ এমোনিয়ম্ সালফেট্ কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। টাটার লৌহ-কারখানায় প্রতি সপ্তাহে যথেষ্ট পরিমাণ এমোনিয়ম্ সালফেট্ প্রস্তুত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে দেশের শতকরা অন্যূন ৮৫ জন লোক কৃষিজীবী, সে দেশে ইহার আদর নাই ; টাটার কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া উৎপন্ন এমোনিয়ম্ সালফেটের অধিকাংশ বিলাতে বিক্রয় করিতে হয়।

নীলকরের অত্যাচারকাহিনী সম্ভবতঃ সকলেই জানেন। শুনিয়াছি, এখনও অশীতিপর অনেক বৃদ্ধ ইহা স্মরণ করিয়া কাঁপিয়া থাকেন ; দীনবন্ধুর লেখনী-প্রভাবে নীলকরের অত্যাচার বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন পাইয়াছে। শুনিতে পাই, বিদেশী নীলকরের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে যে দিন নদীয়া ও যশোহরের প্রজাবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "জীবনে আর কখনও নীল বুনিব না," সে দিন ধীরে ধীরে নীলের চাষ বাঙ্গালাদেশ হইতে উঠিয়া গিয়া বাঙ্গালা সীমান্তে বিহারে আংশিকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু নীলকরগণ যদি নিতান্ত প্রয়োজক ভূস্বামীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন, অর্থের জন্য নরপিশাচের ন্যায় অথথা অত্যাচার না করিয়া প্রজাবর্গের হিতাহিত চিন্তা করিয়া

তাহাদের সহানুভূতি লাভ করিতেন, তাহা হইলেও সম্ভবতঃ এত দিনে নীলের চাষ দেশ হইতে লোপ পাইত।

মানব-সভ্যতার আদিম যুগেই রঞ্জনশিল্প জন্মলাভ করিয়াছে। কোন ক্রমে উদরপূর্ত্তি ও শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া মানুষ সন্তুষ্ট হয় না; সৌন্দর্য্যগ্রাহিতা, কবিত্ব তাহার অস্তিত্বে রক্তাগত। স্বভাবজ পুষ্পের বর্ণ দেখিয়া তাহারও মনে পরিচ্ছদ রঞ্জিত করিবার বাসনা হয়। আর এই রঞ্জনব্যাপারে, অর্থনৈতিক অথবা সাংসারিক নীতিও যে প্রচ্ছন্ন না রহিয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে Indigofera Tinctoria নামক একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, জলে নিমজ্জিত করিয়া নানা প্রকার প্রক্রিয়ার পর ইহা হইতে নীল বিশ্লিষ্ট হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় চারি কোটি টাকার নীল ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপে প্রেরিত হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ রাসায়নিক পণ্ডিত বেয়ার (Bayer) আলকাতরা-নিঃসৃত ন্যাপথিলিন নামক কীটধ্বংসকারী শ্বেত পদার্থ হইতে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করেন। তিনি প্রস্তুতপ্রকরণ দেখাইয়াই অন্য গবেষণা-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। আর্থিক লাভালাভ খতাইয়া দেখিবার অবসর ইঁহাদের নিতান্তই অল্প; পরীক্ষাগারে নিভৃতে ইঁহারা মানবের জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াই চলিয়াছেন। আলকাতরা-সংক্রান্ত এই সকল বহুমূল্য আবিষ্ক্রিয়াকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণীতে ইতোমধ্যে বাদিস্ আনিলিন্ উণ্ড সোডা ফাব্রিক (Badische Anilin und Soda fabrik) নামক বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭ বৎসর ধরিয়া এই কারখানার রাসায়নিকগণ অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে বেয়ারের আবিষ্ক্রিয়াকে ব্যবসায়ে খাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; জলের ন্যায় অর্থব্যয় হইতে লাগিল। দেড় কোটি মুদ্রা শুধু প্রাথমিক অনুসন্ধানেই ব্যয় হইল। অবশেষে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সুলভে কৃত্রিম নীল প্রস্তুতপ্রণালী ইঁহাদের করায়ত্ত হইল।

জানা যায়, কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিবার সুলভ উপায় কিছুতেই রাসায়নিকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছিল না, এমন সময় এক দিন রসায়নাগারের পরিচারক অনবধানতা প্রযুক্ত ন্যাপথিলিন ও গন্ধকদ্রাবকের মধ্যে নিমজ্জিত একটি তাপমান যন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য পরিচারক বিশেষ ভীত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পর গবেষক আসিয়া দেখেন যে, পাত্রমধ্যে কৃত্রিম নীলের প্রধান উপাদান থ্যালিক এসিড (Pthallic acid) যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যের কারণ কিছুতেই তিনি নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না; অবশেষে পরিচারক আসিয়া যখন দোষ স্বীকার করিল, তখন ইহার ব্যাখ্যা সরল হইয়া গেল। ভগ্ন তাপমান যন্ত্র হইতে পারদ বহির্গত হইয়া গন্ধকদ্রাবকের সঙ্গে এক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছিল—এই পদার্থই অনির্দ্দিষ্টভাবে থ্যালিক এসিডের পরিমাণ অসম্ভব বাড়াইয়া দিতেছিল। দৈবক্রমে থার্ম্মোমিটার না ভাঙ্গিয়া গেলে আরও কত দিন রাসায়নিককে যে অনির্দ্দিষ্টভাবে পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা বলা যায় না।

এইরূপ অজস্র অর্থব্যয় ও বিপুল পরিশ্রমের ফলে জার্ম্মাণ জাতি নীল প্রস্তুত করিবার যে সূত্র আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার ফলে স্বভাবতঃ নীল ভারতবর্ষ হইতে একরূপ বিতাড়িত হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার নীল রপ্তানী হইয়াছিল, আর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রপ্তানীর মূল্য মাত্র ত্রিশ লক্ষ টাকা। কলিকাতার বাজারে নীল বলিয়া এখন যাহা বিক্রয় হয়, তাহার প্রায় সমস্তই কৃত্রিম পদার্থ।

আলকাতরা-সংক্রান্ত গবেষণার ফলে নীলের ন্যায় আর এক উদ্ভিদের চাষ ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইয়াছে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে মঞ্জিষ্ঠার চাষ প্রচলন ছিল, ইহা হইতে নিষ্কাশিত লাল রং বহুল পরিমাণে এ দেশে ব্যবহৃত হইত ও বিদেশে রপ্তানী হইত। শালু, খেরুয়া প্রভৃতি রঞ্জিত করিবার জন্য পূর্ব্বে শুধু মঞ্জিষ্ঠাই ব্যবহৃত হইত।

আলকাতরার মধ্যে অ্যানথ্রাসিন (anthracene) নামক পদার্থ অল্প পরিমাণে (শতকরা অর্দ্ধভাগ) বর্ত্তমান থাকে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গ্রাব ও লিবারমান্ নামক দুই জন জার্ম্মাণ রাসায়নিক পণ্ডিত অ্যানথ্রাসিন হইতে অ্যালিজারিণ (alizarin) নামক কৃত্রিম লাল রং প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বে ফরাসী সাম্রাজ্যে বহুল পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চাষ হইত, এই কারণে

য়ুরোপে ইহাকে তুর্কী রং (Turkey red) বলা হইত। লিবারম্যান দেখাইলেন যে, অ্যালিজারিন ও তুর্কী রং একই পদার্থ; বরং অ্যালিজারিনে লাল রঙ্গের আভা আরও অধিক উজ্জ্বল দেখায়। বলা বাহুল্য, সীমন্তিনীগণ কাপড়ের জর্দ্দা রঙ্গের যে লাল পাড় দেখিয়া মুগ্ধ হন, এখন তাহা আর স্বভাবজাত মঞ্জিষ্ঠা হইতে নিষ্কাশিত রং দ্বারা রঞ্জিত হয় না।

১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে য়ুরোপে ৭ শত ৫০টন মঞ্জিষ্ঠাজাত তুর্কী রং প্রস্তুত হইয়াছিল, আর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মঞ্জিষ্ঠার চাষ এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল এবং তৎপরিবর্ত্তে দুই সহস্র টন্ কৃত্রিম অ্যালিজারিন্ রসায়নাগারে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই রাসায়নিক আবিষ্কার ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইটালী, তুরস্ক এবং ভারতবর্ষের এক অতি প্রাচীন ব্যবসায়ের উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল। লণ্ডন রসায়ন-সমিতির সভাপতি সার উইলিয়ম জ্যাক্সন পোপ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "আলকাতরা হইতে প্রস্তুত কৃত্রিম অ্যালিজারিনই মঞ্জিষ্ঠার চাষ নষ্ট করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও প্রতিপত্তিকে সর্ব্বপ্রথম বিশেষভাবে আহত করে।"

আলকাতরা হইতে এইরূপ লাল, নীল, হরিৎ, পীত প্রায় দুই সহস্র নয়নাভিরাম নানাপ্রকার আভাযুক্ত রং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। আঠার বৎসরের বালক পার্কিন (Perkin) যখন সর্ব্বপ্রথম আলকাতরা হইতে মভ্ (mauve) রং প্রস্তুত করেন, তখন সম্ভবতঃ তিনি এই ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ স্বপ্নেও কল্পনায় আনিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে শুধু জার্ম্মাণীতে পঁচাত্তর কোটি টাকা রঙ্গের ব্যবসায়ে নিয়োজিত রহিয়াছে।

আলকাতরা হইতে যে নয়নানন্দকর নানা প্রকার রংই বাহির হইতেছে, তাহা নহে, নানা প্রকার কৃত্রিম ঔষধও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। অ্যান্টিপাইরিন্ (Antipyrin), অ্যান্টিফেব্রীন্ (Antifebrin), ফেন্-এসিটীন্ (Phen acetin) প্রভৃতি অন্যূন ঔষধের পরিচয় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী ভালরূপই রাখেন। ঘুমের রোগের (Sleeping sickness) ঔষধ এটক্সিল্ (Atoxyle) এবং ফেজ রোগের সালভারসান্ (Salvarsan) আলকাতরা-নিঃসৃত উপাদান হইতে প্রস্তুত। তদ্ভিন্ন সাল্-ফোনাল (Sulphonal), ভেরোনাল (Veronal), ট্রাইয়োনাল (Trional), টেট্রোনাল (Tetronal) প্রভৃতি সম্মোহক ঔষধ আলকাতরাজাত। বেদনানাশক এস্-পিরিন্ (Aspirin) নামক যে ঔষধ না হইলে বাঙ্গালীর এক দণ্ড চলে না, বলা বাহুল্য, তাহার জন্ম আলকাতরা হইতে। আর এক একটি ঔষধ আবিষ্কৃত করিতে কি বিশাল শক্তি ও অর্থই না ব্যয়িত হইয়াছে। সালভার্সানের অন্য একটি নাম হারলিকের ছয় শত ছয় (Ehrlicks 606); এই অদ্ভুত নাম ইহাই বলিতে চাহে যে, ছয় শত পাঁচবার বিফলমনোরথ হইবার পর হারলিক সফলকাম হইয়াছিলেন।

জীবাণু ও দুর্গন্ধনাশকারী কার্ব্বলিক এসিড ও ফিনাইল নিতান্ত পরিচিত হইলেও ইহারা যে আলকাতরা হইতে হয়, তাহা সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না। মিষ্টতার তিক্ত নির্য্যাস স্যাকারিন্ (Saccharin)ও আলকাতরা হইতে উদ্ভূত।

বর্ত্তমান কালে যুদ্ধবিগ্রহ বিস্ফোরক না হইলে চলিতে পারে না। বিস্ফোরকের রাজা পিক্রিক্ এসিড্, লিডাইট্, নাইট্রোবেন্জীন্, ট্রাই নাইট্রো টলুইন (T, N, T.) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে গেলে আলকাতরার শরণাপন্ন না হইলে গত্যন্তর নাই।

ইহা ছাড়া আলকাতরা হইতে অসংখ্য গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। যে কস্তুরী মৃগনাভি ভিন্ন অন্যত্র কোথাও থাকিতে পারে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, তাহাও কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারে প্রস্তুত হইয়া কলিকাতার বাজারে দেখা দিয়াছে। ফুলের নির্য্যাস বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, তাহাও অনেক সময় আলকাতরা হইতে বিনির্গত কৃত্রিম পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃত্রিম সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের ফলে ভ্যানিলিন (Vanillin) নামক গন্ধদ্রব্যের মূল্য সের প্রতি পাঁচ হাজার টাকা হইতে মাত্র বিশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা ভিন্ন কুমারিন্ (Coumarin), হেলীয়োট্রপীন (Heliotropin) প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য অনায়াস সুলভ হইয়া পড়িয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য যখন ইংরাজ ও ফরাসীর সহিত মিতালি করিয়া যুদ্ধে যোগদান করে, সেই সময়ে (১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে) রাষ্ট্রপতি উইলসন আমেরিকা-নিবাসী রাসায়নিকগণের এক সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করেন এবং তাঁহাদের সহযোগিতা ভিক্ষা করেন। তাঁহার যুদ্ধ-বিভাগ

রাসায়নিকের সাহায্য বিনা পরিচালন করা অসম্ভব। প্রায় পনর হাজার রাসায়নিক দেশের দুর্দ্দিনে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। আর ইঁহার তুলনায় আমাদের দেশের রাসায়নিকসংখ্যা কিরূপ নগণ্য? অথচ যুক্তরাজ্য প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। সে হিসাবে বলিতে পারি যে, জার্ম্মাণীর ন্যায় শিল্পবহুল দেশে অন্ততঃ এক লক্ষ রাসায়নিক অহর্নিশ গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নিত্য নূতন রং, ঔষধ, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি মানবজীবনের হিতকারী দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইতেছেন।

গত মহাযুদ্ধে ক্ষাত্রশক্তির প্রধান উপাদক জার্ম্মাণজাতি ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইটালীর সম্মিলিত শক্তির নিকট বিধ্বস্ত হইয়া পরাভব স্বীকার করে। জার্ম্মাণীর রণপোত ও অর্ণবপোতের প্রায় সমস্তই বিজেতৃগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। জার্ম্মাণীকে কয়েক বৎসর ধরিয়া কিস্তিবন্দী হিসাবে কত হাজার কোটি টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্ম্মাণ রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধাবসানের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ জাতির দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। যে সমস্ত ভারতবাসী ছাত্র এই চারি পাঁচ বৎসর জার্ম্মাণীতে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সমগ্র জার্ম্মাণজাতি অস্থিকঙ্কালসার হইয়াছিল। কেন না, ইংলণ্ড রণপোত দ্বারা জার্ম্মাণীর মধ্যে খাদ্যশস্য প্রবেশ করিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন রাজকোষ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, জার্ম্মাণজাতি 'দেউলিয়া' হইয়া গিয়াছিল বলিলেও চলে। কিন্তু জার্ম্মাণী আমাদের মত "মরা জাত" নহে —তাহার সন্তানগণের যেমন মস্তিষ্ক, তেমনই শক্তিসামর্থ্য, অদম্য উৎসাহ ও স্বদেশপ্রেম। জার্ম্মাণজাতি প্রতিজ্ঞা করিল, আবার আমরা উঠিব,—কে তাহার গতিরোধ করিবে? তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণীর ইস্পাত, নানাবিধ কলকব্জা ও রঞ্জপাতিতে আবার পৃথিবী ছাইয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ কৃত্রিম রং, ঔষধ, বিস্ফোরক লইয়া জার্ম্মাণী আবার বিশ্বের বাজারে উপস্থিত হইয়াছে। এ সংসারে যাহার শক্তি-সামর্থ্য আছে, সেই টিকিয়া থাকে, অবশিষ্ট সকলে হটিয়া যায়। গত বৎসর "বার্ষিক বসুমতীতে" জগদ্বিখ্যাত মার্কের প্রতিষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, এ বৎসর হৃতসর্ব্বস্ব ও অবমানিত জার্ম্মাণী রাসায়ন শিল্পের সাহায্যে কি করিয়া অর্থনৈতিক প্রভুত্ব ধীরে ধীরে লাভ করিতেছে, তাহারই মূল বিবরণ প্রদত্ত হইল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

পূজার বলি

উকীল অবশ্য আমরা সবাই হই—পয়সা রোজগার করবার জন্য। কিন্তু পয়সা সকলের ভাগ্যে জোটে না, তবুও যে আমরা অনেকেই ও ব্যবসায় মাথা কাটাতে পারি নে, তার কারণ, ও ব্যবসায় টান শুধু টাকার টান নয়। আমাদের ভিতর যাঁদের মন 'পলিটিক্সের উপর প'ড়ে আছে, তাঁরা জানেন যে, বার-লাইব্রেরীর তুল্য পলিটিক্সের স্কুল ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি ন ভূত ন ভবিষ্যতি। ও স্কুলে ঢুকলে আমরা যে দুনিয়ার পলিটিক্সের হাড়হদ্দর সন্ধান পাই, শুধু তাই নয়; সেই সঙ্গে আমাদের পলিটিক্যাল মেজাজও নিত্য তর্ক-বিতর্ক বাগ্-বিতণ্ডার ফলে সপ্তমে চ'ড়ে থাকে। এ স্কুলের আর এক মহাগুণ এই যে, এখানে কোনও ছাত্র নেই, সবাই শিক্ষক—এ কালের ভাষায় যাকে বলে—বারগাটা হচ্ছে পুরো ডিমোক্রাটিক। মিটিং ত এখানে নিত্য হয়, উপরন্তু Freedom of speech এ ক্ষেত্রে অবাধ। তার পর যাঁদের মন পলিটিক্যাল নয়—সাহিত্যিক, তাঁরাও উকীলের বার-লাইব্রেরীতে ঢুকলেই দেখতে পাবেন যে, এতাদৃশ গল্পের আড্ডা দেশে অন্যত্র খুঁজে পাওয়া ভার। উকীল-মহলে এক দিনে যে সব গল্প শোনা যায়, তাতে অন্ততঃ বারোখানা মাসিক পত্রের বারোমাস পেট ভরানো যায়।

পৃথিবীর মানুষের দুটিমাত্র ক্রিয়াশক্তি আছে;—এক বল, আর এক ছল। মানুষ যে কত অবস্থায় কত ভাবে কত প্রকার বল-প্রয়োগ করে, তার সন্ধান পাওয়া যায় সেই সব উকীলের কাছ থেকে—যাঁরা ফৌজদারী আদালতে প্রাক্টিস্ করেন, আর non-violent লোকরা যে কত অবস্থায়, কত ভাবে, কত প্রকার ছল-প্রয়োগ করেন, তার সন্ধান পাওয়া যায় সেই সব উকীলের কাছ থেকে,—যাঁরা দেওয়ানী আদালতে প্র্যাক্টিস্ করেন।

আমি জনৈক ফৌজদারী উকীলের মুখে একটি গল্প শুনেছি. সেটি আপনারা শুনলেও বলবেন যে, হাঁ, এটি একটি গল্প বটে। আমার জনৈক উকীল বন্ধু উত্তরবঙ্গের কোনও জিলাকোর্টে একটি খুনী মামলায় আসামীকে defend করেন। কিন্তু তাকে তিনি খালাস করতে পারেন নি। জুরী আসামীকে একবাক্যে দোষী সাব্যস্ত করেন, আর জজ-সাহেব তার উপর ফাঁসীর হুকুম দিলেন। হাইকোর্টে ফাঁসীর বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ।

আমার উকীল বন্ধুটির দেশে Criminal lawyer ব'লে খ্যাতি আছে। এর থেকেই অনুমান করতে পারেন যে, জীবনে তিনি বহু অপরাধীকে খালাস করেছেন, আর বহু নিরপরাধকে জেলে পাঠিয়েছেন। খুনীমামলায় আসামীর প্রাণরক্ষা না করতে পারলে, প্রায় সব উকীলই ঈষৎ কাতর হয়ে পড়েন, বোধ হয়, তাঁরা মনে করেন যে, বেচারার অপঘাতমৃত্যুর জন্য তাঁরাও কতক পরিমাণে দায়ী। এ ক্ষেত্রে আমার বন্ধু গলার জোরে আসামীর গলা বাঁচিয়েছিলেন, তবুও তার দ্বীপান্তরগমনে তাঁর শোক উপস্থিত হয়েছিল। এ ঘটনার পর অনেক দিন পর্যন্ত তিনি এ মামলার কথা উঠলেই রাগে, ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়তেন, তখন তাঁর বড় বড় চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠত আর তার ভিতর থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ত। তাঁর দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, আসামী সম্পূর্ণ নির্দোষ আর জজসাহেব যদি টিপিনের পরে নয়, পূর্ব্বে জুরীকে ঘটনাটি বুঝিয়ে দিতেন, তা হ'লে জুরী একবাক্যে আসামীকে not guilty বলত। জজসাহেব না কি টিপিনের সময় অতিরিক্ত হুইস্কি পান করেছিলেন এবং তার ফলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সব গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

মামলা হারলেই সে হারের জন্য উকীলমাত্রই জজের বিচারের দোষ ধরেন—যেমন পরীক্ষায় ফেল হ'লে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষকের দোষ ধরেন। সেই জন্য আমি আমার বন্ধুর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি নি। আমার বিশ্বাস ছিল যে

আসামীর প্রতি অনুরাগই তাঁর ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। কারণ, সে ছিল প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের ছেলে, তার পর জমীদারের ছেলে, তার উপর সুন্দর ছেলে, উপরন্তু কলেজের ভাল ছেলে! এ রকম ছেলে যে কাউকে খুন-জখম করতে পারে, এ কথা আমার বন্ধু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি—তাই তিনি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

ঘটনাটি আমরা পাঁচ জন একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। কারণ, সংসারের নিয়মই এই যে, পৃথিবীর পুরোনো ঘটনা সব ঢাকা পড়ে "নব নব ঘটনার জালে", আর আদালতে নিত্য নব ঘটনার কথা শোনা যায়। উক্ত ঘটনার বছর পাঁচেক পরে আমার বন্ধুটি এক দিন বার লাইব্রেরীতে এসে আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন যে, এখানি মন দিয়ে পড়ো, কিন্তু এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলো না। সে দিন আমার বন্ধুর মুখের চেহারা দেখে বুঝতে পারলুম না যে, তাঁর মনের ভিতর কি ভাব বিরাজ করছে;—আনন্দ না মর্ম্মান্তিক দুঃখ? শুধু এইটুকু লক্ষ্য করলুম যে, একটা ভয়ের চেহারা তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে। চিঠির দিকে তাকিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ল যে, তার উপরে কোনও ডাকঘরের ছাপ নেই। তাই মনে হয়েছিল যে, এখানি কোনও স্ত্রীলোকের চিঠি—যে চিঠি সে তাকে দেবার সুযোগ অথবা সাহস পায় নি। এ রকম সন্দেহ হবার প্রধান কারণ এই যে, আমার বন্ধু আমাকে এ পত্রের বিষয়ে নীরব থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তার পর যখন লক্ষ্য করলুম, লিখোনামা অতি সুন্দর, পরিষ্কার ও পাকা ইংরাজী অক্ষরে লেখা,—সে বিষয়ে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না। আমি লাইব্রেরীর একটি নিভৃত কোণে একখানি চেয়ারে ব'সে সেখানি এইভাবে পড়তে সুরু করলুম—যেন সেখানি কোনও briefএর অংশ। ফলে কেউ আর আমার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে সেটি দেখবার চেষ্টা করলে না। উকীল সমাজের একটা নীতি অথবা রীতি আছে, যা সকলেই মান্য করে। সকলেই পরস্ত্রিকে পরস্ত্রীর মত ব্যবহার করে অর্থাৎ কেহই প্রকাশ্যে তার দিকে নজর দেয় না।

সে চিঠিখানি নেহাৎ বড় নয়, তাই সেখানি এত দিন পরে প্রকাশ করছি। প'ড়ে দেখলেই ব্যাপার কি বুঝতে পারবেন।

"আন্দামান।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দেশ থেকে যখন চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে আসি, তখন নানারকম দুঃখে আমার মন অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তার ভিতর একটি প্রধান দুঃখ ছিল এই যে, আপনার আগে আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে আসতে পারিনি। আপনি আমার প্রাণরক্ষার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, তা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব। আমি জানতুম যে, উকীল-ব্যারিষ্টাররা মামলা লড়ে—পয়সার জন্য এবং তারা তাদের কর্ত্তব্যটুকু সমাধা করেই খালাস, মামলার ফলাফল তাদের মনকে তেমন স্পর্শ করে না। এ ক্ষেত্রে পরিচয় পেলুম যে, মানুষ কেবলমাত্র তার কর্ত্তব্যটুকু সেরেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। অনেক মামলা উকীলদের মনকেও পেয়ে বসে। আপনি আমাকে খালাস করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, উপরন্তু আমার বিপদ আপনি নিজের বিপদ হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। আমার সাজা হওয়ার ফলে আপনি যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ করেছিলেন, তা থেকে আমি বুঝলুম যে, আপনি আমার আপন ভাইয়ের মত আমার বিপদে বাথা বোধ করেছিলেন। এর ফলে আপনার স্মৃতি আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গিয়েছে।

আর একটি কথা, আসল ঘটনা কি ঘটেছিল, তা আপনার কাছে আমরা গোপন করেছিলুম। আজকে সব কথা খুলে বলছি। সে কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন যে, ঘটনা যা ঘটেছিল, তা নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও প্রকাশ করতে পারতুম না। আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল যে, সুযোগ পেলেই আপনাকে এ ঘটনার সত্য ইতিহাস জানাব। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের এখনকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। তিনি দুদিন পরে দেশে ফিরে যাবেন। তাঁর হাতেই এ চিঠি পাঠাচ্ছি। তিনি এ চিঠি আপনার হস্তে দেবেন। আপনি জানেন যে, আমি যখন খুনী মামলার আসামী হই, তখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, পড়তুম। শুধু পূজোর ছুটীতে বাড়ী আসি। আমি পঞ্চমীর দিন রাত আটটায় বাড়ী পৌঁছুই। বাড়ী গিয়েই প্রথমে বাবার সঙ্গে দেখা করি, তার পর বাড়ীর ভিতর মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বন্ধুও আমার সঙ্গে মা'র কাছে গেল। বন্ধু কে, জানেন? সেই ছোকরাটি—যে আমার মামলার আগাগোড়া

তদ্বির করছিল, আর যে দিবারাত্র আপনার কাছে থাকত, আপনাকে আমাদের defence বুঝিয়ে দিত। বন্ধু আমার আত্মীয় নয়, কারণ, আমরা ব্রাহ্মণ আর সে ছিল কায়স্থ। কিন্তু এক হিসেবে সে আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের মতই ছিল। বন্ধুর ঠাকুরদাদা আমার ঠাকুরদাদার দেওয়ান ছিলেন, এবং তাঁর দত্ত জোতজমার প্রসাদে ওদের পরিবার—গাঁয়ের একটি ভদ্র গেরস্ত পরিবার হয়ে উঠেছিল। ও পরিবার আমাদের বিশেষ অনুগত ছিল। উপরন্তু বন্ধু ছিল আমার সমবয়সী ও স্কুলে সহপাঠী। সে যখন ম্যাট্রিক পড়ত, তখন তার বাপ মারা যান। সে তাই স্কুল ছেড়ে দিয়ে সংসারের ভার ঘাড়ে নিলে। সেই অবধি সে গ্রামেই বাস করত এবং আমার বাবা ও মা যখন তার ঘাড়ে যে কাযের ভার চাপাতেন, তখন সে কায যেমন করেই হোক, উদ্ধার ক'রে দিত। এই সব কারণে সে যথার্থই ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিল। সুতরাং আমাদের বাড়ীতে তার গতিবিধি ছিল অবাধ এবং তার সুমুখে সকলেই নির্ভয়ে সকল কথাই বলতেন। বাড়ীর ভিতর গিয়ে শুনি যে, মা তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। বন্ধু ও আমি তাঁর শোবার ঘরে ঢুকতেই তিনি বিছানায় উঠে বস্‌লেন। আমি তাঁকে প্রণাম করবার পর তিনি আমাকে ও বন্ধুকে পাশের একখানি খাটে বসতে বললেন। আমরা বসবামাত্র মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন আছ?

—ভাল।

—কলকাতায় কেমন ছিলে?

—ভালই ছিলুম।

—তবে কলকাতা ছেড়ে এখানে এলে কি জন্যে?

—পূজোর সময় বাড়ী আসব না?

—কার বাড়ীতে এসেছ?

—কেন, আমাদের বাড়ীতে।

—তোমাদের ত কোনও বাড়ী নেই।

—মা, তুমি কি বলছ, বুঝতে পাচ্ছিনে।

—এ বাড়ী অবশ্য তোমার চৌদ্দপুরুষের; কিন্তু তোমার নয়। অমন ক'রে চেয়ে রইলে কেন? জিজ্ঞাসা করি, জমীদারী কার, তোমাদের না অন্যের?

—আমাদের বলেই ত চিরকাল শুনে আসছি।

—তবে আমি বলি, শোন। তোমাদের এখন কৌটা দেবার মাটীটুকুও নেই।

—আগে ছিল, এখন গেল কি ক'রে?

—জমীদারী পাঁচ আনীর কাছে বন্ধক ছিল জানো?

—তা জানি।

—এখন পাঁচ আনী দশ আনীরও মালিক হয়েছে। তোমাদের অংশ এখন পাঁচ আনীর কাছে আর বন্ধক নেই, এখন তা দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গিয়েছে, আর তা কিনেছে পাঁচ আনী।

—বল কি? সত্যি?

—সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীখানিও গিয়েছে। পাঁচ আনী এখন তোমাদের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করেছে। যাক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সে এবার পূজো করবে।

—তা হ'লে আমাদের পূজো বন্ধ থাকবে?

—অবশ্য। এ অধিকার এখন পাঁচ আনীর, সে অধিকার সে ছাড়বে না। যে ঠাকুর আমরা এনেছি, সেই ঠাকুরই সে নিজের পুরুত দিয়ে পূজো করাবে, ধুমধামও হবে যথেষ্ট, আর আমাদের কাঙ্গালী বিদেয় করবে।

—এর কোনও উপায় নাই মা?

—থাকবে না কেন, তোমাদের দ্বারা তা হবে না। আমার পেটে হয়েছে শুধু শেয়াল-কুকুর—যদি মানুষের গর্ভধারিণী হতুম, তা হ'লে আর তোমার চৌদ্দপুরুষের পূজো বন্ধ হ'ত না।

—কি উপায়?

—উপায় সোজা, শত্রুনিপাত করা।

মা'র মুখে এ প্রস্তাব শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হলো। তাঁর কথা শুনে আমি মাথা নীচু ক'রে বারবাড়ীতে চ'লে এলুম। বন্ধুও আস্‌ছি ব'লে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, তাই আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবতে লাগলুম। মনটা এতই অস্থির হয়েছিল যে, তখন কি ভাবছিলুম, তা বলতে পারিনে। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক গেল। তার পর বন্ধু হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'ল। সে এসেই বল্লে যে, চল, মা'র কাছে যাই, তাঁকে একটা খবর দিয়ে আসি। বন্ধুর মুখের চেহারা দেখে আমি অবাক্ হয়ে

গেলুম, তার এত গম্ভীর চেহারা আমি জীবনে কখনও দেখি নি ; কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের ভিতর এমনই একটা দৃঢ় আবেগের সুর ছিল যে, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার সঙ্গে আবার বাড়ীর ভিতর গেলুম। মা তখনও নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন। বন্ধু তাঁর ঘরে ঢুকেই বললে, "মা, একটা সু-খবর আছে, তোমার শত্রুনিপাত হয়েছে।" এ কথা শুনে মা ধড়ফড়িয়ে উঠে ব'সে হাঁ ক'রে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বন্ধু আবার বল্লে—"মা, কথা মিথ্যে নয়। আমিই তাকে নিজ হাতে নিপাত করেছি। বলি বাধেনি, এক কোপেই সাবাড় করেছি" এই বলেই সে বুকের ভিতর থেকে একখানা দা বার ক'রে দেখালে, সেখানি তাজা রক্তমাখা, আর সে রক্ত এতই তাজা যে, তা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

তাই দেখে মা মূর্চ্ছা গেলেন, আর আমি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আলাদা মানুষ হয়ে গেলুম। আমার মনের ভিতর যেন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল। মনের পুরোনো ভাব, পুরোনো আশা-ভরসা সব চুরমার হয়ে গেল। ভালমন্দর জ্ঞান মুহূর্ত্তে লোপ পেল, আমার মনে হ'ল যে, আমি একটা মহাশ্মশানের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি, তখন মনে হ'ল, পৃথিবীতে মৃত্যুই সত্য আর জীবনটা মিছে।

আসল ঘটনা যা ঘটেছিল, তা আপনাকে খুলেই লিখলুম। দেখছেন এ ঘটনা, আমি সে কালে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারতুম না, প্রাণ গেলেও নয়। আজ যে আপনার কাছে প্রকাশ করছি, তার কারণ, মা এখন ইহলোকে নেই, বন্ধু ত শুনেছি সংসার ত্যাগ করেছে।

আপনি ঠিকই ধরেছিলেন, খুন আমি করেনি, তবে আমি যে শাস্তিভোগ করছি, তার কারণ, আসল ঘটনা যাতে প্রকাশ না পায়, তার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, এবং সত্য গোপন করতে হ'লে যে পরিমাণ মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, তা নিতে কুণ্ঠিত হই নি। এ সব কথা আপনাকে না বললে আমার মনের একটা ভার নামত না, তাই আপনার কাছে অকপটে তা প্রকাশ করলুম, নিজের মনের সোয়াস্তির জন্য। আমি ভাল আছি অর্থাৎ এখানে এ অবস্থায় মানুষের পক্ষে যতদূর স্বস্তির—মনের আরামে থাকা সম্ভব, ততদূর আছি। ইতি—

প্রণতঃ শ্রী—

এ চিঠি প'ড়ে আমিও অবাক্ হয়ে গেলুম। শুধু মনে হ'তে লাগল যে, রাগের মুখের একটি কথা ও ঝোঁকের মাথায় একটি কায মানুষের জীবনে কি প্রলয় ঘটাতে পারে!

শ্রী-প্রমথ চৌধুরী

কবিতার আবির্ভাব

নির্জ্জন নদীকূলে,
ব'সে আছে কবি সমাহিত চিত্তে একাকী বকুলমূলে।
তখন গোধূলি-বেলা,—
গগনের গায় রঙীন-মেঘের বসেছে প্রমোদ-মেলা।

পাখীরা ফিরিছে নীড়ে,
বহিছে মৃদুল শীতল পবন আলোড়ি' কুঞ্জ ধীরে,
বধূরা যেতেছে ঘরে,
দিন-অন্তের কুম্ভ ভরিয়া পল্লীপথের পরে।

বাজিয়া ধরেছে গান,
জোয়ারের জোরে তরতর করি' ভেসে চলে তরীখান।
দেখিছে তখন কবি,
স্বপন-মেঘের কত না মোহন নয়ন-লোভন ছবি,

ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবগুলি,
আপন পুলকে অন্তরে তার উঠিতেছে দুলি দুলি।
ভাষাও দিয়েছে সাড়া,
ছন্দের দোলে চিত্তহিন্দোলা দুলিছে আপন হারা,—
প্রকাশের বেদনায়
(মরম কাঁদিছে হায়)
মূর্ত্তি লভিতে আসিছে কবিতা শঙ্কিত যন্ত্রণায়,—
মন্থর রিমি-ঝিমি,
গুঞ্জিছে মৃদু মধু মধু মর্ম্ম-সোপানপরি,
সহসা মূর্ত্তি ধরি,
নিবেদের তরে কবির সমুখে দাঁড়াল কবিতাপরী,
সেই শুভ অবসরে,
ছায়াখানি তার হৃদয়ের পটে লইল যে কবি এঁ'রে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

ব্যারণ এণ্ড * * * পিপলাই কোম্পানী

হরিবর্দ্ধনের গলির কোন প্রশাখার মধ্যে একটি 'ব্যাচিলার রেফিউজ' ভবনের একতলার পশ্চিম ধারটি ছিল তারক ওস্তাদজীর দখলে। গ্রাম্য নাম ব্যবহারে আমাদের পবিত্র লেখনী কলঙ্কিত করতে পারি না, তাই ইংরাজী শব্দের সাহায্যে আবাসের আখ্যাটা কলা-কলিত করিয়া দিলাম। বৃদ্ধপরীক নিজ পঞ্চদশবর্ষীয় শান্তশিষ্ট দৌহিত্রটিকে লইয়া পঞ্চাশোর্দ্ধে ঐ স্থানটিতেই বসবাস করিতেছিলেন। অন্নদাতাপ্রাণা সেবাকারিণীর স্বর্গগমনের পর প্রীতির পূর্ব্বস্মৃতি তাঁকে ঐ স্থানে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। সংসারে আপনার বলতে তারকের এখন আর কেহই নাই; দৌহিত্র অজিতের-ও ঐ মাতামহ মাত্র ভরসা। ছেলেটির প্রথম মাতার ও পরে পিতার মৃত্যুর পর তার অবরাপন্ন জ্যেঠামশাই অনাথসংসর্গে পাছে নিজের ছেলেগুলি অধঃপাতে যায়, এই আশঙ্কায় ত্রয়োদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে ঘুঘুড়ীর একটি চটের কলে মার্কামারানের কায শিখবার জন্যে ব'লে দেন। কলের বড় বাবুটি সদাশয় ব্যক্তি, তিনি বালকটিকে নিজের বাসায় রেখে দু'বেলা ভাত খেতে দিতে স্বীকৃত হন ও দুটি চাকরের মধ্যে একটিকে ছাড়িয়ে দেন। অনেক খুঁজে খুঁজে অনাথ অজিত নিজের অনাথ মাতামহটিকে আবিষ্কার করে। ঐ বাড়ীর একটি মধ্যবয়স্কা মেয়ে তারককে বাবা বলে ও ঠাকুর্দ্দা নাতির ভাতটি রেঁধে দেয়। অজিত সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ছে,—জোড়াসাঁকোর একটি স্কুলে, হাফ-ফ্রি।

তারকের আদি বাস ঢাকা জিলায়, সেখানকার সহরে সে শঙ্করদা'র কায ক'রে জীবন নির্ব্বাহ করত, কিন্তু ছোকরাদের নৈতিক দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হয়ে বেচারী কলকাতায় এসে কায আরম্ভ করে। ইদানীং নর্ত্তকী-প্রসবিনীরা সেয়ানা হয়েছে, কুমারী কন্যাদের থিয়েটারে পাঠিয়ে গাড়ী চড়িয়ে নাচ-গানটা কিছু কিছু শিখিয়ে আনে, তাতে খেমটাওলা শিক্ষকদের ব্যবসা বড় মন্দা প'ড়ে গেছে। এতে তারকের তত ক্ষতি হ'ত না—যদি ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার সেকেলে হস্তলিখিত বিজ্ঞাপন উপর বৈজ্ঞানিক হাত না পড়ত।

কলকাতায় প্রথম এসে তারক বাসা করে গরাণহাটার ফকির চক্রবর্ত্তীর গলির ভিতরে একখানা খোলার বাড়ীতে। গরাণহাটায় গরাণ কবে বিক্রী হ'ত, তা আমরা দেখি নি, কিন্তু চিৎপুর রোডের উপরেই যেখানে "গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে তিন মাইল" খোদা একখানি পাথর পোতা ছিল, তা'র পাশেই একটি ছোটখাটো বেশোহাটা ছিল বটে; আর কলকাতার ঐ প্রাচীন সারস্বতকুঞ্জ ও পুস্তকপুঞ্জের আশে-পাশে বাস করতো এক শ্রেণীর গুণীলোকের দল—যাদের অনেকে বলতো গাঁটকাটা।

এদের দেহ-ধারণের প্রধান আসবাব ছিল ঘাড় কামানো চুলে বেহদ্দ বাহারের টেরি। যখন দুপুরবেলা নিমতলার ঘাটে নেয়ে ভিজে কাপড় কাঁধে ফেলে কোমরে গামছা জড়িয়ে ঘরে ফিরত, তখনও মাথায় টেরি; কোর মাখানো কাপড়ে ফুলকোচা দুলিয়ে চাদনীর ধোপদস্ত প্রেটওলা কামিজ প'রে জুতার অভাবে শুধু পায়ে রাস্তায় বেরুত, কিন্তু মাথায় আছে সেই টেরি; আবার ঐ টেরির কেয়ারি করা মাথায় অপরাহ্ণ চীনের বাড়ীর চকচকে বার্ণিশ করা জুতার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে অম্লান-বদনে আটহাতি ময়লা ধুতি প'রে হাতকাটা বেনিয়ান গায় দিয়ে অথবা কাঁধে এক-খানি ধব্‌ধবে তোয়ালে ফেলে ফুর্ত্তি করতে বেরুত। এই দলে চার পাঁচ জন ছোট বড় ছোকরা হঠাৎ দুপুরবেলা একটা সাজানো-গোছানো হোটেলে ঢুকে যখন বিশ-পঁচিশ টাকার কাউলকারি,কাটলেট ও বিহাইণ্ড্ বাণ্ডির অর্ডার

দিত, তখন অনেক হুতীচড়া বাবু-ও অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখতেন। আবার চয় ত ঐ বড় খানার তিন চারদিন পরেই দেখা যেতো যে, ঐ দলের জন দুই একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে খাঁটী খাবার চাব গণ্ডা পয়সার জন্যে উৎপাত করছে; দালানো কর্ণা ভেঙ্গে দেবার, তার ছাপানো রামায়ণে পঞ্চাশখানা পাতা বাদ দিয়েছে, খদ্দের এলে-ই ব'লে দেবে, এই সব ভয় দেখাচ্ছে।

ঢাকার থাকতে-ই তারক ওস্তাদজী চন্দ্রসিংহ সিধাটা সব ক'রে প্রাইভেট ইউ দ্বারা কতকটা আন্দাজ ক'রে ফেলেছিল; তার পর এ দেশের কর্ত্তাভজা বা বিলিতী ফিনেশনরা গুপ্ত সঙ্কেতের টেলিগ্রাফিক সাহায্যে যেমন পরস্পরকে চিনে ফেলতে পারে, গরাণহাটার মহাপুরুষরা-ও তারককে তেমন-ই ইনিসিয়েটেড ব'লে বুঝতে পারে। যে অঙ্গুলীর কলা-কৌশলে ওস্তাদজী বেহালার ছড়ি টেনে লোকের মনকে করুণায় কাঁদিয়ে, উল্লাসে নাচিয়ে দিতে পারতো, তবলার চামড়া থেকে ছন্দের বোল বার করতে পারতো, অতি সাধারণ শিক্ষাতেই সেই অঙ্গুলী টেঁকের টাকা, পকেটের ব্যাগ, গলার হার, কোমরের বিছে কেটে বা খুলে নিতে দক্ষ হলো। নৃত্য-কুশল চরণ ও করকৌশলে হরণের প্রতিভা তারককে বরণীয় ক'রে তুলে তখনকার কলকাতার সমস্ত রাহাজানির মহাজনদের চোখে—টেরুক বাগবাজারের খালধার থেকে আরম্ভ ক'রে নাগাৎ কালীঘাটের আদিগঙ্গার কিনারা পর্য্যন্ত।

হায় রে! এই শঠ-নটবরদের লীলাক্ষেত্রভূমি সে বড়-বাজার আজ কোথায় গেল! হিন্দুস্থানের হুণ্ডামী-গুণ্ডামী বড়বাজারে এখন যথেষ্ট আছে। হুণ্ডীর, তেজিমন্দির ফন্দিতে লোভীর মুণ্ডপাত ও পিণ্ডিচটকান বেশ চলে; কিন্তু যাদালার নিজস্ব সম্পত্তি বনবাদুড়ের ছাড়খানা ঠেকিয়ে গুলী গুড়ানো বিছেটা যেন কোথায় উধাও হয়ে উড়ে গেছে। কি আর বলবো, কলকেতার যে প্রসিদ্ধ পল্লীতে এক দিন এই বঙ্গের বিশেষ বিশেষ জেলার মহাপুরুষগণ সিদ্ধবিদ্যার বলে আজ পর্য্যন্ত কত জনরঞ্জন আখ্যায়িকার নায়করূপে লোকের স্মৃতিতে জাগরিত রয়েছেন, সেই সব জেলার জন্ম নিয়ে এখন দুয় ত পাঁচ সাত জন ছোট আদা-লতের কেরতা বি, এল্ সন্ধ্যার সময় মাড়োয়ারীদের দোকানে টাকায় দু'খানা তিনখানা ক'রে উকীলের চিঠি দেরি ক'রে বেড়ায়।

বছর কতক পূর্ব্বে এক আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমীর সন্ধ্যাকে প্রদীপের আলো দেখিয়ে ও শঙ্খের রবে সহরে আহ্বান করবার পর তারক ওস্তাদজী কয়েকটি পুরাতন মিত্র ও কর্ম্ম-সহযোগীর সঙ্গে ব'সে আলাপ-পরিচয় কচ্ছে।

নকুড়। আর দাদা, আজ দিনটে কি বল দিকি—মহাপঞ্চমী; দেবী হয় ত এতক্ষণ পাতুয়া পার হয়ে এসে-ছেন; পরশু রাত না পোয়াতে পোয়াতে জোছনী দিদী মশায় এই কল্‌কেতায় পদার্পণ করবেন, আর আমরা—আমরা চুলোয় যাক্, স্বয়ং ওস্তাদ দাদা এই কুটুরীর ভেতর পিদীম জেলে ব'সে তামাক টান্‌ছেন!

ফকির। সৈরবী নাকনাড়া দিয়ে বলে কি না, জিনুষে কেবল কুড়ে হয়ে ঘরে ব'সে থাকবে, একটু কষ্ট-কাষের চেষ্টায় বেরুবে না, আরে, বোঝে না যে, কাষের জন্যে কষ্ট, চেষ্টা ক'রে কি কাষের ছিষ্টি করা যায়?

হাবুল। যায়,—ফকিরচাঁদ—যায়; কিন্তু সময় বদলে গেছে; এই যে আমারই ঠাকুরদাদা কলাগেছের এক পাঠ-শালা খুলে গুরুগিরির জোরে বেটুকু জমীজায়গা ক'রে রেখে গাছেন, তার-ই আহ্বরে এখন-ও দেশে ভাতটা আছে, কিন্তু সেই কড়ায়ে গণ্ডাকে পড়িয়ে আর সেব-কচ্ছি লিখিয়ে এখন আর মাসে দেড় টাকা-ও রোজগার হয় না।

পুঁটে। তা হাবুল কাকা, তুমি-ও ত এক দিন কাকীমাকে বাজু-পৈচে, দড়াহার পরিয়েছ—কমটা করেছ কি?

হাবুল। ওরে পুঁটে, শুধু কি পরিবারের গায়ে গয়না দিয়েছি—সে ত সবাই দেয়, এই হাবুল ঘোষ বেহু মা'র হাতে পর্য্যন্ত সোনার পৈচে পরিয়েছে; তোর হাইকোর্টের কটা টার্ণি এ পর্য্যন্ত তা পরাতে পেরেছে বল দিকিন্?

নকুড়। বুঝেছি হাবুল! তুমি যা বলছ, তা বুঝতে পেরেছি, একটু লেখাপড়া না শিখলে এখন কোন কাযই চলে না। কিন্তু আমাদের মোহন চাটুয্যে মশাই ত লিখতে পড়তে অদ্বিতীয় ছেল। কুটপাতে দাঁড়িয়ে পাহারা-ওলা জমাদার,—আর 'একবার পাঞ্জিখানা বার কর ত দেখে নেবো' ব'লে ওয়ত সোদাগরের দোকানে ঢুকে বেমালুম মাল জমা দিয়ে আসতে এক দিকে যেমন পাত্তেন, তেমনি

কর্ত্তা বোচ্ছপুরাণ এক নিশ্বাসে বলে দিতে পারেন। আহা! সেই সরস্বতী যখন বটতলা ছেড়ে গোলদীঘি অঞ্চলে বাসা নিলেন, তখন চাটুয্যের অর্দ্ধেকটা উপাজ্জন ক'মে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই বোবসার এই দুরবস্থা, শেষে ধামুনের ছেলেকে অন্ধ হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে স্বর্গে যেতে হয়েছে।

ফকির। মা-ই হোন আর মাই হোন, পষ্ট কথা কইব, সরস্বতী এই বেহ্মহত্যের ফল হাতে হাতে পেয়েওছেন। ধর, এই বিডন ষ্ট্রীটের চৌমাথা থেকে আরম্ভ ক'রে হাটখোলার মোড় পর্য্যন্ত সোনাগাছির ভেতরটা নিয়ে যতগুলো সরস্বতী পিরতিমে আগে আস্তো? বোধ করি, পঁচিশ তিরিশটে হাত-পেরেম দিন-রাত খেটে-ও নেবত্তোরের পত্তর ছেপে কুলিয়ে উঠতে পাত্তো না, আর এখন কটা খেদ্‌টা-উলী পূজো আনে?

তারক ওস্তাগরী এতক্ষণ কোন কথা-ই কয় নি; এখন নকুড়কে ঘরের কোণ থেকে হুঁকোটা নিতে ব'লে নিজের কলির কল্‌কেটা খুলে তার হাতে দিলে। তার পর বল্‌লে, "এর ভেতরকার মশ্মটা কিছু বুঝছ, না, কবে ঘি খেয়েছ, আজও হাতে তার গন্ধ ওঁকছ?"

পুঁটে। তা জ্যোটামশাই, তোমার মত পাকা মাথা এ কলকাতায় কটা ওস্তীর আছে যে, এ সব কাযের মশ্ম গেরণ করতে পেরে উঠবে?

তারক। বলি ফকির, আমাদের বাংলা বিদ্যের এখন কি আর মাত্তি আছে! অই বাবুরা যে দেশ দেশ করেন, ওটা খালি মুখের বচন। বাংলা ত বাংলা, অমন সমস্কৃত, যাতে কবি কালিদাস স্বয়ং লিখে গেছেন, "চোর বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা", আর "দিঁদ বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়েন মারা", সেই সমস্কৃতই এখন মৃত-প্রায়। বলি, বাংলা কাবকে এখনকার লোক ছোট লোকের কায বলে, তা জান? অর্থাৎ পাকিটটা-আসটার হাত দেওয়া, গোট জিজির কেটে নেওয়া, কি সীলের বার কেটে দেখিয়ে রজায় বেকার ব'লে ভোঁতা ছুরি বিক্রী করার নাম হয়েছে জোচ্চুরী—গাঁটকাটাগিরী। আপনাদের যা হবার, তা ত হয়ে-ই গেছে, এখন যদি ছেলেপুলেগুলোকে 'মানুষ' করতে চাও ত ভাল ক'রে ইংরিজী পাশ মেরে দিতে পারে, তা হ'লে সে আর ঘাস কাটবে না, পুরুষ পুরুষের রক্তের জোরে বড় বড় উকীলরা পর্য্যন্ত তাদের কাছে দাঁড়াতে পাবে না।

ফকির। এ কথা বাবা, তোমার মাল্লা পেতে নি; আপনা-আপনির ভেতর তাই বলছি, আমাদের নজরটা যে একটু ছোট, তার আর নিঃসন্দ কি; ইংরিজীওয়ালাদের নজর উঁচু দিকে, তার উপর সৈনী বলেই হোক, আর বাপ-পিতাম্মোর পুণ্যেতেই হোক, নিজের কথা আর বলব না, —তারকদার ছেলে জন্ম—ঐ আমাদের হাবুলের মত যদি হাত সাফাই থাকে, তা হ'লে একটা হরফের এদিক্-ওদিক্ ক'রে বা একটা পুরির ঘোরফেরে বাজারকে বাজার মেরে ইন্‌সল্‌ভেন্ট নিয়ে ঘরে দোর দে বসতে পারে।

এই সময়ে সদর দরজায় কে কড়ানাড়া দেওয়ায় পুঁটে দিয়ে ঘোরটা খুলে দিলে, ঘরে দু'টি ভারিক্কে গোছ ভদ্রলোক প্রবেশ করলে।

"দারোগা মশাই যে, এঁা, একে সঙ্গে, জমাদার সাহেব!" ব'লে তারকগোবিন্দ শশব্যস্তে উঠে নমস্কার ও সেলাম ক'রে চৌকীর পাশে যে একখানি আলাদা বেঞ্চ ছিল, তাতে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে বসালে। দারোগা মশাই হচ্ছেন মেহেরপুরের করালীকান্ত নস্কর; বেঙ্গল পুলিসের ৩।৪টা জেলায় ঘুরে পেন্সন নেবার আগে প্রায় ৯।১০ বছর কলকেতার টিক্‌টিকি বিভাগে কায ক'রে গেছেন; আর জমাদার সাহেবের দৌলৎখান শ্রীপাট পটুয়াখালী, নাম আলাল-উদ্দীন, হিঁদু হালাদের জোবান ঘোরস্ত নয় বলে তিনি যখন হাটখোলা থানার বড় জমাদার পদে মোতায়েন ছিলেন, তাঁকে লোক জালিয়াৎ মিয়া ব'লে-ই ডাকত।

বহুদিনের পরিচয়, বিষয়কর্ম্মের সূত্রে দু'জনে-ই এক-প্রকার তারক ওস্তাদের দলের মুরুব্বী, কৃতজ্ঞতা-গুণে উভয়ে উভয়ের পাশে আবদ্ধ, পেন্‌সনান্তে কলিকাতা ত্যাগের পর এই প্রথম সাক্ষাৎ।

করালী দারোগা গম্ভীর বিমর্ষভাবে বল্‌লেন, "সব শুনেছি তারক ভায়া, সব শুনেছি; দেখাসাক্ষাৎ না হ'লেও তোমাদের মায়া আজ-ও কাটাতে পাল্লাম কৈ? সৈরভের মতন মানুষ কি আর জন্মাবে, যাকে জেণ্টেল-ম্যান বলতে হয়—পুরো তাই! ও কোণে ব'সে কে, নকুড় না?"

নকুড়। এজ্ঞে, আমাকে সেই পুরুষের ন্যায় নকুড়ে বলেই ডাকবেন।

করালী। তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস্।

নকুড়। সে দিন আর নেই হুজুর, সে দিন আর নেই; চক্ষে দেখছেন ত, মহাপঞ্চমীর রাত, আর এ ক'টিতে আজ শুক্‌নো ব'সে আছি।

করালী। কায-কর্ম্মের গতিক খারাপ? তা, আগেই বুঝতে পেরেছিলাম; নইলে বড় সাহেব এস্টেবলসন দিতে চেয়েছিলেন, তা বল্লাম, হুজুর, মাফ করবেন। তা মনে পড়ে কি নকুড়, বাগ্‌বাজারে একটা তুলারক সেরে অন্ন-পুরোর ঘাটের ওছান দে ফিরতেছি, টাটকা ধরা এক-জোড়া উল্‌সে মাছ হাতে একটা বাবুর মতন সাজগোজ ছোক্‌রা পড়ল সাম্‌নে; রাত্তির তখন দশটা হবে, কাবেই শোবে হ'ল, এটা চোরাই মাল-নিবাস্; কিন্তু তক্কাতক্কি করবার চেষ্টায় ছিল জোড়াটা; সঙ্গে আর্দ্দালী ছিল উদো খাঁ, হুকুম দিলাম, সরকারে জমা দিতে হবে, সে মাছ দু'টো কেড়ে। কি বল তারকগোবিন্দ, মনে ক'রে দিয়ে আর তোমার চোখে জল আনব না, কিন্তু সেই রেতে সৈরভ সেই মাছ রান্নিয়ে,—আহা, লঙ্কাবাটা-মাখা উল্‌সে মাছ ভাজা গরম গরম কত বার খেয়েছি, কিন্তু সৈরভের হাতের ভাজা মাছের তার এখনও যেন মুখে লেগে আছে। চড়কডাঙ্গার মোড়ে নকুড়ের সঙ্গে দেখা, নোড়তলা থেকে দুটো খাঁটি নিয়ে ওই আমার সঙ্গে এখানে আসে। হাবুলও ত ছিলি সে রেতে?

হাবুল। সে কথা আর পাপমুখে ব্যাক্ত করি কি ক'রে।

জালাল। উটি তোমার ভেয়ের বেটা না,হাবুল ঘোষ? চ্যাংড়াটা দেখেছিলুম; একবার আহিরীটোলা ঘাট থেকে একটা ঘটী সরিয়ে সাত বেত হয়; এখন কেমন, হাত বেশ সাফ হয়েছে?

হাবুল। দিনপাত চলে না জমাদার সাহেব, বলতে গেলে দিনপাত চলে না; হাত সাফ হ'লে হবে কি!

আগন্তুকদের বসিয়ে তারক একবার নকুড়কে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়েছিল; কথাবার্ত্তা যখন এই পর্য্যন্ত চলেছে, তখন একটি কাল বোতল আর একটা পাল-পাতার বড় ঠোঙ্গা হাতে নকুড়চন্দ্র ফিরে এল। করালী দারোগা বল্‌লে, "এ সব আবার কি তারক ভায়া! একে সময়টা ভত ভাল নয়, এত উদ্যোগ কেন?"

তারক দু'টি হাত যোড় ক'রে বললে, "আজ আমার কি শুভ দিনটে বলুন ত দারোগা মশাই? আমরা চাকার লোক, বন্ধুকেও ভুলি না—শত্রুকেও ভুলি না; আপনি আর এই জমাদার সাহেব আমাদের কত উপকার করেছেন বলুন দেখি।"

করালী। সেটা পরস্পর দেয়াদায়—সেটা উভয়তঃ; তোমরাও আমার সাহায্যি করেছ, আমিও সাদ্দিমত যা পেরেছি, তা করেছি।

তারক। আর যা ভুলি, আর যা করি, হাড়কাটা গলির নিস্তারের ঘরের ব্যাপারটা। জন্মেও বিস্মিত হ'তে পারব না।

করালী হো হো ক'রে হেসে উঠল। বল্‌লে, "সে মামলাটার কথা জালালউদ্দীন তুমিও বুঝি শোন নি? বোধ হয়, তখন তুমি সুকেস্ ইন্‌ভিটে। তারকদা তখন বেড়াভাঙ্গার জমীদার; সঙ্গে মোসাহেবটা ছিল কে ভায়া?

তারক। আহা, বেচারী আলিপুরে থাকতে থাকতেই রক্ত-আমাশয়ে মারা গেছে; আমাদের এই ফকিরের মামাত ভাই মধু মাইতি, দেয়ালের খড়া বেয়ে জান্‌লা দিয়ে ভেতালার ঘরে ঢুকে হাত-বাক্সর হাতল দাঁতে ধ'রে বেমালুম নেমে এসেছে, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

জালাল। সে সব মানুষ আর জন্মাবে না তারক, সে সব মানুষ আর জন্মাবে না। খোদ আশমানের গাসফর, কেরামত দেখাতে দু'রোজের জন্যে ওঁরা মাঝে মাঝে দুনিয়ার মাটীতে কদম ঠেকাতে আসেন। আমাদের বরিশাল জেলায় অবনি একটি মহাপুরুষ ছেল; তিনি ফকিরের চেহারা নিজেই ভিক্ষে ক'রে ঘুরতেন, ফৌত হবার পর দেখা গেছল, তাঁর কাঁথার জুব্বার ভেতর সিলেই করা ছেল, সন্তর খান সোনার মোহর।

করালী। তা যা বলছিলাম, তারক ভায়া জমীদার সেজেও ছিল খুব জবর; ইয়া চার আঙ্গুল চওড়া চারকোণা পেড়ে কোঁচান ধুতি, তসরের চীনেকোটের উপর সামনে রুমাল, পিছন দিকে ছাতার কাপড় জোড়া ওয়াসকোট, গলায় উঁয়াজী ছড়া সোনার চেন, সোনা তারে বলছি, তা

অবিশ্যি সবাই বুঝছ, তেমনি একটা হীরে-চুনির আংটী হাতে, আর জুতো ত একেবারে খাঁটী লাকচাঁদ! মাগীর জোটে খাঁটী, কিন্তু বিয়াইব ব্রাণ্ডি পেয়ে যত পেয়েছে দিলে একেবারে কাত হয়ে পড়েছে। অমন অবস্থায় তদ্দর লোক হয়ে, গয়নাগাটী পরা মাতাল মেয়েমানুষকে একলা ফেলে আসে কি ক'রে? কোমরের বিচে, গলার হার, তাগা-ফাগা খোলা তত শক্ত নয়, কিন্তু নাকের নাকচাবি, কানের মাকড়ি পর্য্যন্ত আদাড় ক'রে নেওয়া, কাঁচা হাতের কাম নয়।

জালাল। তা তকীগদে তারককে কেউ সেনাক্ত করলে না কি?

তারক। ঠিক তকীগদে নয় জমাদার সাহেব, পুলিস সহজে এ সব হুকম করে না। উমো ব'লে এক বেটা দাগী থাকত কড়েয়ার ওদিকে, সেই মেমকহারার বেটার সাথে মধুর কত্তকটা পরচে ছিল, মধোটার আর সব ভাল, কেবল মদ খেলে মুখটা আলগা হয়ে যেত। শুনে উমো শালা মধুর কাছে এক বখরা চায়, মধু বলে, তোরা ভিন্‌দলের, তোদের বখরা দেব কিসের তরে? এই রাগে হারামজাদা গিয়ে মুচিপাড়ার সার্জ্জন রেবরো সাহেবকে মধুর আর আমার নাম ব'লে দেয়।

করালী। ধর্ম্মের কল, তারকদা উঠে আস্‌বার কিছু পরেই একটা ছোঁড়া গিয়ে নিস্তারের ঘরে ঢোকে; ঠেলে-ঠুলে-ও বোধ হয় তাকে ঠেলাতে পারে নি, তাই খানিক পরেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়; বাড়ীউলী সে ছোঁড়াকে চিনত। নিস্তারও জ্ঞান হবার পর কবুল করে যে, সে মাঝে মাঝে তার ঘরে আস্‌ত।

জালাল। বুঝছি বুঝছি, আশনাই—আশনাই।

করালী। আশনাই হোক আর যা-ই হোক, করালী রায় পেয়ে গেল কেস্ সাজাবার রোশনাই। ছোঁড়াটা বিস্তর কান্না-কাটা করেছিল; এমন কি, তার এক মাগী পিসী তার নিজের গলা থেকে মটরমালা খুলে আমার পায়ের কাছে ধ'রে দিয়েছিল; কিন্তু আমরা পুলিসের লোক, ইংরেজের নিজের হাতে বানানো, পরোপকার পরম ধর্ম্ম, এ কথা আমরা ভুলি না। তবে তাও বলি, তারক আমার সঙ্গে যথেষ্ট—

তাড়াতাড়ি মুখ চাপা দিয়ে তারক ব'লে উঠল, "ও কথা তুলবেন না, দারোগা মশাই—ও কথা মুখে আনবেন না।"

মাস ফিরছে, পুরানো গন্ধ বেশ জ'মে গেছে, এমন সময় দরজার বাইরে থেকে অজিত জিজ্ঞাসা করলে, "মাসী সুধুচ্ছে, তোমার কি খাবার দেরী আছে দাদা-মশাই?" তারক অজিতকে একটু দেরী করতে ব'লে দারোগার দিকে চেয়ে পরিচয় দিলে—ওটি আমার দৌত্তুর; আর তাকে ঘরে আস্‌তে ডেকে বললে, "অজিত, এই দু'জন আমার সেকেলে মুরুব্বী, এঁদের নমস্কার সেলাম-টেলাম কর।" অনুমতি প্রতিপালনের পর দারোগা বললে, "তোমার নাম অজিত? তা বেশ বেশ, এ দুনিয়ায় সবাইকে জিতে যেতে হবে, এটা মনে রেখ।"

তারক। দুটো উপদেশ দিন দারোগা মশাই, বংশে বাতি দিতে ঐ একমাত্র শিবরাত্রির সলতে। মনের কষ্ট, অথকষ্ট, তবুও ওটাকে পয়সা খরচ ক'রে লেখাপড়া শেখাচ্ছি—যাতে মানুষ হয়ে পুরুষানুক্রমের নামটা বজায় রাখতে পারে।

করালী। আমাদের মতন টপ্‌-নট ইংরিজী শিখে এ বাজারে জয় করা আর যে চলবে, তা ত বোধ হয় না। তোমার বাপদাদার লাইনেই যেতে চাও, কি আমাদের পুলিস ডিপার্টমেণ্টেই ঢোক, দু'টো তিনটে ইংরিজী পাশের কম কোন দিকেই দু'পায়ে দাঁড়াতে পারবেক না। বিশ পঁচিশ ভরি সোনা পরানো, কি মালিকের চোখে ধুলো দিয়ে দু'শো দেড়শো টাকা মারা হাতায়, এখনকার বাজারে তাদের কিছু মাল্লি নেই, লোকে বলে ছিঁচকে। পেটি দোকানী আর জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীতে যা তফাৎ; রেল এষ্টেশনের "উঠাইগিরের" আর ২০।৫০ হাজার বাজার-মারার ইংরিজী বোরত হাতের কস্তুতে তাই তফাৎ। অই হিষ্টিরি-টিষ্টিরির ভেতর থেকে নতুন নতুন মতলব বের করতে পারলে তবে কাবে বাহাদুরী পাবে।

অজিত যে সব কথার মর্ম্মগ্রহণ করতে পারছিল, ঠিক তা নয়, তবে অবাক্ হয়ে দারোগা বাবুর মুখের দিকে চেয়ে সব শুনতে লাগল।

জালালউদ্দীন বললে, "কি বলব, মুখের বড়াই নয়, পুরোনো সব রেপটে এই গরীব মোছলমানের ছাওয়ালের নাম হাতে-কলমে লেকা আছে: কিছু না হবে ত জালাল

পুলিসে থাকতে আট দশটা ভারি ভারি ডাকাতীর আস্কারা করেছি; কাপ্তেন মতির মতন ওস্তাদ জালিয়াতও পুজো আর মহরমের ওকে কি বছর নজর দিয়ে গেছে, কিন্তু এই দুটো পাকা চোখের সামনে দিয়ে বাহিন্দির মাষ্টার যে কারচুপী ক'রে গেল, তা তখনে বলবো যে, এটা আরব মুলুকের কেচ্ছা!"

ক'জনেরই শরীরটা তখন চমচমে হয়েছে, মনও খুলে গেছে, দারোগা মশাই বল্লেন, "বলো বলো, তোমার সে গল্পটা জমাদার সাহেব এঁদের সবাইকে—বিশেষ আমাদের অভিত ভায়াকে শুনিয়ে দাও। তারক ভায়া, একবার দোক্ত-কলকেটা আর এক চিলকে কাগজ দাও ত।" লিখতে লিখতে বল্‌তে লাগলেন, "যদি মুখে গল্পই করা গেল, একটু ভাল করেই তাজা হয়ে নেওয়া যাক, বহেশ এখনও বোড়াসাঁকোর দোকানে আছে, করালী রায়ের সইটা অমাক্তি করতে পারবে না; পুঁটিরাম, একবার ঘা বাবা, চট্ ক'রে ঘুরে আয়।"

কাগজখানা নিয়ে পুঁটিরাম বেরিয়ে গেল। তখন দারোগা জালালকে তার সেই পুরোনো গল্প বল্‌তে অনুরোধ করলে।

জমাদার সাহেব আরম্ভ করলেন :—

"তখন আমি জানাহাবাদ, যার নাম আজকাল আরামবাগ হইছে, সেই থানার অধীন কি জানি কি গাঁটার নাম মনে আসছে না, সেখানকার কাঁড়ীর বড় জমাদার; গোষাটার সন্ন দিন হ'ল সায়েবের বাড়ী থেকে একটা বড় চুরী হয়ে গেছে, আমাদের হুদো না হলেও সে চুরীর কথা-বার্ত্তা আমরা ব'সে কইছি, রাত্তির দু' ঘড়ীর কাছাকাছি, এমন সময় সামনের রাস্তার উত্তর বাগ থেকে একটা গোল আর লোকজনের পায়ের শব্দ শোনা গেল; দেখতে না দেখতে একেবারে ৬৭ জন জানটাপিল, দুটো যুম্মো জোয়ান হাতকড়ি লাগান চোরকে নিয়ে খোদ এক ইনিস্‌পেক্টর বাবুর সঙ্গে কাঁড়ী ঘরের সামনে খাড়া। চুরীটা সরিয়ে রেখে মুই ত তাড়াতাড়ি উঠে ফটকওয়ালাকে বল্লাম, ঘর থেকে কুরসীখানা বের ক'রে দিতে, সেলাম করতে গিয়ে দেখলাম, ইনিস্‌পেক্টর বাবুটি যেন চেনা চেনা ব'লে মালুম হ'ল। বাবু একটু মুচকে হেসে বল্লেন, 'তুমি আমায় চিনতে পারবে না বড় জমাদার, কিন্তু তুমি যে সরকারের নেমকের ইজ্জৎ কত বার রেখেছ, তা আমি ফজলুল সাহেবের কাছে শুনিছি; আমি অল্পদিনই হ'ল মেদিনীপুর থেকে বদলী হয়ে আরামবাগের থানায় ছোট সব ইন্সপেক্টর হয়ে এসেছি। বোধ হয়, নিমাই হাজরার নাম শুনে থাকবে, আমি সেই নিমাই দারোগা।'

"না শুনলেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ব'লে ফেল্লাম, শুনছি বই কি, হুজুরের নাম কোথায় ছাপা আছে, ফজলুল সাহেবের মত নামজাদা পুলিস ইনিস্‌পেক্টর যেনার কাছে এই গরীবের খোসনাম করেছেন, তিনিও অবিশ্যি কেউ-কেটা নন। হাত যোড় ক'রে বললাম, 'এক আধটা পানের খিলি এনায়েৎ করবেন কি?' নতুন দারোগা সাহেব বল্লেন, 'তা আপত্তি নেই, তবে মেহনতটা বড় হয়েছে, একটু তামাক টান্‌তে পারলে ভাল হয়।' হুঁকার অসুবিধার কথা আরজি করতে হুজুর বল্লেন, 'ওহে, আমি পাশ ক'রে এক্‌জামিন দিয়ে পুলিসে ঢুকেছি, পৈতে একগাছা গলায় ঝোলাই বটে, তা ব'লে—এখানে একটা কুরসী ছিল না?' সবে তাওয়াটি ধ'রে এসেছিল, তাই শুদ্ধ কুরসীটি আমি নিজে হাতে ক'রে এগিয়ে দিলুম। তামাক টান্‌তে টান্‌তে বাবু বল্লেন, 'সায়েবের বাড়ীর অত বড় চুরীটার অনেকটা কিনারা ক'রে এনেছি, এ দু' বেটার সঙ্গে আর কে কে ছিল, সে নাম এখনও প্রকাশ করছে না, তবে কতকগুলো মাল সেনাক্ত করেছে, ওই আজু বিয়ার হাতে যে বড় পুঁটুলীটা দেখছো, ওতেই আছে, সেগুলো থানায় নিয়ে যাচ্ছি; বিন্দু পোদ্দারটা তেলক-ফেলক কেটে ভক্ত সাজে বটে, কিন্তু চোরাই মাল কেনবার যাদু, আজ আমার হাতে ধরা পড়েছে।' বিন্দু পোদ্দারকে আমি সত্যি সত্যিই গো-বেচারা ব'লে জান্‌তাম, তার এই আচরণ শুনে থতকে গেলাম। বাবু বলতে লাগলেন, 'পোদ্দারটার সিন্দুক খুলিয়ে আমরা মাল—চোরাই মাল বের করছি দেখেই সে বেচেইন হয়ে পড়েছিল, দু'টো চৌকীদারকে মোতায়েন রেখে এসেছি চালা হলেই সাথে ক'রে থানায় নিয়ে আসবে।'

"পান-তামাক খেয়ে বাবু বেশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, আমি দা একটু সেবা-সুশ্রূষা করেছি, তার জন্যে আমায় খুব ধোসনাম করলেন, আমায় ভরসা দিলেন যে, ফজলুল সাহেবকে কাল বিয়ানেই আগে আমার বাত সব-শোনাবেন, আর বাতে আমার জমাদারী তরক্কী হয়, এর জন্যে সুপারিশ

ক'রে সেপরন্টোন সায়েবকে রেপট লিখতে বলবেন। আমি দু'টোর বারগায় আটটাই সেলাম ক'রে বসলাম। দক্ষিণে বসীটাক পথ যেতে না যেতে বাবলা-জোপের মহাড়া থেকেই বেদি, বাবু একা ফিরছেন, আমিও পা-কর এগিয়ে গেলাম; সামনা-সামনি হতেই বাবু আমায় বললেন, 'বড় জমাদার সাহেব, দেখছি, বড় মুস্কিলে পে পড়লাম।' আমি কইলাম, 'আজ্ঞে।' বাবু বললেন, 'পাকেটে হাত দে দেখি, মুনিব্যাগটা ভুলে খুয়ে এয়েছি; এখন উপায়?' আমি আবার বললাম, 'আজ্ঞে।' বাবু যেন আপনি-আপনিই ভাবতে ভাবতে বলতে লাগলেন, "আসামী দু'টো চোরই হোক্ আর যাই হোক্, মনিষ্যি ত বটে, সেই সকাল থেকে টানা-হেঁচড়ানি খাচ্ছে, এক ফোঁটা জলও পেটে যায় নি, আর চৌকীদার ব্যাটাও দেখছি হয়রাণ হয়ে পড়েছে; কিছু এদের পেটে না দিয়ে কি ক'রে এত রাত্রে খানা অবধি নিয়ে যাই;—গোটা দুই-আড়াই—তা তুমি নিজে দারোগা মাইনে পাও, তাতে সাত মানুষ, বে-আইনী এক পয়সাও ছোঁও না,—কাল সন্ধ্যা নাগাত আমার অর্দ্ধাঙ্গী এসে জমা দিয়ে যাবে—গোটা-দুই-আড়াই।"

"গরীব আমি, তা সত্যি, কিন্তু তা ব'লে আর এক জন আমায় গরীব মনে করবে, এটা বুকে সয় না; এর উপর বে-আইনী এক পয়সা ছুঁইনে, এটা একটা ইজ্জতের কথা, কাযেই বললাম, 'বাবু, এক লহমা সবুর করেন, এই কাঁড়ীর দোরটুকু পেতে আর আসতে।' এ দিন বেয়ানে কানাই গাঁজাওয়ালা মাসকাবারী পাশ খাবার চার টাকা জমা দিয়ে গিয়েছিল, সেই চারটে নগদ ঝক্‌ঝকে টাকা এনে বাবুর হাতে দিয়ে বললাম, 'গোলামের যা কিছু, তা ত হুজুরদেরই দৌলতে, তাতে পথে কোথায় কি দরকার হ'তে পারে, কে জানে, তা সওয়ায় আপনাকেও ত এক আধটা সোটা-অরটার-টরটার খেতে হবে, এই কিঞ্চিৎ নিয়ে যান, যখন মর্জ্জি হবে, পোটিয়ে দেবেন।'

"বাবু টাকা চারটি পকেটে পুরে আমার হাতখানা ধ'রে নাড়া দিলেন, একেবারে সেকেণ্ড, বুঝলে, তারকগোবিন্দ, একেবারে সেকেণ্ড—সেকেণ্ড।

"তার পর শোনা গেল, রেতের বেলা হঠাৎ পুলিস ঢুকতে দেখে বিশু পোদ্দারের বুক শুকিয়ে গিয়েছিল; ইন্সপিক্টার বাবু বলেন, তার দিদুকে চোরাই মাল আছে; চাবি খুলতে অনেক সোনারূপোর গয়না তার ভেতর দেখা যায়। সে বলে, তার তেজারতি কায আছে; এ সব তার বন্ধকী গয়না; কিন্তু দু'জন চোর ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বলে যে, ঐ সবের মধ্যে বেশীর ভাগই তারা সা'য়েবের বাড়ী থেকে চুরী ক'রে এনে বিশু পোদ্দার মশাইকে ৪ শত ৭৩ টাকা দাড়ে ৩ আনায় বেচে যায়। এই শুনেই সে রাখা খুয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। জ্ঞান হয়ে চৌকীদার-চৌকীদার সব চ'লে গেছে দেখে তার ধড়ে প্রাণ আসে। ভোরে উঠে সিন্দুক খুলেই দেখে যে, দু'পাঁচখানা কুচো গয়না ছাড়া সিন্দুক খালি; তখন সে থানায় গিয়ে হাজির হ'তে সেখানে শোনে যে, পুলিস এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানে না, সা'য়েবের বাড়ীর চুরীর তদন্ত চলছে, এই পর্য্যন্ত। জালাল আরও বললে, দারোগা মশাই, আপনার গোড় ছুঁয়ে কসম করতে পারি, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নেমাজ করি, তার উপর তখন পুলিসে আমার প্রায় ২০ বছর কেটে গেছে, আমার হুকুমের ধন চার চার টাকা চক্ষে ধুলো দিয়ে নিয়ে গেল। হালার সাজাই ইনিসপিক্টারের বেড় হাজার টাকার উপর গয়না খেয়েও পেট পুরলো না।"

উপস্থিত সকলেই একবাক্যে সাধুবাদ দিয়ে এই সুদক্ষ তস্কর-বীরের নাম জানবার জন্য ব্যাকুল হ'ল, ফকির জিজ্ঞাসা করলে, "ভদ্রলোক ধরা পড়ে নি ত?"

জালাল উত্তর করলে, "মাহিন্দির মাষ্টারের যে নাম করেছি, সে এক সময় ম্যাটারী করত, কিন্তু পরের গোলামী করবে না ব'লে চাকরী ছেড়ে বড়ীবাজী ক'রে বেড়াত; বর্দ্ধমানের পুলিস তাকে সোজে ক'রে ধ'রে আনে, কিন্তু হুগলীর গগন উকীলের জেরার জোরে সে আদালত থেকে বে-কসুর খালাস পেয়ে যায়।"

"বাহবা বাহবা" ব'লে একটা আনন্দ-ধ্বনিতে ঘরখানা যেন কেঁপে উঠল, "মাহিন্দির মাষ্টারকি জয়" ব'লে সকলে এক এক পাত্র টেনে নিলে।

তারক মন্তব্য প্রকাশ করলে যে, বাহাদুরী কাযে আমাদের ওপর যদি কেউ থাকে, তা হ'লে সে উকীল; এই জন্যেই ছোঁড়াকে ভাল ক'রে লেখা-পড়াটা শেখাচ্ছি; মনের শেষ সাধ যে, যাবার আগে অজিতের মাথায় শালের সামলা, আর হাতে ফৌজদারী মামলা দেখে চক্ষু বুজব।

* * * *

উপরি-উক্ত শুভ পঞ্চমীর মজলিস বরখাস্ত হবার পর আর দু'দুটো পঞ্চমী চ'লে গেছে; অজিত এন্‌ট্রেন্স পাশ ক'রে সেন্ট্রাল কলেজে পড়ছে। ফাল্গুন মাসের ঘোর-পূর্ণিমা, গঙ্গাস্নানে যাবে ব'লে তারক তেল-টেল মেখে প্রস্তুত, এমন সময় ফকির প্রস্তাব করলে, "আজ একটা দিনের মত দিন, ঠাকুর-ঠাকরুণ দোলায় দুলছেন, আর আমরা একটু প্রাণটাকে দুলিয়ে নেব না, টিপ তৈরী, ধোঁয়াযাত্রাটা ক'রে নিয়ে যাওয়া যাক।"

নকুড়, ফকির-টকির সবাই এক বাক্যে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালে। প্রসাদ ক'রে দেবার জন্য তারক সোয়া টানটি জোরে মেরে গাঁজার কল্কেটি ফকিরের হাতে দিয়েই দেয়ালে ঠেস মেরে ঢ'লে পড়ল, দুই চক্ষু কপালে, নাকের নিশ্বাস, বুকের ধুক ধুক দুই-ই বন্ধ। মুখ দিয়ে গোবিন্দও বলতে হ'ল না, মলে সবাই যেমন যায়, তারকও তেমনই গোলোকধামে গেল।

হরি বর্দ্ধনের গলির লোক জেনে পড়ল কাল বাড়ীওয়ালীর ঐ পুণ্যমন্দিরে। এমন 'মিতা' এ কলিকালে কেউ কখন দেখেনি, সাধুপুরুষরা ঐ রকম ব'সে ব'সে কথা কইতে কইতেই যান। যে স্ত্রীলোকটি তারককে বাবা ব'লে ডাকত, মরাকান্নার অনেকগুলি বচন তার মুখস্থ ছিল, নাকি সুর সপ্তমের উপর তুলে সেইগুলি সে নিকটস্থ ও দূরস্থ সর্ব্ব-সাধারণকে শোনালে। এই অভাগিনীদের কতকগুলি গুণ আছে, তার মধ্যে নিরাশ্রয়ার রোগশয্যার সেবা-পথ্যদান একটি, আর একটি শববাহকের অভাব হ'লে এগিয়ে গিয়ে খাটে কাঁধ দেওয়া। অনেকগুলি নর-নারী একত্র হয়ে তারকের শবস্কন্ধে নিমতলা ঘাটাভিমুখে শোভাযাত্রা করলে। নকুড় ছুটল অজিতকে কলেজ থেকে ঘাটে নিয়ে যেতে; বলতে বলতে গেল, "দাদার একটা সাধ পূরল না, অজিতের উকীলীটা দেখে যেতে পারলে না।"

কলেজে ভর্ত্তি হ'য়েই অজিত মাতামহের কাছে প্রস্তাব করে যে, তাকে কোন একটা সওদার মেসে রেখে দিতে; তারক কথাটা ভাল বলে-ই মনে করে ও বায়বহনে স্বীকৃত হয়। বামা ব'লে যে মেয়েটি তারককে বাবা বলত, আর রেঁধে দিত, তার বাস্তবিকই একটু বেশ ভাল ধর্ম্মজ্ঞান ছিল; সেই একা জানত যে, তারকের কিছু টাকা লুকানো আছে। এক সময় সে বোজগারটাও বেশী করত, আর নেশা-ভাঙে বেশ্‌ক খরচ করেও বেশ কিছু জমিয়েও ছিল; তার উপর সৌরভ মরবার সময় তার যা কিছু নগদ বা গয়নাপত্র ছিল, সব-ই তারকের হাতে দিয়ে যায়। তারকের অন্তঃকরণ গাঁজায় একদানিন দিতে গিয়ে ফেল্ হওয়ায় দিন তিনেক পরে গলির মুরুব্বী মুখুয্যে মশাইকে ডেকে এনে বাড়ীর ও অন্যান্য পাঁচজনকে হাজির করিয়ে তাদের সামনে নিজের হাতে তারকের শোবার গদীর ওপরকার খেরোটা ছুরি দিয়ে ফেড়ে ফেল্‌লে; তুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে এক একখানা নোট হাতে ঠেকে, আর তুলে গুণে গুণে অজিতের হাতে দেয়; এমনই ক'রে বেরুলো ষোলশ না সতেরশ টাকা! তার পর রূপোর চার গাছা মল, ঐ কোমরের ঝিঁঝির, সোনার এক জোড়া বালা, এক জোড়া তাবিজ, দু'গাছা দন্‌বন্, গোটা আষ্টেক মাকড়ী, দু'টো নাকছাবি, একখানা চিক আর এক ছড়া হার। কাঠের হাতবাক্সটার ভিতরেও হাত-খরচের জন্য যে ক'টা টাকা ছিল, সৎকারের দিন-ই তা খরচ হয়ে গেছে, বামা তা অজিতকে বুঝিয়ে দিলে।

অজিত সমস্ত সম্পত্তি বেঁধে নিয়ে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বামার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বল্‌লে, "তোমায় মাসী ব'লে ডাকতুম, সেটা মিছে কথা, তুমি আমার মা।"

• • • •

আজকালকার দিনে লোক অতি নিকটস্থ গুরুজন বা বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ম'রে গেলে পাছে জীবিত ওয়ারিশদের দু'দিন বাদে তাঁর নামটি ভুলে যায়, এই ভয়ে সেধে-পেড়েই হ'ক বা নগদ কিছু ঝেড়েই হ'ক, একটা রাস্তা, গলি বা লিউয়ার ডিচের মোড়ে সেই নামটা টিনের উপর লিখিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত করেন; যখন বড় বড় লোকের সম্বন্ধেই স্মৃতিরক্ষার এই উপায়, তখন পাঁচ ছয় বছর পরে তারক ওস্তাদের নাম কারুর মনে থাকবে, এটা আশা করা-যায় না। বামা বেটী ও বছর দুই পরে কাশী চ'লে গেছে, আছে কি মণিকর্ণিকায় শুয়েছে, তা বিশ্বনাথই জানেন।

অজিতেরও আর কোন খোঁজখবর নাই; তারকের সদ্গতির মাস ছয়েক পরেই সে কলেজ ছাড়ে, মেস থেকেও চ'লে যায়; এ অঞ্চলের তাকে কেউ দেখেনি, আর কোথায় গেছে, তা কেউ জানে না।

ছেলে ধরার কথা অনেক কাল থেকে অনেক দেশে-ই চ'লে আসছে; মাঝে মাঝে গল্পের পোষাক প'রে দেখা দিলেও ঘটনাটা খুব সত্য। ছেলে হ'লেই যে ৮।১০ বছরের বাচ্চা ব'লে বুঝতে হবে, এমন কোন কথা নাই; ২২ বছরের প্রায় যুবকও ছেলে; ছেলেবুদ্ধির দৌলতে অনেকে বেশী বয়সেও ছেলে থেকে যায়। য়ুরোপে জিপ্সীরা ছেলে ধরে, কৌজের আড়কাটি-হাওলদার ঐ রকম ছেলে ভুলিয়ে সৈনিকের বন্দুক তার কাঁধে দেয়, যখন ইম্প্রেসমেণ্ট প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন জোর ক'রে ছেলেদের ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহাজে মজুরী করাত। ছেলে ধ'রে পকেট মারা, চুরী প্রভৃতি বে-আইনী বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া সে সব দেশে এখন-ও লোপ পেয়েছে কি না সন্দেহ। এ দেশে বেদেরা ছেলে চুরী করে, নাগা সন্ন্যাসীরা ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে চেলা করে, বদমাইসরা ছেলে তৈরী ক'রে তাদের দ্বারা স্বকার্য্যসাধনের উপায় ক'রে নেয়। এ ত গেল রাস্তা ঘাট খোলার যন্ত্রের কথা। অনেক সাজানো-গোজানো সাইনবোর্ড ঝোলানো কোঠাতেও ব্যবসায়ের ফাঁদে, আহিতালেবার দাবীতে,দানে, ভাগে,সংস্কারের ধোঁকায় বা দেশ উদ্ধারের রকমকে পর্দ্দার আড়ালে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ছেলেধরার কারবার চলতে থাকে। কোথাও বেচারারা উচ্ছিষ্টপ্রসাদকণাভোজী, কোথাও বা বলির পশু।

* * * *

যে রঙ দেখে অনেক সম্ভ্রান্ত ফিরিঙ্গীকে আমরা খাঁটি য়ুরোপীয়ান ব'লে মনে করি, নীরদবরণের মুখের রঙ ঠিক তেমনই ফরসা, মাথায় ঢেউখেলানো চুলগুলি বিশ কালো নয়, একটু কটা কটা; বাঙ্গালা মুখখানি অতি সুন্দর, চোখের চাউনীতে পুরুষের প্রতিভা—নারীর লালিত্য; সুস্থ সুঠাম সবল দেহের গঠন; খাড়া হয়ে দাঁড়ালে প্রায় ৫ ফুট ৮ ইঞ্চ দীর্ঘ। এই সুদর্শন অবয়বখানি খাঁটী ইংরাজের দোকানে ফরমাসে তৈরী পরিচ্ছদে ভূষিত। এঁর জন্মস্থান কোথায় বা পিতৃপুরুষের সংবাদ কি, তা কেউ জানে না। প্রিয়দর্শন শ্রী ও পরিপাটী বেশ এঁকে কলকাতার অধিকাংশ উচ্চ সমাজে আদৃত অভ্যাগত ব'লে গ্রাহ্য ক'রে নিয়েছে; তার উপর ইনি পরিচয় দেন, কোনও প্রসিদ্ধ ধনবান্ জমীদারের জামাই ব'লে; কিন্তু জামাতার প্রধান প্রমাণ যে শ্বশুর-কন্যা কোথায় বিদ্যমান, তার খবর আজও কেউ পায় নি। নীরদ এম-এ ফেল হবার পর মর্টহাও লিখে খবরের কাগজের রিপোর্টারী কায আরম্ভ করে; যে সৈসমানের প্রভাবে কোন কোন মানুষ —কি স্বদেশী, কি বিদেশী লোকের সঙ্গে চট্ ক'রে মিশে তার মনের বিশ্বাসকে আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়, প্রকৃতি-দত্ত সেই শক্তি নীরদবরণের উপরে ভিতরে দুই-ই স্থানে ছিল। কলকাতার প্রাচীন ও সম্মানভাজন রিপোর্টার হিল্‌টন নীরদকে অল্পদিনের মধ্যেই নিজের কোলের কাছে টেনে নিলেন; নীরদ হিল্‌টনকে গড্ কি না গভর্ণর অর্থাৎ কর্ত্তা ব'লে সাদরে সম্বোধন করত। হিল্‌টন কেবল যে আশ্রিত যুবককে শর্ট্‌লিপি-কলায় নিপুণতর ক'রে তুলতে লাগ্‌লেন, তা নয়, তাকে প্রায়ই বাসায় জলযোগাদির জন্য নিমন্ত্রণ করতেন এবং তাঁর নিজের ও আরও কয়েকটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের নরনারীর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ক'রে নিলেন। অনুকরণ-বিদ্যার সিদ্ধসাধক নীরদবরণ আপনার আশির-চয়ণ দু'টি ফিরিঙ্গী-ভঙ্গীতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই পটিত ক'রে তুল্‌লে। জানা নাই, যা বল্‌তে কেউ কোথাও বর্ত্তমান আছেন কি না, কিন্তু যদি থাকেন, তিনি সশরীরে এসে উপস্থিত হ'লেও কথার উচ্চারণ শুনে কোন রকমেই বুঝতে পারতেন না যে, বাছা তাঁর গর্ভজাত।

রিপোর্টিং কাযের আয় মাসিক দেড় শত টাকার উপর দাঁড়াল, তা ছাড়া নবাগত ধনিসন্তান সহরে এলে তাদের বাড়ী ফর্ণিশ করা, মোটর কিনে দেওয়া, দু'পাঁচ জন বড়লোকের সঙ্গে ইনট্রোডিউস করা ইত্যাদি অবেও মাঝে মাঝে থোক দু'শো চারশো টাকা আসতে লাগল; কিন্তু যে বাপ দিয়ে চাঁদ বিধতে চায়, খেজুরগাছের আগায় তীর ঠেকিয়ে কখন-ই তার মনের তৃপ্তি হ'তে পারে না।

ছোটোর মন সাহেব সেজেই সন্তুষ্ট; কিন্তু নীরদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চায় বড় সাহেব হ'তে। যে সার্ভিসের সিঁড়ি দিয়ে উঠে বড় সাহেবের কেদারা দখল করতে পারা যায়, সে সার্ভিসে প্রবেশের সার্টিফিকেট নীরদের নাই, আর চাকরীর বন্ধনও সে কোন দিন পছন্দ করে না। কেবল হাটকোট মাত্র সম্বল নিয়ে বিলেত থেকে এসে ক'ত সাহেব ব্যবসার দ্বারা ক্রোরপতি হয়ে দেশে ফিরেছেন; এর পর অন্য স্থান ভিন্ন বহুদর্শী হিল্‌টনের চায়ের টেবলে ব'সে সাহেবের নিজের ও উরেল, হব্‌সন্, গিলার্ড, গ্রাণ্ট প্রভৃতি অন্যান্য লোকের মুখে শুনেছে।

বাঁকুড়া জেলার এক যুবক কলকেতার কাগজের জন্ত "প্রেরিত পত্র" "মফঃস্বলের সংবাদাদি" লিখে লিখে হাত তৈরী হয়েছে মনে ক'রে মাসিকপত্রে ছাপাবার জন্ত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠাতে সুরু করেন। অপ্রসিদ্ধ দু' একখানা মাসিকে এক-আধটা কবিতা ছেপেছিল, কিন্তু তাঁর দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধের জন্ত অপ্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কোন মাসিকই স্থান সঙ্কুলান করলে না।

মনের আগুন মনে চেপে অজয়চন্দ্র আর কাকে কোনও প্রবন্ধ পাঠালে না; কিন্তু তার লেখা চল্‌তে লাগল অবিশ্রান্ত। ঘরে পয়সা আছে, পৈতৃক সম্পত্তি থাকলে উপার্জ্জনের জন্ত পরিশ্রম বাঙ্গালীর পক্ষে বড় অপমানের কথা, পিসীমা বলেন, এতে বংশের কলঙ্ক হয়, সুতরাং যশ উপার্জ্জনের দুর্জ্জয় পিপাসা-কাতর মন ও সুস্থ সবল হস্ত অজয়কে লেখনী-তাড়নায় নিযুক্ত করলে।

'ঋগ্বেদ ও জেন্দাবেস্তা'; 'মনুসংহিতার পদাবলীর উপর মিল্‌টনের প্রভাব'; 'ব্যাবিলনের শাসনপ্রণালীর সহিত রাসলীলার যৌগিক সম্বন্ধ'; 'ব্রিটিশ ও ত্রেতাযুগের শৃগালের তারতম্য'; 'মঙ্গলগ্রহে ত্রিরাত্রি';—এইরূপ প্রবন্ধ অন্ততঃ দেড়শো দফা। তার পর কবিতা, 'নাসার নিশ্বাস,' 'অগ্রহায়ণের আত্মহত্যা,' 'বেণী বিনাইয়া,' 'অধর শিশির' প্রভৃতি কবিতার রাশি। উপন্যাস-ও বিস্তর, যথা;—'বেজ বাসী'; 'বর্দ্ধমানের বউ'; 'অপাঙ্গের কাণ্ড'; 'ভার্য্যার শয্যা'; 'ভগ্নীর অগ্নি,' আরও এ রকম বিস্তর। বছর দেড়েকের ভিতর সাতষট্টিখানি নাটকও অজয় লিখে ফেলেছে; পাছে শুনে আর কেউ ছাপিয়ে ফেলে, এই জন্ত নাটকগুলির নাম প্রকাশ নিষেধ। তবে রোদন-রসাত্মক ট্রাজিডীর, প্রমোদ-পীযূষ-সিক্ত কমিডী, রৌদ্র-বৃষ্টিসম্বলিত ট্রাজিডি কমিডী, দমফাটন সমর্থ হাস্যরসাত্মক প্রহসন ও নয়ন-জল-নিঃসারিণী প্রহসনিকা, রঙ্গমঞ্চবিদারী ঐতিহাসিক বীর নাটক এ, পরা, অপ, সম্‌সংযুক্ত বিবিধ অপেরা, এর উপর ধর্ম্মপ্রাণ পৌরাণিক চৌরাশিক আদি লিখে যে সময় অজয় তাঁর অষ্টষষ্টিতম নাট্যোদ্ভব, প্রহসনখানির নায়িকা দর্শকবৃন্দকে হাস্যরসে নিমজ্জিত করবার জন্ত সর্ব্বাঙ্গে বোতল হ'তে কেরোসিন ঢালছেন, সেই অবস্থার উপর ব্ল্যাঙ্কভার্স লিখছেন, এমন সময় বাড়ীর ভিতর কান্না উঠল, তাঁর পিতার হার্টফেল হয়েছে।

শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন ক'রে প্রাণের বন্ধু রাধিকা মাধবকে সঙ্গে নিয়ে অজয় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে। অর্থাৎ এত দিন যে সব বেয়াদব দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক তাঁর প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিগুলি পুরানো কাগজওয়ালাকে বিক্রয় ক'রে আপনাদের ছাপাখানার ব্যয় সঙ্কুলান করছিল, তাদের জব্দ করবার জন্তে কলকাতায় এসে প্রথমে হরীতকী-বাগানে একটি বাসা ভাড়া করে। তার দৈব প্রতিভাকে দাবিয়ে রাখার জন্তে যে বাবা নামক জীবটি অন্তরায়স্বরূপ ছিলেন, তিনি শিব হওয়ায় এইবার অজয় নিজে ছাপাখানা খুলে সম্পাদকপ্রবর হবেই হবে।

অপরাহ্ণে হেদুয়া পুষ্করিণীর চক্রবেষ্টনী প্রদক্ষিণ করতে করতে একদিন হঠাৎ অজিতের সঙ্গে অজয়ের পরিচয় হ'লো; পরিচয় ক্রমে পরিবর্ত্তিত হ'ল বন্ধুত্বে। পরে বাসায় নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে একসঙ্গে ভোজনান্তে অজিত বুঝতে পারলে যে, অজয় জ্ঞানে বেশ ভারী। কলেজের বাইরে শুধে অজিত যে নিজেরও দৈব প্রতিভাকে অন্ধরূপে বদ্ধ ক'রে রেখেছে, দু'চার দিনের আলাপেই অজয় তা' বুঝতে পারলে।

টেষ্ট এক্সামিনে ৩০ পারসেণ্ট রাখতে না পারায় পরই অজয় মনে মনে বুঝেছিল যে, স্বয় পরিশ্রম তৈরী বাঁধা রাস্তায় চলবার জন্তে সে ধরাধামে অবতীর্ণ হয় নি। আকাশকুসুম-স্তবক-শোভিত, স্বপ্নফলভারাবনত উদ্যান রচনার অশেষ উপাদান তার মনের মরদানে সবুজের মধ্যে নিহিত রয়েছে; সেই জন্ত প্রতিভার পরম শত্রু মুদ্রিত পুস্তকের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়।

কলেজে ইস্তফা দিয়ে মেসের বাসা থেকে পাশ কাটিয়ে অজয় মায়ার সঙ্গে অজিত এক ছাদের নীচে-ই বাসা ভাড়া করে।

অজয় একে জমীদারীর উত্তরাধিকারী, তার উপর কবির সনাতন ছবির আদর্শে সে প্রতিভার কোঁটাটিকে আয়ত-লম্বিত কুন্তলদলে সাজিয়ে রেখেছে, মুখখানি বিরহিণী বিরহিণী, ধৃতি-চাদরে বালবিধবা। এর উপর গ্রাম ও তার অধীন, পথে বাহির হ'লেই বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে দণ্ডবতে অবনত মেরুদণ্ডের ধৃত। সে সহরে গেলে-ও আদালতের উকীল, মোক্তার, পেয়াদা, দোকানী-পসারী সকলেরই সম্ভ্রমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হ'তো। কিন্তু কলকাতায় এসে বেচারী পড়ল প্রথম মুস্কিলে, কেউ তার দিকে ফিরেও চায় না দেখে। সে ভাবতে ভাবতে এসেছিল যে, পরিচয় বিজ্ঞাপিত

হবার পূর্ব্বে চেহারার বহরেই সহরটাকে চমকে দেবে, এসে দেখলে, এ যে আটলান্টিকের উত্তাল তরঙ্গমালা; পদ্মার তুফান ব'লে আমি কি তবে এত দিন বৃথা গর্ব্ব করতাম! অশ্ব-পুচ্ছ, চুল উচ্চ, কাউণ্ডচ্ছ প্রভৃতি চুলের কেতা দেখে দর্পণ-টাকে তুচ্ছ তুচ্ছ ব'লে তিরস্কার করতে লাগল। ঠোঁটের উপর উঁকি মারবার আগেই সে খুরের সাহায্যে গোঁফের বংশ লোপ ক'রে দিয়েছিল—কিন্তু কলকাতায় এসে সে কামানো, অকামানো, আধ-কামানো, মুড়োঝারা নানান ভঙ্গীর গোঁফ দেখে আপনাকে হীন মনে করতে লাগলো। গত সেন্সাসে ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দাড়ির সংখ্যা হ্রাস হয়ে আসছে বটে—কিন্তু যে দু' দশ জন আজও এই আপ্রাই আস্‌বাব বজায় রেখেছেন, তাঁদের দেখলে বুঝা যায় যে, বাদশাই গাম্ভীর্য্যে, শিখের শৌর্য্যে, ধর্ম্মের বাৎসল্যে বা বর্জ্জিত মাধুর্য্যে এক একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস পরিপূর্ণ। আর বিরহিণী বিধবা বাবু বাসে, ট্রামে, রোয়াকে, পার্কে ছড়াছড়ি।

বাঁধা অন্নের সংস্থানটা বড় জোর আর্শ্বারি; আত্মরক্ষায় ও শত্রুশাসনে ঘি-মাখা ভাতের ধার চৌরাঙ্গীর চেয়ে ঢের বেশী। তাই পিতৃপরিত্যক্ত দিব্যুক বল্লে, 'আমার যত লোহার বন্দুক হাতে থাকতে তুমি কাকে দেখে ভড়কাও অজয়?' পুণ্ডরীকাক্ষরূপে এখন আর অপবিত্রকে পবিত্র গাঁড় করানো সম্ভব নয়; আওড়াও গুহ্যমন্ত্র—'দেশোদ্ধার, দেশোদ্ধার, দেশোদ্ধার', তার পর লেগে যাও শুভ কাযে।

গুহ্যমন্ত্রটা অজয়ের বুক থেকে বিবেকের ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছল। সে কলকাতায় আসার পর একটা ইলেক্‌সনের পরব হয়ে গেছে। তখন সে দেখেছে যে, গাছপাকা সুরুচি বাবুরা মেনকা-উর্ব্বশী মার্কাদারা বাসে চড়লে কুরুচি হয়ে যাবেন ব'লে ভয় করেন, তাঁরাও দেশের কল্যাণের নামে ভোট জোটাতে হরি, নরী, তরীদের বাড়ীতেও দিন-দুপুরে বা দাঁকের আঁধারে দিব্যি গতায়াত করেছেন।

দেশকে ফাঁকালো ক'রে তুলতে হ'লে প্রথম ও প্রধান দুটি উপায় হচ্ছে, সাহিত্যে কলা কলানো আর বাণিজ্যে কলা দেখানো; এ কথা এখন অনেক বড় বড় লোক-ই স্বীকার করেন।

কলেজে ঢুকে অজিত একটু সায়েন্সের পাঠা উল্টে-ছিল। সে বললে, "পজেটিভ-নেগেটিভ দুটোয় ঠেকাঠেকি করিয়ে না দিতে পারলে কোন কায-ই বিদ্যুদ্বেগে চলতে পারে না।" তাই বাণিজ্যরূপ নেগেটিভকে সাহিত্যরূপ পজেটিভের হাতে স'পে দেবার পর অজয় একটি প্রেস কেন-বার চেষ্টায় ঘুরতে লাগল।

• • • •

কোন নূতন কনট্রাক্টর যদি প্রথম একটা বড় রকম ইমা-রত তৈয়ার করবার কায হঠাৎ হাতে পায়, তার প্রথম ভাবনা দাঁড়ায়—লোকজন কোথা থেকে খুঁজে বার করবে; কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখে যে, তার বাড়ীর উঠান, দালান প্রভৃতি সব স্থান রাজমিস্ত্রী, ছুতার মিস্ত্রী, টিনওয়ালা, চুণ-সুরকীওয়ালা, কাঠের মহাজন, লোহার মহাজন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় লোকে ভ'রে গেছে। আবার এ-ও দেখতে পাই, বিশেষ বিশেষ মিষ্টরসের ভিন্ন ভিন্ন প্রাণাকর্ষণে লাল কালো ভেরো আদি পিঁপড়ের সারি দেখা দেয়। গৃহমক্ষিকা ও গাত্রচর্ম্মের ঘর্ম্ম হ'তে আরম্ভ ক'রে আমিষ-নিরামিষ সকল প্রকার চর্ব্বা-চুষ্য-লেহ্য-পেয়ের ধর্ম্মগ্রহণ সকল জন্তুতেই করতে থাকে; কিন্তু পৌষবাসেও ছাড়ান দিবি একটি বাদ্রাজী আম বা অকালের কাঁঠাল, অমনই কার কাছে কোথা থেকে খবর পেয়ে এঁবো মাছি ও ব্রহ্মরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পনস-মক্ষিকা ভোঁ ভোঁ রবে এরোপ্লেন চেপে আবির্ভূত হয়ে পড়ে।

অজয়ের বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়, এসে বাসা করেছে হর্ত্তকীবাগানে, আর আমাদের নীরদবরণের অবস্থান ক্রীক্ রোতে। তবু ঐরূপ অনৈসর্গিক আকর্ষণের এক শুভ প্রাতে অজয়ের বাসার সাম্‌নে একখানি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো, আর তা' থেকে নাবলেন আমাদের নীরদবরণ।

N. B. Saina,

"Journalist & General Agent"

কার্ড প'ড়ে অজয় ও অজিত দু'জনে-ই বাইরে এসে সসম্ভ্রম সংবর্দ্ধনা ক'রে সেইনা সাহেবকে ঘরে নিয়ে গেল।

পরস্পরে বহুক্ষণ কথোপকথন হ'ল; অর্থাৎ কথাটা আগাগোড়া প্রায় কইলেন সেইনা সাহেব, তাঁর হস্তোচ্চোচ্চা-রিত ইংরাজীতে বলতে গেলে একাই; অজিত মধ্যে এক-আধটা উপকথন করেছিল, অজয় আগাগোড়া ঘাড় নেড়েই গেল।

বিদায় নিতে উঠে একটা নতুন সিগারেট ধরাতে ধরাতে সেইনা সাহেব বললেন,—"Easy, Easy Mr. Editor; it's all right Dicky' 'st avt' aw oders।"

এডিটার সম্বোধনে সন্তাষিত হয়ে অজয় এত আপ্যায়িত হয়ে গেল যে,তখন-ই সে মনে মনে নীরদবরণকে জীবন সমর্পণ করলে, আক্ষেপ সে নয়, তাই যৌবন সমর্পণ করতে পারলে না। অজিত একবার জিজ্ঞাসা করলে, "হু ইজ ডিকি?" নীরদ উত্তর করলে, Ha! Ha! Ha! চোনচুনো? They are the Dickinson fellahs, Dicky we call them in the Office, বা-দ-বাবু, Wat name did ye say?

সাহেব-ও আগে জিজ্ঞাসা করেন নি, অজিত-ও নিজের নাম এতক্ষণ বলে নি, উত্তরে এইবার বললে, "অজিত-কুমার শিপলাই।" সাহেব বড় খুসী হলেন, বার দুই আপনা আপনি আজিট্—আজিটটা মুখস্থ ক'রে নিয়ে অনুগ্রহের আদরে নামের অধিকারীর পিঠটা চাপড়ে বললেন, "Dats right, D—mind calling ye Jity—my Jity?"

অজয় ত মরে-ই ছিল, এইবার অজিত-ও ম'ল। হতুকী-বাগান যায়গাটা না সাহিত্যিক না বাণিজ্যিক কোন রসাশ্রিত নয়; তার উপর একবারে গয়লাপাড়াগোছ দ্বিধীয়ান, তাই অজয়ের ইচ্ছা ছিল, ছাপাখানা ও বাসা একসঙ্গে যাতে হয়, এমন একটি উচুদরের ষ্ট্রীট মনোনীত ক'রে নিতে হবে। নীরদবরণের একান্ত ইচ্ছা—উড ষ্ট্রীট; কিন্তু সেখানকার ভাড়ার হার শুনে অজয় একপ্রকার মুর্চ্ছাই য'মে গেল, শেষ হ্যারিসন রোড বংশনের কাছে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপর ১৮৫ টাকা মাসিক ভাড়ায় বাড়ী ঠিক হ'ল। অজয়ের বরাবর মনে সাধ ছিল যে, ছাপাখানার নামটি দেবে বিরাট মুদ্রাযন্ত্র। কিন্তু নীরদবরণ তার উচ্চারণ-ভাণ্ডারের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে এতে আপত্তি করলে; বুঝিয়ে দিলে যে, প্রথমতঃ সে সব সাহেববাড়ী থেকে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন বা জবের কাম নিয়ে আসবে ঠিক ক'রে রেখেছে, তা যন্ত্র-ফন্ত্র গোছ মর্য্যাদা-হীন নাম থাকলে মুস্কিল হবে; কিন্তু তার চেয়ে-ও বেশী বিবেচনা করবার যোগ্য কথাটা হচ্ছে, পেট্রিয়ট হয়েছি ব'লে আমাদের নেহাত অকৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য নয়। "দেশ" চিরকালই আমাদের দেশে ছিল, আর "রাজ" কথাটাও যে আমরা জানতুম না, তা নয়; প্রমাণ রামরাজা, যমের রাজা ইত্যাদি। তবে যে আজ আমরা স্বদেশ, স্বরাজ এই সব ব'লে গর্ব্ব করছি, এই 'স্ব'টিই যে আমরা ইংরাজের কাছ থেকেই পেয়েছি, এ কথা কখনই অস্বীকার করা যায় না। উচু-দরের খাঁটী পেট্রিয়টের 'স্ব'-কেই সর্ব্বস্ব ব'লে জানা উচিত, সেই জন্য ইংরাজী নামটা পর্য্যন্ত যে আমাদের বর্জ্জন করতে হবে, এমন কিছু নয়। তেমন তেমন সভার রিপোর্ট আনতে যেতে হ'লে আমি খদ্দর পর্য্যন্ত পরি, একটা আলাদা স্যুট-ই আছে তার জন্য; কিন্তু অফিসিয়াল পোষাকে অফিসিয়াল নাম—আমার কার্ড দেখেই তা বুঝতে পেরেছেন; আমি বৃটিশ স্পিরিট দিয়ে ডিয়ার কাণ্ট্রীজ ইণ্টারেষ্টকে খুবে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া ভাল ব'লে মনে করি। এ বিষয়ে আরও অনেক কথা হয়েছিল।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীর সামনে যে লম্বা সাইনবোর্ডখানা ঝুললো, তাতে বড় বড় গিল্‌টি করা ইংরাজী অক্ষরে লেখা রইল,—গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, উপরে ছোট ছোট অক্ষরে "সেল্‌ফ" কথাটি যার ইচ্ছা হয়, সে প'ড়ে নিতে পারে।

'মাসিক মনতোষ' কাগজের পোষ্টারে পোষ্টারে কলকাতার সমস্ত ষ্ট্রীটের পৃষ্ঠদেশে রিটার ব'সে গেল। কি আয়, কি ব্যয়, লাভ হচ্ছে কি লোকসান হচ্ছে, তা দেখে সেইনা সাহেব আর তাঁর ডিয়ার জিট অর্থাৎ আমাদের অজিত। নিজের রচনা মুদ্রিত অক্ষরে বিকসিত দেখেই অজয়ের আনন্দ; "কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন," বিষয়-আশয়ের দিকে মন দিলে সাহিত্য-প্রেমিকের প্রেমতরঙ্গে তৈলনিক্ষেপের ফল ফ'লে যাবে যে।

অজয়রূপ কমিসরিয়েট-কাপ্তেনের পত্রিকার খ্যাতি-অখ্যাতি, দেনা-পাওনা, সফল-ফল, আদালতে পরাজয়, বন্ধন-ক্ষয় প্রভৃতি দ্বি-বার্ষিক বাণিজ্য-জীবনের তত্ত্ব তত্ত্ব বিবরণ বলতে গেলে কর্ণেল নীরদবরণ আর লেফটেনাণ্ট অজিত এই দুই কর্ম্মবীরের শক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশ আর পূজার পুষ্পে শেষ হয় না; এই মাত্র জেনে থাকুন যে, সে সম্পূর্ণ পাগল হবার কিছু পূর্ব্বে-ই অজয়ের মামা বাড়ুড়া থেকে এসে "স্বদেশের" গ্রাস হ'তে মুক্ত ক'রে তাকে দেশে নিয়ে গেল।

এমন কত অকূল সর্ব্বস্ব হারায়, পালায়, পাগল হয়, হাট ফেল হয়ে মরে। কিন্তু নীরদবরণ-অজিতরা ট্যাক্সি ছেড়ে মোটর কেনে, ক্রীক রো আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ছেড়ে ভাল কায চালাতে পারলে হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে-ও বাড়ীভাড়া করতে পারে; কখন-ও কখন-ও বালীগঞ্জে কুঞ্জ রচনা হয়। কটিনেন্টাল-টেন্টাল ছেড়ে কিয়পোয় ওখানে লাঞ্চ করে, কেল্‌পস্ চিনে কেল্‌লে চল এণ্ডারসনের ওখানে একাউন্ট খোলে; ঘড়ী, চেন, ষ্টাড্ এ আর কেউ কটাশাখর ক'রে ক'রে দেখতে চায় না, এ থেকেই জগৎ বুঝতে পারে, অর্থ অনিত্য, স্বার্থ নিত্য।

এই নিত্য পদার্থের মুগ্ধ অবতার কখন পাটের বেলায়, কখন ইণ্ডেণ্ট ইম্পোর্টার, কখন ব্যাঙ্কের গেটে, কখন সেয়ার মার্কেটে আবির্ভাব ও তিরোভাবের লীলা দেখাতে লাগলেন। অজিতের মনে এক দুঃখ, তার মাতামহ তারক ওস্তাদ স্বচক্ষে দৌহিত্রের এই ওস্তাদী দেখতে পেলে না; দাদামশাই আর করাসী দারোগার সদুপদেশের বীজ ইংরাজী শিক্ষার সারে পরিপুষ্ট হয়ে কি শিকার আকর্ষণকারী প্রেত-তরুতে পরিণত হয়েছে, তা দেখে যেতে পারলে তাঁদের আত্মার উদ্ধারের জন্য আর কাহাকে-ও গয়ায় পিণ্ডদান করতে হ'ত না।

নামজাদা কায়গাথা গুটি আষ্টেক বঙ্গ-সন্তানের ডিরেক্টরীতে "দি জাপো-ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল এণ্ড কমার্শিয়াল কোম্পানী লিমিটেড" নামে একটি বিরাট বাণিজ্য-ব্যাপারের প্রসপেক্টাস বেরুলো। মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা; প্রতি সেয়ারের মূল্য ১০ টাকা মাত্র। এর মধ্যে জাপান প্রায় ৮ লক্ষ টাকার সেয়ার আপনারাই নিয়ে রেখেছে, ভারতবর্ষের ভাগ্যবৃদ্ধির জন্য বাকী যে ৭ লক্ষ টাকার সেয়ার তারা ছেড়ে দিয়েছে, তার ভিতর থেকেও মাত্র দেড় লক্ষ টাকার সেয়ার প্রবোধবরণ ডিরেক্টর মহাশয়দের দিয়ে ম্যানেজিং এজেন্টস্ "ব্যারণ-পিপলাই এণ্ড কোং" নিজেরা আড়াই লক্ষ টাকার অংশ নিজেদের জন্য রিজার্ভ রেখে কেবল ৩ লক্ষ টাকার সেয়ার সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বাজারে ভাসাতে সম্মত।

মুরুব্বীরা মতলববাজ হলে-ও বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতার প্রাণে সে সময় দেশের গৌরবরক্ষার জন্য এমন একটা সত্য অনুরাগ জন্মেছে যে, হৃদয়ের শাসনে বুদ্ধির পরামর্শ দিবার শক্তি একেবারে যেন লোপ পেয়ে গেছে।

অনুকূলবাবু পোর্ট কমিশনারের অফিসে মাসিক ৪৫ টাকা মাহিনার কেরাণী; সে-ও শুধু নিজে যে দু'খানা সেয়ার নিলে, তা নয়,তার সম্বোধিবধবা জ্যেঠা ভ্রাতৃজায়া "হিন্দু বিউটিউরাল পেন্সন ফণ্ড" থেকে একশ তেষট্টি টাকা ছ আনা সাত পাই পেয়েছিলেন, তাঁকে বুঝিয়ে তাঁর বন্ধলের জন্য ৮।১০ খানা সেয়ারের আবেদন দাখিল করেন; কিন্তু পিপলাই সাহেব কোনমতেই দু'খানার বেশী তাকে দিতে পারলেন না।

সেয়ারের এত ডিম্যাণ্ড—এত টানাটানি যে, অনুকূলের ভাগে ১০ খানার টাকা জমা দিয়ে ৩ খানা বই পেলে না, এই খবর যখন আর্ডিনস্কিনারের যাদববাবুর কাণে পৌঁছল, তখন তিনি এক মাসের সম্পূর্ণ বেতন একশ' কুড়ি টাকার উপযুক্ত সেয়ারের জন্য দরখাস্ত করলেন; দেখাদেখি আরও কত যাদব, কত অনুকূল, কত বিধবা ভাজ, ভগ্নী, পুত্রহারা মা, পাচিকা-পুণির পিসী, দাসীবৃত্তিধারিণী বারুণী-বৌ খোদে বা গুরুতে নিজ নিজ যথাসর্ব্বস্ব শনির অবশ্য পোষ্য এই ব্যারণ-পিপলাই এণ্ড কোঁর দোরের সামনে ধ'রে দিলে।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের প্রশস্ত ফ্ল্যাট, দোরে ডোর-প্লেট, ব্লু রংএর সেণ্টন কাপড়ের উর্দ্দিপরা, কোমরে কোমরবন্ধ, পাগড়ীতে চাঁদীর ক্রেষ্ট শিখনের তমন; প্রবেশ-পথে গুর্খা সেপাই, আর অফিসের ভিতর পার্টিশন করা বড় সাহেব ছোট সাহেবের দুই কামরা। দু'পাশে পালিশ করা কাউণ্টার সারির পিছনে বড় বড় বাঁধানো খাতা খুলে কেরাণীরা কায করছে; বাঙ্গালীর এই উদ্যমের—এই কীর্ত্তির উচ্চ প্রশংসা প্রতি প্রভাতেই সমস্ত সংবাদপত্রে কীর্ত্তিত। জাপানী মেলে মেলে ব্যারণ-পিপলাই কোম্পানী-চিহ্নিত বড় ডাকঘরের বাক্সে আর চিঠি ধরে না। ৫ মাসের মধ্যে কেবল সেয় দুই টাকার কল্‌টি সেয়ার-হোলডারদের কাছে দেওয়া বাকী রইল।

• • • •

বছর ১০।১২ হ'ল, এক সাধুপুরুষ সন্ন্যাসীর কোন গ্রাম থেকে এসে কালীঘাটে একটি অনাথাশ্রম খুলেছেন। সাধুপুরুষ বললেম ব'লে মনে করবেন না যে, তিনি জটা-ভূটমণ্ডিত সৈরিক-পরিহিত কুমার সন্ন্যাসী। ঐরূপ ভেক-ধারণ ভাণ ও ভণ্ডামী ব'লে তিনি ঘৃণা মনে করেন। তাঁহার মত এই যে, সংসার-ই প্রকৃত তপোবন, কালাপেড়ে ধুতি ও সিল্কের পিরাণের আবরণে অধি-মনকে প্রচ্ছন্ন রেখে সস্ত্রীক সাধনায় বসে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম।

এর অনেক আগে থেকেই কালীঘাটের একটি গলির মধ্যে একতলা বাড়ীতে আর একটি অনাথাশ্রম এক রকম মন্দ চলছিল না। যখন এই গলির জনক ঋষি রাস্তার উপর বড় দোতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে অনাথাশ্রম খুললেন, তখন পুরাতন আশ্রমটির একটু আশঙ্কা হ'ল। পুরাতন অনাথাশ্রমের বালকরা আধ-ময়লা কাপড় প'রে একটা ছোট টিনের বাক্স হাতে যাত্রীদের কাছে সাহায্য আদায় করত; জনক ঋষি তাঁর অনাথদের খাকি রংএর সর্ট-সার্ট পরিয়ে দিলেন, সার্টের বুকে লাল সালুর ত্রিশূল মার্কা; হাতে এক একটি ভাল বার্ণিশ করা কাঠের বাক্স চাবীবন্ধ, ডালায় টাকা সিকি পয়সা ফেলবার জন্য একটু চেরা ছিদ্র; এই রকম কাপড়-চোপড় পরবার লোভে অনেক অনাথ পুরাতন আশ্রম ছেড়ে নূতনের আশ্রয় গ্রহণ করতে আরম্ভ করলে। ক্রমে দুই দলে পরস্পরে মুখে ও ছাপিয়ে গালাগালি, শেষ এক দিন দুই দলে মহাদাঙ্গা। সাধু পুরুষের মূলধন অপেক্ষাকৃত বেশী; তিনি ধর্ম্মের নামে অনেক ভাল ভাল গুণ্ডা যোগাড় করতে পেরেছিলেন, আর পুরাতন অনাথ-পালকের সহায় পাড়ার গোটাকতক বওয়াটে বালক মাত্র; কাযেই বেচারাকে পালিয়ে গিয়ে তারকেশ্বরে দরিদ্র-পালন ব্রতে নিযুক্ত হ'তে হ'ল।

সাধু সারারাত্রি সস্ত্রীক যোগে মগ্ন থাকেন, ছেলেরা ব'লে বেড়ায়, তিনি থেকে থেকে মাটীর উপর এক হাত উঁচু পর্য্যন্ত লাফে উঠতে পারেন; সুতরাং জড়-শরীরকে হাল্‌কা করবার জন্য অন্ততঃ ১৫ টাকা মণের কম চাউলের অন্ন গ্রহণ না করলে তাঁদের চলে না; মস্তিকে ফসফরাস সরবরাহের জন্য মৎস্য অবশ্য প্রয়োজনীয়,. আর পালাদারেরা আশ্রমে যে নিত্য একটি ক'রে প্রসাদী ছাগমুণ্ড প্রেরণ করেন, তাই বা পরিত্যাগ করেন কি ব'লে?

কিন্তু অনাথদের পরকালের মঙ্গলের জন্য সাধু কঠোর সংযম শিক্ষা দেন। চাউল যত গোল ও লাল হবে, ততই তাতে বেশী পরিমাণ ভিটামিন্ থাকবে; কাঁচ-কলার খোসা, লাউয়ের ডাঙ্গা, ডাঁটার সূল সোটাইয়ে পরিস্রুত, খাঁসওলা জল মাত্র, এই সব ঐগুলি সিদ্ধ ক'রে আহার করাই অনাথদের ইহকাল পরকাল সোটাইয়ের পক্ষে একমাত্র সুপথ। তারা ভোর থেকে বেলা দেড়টা পর্য্যন্ত যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা করে, তার পর আহারান্তে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার, সাধু ও সাধ্বীর তোজনপাত্র পালা বাটি গেলাস এবং পাকশালার ব্যবহার্য্য ডেকচি গামলা ঘড়া ঘটী হাতা বেড়ী ইত্যাদি মেজে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করে; আবার তিনটে থেকে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ঘুরে কাঁচা ঘাস বোঝাই ক'রে এনে মুরগী ও বেগুনী খায়, পরে ব্যায়ামের জন্য সাধুর অঙ্গসেবা করে। সন্ধ্যার পর মায়ের বাড়ী ছুটে একটু এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরে আশ্রমে ফিরে এসে সাধ্বীর যে দিন মন ভাল থাকে, সে দিন ছেলেদের বসিয়ে একটু ক খ পড়ান; পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে সমস্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও শাস্ত্রমর্ম্ম নিহিত, তাই হক্ক'র পরে আর ছেলেদের এগিয়ে যেতে দেওয়া নিষিদ্ধ। আশ্রমের অবস্থা বছর তিন চারের মধ্যেই এত উন্নত হ'ল যে, ব্যাঙ্কে যাতায়াত করবার জন্য সাধুকে একটি ঘোড়া রাখতে হয়েছিল; আশ্রমের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কুটুম্বিতা বন্ধনের নিমিত্ত হলেন—মাড়োয়ারী ভক্তরা।

সাধু মনোবিজ্ঞানে একরূপ পণ্ডিত ছিলেন, তাই আশ্রমবাসীর এক প্রকোষ্ঠে তিনি একটি সুদৃশ্য সুসজ্জিত সত্যনারায়ণমূর্ত্তি একখানি মূল্যবান্ সিংহাসনে স্থাপিত ক'রে মাড়োয়ারী যাত্রীদের আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সোনালী কাযের পাড়, জরদ-রংএর জোড় প'রে চাঁদীর সিল্‌টী করা পঞ্চপ্রদীপ হাতে শিবস্তোত্র সুরসংযোগে পাঠ করতে করতে তিনি যখন আরতি-কলা প্রদর্শন করতেন, তখন মাড়োয়ারীর ভিড় ঠেলে অন্য ভক্তরা উঁকি মেরে দেখতেও পারত না। রূপার পঞ্চপ্রদীপ, ঘণ্টা, পুষ্পপাত্র, ভোগ সাজাবার বিবিধ প্রয়োজনীয় পাত্র সুটের পর সুট জ'মে যেতে লাগল। এর উপর আবার মানত; হুণ্ডী আদায়ের, তেজিমন্দি জিতের, মামলা ফতের, পুত্র লাভের, পতি বশীকরণের, মৃত ধরা না পড়ার, সচ্চরিত্র ফুড ইন্‌সপেক্টরের বদলীর জন্য, আরও কত কি, তা এ অভক্ত কি ক'রে জানতে হবে! সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য এত বৃদ্ধি পেতে লাগল যে, যাত্রীদের উপর অনাথদের দৌরাত্ম্য কতকটা যেন ক'মে এল। কিন্তু সাধু তাঁর প্রথম সঙ্গী এই অনাথদের ত্যাগ করলেন না; এমন সেবাপরায়ণ অবৈতনিক ভৃত্য অনেক দেশহিতৈষীর বরাতেও জুটে না। বরং জনক ঋষির (মাড়োয়ারী ভক্তরা তাঁকে এই নাম দিয়েছে) অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা হয়েছে যে, এই অনাথরা যাতে বয়ঃপ্রাপ্তে

প্রাণনাথ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য একটা অনাথিনী-হুগ খুলবেন ; কেবল সদা-সন্দিগ্ধপ্রাণা সাধ্বীর প্রতিবন্ধকতায় সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করতে পারছেন না।

• • • •

নীরদবরণ বা সেইনা সাহেবকে সকলে এখন ব্যারণ সাহেবই বলে। হঠাৎ এক দিন তিনি সাধুবরকে "বেঙ্গল-বঙ্গল ব্যাঙ্কে" দেখতে পান ; ঘন্‌ইং ভচ্চিনিতঃ যে,ইটি জাত সাপ; পাকা বাঁশ হেলে চোঙা ধরে না, কেউটে গোখরো ঘরে-ই তার আনন্দ। চাকৃতি হাতে বিরক্ত মুখে একখানা বেঞ্চের উপর ব'সে যেন ছট্‌ফট্‌ করছেন বুঝে ব্যারণ সাধুর কাছে গিয়ে ইংরাজী রসনায় প্রশ্ন করলেন যে, "আপনি কি চেকের টাকার জন্য অপেক্ষা করছেন ?" পূর্ব্বজন্মের ভোগ যদ্দিন কপালে ছিল, সাধুকে তদ্দিন লেখাপড়া করতে হয়েছিল, তার-ই জোরে তিনি বাঙ্গালী-ইংরাজীতে উত্তর দিলেন, "ইয়েস সার, আই হ্যাড বিন ওয়েটিং ফর নিয়ারলি এট লিট্‌ল্‌ আওয়ার্স এণ্ড টুয়েন্টি মিনিটস্‌ অল্‌ টু ডেট।" হাত ধ'রে টেনে কাউণ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ব্যারণ তাঁর পাওনা নোট ক'খানি দিইয়ে দিলেন, in a jiffy. তার পর বল্লেন, আপনি কোথায় যাবেন, do you mind my giving you a lift ? সাহেব যে বাঙ্গালী, এটি বুঝতে পেরে সাধু যে কেবল আনন্দিত হলেন, তা নয়, স্যুটের নীচে যে একটা দৈবশক্তিসম্পন্ন মাথা আছে, তাও বুঝতে পারলেন ; বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ, আর উঠলেন সাহেবের মোটরে।

আফিসের জলুষ দেখে সাধু ত একেবারে বিমুগ্ধ। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য ইত্যাদি নানা বিবরণ শোনার পর ব্যারণ বললেন, "পন্থা ভিন্ন হলে-ও আপনার ও আমার উদ্দেশ্য দেখছি এক ; এই পীড়িত পরপদদলিত দরিদ্র ভারতের উন্নতি করা।" এই বহু-সংস্কৃত শব্দগুলি বৃটিশ এম্‌ফ্যাসীস্‌ সংযোগে ব্যারণ সাহেব যে ভাবে উচ্চারণ করলেন, তাতে সাধুর বিমুগ্ধ চিত্ত ব্যারণের দয়ার্দ্র পান-প্রত্যাশায় নিতান্ত লুব্ধ হয়ে উঠল। ব্যারণ বলতে লাগলেন, "দেশের এই উপকার করতে হ'লে আমাদের প্রধান আবশ্যক টাকা ; মনে রাখবেন, দেশ বলতে আপনার বা আমার জন্মস্থানের গণ্ডীও নয়, আর কলকাতা, ঢাকা, বর্দ্ধমান, ঘরিশালও নয় ; আপনার গঙ্গায়, টাকার প্রয়োজন, তা অবশ্যই বুঝতে পারছেন।" বড় বড় কুম্ভমেলার সভ্য সাধুরাও সাহেব দেখে অবাক্‌ হন, ইনি ত লৌহজঙ্গের নব ঢংএর সাধু ; বুঝুন না বুঝুন, হাঁ ক'রে ব্যারণের কথা শুনে যেতে লাগলেন। ব্যারণের বক্তৃতা চলতে লাগল :—"কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়, আলাদীনের গল্প নয়, আমি দেখে-ই বুঝতে পেরেছি, আপনার ভিতর প্রতিভার প্রদীপ আছে,কিন্তু সেটি এখন-ও আপনি ঠিক খুঁজে পাননি; উষ্ণমরুপ দৈত্যের হাত থেকে একটিমাত্র আংটী পেয়েছিলেন, সেইটি ঘষতেই আপনার সুমুখে অনাথাশ্রমে সত্য-নারায়ণের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কত টাকা আসবে ওতে যে, আপনি ভারতের মঙ্গল করতে পারবেন ? বৃটিশ যুগে প্রত্যক্ষ দেবতা হচ্ছে বাণিজ্য। আপনিও ত্যাগী, আমিও ত্যাগী ; দেশমাতৃকার সেবার জন্য আমি মাতৃদত্ত ধুতি ত্যাগ ক'রে লুণ্ঠনের পেণ্টালুন পরিধান করেছি,—উদ্দেশ্য, ইংরাজদের হাত থেকে ব্যবসা-আধিপত্যটা লুটে নিতে হবে। আর আপনি দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য সৈরিকের অভিমান ত্যাগ ক'রে সাদাসিধে ভদ্র-বেশে আত্মগোপন ক'রে রেখেছেন। কিন্তু আপনি আর আমি বা আমাদের মতন আর দু'চার জন ত্যাগ করলেই ত আর সমস্ত দেশটার মঙ্গল হবে না ; আর বক্তৃতা শুনেও কেউ যে স্বার্থত্যাগ করবে, তা বড় আমার বিশ্বাস হয় না ; সুতরাং যেমন ক'রে হ'ক লোককে বাধ্য ক'রে ত্যাগের পথে আনতে হবে।"

সাধু। আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সাহেব-পাঁড়ার বুকের উপর ব'সে আপনি যে জাঁকিয়ে আফিস খুলেছেন, এতে আপনার সাহস ও বুদ্ধি, দুইয়ের-ই প্রশংসা করতে হয়।

ব্যারণ। প্রশংসার যোগ্য নিজেকে বিবেচনা করব তখন, যখন প্রতি ৩০ টাকা বেতনের কেরাণীর ব্যাঙ্কের খাতায় অন্ততঃ গোটা ৫০ হাজার টাকা ব্যালান্স থাকবে ; যখন ভারতের ভিখারীরা প্রতি প্রভাতে নিজের নিজের মোটার চ'ড়ে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে।

সাধু। কায ত আপনার খুবই ভাল চলছে বুঝতে পাচ্ছি।

ব্যারণ। সো সো ; বিজনেস্‌ আরও ফলাও করতে

জাপানে পাঠাতে হচ্ছে, সেখান থেকে তিনি কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া ভারা বোর্ণিও ক্যাণ্টন নভাজেমলা ববলিনটন বার্ম্মা-ডোসা বিলিপট ক্যাভেণ্ডিস জোহার—আরও বিস্তর যায়গায় এজেন্সী খুলবার বন্দোবস্ত করবেন।

সাধু মনে মনে ভাবলেন, সত্যনারায়ণের এই রকম ব্ল্যাক অফিস নানান্ দিকে খুললে হয় না? মাড়োয়ারী নেই এমন বাক্সা ত পৃথিবীতে নেই। প্রকাশ্যে বললেন, "তা হ'লে আপনার একার ঘাড়েই ত সমস্ত ভার পড়বে?"

ব্যারণ। যদি না এক জন ভাল বখরাদার ঠিক করতে পারি। এ চাপ ক্রম চিটাগং লাকখানেক টাকা নিয়ে ক'দিন ধ'রে আমার সাধাসাধি করছে; কিন্তু টাকা আমি হাতের ময়লা মনে করি; আমি চাই ইণ্টেলিজেন্স। ধরুন, আপনার মতন কোন ইয়ংম্যান সত্যনারায়ণ দেবার ও যোগের প্রক্রিয়ার মধ্যে অবসর ক'রে আমার দিন দু'ঘণ্টা ক'রে দিতে পারেন, তবে আমরা বেঙ্গলের রকফেলার হয়ে মিনিটে হাজার টাকা রোজগার করতে পারি।

সাধু। বলেন কি!

ব্যারণ। ওন্‌লি ম্যাথামেটিক্স। আপনি অবশ্য কনিক্-সেক্সন বোঝেন।

সাধু। আ—আ—আজ্ঞে—

ব্যারণ। তা হলেই দেখুন, নভাজেমলা থেকে পাট খরিদ ক'রে যদি কামাস্‌কাটকায় চালান দেওয়া যায়, আর সেখান থেকে নীল আনিয়ে;—তা ছাড়া একটা অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক সিক্‌রেট আমার মাথায় আছে, সেটা প্রকাশ—প্রকাশ—

সাধু। গোপনে তান্ত্রিক-সাধনে আমি সিদ্ধ; আমার দ্বারা গুপ্ত কথা প্রকাশ পেতেই পারে না।

ব্যারণ। তবে বলি শুনুন; টাটা কোম্পানীর বিরাট লোহার কারখানার কথা অবশ্যই শুনেছেন?

সাধু। শুনেছি কেন, দেখেছি; তবে যায়গাটায় একেবারে দয়া-মায়া নেই; বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, নর-নারী সকলকেই সেবা দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রে দিনপাত করতে হয়, একটা অনাথ পাওয়া যায় না।

ব্যারণ। সেই টাটাকে আমি ছোটোর ছোট ক'রে ফেলতে পারি বছর দু'এর মধ্যে।

সাধু। সে কি।

ব্যারণ। ফুল! কতকগুলো ফুল সেখায় জুটেছে, বিজ্ঞান জানে না, তাই কোথায় বনে-জঙ্গলে গুপ্তধন দিং-দিং ঘুরে লোহা খুঁজে বেড়ায়। অথচ আমি মনে করলে এই বাঙ্গালার প্রত্যেক এক সের মাটী থেকে অন্ততঃ এক ড্রাম লোহা বার ক'রে দিতে পারি।

সাধু। কি ক'রে?

ব্যারণ। ম্যাগনেট! একখানা হুইলের গায়ে কতকগুলো ম্যাগনেটের স্পাইক এঁটে দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক কোরে ঘুরনো, আর ছোতলা থেকে রাশি রাশি মাটী তার উপর ফেলা, এই বই আর কিছু নয়। মাটীস্থ লৌহরেণু গেল ম্যাগনেটের গায়ে লেগে, বাকী মাটীটা নীচে প'ড়ে গেল; সেটা বাইপ্রডাক্ট হয়ে পটারীর কাযে লেগে যাবে। এখন হিসেব করুন, এক মিলিয়ান টন মাটী যদি আট ঘণ্টায় চালা যায়, তবে ২৪ ঘণ্টায় কত লোহা পাওয়া যাবে।

ও সাধু মহারাজ! এ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তোমার সত্যনারায়ণ বার করতে পারে?—না দরিদ্র-নারায়ণরা নভাজেমলার পাটের খবর রাখে?

ব্যারণ। যাই দি যাই, আপনার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সটা এখন আন্দাজ কত, জিজ্ঞাসা করলে কি বেয়াদপি হবে?

সাধু। কিছু না; তবে সঞ্চয়ের ভক্তিটা আমার কখন-ই নেই, দেবতার স্থানে যা কিছু পড়ে, বলতে গেলে এক রকম হরির লুটই দিয়ে দি; তবে আমার শক্তি যিনি, তিনি অনেক কষ্টে কিছু কিছু রাখেন, তাতে বোধ হয় এখন হাজার সাতেকের উপর—

ব্যারণ। ওয়েট—ওয়েট। সেভেন—সেভেন; তা হ'লে সেভেন × থ্রি-থাউজেন নাইন হাণ্ড্রেড—আচ্ছা, ক্রাকসান-গুলো ছেড়ে দিয়ে কিউব্রুট করে দাঁড়াচ্ছে, B × C—XYZ = 75 thousand three hundred 64 Rs. 6 as. 8 pies; ৯ মাস সাড়ে আটাশ দিনে। অর্থাৎ—

সাধু। এই সাত হাজার টাকা খাটালে মাস নয়েকের মধ্যে ৭৫ হাজারে দাঁড়াতে পারে?

ব্যারণ। ৭৫ হাজার নয়, ৭৫ হাজার ৩ শত ৬৪ টাকা ৬ আনা ৮ পাই, এই ঠিক অঙ্ক।

সাধু। কাল যদি একবার আপনার সঙ্গে এসে দেখা করতে ইচ্ছা করি, তা হ'লে কি সময় হবে?

ব্যারণ। কাল—কাল—ডিনটে ২৬ মিনিটের সময়

সেই চিট্টাগং চাপটির সঙ্গে এনগেজমেণ্ট আছে ; ২টা ৭ মিনিটে রয়াল এক্সচেঞ্জে মিটিং ; ৪টার পর লেনহোর্ণ, আর —আর—আর—

সাধু। আমি যদি ঠাকুরের ভোগ-টোগ দিয়ে ঠিক বারটার সময় এসে পড়তে পারি ?

ব্যারণ সাহেব ডায়েরী খুললেন ; "ইয়েস ইয়েস" করতে করতে পর পর পাতা উল্টে বল্লেন, "১২টা ৯ মিনিট থেকে ৩৭ মিনিট পর্য্যন্ত আপনার জন্য দিতে পারি ; মাপ করবেন, উই আর বিজী মেন।"

• • • •

৯ মাস সাড়ে আটাশ দিনের মধ্যে আড়াই মাস সাড়ে তিন দিন সাধুর ৭ হাজার ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোম্পানীর সেবায় খেটেছে ; এমন সময় সাধু ভোগ-রাগ দিয়ে দু'টি দরিদ্র-নারায়ণের গা-টেপার গুণে একটু দিবানিদ্রা সেরে নিয়মিতরূপে অফিসে এসে উপস্থিত, ব্যারণ এবং পিপলাইও একসঙ্গে লঞ্চ ক'রে বড় সাহেবের কামরায় এসে সবে বসেছেন। রিষ্টওয়াচের ডালায় দৃষ্টিপাত ক'রে পিপলাই একটু হেসে বল্লে, "হাফ এ মিনিট আর্লিআর, মিঃ সাধু।"

সাধু। ও এক-আধ মিনিট—

পিপ। নো—নো, সাধুজী ; টাইম টাইম ; একটু আগে নয়, একটু-ও পরে নয়। এই টাইম-ই আজ ব্যারণ এণ্ড পিপলাইকে জগতের শ্রেষ্ঠ বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য ক'রে তুলেছে।

সাধু। একটা কথা হঠাৎ মাথায় এল, তাই ঘড়ির দিকে না চেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি। বড় সাহেব সে দিন বলছিলেন যে, কলম্বো কোলটার কোম্পানীটা লিকুইডেসনে যাচ্ছে, যদি চারনা ব্যাঙ্কে অতগুলো টাকা এডভান্স না করতেন, তা হ'লে কোলটার কোম্পানীটা সস্তায় লাখ খানেক কিনে নেওয়া যেতে পারত।

ব্যারণ। ওয়েল—ওয়েল ?

সাধু। আমার এক পিসে-শ্বশুর বেশ কিছু গুছিয়ে নেছেন ; সামান্য শ'দুই টাকায় যেসে মহাজনী সুরু ক'রে ক্রমে নীলামে জমী-টমি কিনে—আরও পাঁচ রকমে এখন এক জন ধনী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে মানুষটা খড়ী-বাজ। আপনাদের সঙ্গে বলতে কি, তাঁর মত এই যে, ধর্ম্মের

পিপ। প্রিন্সিপল নেহাত মন্দ নয় ; আমার গ্রাণ্ডফাদার—

ব্যারণ। পিস বি টু হিজ সোল্!—

সাধু। লোকটা কিন্তু ভয়ানক সন্দিগ্ধ-চিত্ত, কাউকে-ও সহজে বিশ্বাস করে না।

ব্যারণ। ঠিক ওই রকম এক জন লোক আমাদের খুব দরকার। কি বল মিটি ? তুমি আমি দু'জনেই বড় হাল্কা, যার তার কাছে মন খুলে ফেলি।

সাধু। তাও কিন্তু ব'লে রাখছি, লোকটা ভয়ানক। আমি একটু কথা পেড়েছি, তা বলেন, আমি নিজে সব তত্ত্ব তত্ত্ব ক'রে বুঝতে চাই, জান ত আমার কষ্ট কষ্টের টাকা।

ব্যারণ। আমার স্থানে এক দিন সান্ধ্যভোজনে তাঁর কোন আপত্তি আছে ?

সাধু। আপনি ত ইংরাজী ধরণে খাওয়া-দাওয়া করেন ?

ব্যারণ। বাঙ্গালা বন্দোবস্তও আছে ; অফিসিয়েল আহার আ—লা—এমেল ; সামান্যিকে মোচার ঘণ্ট, কই মাছ বন্দোবস্ত।

সাধু। তা হ'লে বিনা খরচায় নিরমুণ রক্ষায় তাঁর কোন আপত্তি হবে না।

ব্যারণ। সামনে শুক্রবার আমার জন্মদিন ; আমি যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিমন্ত্রণপত্র লিখে আপনার কাছে দিচ্ছি, ঐ দিন একত্র ভোজন ও প্রয়োজনীয় কথোপকথন।

• • • •

হ্যাঁ, একটা জন্মদিনের মত জন্মদিন বটে ! ইংরাজদের মধ্যে জন্মদিন রক্ষাটা একটা অবশ্য পালনীয় পর্ব্বের মধ্যে গণ্য আছে। ছেলে মেয়ে সবারই জন্মদিনটা একটা উৎসব ব'লে পরিবারে পরিবারে পরিগণিত হয়। অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও তাঁদের জন্মদিনে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের কাছ থেকে পর্য্যন্ত আদরের উপহার প্রাপ্ত হন। আর আমাদের এই দেশ, যেখানে বিদ্যার, ধনৈশ্বর্য্যের শক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারীমূর্ত্তিতে পূজিতা হন, সেই দেশে নারী এত হেয় হয়ে পুরোহিত ও শিক্ষচক্ষুতে দাঁড়িয়েছে যে, দেবদেবীর জন্মদিনে ঠাকুরঘরে একখানা বেশী নৈবেদ্য দিলে সংসারের অকল্যাণ করা হবে ব'লে ভয় হয়। মা-ঠাকুরমাগুলো ছাড়ে না, তাই জন্মতিথির দিনে পুত্র-পৌত্রের হাতে গাছকতক সুর্কো বেঁধে

অনেক বাবুই এটা খুব ছেলেমানুষী মনে করেন। সেকালে পাথুরেঘাটার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিজের জন্মতিথিতে একটু ধুমধাম ক'রে লোকজন খাওয়াতেন ব'লে তখনকার কোন কোন বড় মানুষ তাঁর নাম রেখেছিল "খোকা বাবু"। জন্ম-জন্মান্তরীন কত পুণ্য থাকলে যে ষাটের কোটে পা দিয়েও শৈশব-সারল্য-প্রফুল্ল মনে "খোকাবাবু" থাকা যায়, এটা বোধ হয়, তাঁরা ভেবে দেখেন নি।

আজকাল শুনতে পাই, একান্নবর্ত্তী পারিবারিক জীবন পরিত্যাগ ক'রে অনেক দম্পতি প্রথম চুম্বনের বাৎসরিক উৎসব গৌরবে সম্পন্ন করেন।

কিন্তু নীরদবরণের জন্মদিন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ভোজ্য-সম্ভারের আড়ম্বর দেখে এবং তদপেক্ষা চবা-চুষা-লেহ্য-পেয়গুলি যে সকল বিবিধ গঠনের রজতাধারে রক্ষিত, মনে মনে তার মূল্য খতিয়ে পিস্-শ্বশুর মশাই একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। এত বেশী ওজনের রাশীকৃত রূপার বাসন যে এক জন লোকের বাড়ীতে থাকতে পারে, এ ধারণা কখন-ই তাঁর মনে ছিল না।

পূর্ব্বরাত্রির নিয়োগানুসারে বিবরকর্ম্মের কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য পরদিন ঐ পিস্-শ্বশুর গেলেন ব্যারণ কোম্পানীর আফিসে। এই মায়াময় ধরাতলে জীবে জীবে আমি মাত্র দুইটি সম্বন্ধের অস্তিত্ব দেখতে পাই, খাদ্য ও খাদক। যিনি খাদ্য তিনিই আবার খাদক। পিস্-শ্বশুর মশাই একটি প্রকাণ্ড ভেটকী মাছ। চুনোপুঁটী থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক মৃগেল পর্য্যন্ত তিনি হজম করেছেন; কিন্তু তাঁকে এক গালে পেটে পুরতে পারে, এমন হোয়েল-ও যে লবণ-সমুদ্রে আছে, এটা কখন-ও ভেবে দেখেন নি। পিপলাই জাপান যাচ্ছেন, ব্যারণ সাহেবকে-ও দূরে দূরে এজেন্সী পরিদর্শন করতে বেরুতে হবে; কলকাতা আফিসের বড় সাহেব হয়ে এখানকার কাযকর্ম্মের সমস্ত ভার নেবেন, এমন এক জন পাকা কাযের লোক বখরাদার চাই। "চিটাগং চাপ-টা" দেড় লাখ টাকা নিয়ে সাধাসাধি,কিন্তু সে কাযকর্ম্ম কিছু জানে না ব'লে বেচারাকে আশায় বঞ্চিত ক'রে আর প্রাণের বন্ধু সাধু মহাত্মার বিশেষ সুপারিসে মাত্র ৫০ হাজার টাকা মূলধনে ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোম্পানী পিস্-শ্বশুর মশাইকে জুনিয়ার পার্টনাররূপে রেজেষ্টারী দলিলের দ্বারা গাঁথা ক'রে নিলেন।

এই পিস্-শ্বশুর সহজে যে তাঁর সর্ব্বস্ব এই অক্ষক্রীড়ায় পণ করলেন, তা মনে করবেন না; অনেক কূটতর্ক, অনেক সন্দেহের কথা, অনেক জমা-খরচ হান-ত্যান নিয়ে তিনি নিজের বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু তিনটে বড় বড় লোহার সেফ, ছটা ব্যাঙ্কের চেক বই, মাঝে মাঝে উর্দ্দিপরা চাপরাশীদের প্রবেশ প্রস্থান, সাহেব মাদ্রাজী বাঙ্গালী কেরাণীদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাতা সই করাতে আনা, আর সবার চেয়ে ৫০ হাজার কেমন ক'রে ৩ বছরের ভিতর ৭ লাখ ৬২ হাজার ৮ শ' ৪২ টাকা ৯ আনা ৭ পাইয়ে পরিণত হ'তে পারে, এলজ্যাবরার সাহায্যে ব্যারণ সাহেব কর্ত্তৃক সেইটে বুঝিয়ে দেওয়ার ভেটকীর পেরো-ভেজারতি বুদ্ধিটুকু পটকে দিলে।

• • • •

পক্ষাধিক কাল কেটে গেছে; পিপলাই জাহাজে চ'ড়ে ভেসে গেছেন। ছ' দিন পূর্ব্বে ব্যারণ সাহেবকে বোম্বে তুলে দিয়ে-পিস্ শ্বশুর মশাই স্বয়ং বড় সাহেবী করতে আরম্ভ করেছেন; মোটার থেকে নামলে গেটের জমাদার ধাঁড়িয়ে সেলিউট করে; হলের ভিতর দিয়ে কামরায় যাবার সময় দু'ধারে সেলাম; পিস্-শ্বশুর যেন আপনাকে আর স্বরূপপুরের জনার্দ্দন রায় ব'লে চিন্‌তেই পারেন না। "সাধু" জামাইও দুপুর বেলা একবার ক'রে কেসিয়ারের কাছ থেকে খবর নিয়ে যান, তাঁর টাকা কি রকম বাড়ছে। কেসিয়ার জবাব দেয়, আপনারা কর্ত্তা ব্যক্তি, আপনাদের হিসাব আমাদের মত কেরাণীর কাছে থাকে না; ব্যারণ সাহেব নিজে-ই সে সব রাখেন।

• • • •

জনার্দ্দন রায় দোরে খিল দিয়ে পূজো করেন পাকা তিন ঘণ্টা, তার পর ভোজনান্তে একটু গড়াগড়ি দিয়ে অফিসে আসতে বাজে প্রায় একটা। কালকে মহালয়ার ছুটী; আজ তাই আধ ঘণ্টাটাক সকাল-সকাল অফিসের দরজায় পৌঁছে জনার্দ্দন সেইখান থেকেই শুনলেন, উল্টো সমবেদনা। কতকগুলো লোক ব'লে উঠলো, "এই এক শালা—এই এক শালা!"—"মার জোচ্চোর বেটাকে—মার জোচ্চোর বেটাকে, মোটার থেকে নামিয়ে পায়ে থেঁৎলে মেরে ফেল।" ব'লে একটা চীৎকার উঠল। "আমি স্বহস্তে ওঁকে খুন করব; আমার লাখ টাকার মোহর আমাকে ফিরিয়ে

আনন্দমঠের মাতৃমূর্ত্তি

[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বসুমতী প্রেস]

বাজারে দু'পয়সায় বিক্রী হয় না ; মেয়ের যে দেব কোত্থেকে আমি।" একটি বিধবা ফুটপাথের উপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ; আর একজন বিধবা নিজে কাঁদছে আর তার মুখে জল দিচ্ছে।

ব্যাঙ্কের লোক জন এসে অফিস দখল ক'রে বসেছে ; চাপরাশীরা পয়সার থুলে দেখাচ্ছে, কেরাণীরা বুক চাপড়াচ্ছে ; সে এক বীভৎস দৃশ্য !

মোটারম্যানটি মানুষ-ও ভাল এবং চতুর-ও বটে ; কোন মতে 'কার'খানা ব্যাক ক'রে চার্চক রেলের ভিতর দিয়ে উধাও ক'রে দিলে।

• • • •

বহালয়ার পূর্ব্বদিন যে সর্ব্বস্বহারা দরিদ্রা বিধবাটি "আশো ইণ্ডিয়া এগ্রিকালচারাল এণ্ড কমার্শিয়াল কোম্পানী লিমিটেড" অফিসের সামনের ফুটপাথের উপর মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, কতকগুলি ভদ্রলোক মিলে তাঁকে একখানি ট্যাক্সিতে তুলে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দেন। কয়েক দিন শয্যাশায়ী থেকে কোজাগরের রাত্রিতে তিনি সকল যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ করেন। কলিকাতার শ্মশানে যে সময় তাঁর চিতা জ্বলছিল, সেই সময় ঘুরে সমুদ্রবক্ষে একখানি বড় জাহাজের কোয়ার্টার-ডেকে ব'সে নীরদবরণ আর অজিতকুমার।

নীরদ। Half a peg more Jity, half a peg more, before we retire,

অজিত। Retire ! And on such a night as this ! না, চলুক—চলুক ! এমন জ্যোৎস্না রাত্রি, তরঙ্গের দোলায় দুলছি, কে যায় এখন বাসরঘরে ঘুমুতে !

নীরদ। বেশ, এনজয়—এনজয় ! যদি ভোগই না করা যাবে, তবে রোজগার করা গেল কেন ? ফুলস্—ফুলস্ ! এ পৃথিবীটা বোকায় পরিপূর্ণ।

অজিত। এই বোকামীর জন্মদাতা কে জান ? লোভ —লোভ, আর কেউ নয়।

নীরদ। তা আমি জানি ; মানুষের ঐ দুর্ব্বলতাটুকু ধরতে পেরেছি ব'লে আজ আমার এত জয়জয়কার।

অজিত। তবে একটা মনে হয়, কতকগুলো গরীব লোক নেহাত মারা পড়েছে।

নীরদ। তেমনি ঐ সাধু জোচ্চোরটা আর তার শ্বশুর বেটার মত পাজী যথেষ্ট জব্দ হয়েছে।

অজিত। তা বটে—তা বটে ; তবে ঐ দু'চারটি বিধবা স্ত্রীলোক ছিল—

নীরদ। ছিটি, আজ ডিনারের সময় তুমি যখন কাঁটায় বিঁধে বিঁধে মাছমাংসগুলো গালে পুরেছিলে, তখন কি সেই ভেড়া মুরগী-টুরগীর জন্য তোমার মনে ব্যথা হয়েছিল ? আহার—আহার ! পশুপক্ষি-কীটপতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত যার পানে চাও, দেখতে পাবে, সব হাঁ ক'রে আছে। যার যতটুকু সাধ্য, সে ততটুকু গালে পুরছে। এনজয়—এনজয় ! কে মরে কে কাঁদে—তার খবরে তোমার আমার কি ! ছেড়েছি টাকা—খুঁজেছি টাকা—পেয়েছি টাকা ! ডেকে যাও ও-সব বিবেকের বাজে বকুনি। ভোগ কর—ভোগ কর। শুনেছি সুইজারল্যাণ্ড বড় সুখের জায়গা, সেইখানে সাধ মিটিয়ে বসা ওড়ান যাক। ছিটি, বাঙ্গালার দিকে আর চোখ ফিরিও না ; সেখানকার জীবন ভুলে যাও। What will you have—waiter, champagne,

মৃতা বিধবার প্রতিবেশীরা রাত্রিশেষে যখন তাঁর চিতাস্তূপের উপর গঙ্গার জল ঢালছে, তখনও জাহাজের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ডেকের উপর চলছে—নীরদ ও অজিতের স্যাম্পেন ; আর দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, আকাশ-পথে বিমানে ব'সে চোরাই ফুলের মালা গলায় তারক ওস্তাদজী নকুড়-ফকিরাদি পারিষদসঙ্গে বিরাজমান। করালী দারোগা মাথায় ছাতা ধরেছেন, একদিকে জালালউদ্দীন অন্যদিকে সৈরবী চামর ব্যজন করছে, আর নীরদবরণের মুখে তাঁর যে শ্বশুরের কথা শোনা যেত, তিনি তুলসীর কণ্ঠি ও গরদের জোড় প'রে জামাতার কীর্ত্তির উপর পুষ্পবৃষ্টি করছেন।

বিমানে সুবর্ণাক্ষরে লেখা—

ADVANCE EDUCATION !

আদিরসের উপাখ্যান

৯

মোহনপুরের বিখ্যাত জমীদার অগ্নিশর্ম্মা গাঙ্গুলী প্রতি-বৎসর শারদীয়া পূজা উপলক্ষে একবার জন্মভূমি ও প্রতিমা দেখিতে আসেন। সহধর্ম্মিণী সুরমা দেবী সেই অবসরে পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে পিত্রালয়ে চলিয়া যান।

গাঙ্গুলী মহাশয় সাহিত্য ও সঙ্গীত-সেবকবর্গের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সঙ্গীতের মধ্যে তিনি যাত্রাসঙ্গীত ও কীর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। সাহিত্যের মধ্যে তিনি প্রেম ও ভক্তি-সংক্রান্ত উপন্যাস ও কাব্য পছন্দ করিতেন। সুতরাং অন্ন-সংস্থানের চেষ্টায় দুই এক দল নব্য সাহিত্যিক ও যাত্রার দলের অধিকারী দলবল লইয়া পূজার সময় জুটিয়া যাইত। গাঙ্গুলী মহাশয় সূক্ষ্ম গুণগ্রাহী লোক ছিলেন, সুতরাং রিক্ত-হস্তে কাহাকেও ফিরিতে হইত না।

গাঙ্গুলী মহাশয় আসিবামাত্র গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণকুল যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিল। প্রজা দলে দলে আসিল। দালান-কোঠা পরিষ্কৃত হইল। পিসী, মাসী, খুড়ী, জেঠী এবং তাঁহাদের পুত্র-কন্যা, স্নেহ-বচন ও সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন দ্বারা গাঙ্গুলী মহাশয়ের তৃপ্তিসাধনে রত হইলেন। পিসী প্রতি বৎসরই জিজ্ঞাসা করেন, 'বৌমা ভাল আছে ত, ছেলে-পুলের নয়ন ত?' প্রতি বৎসরই গাঙ্গুলী মহাশয় উত্তর দেন, 'অমনই একরকম।' এবার উত্তর দিলেন, 'ঠিক বুঝতে পারা যায় নি।' বৌমা আসেন না কেন, সে সম্বন্ধে কেহ কখনও সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিত না। কেহ কেহ বলিল, শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, বেড়াবার যায়গা নাই, পাড়া-গেঁয়ে মেয়েরা মূর্খ, তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে সুখ নাই, বড়লোকের মেয়ে, আসবে কেন? তাঁর কি নিজের বাপ-মাকে দেখতে সাধ হয় না? কিন্তু জনপ্রবাদ ছিল যে, বৌমা দু'দিন পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া জ্বরে পড়িয়াছিলেন ও কম্পের সময় শাশুড়ীর আবছায়া শয়নগৃহের এক কোণে দেখিয়া জ্বর একশ' ছয় ডিগ্রী পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। যাহা হউক, এ সব কথা অগ্নিশর্ম্মা গাঙ্গুলীর কর্ণ পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। সকলের ভয় ছিল যে, তিনি 'নামেও যা, কামেও তা।'

গাঙ্গুলী মহাশয়ের মেজাজ 'খিটখিটে' থাকা সত্ত্বেও, এবং একটু 'খামখেয়ালী' হওয়া সত্ত্বেও, সন্তোষজনক কৈফি-য়ৎ পাইলে তিনি কৈফিয়ৎদাতাকে যথাসম্ভব পুরস্কৃত করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। গাঙ্গুলী মহাশয় হঠাৎ জটিল বিষয়ের কোন প্রশ্ন করিলে, অনেকে প্রাণপণে সমস্যাপূরণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। কখনও গাঙ্গুলী মহাশয়ের সমস্যা কেহ পূরণ করিয়াছিল কি না, তাহা কেহ জানিত না; কিন্তু পূরণের পথে খানিকটা অগ্রসর হইলেও তিনি পুরস্কার দিতেন। দিবাভাগে জমীদারীর খানিকটা প্রদর্শন শেষ হইলে রাত্রিতে প্রকাণ্ড মশারি খাটাইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় নিদ্রার কোলে বিশ্রামলাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টাই তাঁহার কালস্বরূপ দাঁড়াইয়া গেল। গ্রহ-বৈগুণ্যে মশারির কোণে একটা ছিদ্র ছিল, এবং মনোযোগেও গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ একটা দিক উন্মুক্ত ছিল; সুতরাং দ্বিপ্রহর রজনীকালে মশকের দল ও পূর্ব্বস্মৃতির তরঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাপরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া বসিলেন। সেখানেও রক্ষা নাই, পুষ্করিণীর দূষিত বাষ্প ও ঝিল্লীর আর্ত্ত-নাদ তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। প্রথমে তিনি মনে করিয়া-ছিলেন যে, খানসামাকে ডাকিয়া একটু বাতাসের যোগাড় করেন, কিন্তু তাহার নাসিকাগর্জ্জনের ধুম দেখিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। নিজেই তালপত্রের পাখাখানি হেলাইয়া দোলাইয়া মশকের আক্রমণ হইতে কিঞ্চিৎ অব্যাহতি পাই-লেন, কিন্তু দুশ্চিন্তার সংখ্যা বাড়িয়া গেল। ক্রমে অন্য-মনস্ক হইবার চেষ্টা করাতে পাখার আঘাত নাসিকায় লাগিয়া শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তকে উঠিল। আত্মরক্ষার নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে গাঙ্গুলী মহাশয় দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিকের আকাশে আলোকের সঞ্চার হইয়াছে। মনে

ঠিক, কিংবা অন্য কোন প্রকার হউক, পবনের মত একটা তীব্র ঝাউ-বৃক্ষের শীর্ষ আন্দোলিত করিতেছিল। বাগানের একটি নবীন বকুলবৃক্ষে 'বউ কথা কও' পাখী গলা ছাড়িয়া দিয়াছিল। মহালয়ার রাত্রি। অন্ধকারের শেষে আলোকের রেখা দেখিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের তরলা হইল। ক্রমশঃ পলকের সঙ্গে অন্ধকারের চিন্তাগুলি অদৃশ্য হইল। নিদ্রাদেবী চক্ষুপল্লব স্পর্শ করিলেন।

ঠিক সেই সময় খানসামার নাসিকাধ্বনি বিলীন হওয়াতে ও নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিল, গাঙ্গুলী মহাশয় বাহিরে এক-খানি চেয়ারে বসিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ভয়, পাছে রৌদ্র উঠিয়া পড়িলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। গাঙ্গুলী মহাশয়ের বেলাতের অনুযায়ী চড়টা-চাপড়টাও প্রসিদ্ধ ছিল; সুতরাং সে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল।

মোহনপুরের অতিশয় সৌভাগ্য যে, গাঙ্গুলী মহাশয় প্রাতঃকালে একটু নিদ্রালাভ করিয়াছিলেন, নচেৎ তিনি সেই দিনই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। বেলা আটটার পর নিদ্রাভঙ্গ হইলে নায়েব শ্রীনাথ কৌমিক মহাশয় করযোড়ে উপস্থিত হইলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "আমার একটু সুনিদ্রা হয়েছে। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে তাঁহার পিত্রালয়ে একটা পোষ্টকার্ডে সেই সংবাদটা দেও। আমার লিখিবার অবকাশ নাই।"

২

সুনিদ্রা হওয়া স্বাস্থ্যের পূর্ব্ব এবং পশ্চাৎ—উভয়বিধ লক্ষণ। তাহার বিশেষ প্রমাণ লক্ষিত হইল আহারের সময়। কচুর শাক হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড় জামবাটির ক্ষীর সাবাড় করাতে আত্মীয়বর্গ মনে মনে প্রীত হইলেন। সম্মুখে একটি বালিকা বাতাস করিতেছিল। জঠরানল নির্ব্বাপিত হওয়াতে গাঙ্গুলী মহাশয়ের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি, মা?"

বালিকা। মোক্ষদা।

গাঙ্গুলী। বেশ নামটি। তুমি কার মেয়ে?

পিসী। তোমারই এক জন খুড়তুত ভগ্নীর মেয়ে।

গাঙ্গুলী। বিবাহ হয়েছে?

গাঙ্গুলী। এমন সুন্দরী মেয়ের দরেও কোন্ শা—পয়সা চায়?

(বালিকা সলজ্জে চলিয়া গেল)

পিসী। সকলেই চায়, বাবা।

গাঙ্গুলী। আমার পিতৃপুরুষ কিংবা আমি ত কখনও চাইনি। এখন দেখছি, যাদের টাকা আছে—তারাও হেঁকে বসে। কাঁটা মার এমন সমাজের মুখে। কত টাকার দরকার?

পিসী। শুনেছি, ও হাজার।

গাঙ্গুলী। টাকা নিয়ে উড়িয়ে দেবার মতলব! দেশের টাকা বিদেশে উৎসর্গ করবে। কাঁটা মার এমন দেশের মুখে। যা হ'ক, মেয়েটিকে দেখে আমার বাসা হয়েছে। একটা ভদ্রলোকের ছেলে পছন্দ ক'রে ফেল। হয় টাকা চাবে, কিংবা চাবে না। যত চায়, আমি দেব, যদি না চায়, তবে তার ভরণ দেব। কিন্তু শেষ কথাটা প্রকাশ না হয় যেন।

পিসী। বেঁচে থাক বাবা। আমি এখন পুজোর যোগাড়ে যাই।

গাঙ্গুলী। তোমরা মরলে পুজোর যোগাড় কে করবে, তা মাঝে মাঝে ভেবে ঠিক পাই না।

পিসী। কিছু ভাবতে নেই, দেশের দুর্দ্দশা যেমন হয়ে আসছে, আবার সকলেই পুজো করতে বসবে।

গাঙ্গুলী মহাশয় প্রসন্নবদনে বাহিরে গেলেন। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। অনেকগুলি আগন্তুক তাঁহার প্রতীক্ষায় প্রাতঃকাল হইতে বসিয়া ছিল। নায়েব মহাশয় সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

প্রথম, রাধাচরণ বাঙ্গুয্যে, তিনি নূতন ধরণের যাত্রার দল খুলিয়াছেন। যাত্রার অভিনয়ের সাহায্যে অধিকারী মহাশয় নীতি-শিক্ষা দেন ও দেশের দুরবস্থা বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় আগন্তুক কৃষ্ণচরণ চাটুয্যে। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র; পল্লীসংস্কার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। কচুরী পানা প্রভৃতি দূর করিয়া পুষ্করিণীগুলি উদ্ধার করা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। দেখিতে অতিশয় সুন্দর মুখশ্রী, সবল ও স্বাস্থ্যপূর্ণ। তৃতীয়, সুবলচন্দ্র প্রামাণিক, ইনি রবীন্দ্রনাথের ছাঁদে ও ভাষায় প্রেমের কবিতা লিখিয়া

ইতিহাস ও দেশবিদেশের সমাজতত্ত্বে সুপণ্ডিত। পঞ্চম, নীলমণি শেঠ, অতিশয় সুগায়ক। বাকী সব ইঁহাদেরই দলবল ও বন্ধুবান্ধব এবং গ্রামের আত্মীয়স্বজন ও প্রজাবর্গ।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের মেজাজ হইতে সৌজন্যই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি সকলের সহিত করমর্দ্দন ও আলিঙ্গন প্রভৃতি শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, আমাদের সঙ্কীর্ত্তনের দলকে ত দেখছিনে।"

নায়েব। তারা সঙ্কীর্ত্তন ছেড়ে যাত্রার দলে আপাততঃ মিশে গিয়েছে।

গাঙ্গুলী। তা যাক্, থিয়েটর ফাঁদে নাই ত?

গাঙ্গুলী মহাশয় থিয়েটরের অভিনয় সহ্য করিতে পারিতেন না, মাথা গরম হইয়া পড়িত। বিশেষতঃ কনসার্টের নির্ঘোষ শুনিলে তাঁহার বিবাহকালীন 'ব্যাণ্ডে'র কথা মনে হইয়া এবং বাসরঘরের যন্ত্রণা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া ভীতির উদ্রেক হইত।

বাসরঘর হইতে অব্যাহতি পাইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সেখানে কিঞ্চিৎ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া তিনি বি-এ কোর্স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া জমীদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে মগ্ন হন। ক্রমে তাঁহার মন পারমার্থিক তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

হঠাৎ থিয়েটরের অভিনয় সম্বন্ধে উল্লেখ হওয়াতে এবং আধুনিক মাসিক পত্রিকায় নারীতত্ত্ব প্রভৃতির মৌখিক গবেষণা ও তাহার প্রতিবাদ মনোযোগে উদয় হওয়াতে, তাঁহার একটা সন্দেহের কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই সন্দেহটুকু তাঁহাকে প্রায় ১০ বৎসর ধরিয়া আকুল করিতেছিল।

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "আপনারা সকলেই সুরসিক লোক বলেই এই গ্রামে পদার্পণ করেছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য মহৎ। একটা জিনিষে আমার যদি সন্দেহ মিটাতে পারেন, তবে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করব।"

যাত্রার অধিকারী, পল্লী-সংস্কারক ও কবি প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "আজ্ঞা করুন, আমরা প্রস্তুত।"

৩

গাঙ্গুলী মহাশয় অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কথাটা বিশেষ কিছুই নয়। আমার বহুকালাবধি 'আদি-রস' তবে অন্ত-রসও আছে। যদি বলেন, রস অনাদি ও অনন্ত, তবে তার আদিও নাই, অন্তও নাই। কিন্তু কেহই সে কথা বলে না। যদি বলেন যে, রসের উৎপত্তি সময়-বিশেষে হয়, তবে তার আধার একটা কিছু আছে। এখন আমার প্রশ্ন যে, এই রসটা কি পদার্থ ও তার আধারই বা কি? আরও জিজ্ঞাস্য যে, যদি এই রসটা উপকারে আসে, তবে বেশের দলের জন্য সঞ্চয় করার কোন সম্ভব আছে কি না?"

সকলে নীরব হইয়া রহিল। মোহনপুরের সোমনাথ তর্কালঙ্কার, গাঙ্গুলী মহাশয়ের মনোভাব কিছু কিছু বুঝিতেন। তিনি নস্য গ্রহণানন্তর বলিলেন, "প্রশ্নটা অতিশয় জটিল। রসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ একটা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন। যেমন অদ্বৈতবাদ। যদি রসবোধ দ্বারা রসের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে একাধারে রসময় ও রসজ্ঞের দ্বৈত-বাদ। যদি আধার বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে রসজ্ঞ, রসময় ও রসিকা রসময়ীর জীবভাবে দ্বৈতবাদ। কিন্তু আধার বিভিন্ন হ'লেও আধিরস একই পদার্থ, সুতরাং আধারভেদে রসের ভেদ হয়, এ কথাও বলা যায় না। যদি দুইটি মৌলিক পদার্থ সংযুক্ত হয়ে রসের উৎপত্তি হয়, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রসায়ন-তত্ত্বের অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে আমাদের পল্লীসংস্কারক কৃষ্ণচরণ বাবুর বুৎপত্তি অসাধারণ। বোধ হয়, গাঙ্গুলী মহাশয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই পছন্দ করবেন।"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "অনেকটা তাই। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করে না। বৈষ্ণবদের চৌষট্টি রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ পুথিগত বিদ্যা আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরিচয় ঘটে নাই। অদ্বৈতবাদের রস আমার বুদ্ধির অগম্য। বরং বোধ হয় যে, বৈষ্ণবদের মনোময় রসতত্ত্বে গতিবিধির সঙ্গে—প্রাণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ই অনাদি, সুতরাং উভয়ের মিলনে যদি কোন রসের সঞ্চার হয়, সেটাও অনাদি। সাধারণ লোক আদি-রসকে ক্রমক্রমে কামপ্রবৃত্তি কিংবা প্রজননেচ্ছার মধ্যে দেখে। সেটা স্বাভাবিক, কেন না, যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই রসের আধিক্য হয়। পূর্ব্বাপর আমাদের প্রেম ব'লেও একটা সংস্কার আছে, সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ আছে, বিবাহ ও বংশবৃদ্ধি আছে, সকলগুলা [illegible] ছেলেপুলেরা

সেগুলো দেখে শুনে ও পুথি প'ড়ে প্রেমের সঙ্গে ও আদি-রসের সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে। কিন্তু আমার কথাটার তাৎপর্য্য, মোটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই রুচিকর হবে। রসের উৎপত্তিস্থান ও আধার আমাদের দেহের মধ্যে বস্‌লে অশ্লীল হয়ে পড়বে, বরং রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে, খাদ্যের মধ্যে, এক কথায় বাহিরের পদার্থের মধ্যে সেটার অনুসন্ধান করলে হয় ত রসটাকে আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের উপকারে লাগাতে পারি। এইটুকু কি উপায়ে হয়, ভেবে দেখুন।"

পল্লীসংস্কারক। অর্থাৎ রসটার ব্যক্তিগত আধার না দেখে, সর্ব্বসাধারণের হিত তা হ'তে কি ক'রে হয়, সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করাই আপনার উদ্দেশ্য ?

গাঙ্গুলী। ঠিক। তোমার কথায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। যদি রসের মূল আদি-রসই হয়, তবে আদি-রসের মধ্যে সকল রসই আছে,—যেমন একটা সুরের মধ্যে সাতটা। এখন দেখতে হবে যে, সকল রস এসে জোটে কোথায় ? তীর্থস্থানে হয় ত ভক্তিরস জোটে, যুদ্ধক্ষেত্রে রৌদ্ররস এসে একত্র হয়। গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে কতকগুলো রস জুটে যায়। কিন্তু সকল রসের আধারটা কি ?

কবি। বোধ হয়, কাব্যে সেই রসটাকে বিস্তার করলে আরও মধুর হবে।

গাঙ্গুলী। কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, সব দিকেই সেটা উজ্জ্বল হওয়া চাই।

অধিকারী মহাশয়।—যাত্রা ও গানে ও সঙ্কীর্ত্তনে।

গাঙ্গুলী। নিশ্চয়। এখন পুনর্ব্বার মনে করিয়ে দিচ্ছি, যৌনতত্ত্বের কথা যেন তু'ল না। আমার বংশবৃদ্ধি হউক, এ রকম একটা সম্বন্ধ সে কালে কেউ কেউ পছিন্দ দেখে করত। এখন কেবল উপভোগের ইচ্ছা। যে রকম রসেরই উপভোগ হউক না কেন, এখন সেটা স্বার্থপর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার স্বার্থপর। কিন্তু আদিরসের মধ্যে নিঃস্বার্থভাব দেখাতে হবে আধারটার দিকে তাকিয়ে। আপাততঃ আপনারা স্নানাহার করুন। বেলা অনেক হয়ে পড়েছে, মার্জ্জনা করবেন।

পল্লীসংস্কারক। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। পল্লী-গ্রামে এলেই একটু বেলা হয়ে থাকে, তজ্জন্য কিছু ভাববেন না, আমরা ভোগ-কার্য্যে যাই।

পল্লীসংস্কারক, কবি, ঐতিহাসিক, গায়ক ও যাত্রার অধিকারী মহাশয় তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া, তৈল ও তামাকু প্রভৃতির সুব্যবস্থা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। অতঃপর প্রত্যেকে এক একখানা গামছা স্কন্ধে ফেলিয়া গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইলেন। জনকতক গ্রাম্যসুন্দরী—যুবতী ও প্রৌঢ়া, এক দিকে স্নান করিতেছিল, তাহারা অতিথিবর্গের সমাগমে মস্তক অবগুণ্ঠনাবৃত করিয়া উঠিয়া পড়িল।

অধিকারী। না, আপনারা স্নান করুন, আমরা একটু পরে আস্‌ব।

এক জন প্রৌঢ়া। আমরা সেরে নিইছি। দেখছেন ত পুকুরটা। পদ্ম-জলও নেই। পানায় ভরা। কেবল এই ঘাটটুকু।

দ্বিতীয়। তা না হ'লে আমরা ত চলেই যেতেম না।

পল্লীসংস্কারক। পানা পরিষ্কার করবার কেউ নেই ?

প্রৌঢ়া। না বাবা।

অধিকারী। আপনারা স্নান। আমরাই পানাগুলো তুলে দেব। কাল্‌কে আপনারা জল ক'রে স্নান করবেন।

৪

ব্যর্থ প্রয়াস। অত বড় বৃহৎ পুষ্করিণীর পানা উদ্ধার করা কি দুই এক ঘণ্টার কায ? ফলে অতিথির দল ঘাটু-জলে গামছার সাহায্যে মস্তকে জলসেচন করিয়া ক্ষুণ্ণ-মনে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অবেলায় আহার করিয়া জলপিপাসা বাড়িল। শীতল জলের অভাব। ফিল্টারের জল ছিল। তৃষ্ণা মিটিল না। জলের জলত্ব নাই, স্নিগ্ধতা নাই। ক্রমশঃ অগ্নিমান্দ্য ও বায়ুপ্রাবল্য।

সন্ধ্যার সময় সকলেই স্তিমিতপ্রাণ—পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া। অধিকারী মহাশয় বলিলেন, "ভায়া, তোমরা ত সকলেই সুপণ্ডিত, এখন সকলে মিলে আদিরসের একটা মীমাংসা না করলে, এবার শুধুহাতে ফিরতে হবে।"

পল্লীসংস্কারক। বাঙ্গালা দেশের অবস্থাটা বোধ হয় ঐ পুকুর দেখেই বুঝতে পেরেছেন ?

অধিকারী। না বুঝেই কি বল্‌ছি ? তামসুরো আর অমনটী যেন দেশে কেউ আর না হয়।"

গায়ক। শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করছে।

অধিকারী। তানপুরোটা ম্যাও-ম্যাও করলেই সুস্থ হবে। যখন কেরানীগিরী ছেড়ে গানের ব্যবসা ধরেছ, তখন গলার শক্তি গলায় বের করতে হবেই (কবির প্রতি) ভায়া! আদিরসের কাব্য কিছু সংগ্রহ আছে,—যাকে আমরা বলি 'প্রেম'?

ঐতিহাসিক। পুষ্করিণীর পাড়ের প্রেমটাই এ দেশের লোক বুঝবে ভাল।

কবি। প্রেমের উৎপত্তি কৈলাসে।

ঐতিহাসিক। গড়িয়ে এসেছে শেষে বাঙ্গালা দেশে। পার্ব্বতীর প্রেম কেবল রয়েছে—পুজোর মন্ত্রের মধ্যে। সেটা নবমীর শেষ রাত্রিতে অধিকারী মহাশয় প্রকাশ ক'রে বল্‌বেন।

কবি। যমুনার জল?

ঐতিহাসিক। সে প্রেম আগ্রা থেকে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত। সব প্রেম জড়িয়ে বাঙ্গালার ডোবা-পুষ্করিণী। তোমার পুঁজির মধ্যে যদি কোনও প্রতিভাসম্পন্ন কবির পুষ্করিণীর পাড়ের মনোবেদনা থাকে, তবে সেগুলো উঁচকে দেখ।

কবি। আছে বৈ কি। তবে মাঝে মাঝে গোটা-কতক কথা।

অধিকারী। তা হলেই হবে।

কবি। 'বধূরা আইল ঘাটে।' তার পর—

'নামিল নিভৃত নীরে' 'স্নিগ্ধ জলে মুগুভাবে ধরিল তনুখানি,'

'মধুর দুটি বাহুর ঘায় অগাধ জল টুটিয়া যায়।'

পল্লীসংস্কারক। কি দুঃখ! সেই অগাধ স্নিগ্ধ জল কি আর হবে রে ভাই?

অধিকারী। যাত্রা জুড়ে দিলেই হবে।

কবি। 'জলের পর এলায়ে দিয়ে আপন রূপখানি

সরমহীন আরাম-সুখে, হাসিটি ভাসে মধুর মুখে।'

অধিকারী। কি তালে বাঁধা যায় বল ত?

গায়ক। আড়খেমটা।

অধিকারী। ঠিক। তবলা ছেড়ে ঢোলের বন্দোবস্ত করতে হবে—তার পর?

কবি। 'আধেক কায়া, আধেক ছায়া

জলের উপর রচিছে মায়া

দেহের যেন দেহের ছায়া করিছে পরিহাস।'

ঐতিহাসিক। কি সুন্দর! এ মায়াটা এখন কোথায়?

পল্লীসংস্কারক। দুঃখের বিষয়, ক্ষুরি-পানার মধ্যে। দুর্ভাগা বাঙ্গালা দেশ!

অধিকারী। তার পর মা জননীরা গেলেন কোথায়?

কবি। 'ত্বরিত পদে চলেছে গেহে, সিক্তবাস লিপ্ত দেহে,

যৌবনের মাধুরী যেন লইতে চাহে কেড়ে,

মাজিয়ে তনু যতন ক'রে পরিবে নববাস।'

(তিনকড়ি চুলীর প্রবেশ)

তিনকড়ি (চুলী)। অধিকারী মহাশয়, ঢোলের আজ্ঞা করেছেন?

অধিকারী। যাত্রার ঢোল। চাকের দরকার নেই।

তিনকড়ি। আমার সন্ধ্যার সময়, কি জানেন, কম্প দিয়ে জ্বর হয়।

অধিকারী। সর্ব্বজ্বরান্তকলৌহ, বসন্তকুসুমাকর রসের সঙ্গে মধু, কুইনাইন ও কচুর পাতা বেড়ে নিয়ে খেয়ে আর।

পল্লীসংস্কারক। (পদে চপেটাঘাত করিয়া) এরই মধ্যে মশা এসে জুটেছে। কি বিষের জ্বালা!

অধিকারী। আপাততঃ আদিরসের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটা দেখা যাক্। (কবির প্রতি) দেহের সম্বন্ধে কবি কি বলেন?

কবি।

'বক্ষ হইতে বাহির হইয়া বাসনা ফিরে মরীচিকা সম।

বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে, বক্ষে ফিরিয়া পাই না।

যাহা চাই, তাহা ভুল ক'রে চাই।

যাহা পাই, তাহা চাই না।'

অধিকারী। দেহ-তত্ত্বের আরও কিছু ব্যাখ্যা চাই।

কবি। নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির-চূড়ার কথা বল্‌ছেন?

ঐতিহাসিক। সেটা বাৎসল্যরসের সিগন্যাল। সর্ব্বাঙ্গের কথা বল।

কবি। 'সর্ব্বাঙ্গ চালিয়া আজি আকুল-অন্তরে

দেহের রহস্যমাঝে হইব মগন।

হৃদয় লুকান আছে দেহের সাগরে

চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।'

দেহ-তত্ত্বের এমন সুন্দর ভাব পৃথিবীর কোনও কাব্যে আছে কি না সন্দেহ।

পল্লীসংস্কারক। ঠিক। আমাদের আজ দ্বিপ্রহরের পুষ্করিণীর পাড়ের অবস্থা হয় ত অবশেষে সেই রকম দাঁড়িয়ে যেত।

অধিকারী। কবিও কেঁদেছেন; আমরাও কেঁদেছি। এখন এই বিরাট রসটার উদ্ধার হয় কিসে?

ঐতিহাসিক। পঙ্কোদ্ধার। ইতিহাসের এই বিষয়ে অনেক দেখবার বাকী আছে।

প্রাতঃকালে অগ্নিশর্মা গাঙ্গুলী মহাশয় স্নান-আহ্নিকের পর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। সকলে উপস্থিত হওয়াতে সভাটী নবরত্নের সভার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গাঙ্গুলী মহাশয় ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোধ হয়, আপনারা আদিরসের মীমাংসা করেছেন?"

ঐতিহাসিক নীলোৎপল বাবু বলিলেন, "আমরা যতই ভেবেছি, প্রশ্নটা ততই কঠিন ব'লে বোধ হয়েছে। আমরা আনাড়ী লোক। চিরকাল 'আদিরসের' নামটাই শুনে আস্‌ছি, কিন্তু আদি কি ও 'রস'টা কি, তা ভেবে দেখি নি।"

অগ্নিশর্মা। আদিও যা, অনাদি ও অনন্তও তা। ওটা কেবল কালজ্ঞাপক কথার মারপ্যাঁচ। তবে রসটা কি? তোমাদের ইতিহাস কি বলে?

ঐতিহাসিক। সকলেই বলে 'রস।' সেটা জলীয় কি বাষ্পীয়, কি মনের একটা ভাব মাত্র, সে কথা পল্লীসংস্কারক কৃষ্ণচরণ বাবু বুঝিয়ে দেবেন। ইতিহাসের দিকে তাকালে প্রথমে সমুদ্র-মন্থনের উপাখ্যান মনে পড়ে। সেখানে রসটাকে 'অমৃত' বলা হয়েছে। 'অমৃত'ই রসরাজ। বিষ্ণু সেটা ভাণ্ডের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন মোহিনীরূপে। এই নিয়ে দেবাসুরের যুদ্ধ। অমৃতই অমরত্বের প্রমাণ, কিংবা বাজীকরণ বলতে পারেন। 'জীব' সেই অমৃতের পুত্র। রসিকশ্রেষ্ঠ জীব হচ্ছে মানুষ। সত্যযুগের ইতিহাসে কেবল 'সোমরসে'র উল্লেখ আছে। ত্রেতার ও যোগের ইতিহাসে দেখ্‌তে পাই যে, আমাদের মাথার মধ্যে চন্দ্রলোক আছে, সেই স্থানটা রসের আধার। খেচরীমুদ্রায় যোগে জিহ্বাটিকে উল্টে নিয়ে যোগী সেই রস পান করেন।

অগ্নিশর্মা। যেমন পুষ্করিণীপাড়ে ব্যাং! আমার বোধ হয়, তান্ত্রিকরা এই প্রক্রিয়া করত। রসটাকে জলিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে!

ঐতিহাসিক। বোধ হয়। তার পর ত্রেতায় দেখি যে, অসুরশ্রেষ্ঠ রাবণ, যার রসটা ইন্দ্রিয় প্রবল, সে সীতাদেবীর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পেয়ে তাঁকে অশোকবনে লুকিয়ে রেখেছিল। মহাকবি বাল্মীকি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সেই অমৃতই সতীত্বের আধার। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেটা বাজেয়াপ্ত করা অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভগবানের অংশ শ্রীরামচন্দ্রের মনেও—সেটার সন্দেহ হয়েছিল। অর্থাৎ যমজ লব-কুশ অমৃতের পুত্র কি না। তাই নিয়ে অগ্নি-পরীক্ষা; চিতার পরীক্ষা; শোক-দুঃখের পরীক্ষা।

অগ্নিশর্মা। বেশ। এখন দ্বাপর ও কলিতে চ'লে এস।

ঐতিহাসিক। দ্বাপরে অসুর-প্রকৃতি দুর্য্যোধনও মনে করেছিল যে, সেই অমৃতটুকু—পাঁচটা ইন্দ্রিয় কিংবা দেহের মধ্যেই আছে। তাই বেদব্যাস দেখিয়েছেন বস্ত্রহরণের অভিনয়ে। বোধ হয়, দুর্য্যোধনের ভ্রম হয়েছিল বৃন্দাবনের বস্ত্রহরণের কথা শুনে। কিন্তু পাশাখেলা কিংবা কাঞ্চনের পণে জয় হলেও, অমৃতের আধার যে হস্তগত হয় না, তার প্রমাণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। যতই বস্ত্র টানুন না কেন, নূতন বস্ত্র এসে মায়াময় দেহটাকে আবৃত করে। কলি-কালে এই অমৃতের সন্ধানে শ্রীমূর্ত্তিতে হেলেনকে নিয়ে মহা-যুদ্ধ বেধেছিল। মহাকবি হোমরের ইলিয়ডে সেটা দেখ্‌তে পেয়েছি। আমাদের ভারতবর্ষে তার চেয়েও জাজ্বল্যমান উপাখ্যান আছে রাজস্থানে। সতী সেই অমৃতটুকু দেহের মধ্যে লুকিয়ে অগ্নির চিতার মধ্যে লাফিয়ে পড়ত। বৃথা ইন্দ্রিয়ের উপভোগ, বৃথা ইতিহাস, বৃথা মানব-জন্ম, বৃথা প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি—যদি সতীর ঔরসে অমৃতের পুত্র না জন্মে। দেহটাকে পবিত্র রাখ্‌বার জন্য মন্ত্রর ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণের আগ্রহ, আমাদের বিরাট সমাজের পূর্ব্বসংস্কার। যোগে ও পাঠানদেরও অনেক চেষ্টা হয়েছিল—সেই অমৃতটুকু কৌশল ক'রে অপব্যবহার করা। কিন্তু অবগুণ্ঠন, অবরোধ, নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্যদেবের তর্কিকথা, বুদ্ধদেবের করুণার কথা ও নবদ্বীপের টোলের ব্যবস্থা সেই অমৃতটুকু এখনও

অগ্নিশর্ম্মা। কিন্তু এখন যে রসের লড়াই দেখতে পাচ্ছি, তাতে আসল রসটা পাতালে না প্রবেশ ক'রে ব'সে থাকে।

ঐতিহাসিক। আমাদের দেশে সে ভয় করবেন না। মায়ার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়েছে সত্য, কিন্তু রসটা লুকিয়ে থাকবে ভাবের মধ্যে। রসের প্রহরী নারী। নারী শক্তি-স্বরূপিণী জগদ্ধাত্রীর সহচরী। সে চিতাকেও ভয় করে না, বংশবৃদ্ধিকেও ভ্রূক্ষেপ করে না। অমৃতের রসকে সে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বেই। অভিনয় ক'রে দেখ্‌বে, চাহনি ভাবভঙ্গীতে দেখ্‌বে, প্রেমের কথায় দেখ্‌বে, কাব্যে দেখ্‌বে, সাহিত্যে দেখবে, জাহাজে, রেলপথে, নৌকাপথে, মোটর-কারে, দাম্পত্যজীবনে, গৃহস্থপ্রাঙ্গণে, রাণিজ্যে-ব্যবসায়, পল্লীগ্রামের দুঃখে, দলাদলি ও পলিটিক্যাল ইকনমির মধ্যে, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনার মধ্যে, কোন্‌টুকু বিষ ও কোন্‌টুকু গরল, তার পার্থক্য তারা যেমন বুঝতে পারবে, পুরুষ তা পারবে না। পুরুষ হয় জ্ঞানময় মহাদানব, কিংবা মহিষাসুরের বংশ। জ্ঞানময় হ'লে সে শিব। মহিষাসুর হ'লে মা ভগবতী সিংহের পিঠে চ'ড়ে তাকে কামড়ে যেবেনই। ইতিহাস সেই কথা প্রতিপন্ন করছে সব দেশে। সমাজ ছারখার হলেও সেই কথা প্রতিপন্ন হবে।

৬

অগ্নিশর্ম্মা। ইতিহাসিক নীলোৎপল বাবু ইতিহাসের সাহায্যে রসটা উত্তেজিত করেছেন ব'লে বোধ হচ্ছে। এখন কবি সুবল বাবু কি বলেন?

কবি। নীলোৎপল বাবু ব'লে গিয়েছেন যে, রসটা কি, তার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কথাটা ঠিক। তার কারণ হচ্ছে যে, কোন্ জিনিষটা কি, তার বর্ণনা কেবল ভাব দিয়েই হয়। রসটা কি, সেটা বর্ণনা করতে হ'লে আমরা মনের মধ্যে কি ভাব হয়, সেইটে ব'লে থাকি। ভাবটা একেবারে বাদ দিলে সেটা হয়ে পড়ে বৈজ্ঞানিক। পল্লীসংস্কারক কৃষ্ণচরণ বাবু সেটা বলতে চেষ্টা করবেন। আমার পুঁজি ভাবের মধ্যে। আমি যখন এই দীনদুঃখী দেশটাকে রোগে, শোকে, উৎপীড়নে কাতর দেখি, তখন মনে হয় যে, কেবল সেই অমৃতটুকু বক্ষে ক'রে তারা বিশ্বপালকের কোনও মহান্ উদ্দেশ্যসাধন করছে। আমার এক পিসী ছিলেন বিধবা, তাঁর নাম বগলা। তাঁর প্রধান কাজ ছিল পুষ্করিণীর পাড়ে ঘুরে বেড়ান ও যুবতীদের গালিপাড়া। তাঁরা পুষ্করিণী থেকে সুরু ক'রে বাঙ্গালাদেশের যত পুষ্করিণীর খবর তাঁর মুখস্থ ছিল। আষাঢ়-বাষাঢ় ভেজে, গলি-কানাচি দিয়ে, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ঘাট পার হয়ে, কানাঘুসোর কথাগুলো ভয় ভয় ক'রে অনুসন্ধান ক'রে, পতিতা ও রক্ষিতাদের প্রণয় ও গুপ্ত প্রেমের ইতিহাস সংগ্রহ ক'রে, শুক্রবারের হাটে স্ত্রীলোকদের একত্র ক'রে প্রথমতঃ হাঁড়িটা ভাঙ্গতেন, তার পর দলাদলি পাকাতেন। যুবতীর দল এক পাশে মুদীর দোকানের ঝাঁপের আড়ালে গিয়ে কাণ খাড়া ক'রে শুনত। বগলা পিসীর বর্ণনাটুকু ছোট উপন্যাসের মত। রসের ছড়াছড়ি এত থাকত যে, আনাড়ী লোক মনে করত যে, তাতে হিতে বিপরীত ঘটছে, কেন না, তিলকে তাল পাকিয়ে, যেটা কেউ কখন ভাবে নাই, সেই মনস্তত্ত্বগুলোর ক্রম-বিকাশ ক'রে ভবিষ্যৎ যুগের ছড়া কেটে একাকার করছেন। কিন্তু বাঙ্গালার ডোবা চৌষট্টি রসের আধার। হিমালয়-নিঃসৃত গঙ্গা-নদীর রসের সঙ্গে অনেক দেশ-প্রদেশের নদীর রস মিশে একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ! কাযেই যুবতীদের ভাব লেগে যেত। সেটা সাহিত্যিক পিসীর হাত-যশ। ফলে পাড়িয়ে যেত ধর্ম্মভয়। পিসী সমাজটাকে এই ক'রে রক্ষা ক'রে যেতেন। বগলা পিসী বলতেন, কলিকালে দেহের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে ঘোমটার মধ্যে। অন্দরের ঠাকুরকে ঘোমটার মধ্যে দেখ্‌তে হবে। যদি বাহিরের ঠাকুরদের দেখ্‌তে চাও, তবে রূপটা দেখাতে পার, কিন্তু মনের কপাট বন্ধ রাখতে হবে। যদি মাতৃত্ব দেখাতে চাও, তবে হাফ-ওপনস্লেই সেমিজ গায় দিলে অনেকটা সীমা নির্দ্দিষ্ট হ'তে পারে, সেটা পিসীর মতে 'সারেনটিফিক্ ক্রনটিয়ার।' যদি এর চেয়েও আর্ট ফলাতে হয়, তবে হাঁটু পর্য্যন্ত শাড়ী গুটাতে পার—নাচের সময়। এগুলো কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে নয়। যাদের রূপ আছে, যৌবন আছে, ভাল পোষাক আছে, গাড়ী-ঘোড়ায় চড়ে, দুহাতে পয়সা বিলোয়, তাদের জন্য। অধিকারিভেদে সীমা। পাড়াগেঁয়ে যুবতী আহ্লাদী, কিংবা পেহ্লাদের মা, যার নাইক' সাবান, খায় দুমুটো শাকভাত, ঘরে প'ড়ে বৎসরে ছয়মাস ও কেঁদে কেঁদে সারা হয় বাকী ছয়মাস, তাদের রঙ্গস্থলে নাচার সাহিত্য এখনও বাজারে বাহির হয় নি। যদি বাহির হয়, তবে

রসচর্চার অভিনয়ে প্রকাশ হবে। পিসীমা বলতেন যে, দেহের উপর নজর দিলেই বুঝতে হবে—সেটা কু-নজর। সু-নজর দিয়ে কবি ও আর্টিষ্ট দেখ্‌তে পারেন, কিংবা অধিময় নজর দিয়ে দার্শনিক দেখ্‌তে পারেন, কিন্তু সেটা চিরকাল পুথি-পত্রই থেকে যাবে। উপভোগের জন্যই সকলে হাউমাউ করে রাক্ষসের মত। রেলে চড়া, পথে হাঁটা, মন্দিরে তীর্থযাত্রা করা মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

অগ্নিশর্মা। তবে কাব্যে ও সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সীমা রাখ্‌বে কি ক'রে?

কবি। প্রেমটাকে প্রথমে রসস্থ ক'রে নিয়ে, শেষে অগ্নিতে পাক করলেই নজরটা দেহ থেকে ঊর্ধ্বগতি হয়ে উঠে যাবে মাথায়। কবিরাজ মহাশয় বলতেন যে, এটা 'পুটপাক।' যত পাকতেল ও রসায়ন এই প্রণালীতে তৈরী হয়। চরকের মতে আদিরসের বিকার হওয়াতে সব রোগের সৃষ্টি। বাঙ্গালাদেশের বৈশিষ্ট্য তাই দিয়ে।

অগ্নিশর্মা। কি রকম অগ্নি?

কবি। দুঃখ; করুণার উৎপত্তি হয় যাহাতে। দেহ ও রস, এই দুটো নিয়ে যদি ভাব মেশে যায়, তবে ভাবটা রস নিয়ে দেহের পয়ঃপ্রণালীর দিকে গড়িয়ে আসবে। কাযেই একটা বাঁধের দরকার।

অগ্নিশর্মা। অমৃত রস?

কবি। অমৃত রসের কিংবা আদি-রস যা-ই বলুন, তার মধ্যে করুণভাবটাই পাথরের বাঁধ। আর সকল বালির বাঁধ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধময় সুন্দর মানবদেহকে বিষাক্ত ক'রে নরকের পূতিগন্ধে নিক্ষেপ করলেই তাতে কর্মফলের ভীষণ কুঠার অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে আসবে। কাব্যের ও সাহিত্যের মধ্যে সেই জন্য শাসনের বিধি আছে।

২

অগ্নিশর্মা। ভাবের সীমা নির্দ্দিষ্ট করলেও দেখ্‌তে হবে, কি প্রকারে বৈজ্ঞানিক সীমাটুকু ঠিক রাখা যায়। নিরক্ষর হয়ে ভাবের গোড়ায় পাহারা দেওয়া আমার মতে অসম্ভব। যদি গুরুর পাহারাওয়ালার উপর পাহারাওয়ালী এসে জোটে, কি 'ভাইসি—ভর্সা', তা হ'লে শান্তিস্থাপন করতে গিয়ে পুলিস ডাকাও কখনও কখনও দরকার হয়ে পড়ে। আমার বোধ হয়, এটার মীমাংসা কর্ম্মকাণ্ডে আছে। পল্লীসংস্কারক কৃষ্ণচরণ বাবু সে দিন তার আভাস খানিকটা দিয়েছিলেন।

পল্লীসংস্কারক। আপনি ঠিক আন্দাজ করেছেন। বৈজ্ঞানিক মানুষ ভাবের দিকে তাকায় না, কর্ম্মের দিকেই তাকায়। আমাদের দেশে কর্ম্মকাণ্ডের তিন রকম ব্যবস্থা ছিল। প্রথম যোগে, দ্বিতীয় বৈদিক যাগযজ্ঞে, তৃতীয় সংহিতায়। তিনটিরই মর্ম্ম এক। বস্তুভাব ইন্দ্রিয় হ'তে মুক্ত হয়ে মনের মন্দিরে ব'সে অমৃতের অধিকারী হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু যোগক্রিয়াসাধন, কিংবা যজ্ঞ সকলের ভাগ্যে ঘ'টে উঠে না। ফলে সে পথে অবগাহন হয়ে ব'সে থেকে শিষ্টের দল ক্রমে ভ্রষ্ট হয়। সংহিতায় ব্রাহ্মণ-শাসনের জোরে কোনও প্রকারে দিনটা চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু কর্ম্মের ব্যবস্থার মধ্যে প্রবৃত্তি ছিল কম, নিবৃত্তিই বেশী। সংসারের প্রসারণ ও স্ফুরণের সঙ্গে প্রবৃত্তি আস্‌বেই। দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে খুব। কাযেই জগৎকে কর্ম্মক্ষেত্রের পথে উৎসাহ ও আনন্দের ভাগ বাড়িয়ে না দিলে, কেবল বিদ্যা-সুন্দরের 'বিদ্যা-পক্ষ' ও 'কালী-পক্ষের' ভাষার্থে আদি-রসের বিকার প্রশান্তি লাভ করবে না। দিনরাত্রি খাটো, সময় পেলে একটু ভাবচর্চ্চা কর। বিশুদ্ধ সাহিত্য যেন সেটাকে অমৃতময় ক'রে তোলে। এই জন্য জগতে সাহিত্য ও কর্ম্ম পরস্পরের হাত ধ'রে কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছে। পরিশ্রমের মূল্যের দিকে সকলের নজর পড়েছে। অধ্যবসায়ের সময় একটু চরকা-টানার মূল্য লাখ টাকা। তা ভারতবর্ষ বুঝতে পারে নাই এখনও। আমরা বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান দিয়ে মীমাংসা করি। ভাব আছে, তা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সেটা বাহির হ'তে ইন্দ্রিয় দিয়ে দেহে আসে, কিংবা অন্তর হ'তে দেহ দিয়ে বাহিরে যায়, তা নিয়ে তর্কও করি না, ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধও করি না। আমরা সকল রসের আধারকে দেখি জল।

$$H_2O$$

অর্থাৎ এক পরমাণু অগ্নির ও দুই পরমাণু সোমের। উহাই সোমরস। যমক ভাই লবকুশের জন্য সীতার অগ্নি-পরীক্ষা। আদিরস, করুণারস, বাৎসল্যরস সব তারই মধ্যে। জলই অমৃত। জলেই নারায়ণী প্রকৃতির গতি

বলিয়া তিনি নারায়ণ। তিনই জগদ্ধাত্রী লক্ষ্মী। সোমের সঙ্গে কলের সম্বন্ধ আছে বলিয়া চান্দ্রমাসে স্ত্রীদের রজস্বলা হয়। শক্তি নিজেই স্ত্রীঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে স্ত্রী ও পুরুষমূর্ত্তি হয়। আদিরসে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ রহস্যময়। কোন ভেদাভেদ নাই। পশু ও মানুষের তফাৎ নাই। স্ত্রীর ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে পিতা নিজের পুত্র হয়। বিজ্ঞান তাকেই পুনর্জ্জন্ম বলে। দেহ নিমিত্তমাত্র। শক্তি তাহার চালক। এই জন্য বিজ্ঞানের অদৃষ্টবাদ এত প্রবল। আমাদের ভগবান্‌ও বোধ হচ্ছে গীতায় বলেছেন যে, কর্ম্মের গতি অতিশয় গহন, তার জন্য মাথা খুঁড়ে কায নাই, কেবল নিমিত্তমাত্র হয়ে কর্ম্ম কর। কর্ম্ম যেমন মায়াকে ধ্বংস করে, সেই রকম সজীবও করে। মায়াটাকে সজীব ক'রে কর্ম্মের কৌশলে তার মধ্যে জগতের আনন্দসঞ্চার করাই এ যুগের সমাজ-সমস্যা। সবই সত্য। জগৎ, সমাজ, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার, বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, বিলাস, দুর্ভিক্ষ, উপবাস, অভিনয়, অভিসার, বিপ্লব, তাড়না, রাষ্ট্রবিপ্লব ও আত্মহত্যা পর্য্যন্ত সবই কঠোর সত্য। চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করতেই হবে, মায়াপিটের মধ্যে শান্তিস্থাপনা হবে, দ্বন্দ্বের মধ্যে সখ্যতা ও আলিঙ্গন হবে—কেবল একটি উপায়ে; পরহিতসাধনার কর্ম্মে। যে তোমার শত্রু, তার যদি হিতসাধনা তোমার কর্ম্মে হয়, সে সর্প হ'লেও বশীভূত হয়ে পড়বে। আমরা 'বিলাস' 'বিলাস' ক'রে আপসোষ কচ্ছি, কিন্তু এই বিলাসেই অনেক শ্রমজীবী প্রতিপালিত হয়ে পড়াতে জয়-কোলাহল এক দিকে কর। ইন্দ্রিয় প্রবল হয়ে পড়লে বিলাসই ইন্দ্রিয়গুলোকে নষ্ট ক'রে ফেলবে।

পাঁকের মধ্যে গরলও থাকতে পারে, অমৃতও থাকতে পারে। ভাবের ও দেহের সীমা নির্দ্দিষ্ট হবে জলের মধ্যে। তড়িতের প্রবাহ অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জের আবর্ত্তের মধ্যে অহরহঃ ঘুরছে। জড় ও মন একই, তা-ও সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সেই অমৃতটুকু রক্ষা করবার জন্য অসংখ্য গ্রামমণ্ডলী। দেহের পৌরাণিক ইতিহাস ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্যে, নবীন ইতিহাস মাথার মধ্যে। মাথা চায় ব্রহ্মরন্ধ্রকে বাবু করতে, কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্র হচ্ছে শক্তি ও স্ত্রী, সে স্বামীর দাসী-বৃত্তি কখনও স্বীকার করবে না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামী ভাবরাজ্যের কৈলাসে যোগীশ্বর হয়ে বসবেন না। স্ত্রী অমৃত নিয়ে সেখানেই যায়। আবর্ত্তগুলোর মধ্যে পাক দেখে যে রসটাকে আমরা অমৃত ব'লে ঠাওরাই, তার দফা রফানিক বিশ্লেষণে পরিষ্কার হবে। আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালার ডোবা-পুষ্করিণীর মধ্যে তিন যুগের প্রেম প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে। অমৃত রক্ষা করতে না পেরে অনেক পতিতা এবং জীবনসাধবর্জ্জিতা চিরদুঃখময়ী নারী সেখানে দড়ী ও কলসীর সাহায্যে আত্মহত্যা করেছে। ঐ পুষ্করিণীতেই আমরা চিরকাল দেবীর হাতে অমৃতের নৈবেদ্য দিয়ে তাঁকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, দুঃখে বলেছি, 'বঙ্গের মা! তুই কৈলাসে ফিরে যা, আমরা আর অমৃতের অধিকারী না।' কিন্তু তিনি হেসে ব'লে গিয়েছেন, 'বঙ্গজননি, তোদেরই মধ্যে আমি অমৃতটুকু লুকিয়ে রেখে জগতে 'মা' ব'লে পরিচয় দিই। আমি সতীর মা, তাই আমার অত স্পর্দ্ধা! আর বেশী দিন নাই। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পৃথিবী জুড়ে প্রলয় বাধবে। যুগশেষের অমাবস্যার মহানিশায় আমি যখন দেখব যে, স্ত্রীর সতীত্ব গিয়েছে, তখন পুরুষকে পদদলিত করব, নিজের রুধিরধারা নিজের মাথা ছিন্ন ক'রে পান করব, তোরা তখন উলঙ্গ হয়ে রণস্থলে নাচবি। কিন্তু যদি তোরা সে দুঃখটুকু না দেখতে চাস্, তবে তোরা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কর্। গভীর জলে আবার বাঁশের নাম ক'রে ডুব দে। সেখানে উলঙ্গ হ। কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত সীমা কর্। পুরুষ দেখে লজ্জা কি মা? পুরুষের অধঃপ্রবৃত্তি দেখে ঘৃণা হ'লে মাথায় কাপড় দিস্। স্বামী যদি লম্পট হয়, কুৎসিত রোগগ্রস্ত হয়, তোর প্রারব্ধ! ইচ্ছা করলেই কি দেবতুল্য স্বামী মিল্‌বে? দেবতুল্য ক'রে তোল্ তাদের। রূপ? রূপের মধ্যে কোন্‌খানটা রূপ? যে ঢেউ আসছে, তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিস্ ব'লে তর পাসনে। তোদেরও দিন আসছে। তোদের অমৃতের কণা আমার স্বামীর ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে। অন্নপূর্ণারূপে আমি এক দিন সাধ ক'রে তাঁকে দিয়েছিলেম। ওরে! তোরা জানিস নে, মহেশ্বরের তাইতে আনন্দ কত! সেই অমৃত তাঁর ভালবাসা।'

পল্লীসংস্কারক কৃষ্ণচরণ বাবু ইহা বলিয়া অগ্নিশর্ম্মা গাঙ্গুলী মহাশয়ের দিকে করযোড়ে চাহিলেন।

অগ্নিশর্ম্মা। বাবা! তোমার কথায় আমি আনন্দ লাভ করেছি। আমি গ্রামের ভাবিয়ে যাতে পুষ্করিণীটার পঙ্কোদ্ধার হয়, তার বন্দোবস্ত করছি। যত টাকা লাগে, দেব। আদিরসের পালা দিয়ে সেই সৎকর্ম্মটা জাগিয়ে

না তুললে আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ হবে কি ক'রে? অধিকারী মহাশয় কি বলেন?

অধিকারী। আমি ব'সে ব'সে একটা 'পঙ্কোদ্ধারের পালা' নামক নাট্যগীতি লিখেছি।

অগ্নিশর্মা। বাঙ্গালার পঙ্কোদ্ধার যদি করতে হয়, তবে রামরাজ বসুজ মহাশয়ের শরণাপন্ন হউন। তাঁর কাছে বইখানা একবার দেখিয়ে মঞ্জুর ক'রে নেবেন। নাহ'লে লোকের পাল্লায় পড়বেন না।

অধিকারী। রসের অধিকারী হলেই সেখানে সকলকে যেতে হবে।

গায়ক নীলমণি বাবু। সুরগুলো বাঁধা যায় কি ক'রে?

অগ্নিশর্মা। বিদ্যাসুন্দরের ঢঙে। হাততালি দিয়ে বাগিনী বাসীর মত নাচবে, এক একবার আড়চোখে চাইবে। নয়নবাণই বাণের মধ্যে সেরা। ভ্রূধনুর মাঝখানে সন্ধান রাখবে, বাণ ফেলবে আশেপাশে।

৮

'পঙ্কোদ্ধারের পালাটার রস ওতরাবে ভাল', এইরূপ আশার সঞ্চার হওয়াতে গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার সুরমা দেবীকে পিত্রালয়ে পত্র লিখিলেন—"প্রিয়তমে! আমি এবার তোমার জন্য একটা আদিরসের পালার যোগাড় করেছি। কোনও যাত্রার দলের অধিকারী অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে সেটা রচনা করেছেন। তুমি যে কাব্য-উপন্যাসগুলো পড়, তার সার-সংগ্রহ তারই মধ্যে। আমাদের বড় পুষ্করিণীর পাড়ে সামিয়ানা খাটিয়ে তিন দিন যাত্রা হবে। আর একটা সু-খবর। আমাদের মোক্ষদার বিবাহের যোগাড় করেছি এক জন পল্লীসংস্কারকের সঙ্গে। যেমন রূপ, তেমনই গুণ; যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই কর্মিষ্ঠ। এক দিনে ছুটো পুষ্করিণীর কচুরী-পানা পরিষ্কার ক'রে ফেলেছে। প্রতিমাও এমন সুন্দর হয়েছে, যেন বোধ হয়, মা কল্যাণময়ী তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে দুঃখিতা।'

স্বামীর চিঠি পাইয়া সুরমা দেবী সপ্তমীপূজার দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনখানা পাল্কীর ডাকহাঁক শুনিয়া প্রজারা জানিতে পারিল যে, বহুদিন পরে দেশের বধূ দেশে আসিতেছেন।

প্রথমে গাঙ্গুলী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা কিঞ্চিৎ লবণের ও লবণের ব্যাপার দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু স্বামীর পক্ষে চুম্বন ও স্ত্রীর পক্ষে দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে সেটার মীমাংসা হইয়া, বাকী রহিল, পুরানো কতকগুলি সংশয় ও হৃদয়বেদনার কথা। যদিও সুরমা দেবী বলিলেন, 'সে কথা থাক্', তথাপি গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, 'সুরো, ভাবে কেন? তুমি আমার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করেছ অনর্থক।"

সুরমা। আমার গা ছুঁয়ে বলছ?

অগ্নিশর্মা। এটা কি কড়া হুকুম?

সুরমা। (হাসিয়া) প্রবঞ্চক স্বামী অবশ্যপাতে গেলে স্ত্রীই তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। বিধাতার নিয়ম।

অগ্নিশর্মা। তবে তোমার দেহ স্পর্শ করছি। এখন তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল।

সুরমা। আমাকে সন্দেহ হয়?

অগ্নিশর্মা। সন্দেহ না হক্, এটা একটা পৌরাণিকী প্রথা।

সুরমা। অগ্নিপরীক্ষা? কেন? পুকুরে ডুবে মরলেই ত হয়?

অগ্নিশর্মা। তুমি কোনও কালে বল নাই যে, আমি তোমার মনের মত।

সুরমা। না-ই হ'লে মনের মত। তুমি আমি এক, নিজের মনের মত নিজে কে? মন যখন উঁচু উঁচু করবে, তোমার বুকের মধ্যে লুকাব।

আজ শিশী কত খুশী! সাত বৎসর পূর্ব্বে যেমন যে ঘরে এসেছিলেন, সেই ঘর কত সুন্দরভাবে সাজানো। বকুলবৃক্ষের ঘন ছায়ার নীচে সুন্দরী-ফুলের মালা-হস্তে সমাগম! এক দিনের জন্যও দৈন্যের জ্বালা, জ্বরের জ্বালা ও পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া তাহারা জমীদারগৃহিণীর মুখের সঙ্গে জগদ্ধাত্রীর মুখের তুলনা করিয়া প্রতীকোপাসনা বাস্তবে সমাধা করিল। কত আশা-ভরসা সেই মানবী মা আমাদের! তাহাদের অশ্রু দেখিয়া সুরমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের অমৃত উচ্ছ্বসিত হইল। সুরমা বলিল, 'আয়, তোরা বুকে আয়! কি ছার আমার ধনদৌলত-বেশভূষা? যেখানে অমৃতের সঙ্গে অমৃতের মিলন, সেখানে আমি মরণ পর্য্যন্ত থাকব। আমি যে আজ তোদের দেখে সব ভুলে গিয়েছি।'

খোকা আর খুকী দুজনেই মাতৃ-অঞ্চল ধরিয়া স্নিগ্ধ-নয়নে মুখপাত করিতেছিল। সুরমা দেবী আনন্দিতকে লইয়া

প্রতিমার নিকট গেলেন। তাহারা মহিষাসুর ও সিংহ দেখিয়া ভয় পাওয়াতে সুরমা দেবী বলিলেন, "সন্তান, তোমরা অসুরের অধিকারী, পিতার উত্তরাধিকারী। সিংহ মহিষাসুরকেই কামড়াবে, তোমরা যেন কখনও মহিষাসুর হয়ে পড়িসনে। মাকে প্রণাম কর্।"

অধিকারী মহাশয় সেখানে দাঁড়াইয়া সুরমা দেবীর মাতৃমূর্ত্তি দেখিতেছিলেন। কবি সুবলচন্দ্র বলিলেন, 'বাঙ্গালা দেশের এই মূর্ত্তিই বাঙ্গালীর সম্পত্তি, চরম শিল্প!' ঐতিহাসিক নীলোৎপল বাবু বলিলেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাসের পূর্ব্বযুগের শেষদিনেও যে এ মূর্ত্তি আছে, সেটা দেশের পক্ষে মঙ্গল।' পল্লীসংস্কারক কৃষ্ণচরণ ভাবিল, 'একবার কর্ম্মস্থলে এ প্রতিমা পাঠাইলে অসুরপ্রকৃতি যাদের তাদেরও বিষ্ণুর কণ্ঠচক্রে লেগে যাবে, পঞ্চোদ্ধারের বারে আনা ত ঐটুকু।'

সুরমা দেবী সকলকে নমস্কারাদি ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের জলখাবারের কি যোগাড় হয়েছে?"

গায়ক। মুড়ি আর মুড়কি!

সুরমা। কি দুর্ভাগ্য! এমন ত কখনও শুনি নাই। অতিথি সব অনাহারে, (অগ্নিশর্ম্মার প্রতি) আর এ দিকে আদিরসের পালা?

অধিকারী। সেইটুকু বোঝে কে মা! আপনি এসেছেন, তাই রক্ষা, নয় ত আদিরসের বদলে অন্ত-রসের পালা হয়ে পড়ত।

শ্রীসুরমা দেবী

শীকার

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বরলিপি

সুর মিশ্র—তাল তেওরা

হে চির-প্রিয়তম এই জীবন মম অসীম করুণায় করেছ তুমি দান।
অতুল রূপবতী মধুরা বসুমতী ইহারি মাঝে তুমি দিয়েছ মোরে স্থান।
জগত-সনে নিশি মাতায়ে দশদিশি গাহিব দিবানিশি তব মহিমা-গান—
যে গানে অভিনব প্রীতি-পীযূষ তব উথলি অনুরাগে মাতাবে সব প্রাণ।
যদি বা সুখে রহি যদি বা দুখে দহি সুখেতে ভেদ না রহে ভগবান—
সুখেরে চুমো দিয়ে দুখেরে কোলে নিয়ে হয় যেন হে বিভু জীবন অবসান।

+	১	২	+	১	২
সা পা পা	পা পা	দা দা	ণা ধা সা	ণা ণা	দা পা
হে চির	প্রিয়	তম	এ ই জী	ব ন	ম ম
+	১	২	+	১	২
সা পা পা	মা মা	জ্ঞা—।	রা জ্ঞা মা	জ্ঞা মা	পা—।
অ সী ম	ক রু	ণা য়	ক রে ছ	তু মি	দা ন
×	১	২	+	১	২
পা সা দা	সা সা	রা ণা	ণা ধা দা	দা জ্ঞা	জ্ঞা পা
অ তু ল	রূ প	ব তী	ম ধু রা	ব সু	ম তী
+	১	২	+	১	২
পা দা পা	মা জ্ঞা	জ্ঞা জ্ঞা	পা মা জ্ঞা	রা মা	সা—।
ই হা রি	মা ঝে	তু মি	দি য়ে ছ	মো রে	স্থা ন
+	১	২	+	১	২
সা জ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞা মা মা	জ্ঞা মা	পা পা
জ গ ত	স নে	নি শি	মা তা বে	ব শ	নি শি
×	১	২	+	১	২
পা সা সা	গা গা	দা পা	মপা মা জ্ঞা	রা জ্ঞা	মা—।
গা হি ব	দি বা	নি শি	ত ব ম	হি মা	গা ন
+	১	২	+	১	২
মা পা দা	পা পা	ধা ণা	পা দা ণা	সা সা	র্সা র্সা
যে গা নে	অ ভি	ন ব	প্রী তি পী	যূ ষ	ত ব
+	১	২	১	১	২
সরা সা ণা	দা দা	পা পা	মা পা মা	জ্ঞা রা	সা—।
উ থ লি	অ নু	রা গে	মা তা বে	স ব	প্রা ণ
+	১	২	+	১	২
সা রা মা	পা পা	পা পা	পা দা মা	পা ণা	দা দা
য দি বা	সু খে	র হি	য দি বা	দু খে	ম হি
+	১	২	+	১	২
সা রা ণা	দা দা	পা—।	মা পা জ্ঞা	সা রা	মা—।
সু খে দু	খে তে	ভে দ	না র হে	ভ গ	বা ন্
+	১	২	+	১	২
পা পা পা	পা ণা	পা ণা	ণা পা ণা	ণা সা	সা সা
সু খে রে	চু মো	দি য়ে	দু খে রে	কো লে	নি য়ে
+	১	২	+	১	২
সা রা জ্ঞা	রা রা	সা সা	মা পা দা	জ্ঞা রা	সা—।
হ য যে	ন হে	বি ভু	জী ব ন	অ ব	সা ন

কথা ও সুর—শ্রীদেবকণ্ঠ সরস্বতী সঙ্গীতাচার্য

এখানেতে নাচ-গান হয়, কার্য্য অতি হেয় ;
এখান থেকে চক্ষু বেঁধে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

রাজনীতি

এখন রাজনীতি নিছক রাজনীতি। অর্থাৎ প্রজার সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। আগেও তবু প্রজা ব'লে একটা জিনিষ ওরি মধ্যে স্বীকার ক'রে, নয়চে আড়ালে গিয়ে তামাকটা খাওয়া হতো, এখন আর তাহও নাই, লজ্জাও নাই। আজ যা মুখে বলা, কাল রাত পোহাতে পোহাতেই সেটা কাজে করা। আজ যেটা মাথায় খেয়াল, কাল সেটা সত্যি সত্যি একটা প্রকাণ্ড আইন। এই ত রাজনীতির অবস্থা। দেশের রাজনীতির বৈদ্যগুলো রোগীকে সকলেই এলে দিয়েছেন। তবে কাউন্সিল করাটা কি রকম জানো, যেমন গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া অথবা পুজোর সময় পশ্চিম যাওয়া বা বিলেত যাওয়া, ওটা না হলে ইংরেজী লেখা-পড়ায় ইজ্জত থাকে না। যেমন পুজোর সময় শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে কি জোড়াসাঁকোর দাঁ'দের বাড়ীতে, কি পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের বাড়ীতে মানানসই চালচিত্তির, কি বাবরীওলা কার্ত্তিক, কিংবা ভয়ানক রাগমুখো অসুর চাই, সেই রকম বাঁড়ুয্যে, ঘোষ, বোস, মিত্তিরদের বছর বছর এম, এল, সি বা এম-এল-এ বা চেয়ারম্যানী ঐ রকম একটা পোষাকী ব্যাপার থাকা চাই। এখন পলিটিক্স বা রাজনীতির দৌড় এই অবধি। না, থুড়ি, একটু ভুল হয়ে গেল—আগে দাবা-পাশায় বিলাসী বাবুদের অবকাশময় কাটতো, তাঁরা দাবার নেশায় এমন মজগুল থাকতেন যে, ছেলেকে সাপে কেটেছে, খবর পেলেও "কার সাপ" ব'লে মুখব্যাদান ক'রে "এই কিস্তি" ব'লে কিস্তি দিতেন, সেইরূপ এখন হয়েছে মিনিষ্ট্রী ভাঙ্গা ও মিনিষ্ট্রী গড়া। এ একটা নূতনতর শক্ত রকমের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান কেউ কখন দেখেও নি, কেউ কখনও শোনেও নি। মিনিষ্ট্রী ভাঙ্গবার বেলায় কেবলই এই দাবা-বোড়ে চালের চিন্তা। দশের ঘরে চাল থাকুক আর না থাকুক, কাউন্সিলের চালবাজীই এখন রাজনীতি। গজ চক্র গেছে, এখন বহিম মিত্তির পাশা পড়েছে। কেউ কেউ বলছেন, এ বড় কঠিন ঠাঁই, এখার সব চালের উপরে চাল পড়েছে। যে মসনদ কাগজ আছে, জমীদারী আছে, এমন লোককে ধ'রে মিনিষ্টার করা হচ্ছে। তার পর প্রভাস মিত্তির—তিনিও এক পুরুষে নন, কাযেই এখানে মিনিষ্ট্রী যাং করা বড় চাট্টিখানি কথা নয়। নাই বা যাং হলো। কোম্পানী বাহাদুর ত বলছেনই যে, স্বরাজীদের রক্ত ঠাণ্ডা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথাও ঠাণ্ডা হয়েছে। তারা বুঝেছে, চারলেও রাজার মাটী, জিতলেও রাজার মাটী। সুতরাং আর তাঁরা তেমন ভাজনের দিকে নেই। এখন বরং রাজার হয়েই কোমর বাঁধছেন। মাদ্রাজ কংগ্রেসে একটা উপায় পেলে হয়। তা হলেই সকল আপদ চুকে গেল। চলকার ব্যানোর ব্যানোরটা ত নাই বললেই চলে, কেবল রাজবন্দীদের নিয়ে একটু-আধটু যা আছে, তা সুভাষ বসু, সত্যেন মিত্র আর কত দিন চালাবেন? দেশে একেবারে সাড়া না পেলে 'সোলো' গান কত দিন গাওয়া যায়? যে কথাই তোলো না কেন, রাজনীতিক্ষেত্রে দোহারের একান্ত অভাব। তবে ভড়িলে রসুকের ঘাড়ভাঙ্গার দল এক হাত দেখালে বটে। দলীপ সিংহের মাথাটা নিতে পারুক বা না পারুক, এক মাসের মধ্যেই ত একটা কড়া আইন ক'রে নিলে। কংগ্রেসও বলেন তথাস্তু। তোরা স্বরাজীই হও আর বিরাজীও হও, চীৎকার ক'রে গলা ফাটালেও কেহ শোনবার নেই। কিন্তু এইবারে পীরপয়গম্বরের উপর লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই দেখে, সরকার এমনই চটে গেলেন যে, সরাসরি আইন বেঁধে দিলেন যে, ধর্ম্ম নিয়ে চালাকী চলবে না। নয়তে নবাব বেগের নবাব, যত সোম নন্দ ঘোষ, যত কিছু অনাছিষ্টি সব না কি খবরের কাগজগুলোর জন্যে। তাই আর একটা কিম্ভূত-কিমাকার আইন পুতনা পাঠিয়ে ওগুলোকে আঁতুড়-ঘরেই গলাটিপার ব্যবস্থা। এই হচ্ছে এক প্রস্থ রাজনীতি।

তার উপরে এই রাজনীতির জন্যে এবার হিন্দুর মেয়েগুলোর একটা হিল্লে হলো। একেবারে আইন হয়ে গেল, আর ১২ বছরের আগে কারোর বিয়ে হবার যো নেই। কিন্তু বাবাগুলো ত আর পণের দায় থেকে বাঁচলো না। তবে

বারে ১ বছর থেকে ভদ্রাসন বাঁধা বা বিক্রীর চেষ্টা করতে হতো, এবার একটু সময় পাওয়া যাবে। তবে মনু যাজ্ঞবল্ক্য এরা ত ম'রে ভূতই হয়ে আছে, হিন্দুরা ত তাদের ভাকুনা ছেড়েই দিয়েছে। তাই এ আইন টোড়ালাপ।

একটা বড় কথা ভুলে গেছি। সেটা হ'লো রয়াল কমিশন। রাজনীতিকের সাধের গুড়ে একেবারে বালি। তাঁরা ছেড়া কাথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন দেখ্‌ছিলেন,'হান হব, তান হব'—'ছাতী পাব, ঘোড়া পাব।' কোথা থেকে একটা মার্কিনের মেয়ে এসে ছুট্‌লো, এমন চাল চেলে দিলে, আর পাওয়া-পোওয়ার নামটি মাত্র নেই। এখন বাপের নাম রাখাই মুস্কিল। মার্কিণী মিস্ বলে কি না—এরা আবার একটা জাত, প্যারদার আবার শ্বশুরবাড়ী। এদের নাম করলে গঙ্গা নাইতে হয়, এরা আঁতুড়ে মেয়ের বিয়ে দেয়, আট বছরের ছুঁড়ীকে দিয়ে ঘর-কন্না করায়, তাদের মেয়ে ফেলে বংশরক্ষা করে, এ জাতকে একেবারে সাবাড় ক'রে ভারতবর্ষ ফেনাইলে না ডোবালে সমস্ত পৃথিবীর একটা আপদ ঘুচবে না। কোথায় তাদের জনপ্রতি একটা ঘড়ি-কলদীর ব্যবস্থা করবে, না তাদেরই হাতে রাজ্যভার! জগৎ শুদ্ধ লোক এই আইবুড়ো মার্কিণী নারীর কথা শুনে প মেরে গেছে। রাজনীতি ত এমনি ম'রে ভূত হ'রে এপার্টি সেপার্টির ঘাড়ে চেপে মহা একটা হটো-পাটি লাগিয়েছিল। মেয়ে সেই ভূতের হাত থেকে ইংরাজকে একেবারে বাঁচিয়ে দিলে আমরাও বাঁচলুম। এখন রামপ্রসাদের মতে বিবাহার তীরে রাজনীতির কুশপুত্তুল দাহ ক'রে অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী গিয়ে একেবারে রেহাই পেলেই বাঁচি। তা হলেই বোধ হয়, পেঁচোর পাওয়া কংগ্রেসটারও আনন্দাদির ঝাড়া পৌছাতেও আর ধড়ে প্রাণ আসবে না।

নীচ যদি উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। মহাত্মা সুবুদ্ধিদের হাতে রাজনীতির হাল ছেড়ে দিয়ে হাবা-গোবা ভালোকে কতক বিনায় করেছিলেন, কতক চরকা-তাঁতে লাগিয়েছিলেন। এখন রাজনীতি মাকে দরিয়ায় ডুবলো : কিন্তু নীচদের সে কথা কে শুনে। এবারে সুবুদ্ধির সমস্ত রাজনীতিটাকেই হেসে উড়িয়ে দিয়ে খুবড়ে মেয়ে আর বিধবাদের বিয়েতেই কোমর বাঁধবেন, এ রকমই দেখা যাচ্ছে। আমরাও বলি, রাম, বাঁচা গেল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আবার ত অন্ততঃ রেগুলেশন ও অর্ডিনান্সের ভয় ঘুচলো। সে রাম তিলকও নাই, সে রাজনীতির অযোধ্যাও নাই। যাদুগোপালরা ত সে ছাড়া হয়েইছে, আমরাও সকলে হাঁপ ছাড়লুম। কি শুভক্ষণেই কাউন্সিলী রাজনীতি এসেছিল। বেঁচে থাকে আরেঙ্গারের গো!

শ্রীবসুমুখ্য

মোহিনী

অনন্ত-সুষমাময়ী বিশাল ধরণী,
তৃপ্তি-সুখ-সৌন্দর্য্যের বিপুল সম্ভার
আদরে আপন বক্ষে ধরেন জননী
জীবের মঙ্গল হেতু—স্নেহে অনিবার।

হাসে চন্দ্র, ফুটে ফুল, পিক-কুহুধ্বনি
শ্রবণে অমৃত ঢালে ভ্রমর-গুঞ্জন,
বহে স্নিগ্ধ মলয়ের পবন আপনি
জন্মান্তর-স্মৃতি যেন পরশে জীবন।

কি অভাব এর মাঝে ছিল নাহি জানি—
জানিতাম এ ধরায় এই মাত্র সবি,
তুমি আসি সে সবতা পুরাইলে, রাণী,
দেখালে নূতন বৃত্ত—সম্মোহন ছবি।

জানি না, মোহিনী, তুমি দেবী কি মানবী,
জানি মাত্র করিয়াছ অ-কবিরে কবি।

শ্রীনরকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য